জলসাঘরে চলে যাইস্কেল, ছোটে মূর্তির ফোয়ারা—খেলাঘরে ব'সে
সাধীসঙ্গীহীন মা-হারা একা খাঁ খাঁ-করা শূন্য পুরীতে যেন পাপড়ি
দেবশিশু যেন ছোট্ট এক ডানাকাটা পরী

নান্থা ফ্লাই-ক্লা

বিশ্বসেরীর কত ইথম্যান বলে

বিচিত্রা ইন্টারন্যাশনালের এক রাত্রের অবদান ছবি।

নাগি রেড্ডি প্রযোজক

পরিচালনা : টি. প্রকাশ রাও সঙ্গীত : কল্যাণজী আনন্দজী কাহিনী : চৌহিহর কে. মূর্তি-
সংলাপ : শিবরাজ আচার্য গান রচনা : সরিক আলোকচিত্রণ : রবীন্দ্র ঘাটোলে
শিল্পনির্দেশনা : এস. রঙ্গ রাও

ম্যাস্কিকতার জয়ধ্বনি দিলো নতুনের অন্বেষণকে স্বাগত জানালো, নাগি রেড্ডির
হিন্দী ছবি ভারতীয় চলচ্চিত্রশিল্পে মাইলস্টোন হিসেবে অভিনন্দন পাবে।

খেটে খাই –
ষোল-আনা তৃপ্তি চাই !

সিজার্স
সব সময় তৃপ্তি দেয়—এর স্বাদই আলাদা

৫৫ পয়সায় ১০টি

১২৬১-৩

এল-পি রেকর্ড

'জয় মি ফেস্টিভ সীজন'

আরতি মুখোপাধ্যায় . আলো চৌধুরী . বিশ্বেশ কুমার শুক্লা মুখোপাধ্যায় . দিপালী মুখোপাধ্যায় . শ্যামলী দেবশর্মা . রামেশ্বর মুখোপাধ্যায় . গীতা মান্নাদেব . শ্যামল মিত্র . সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় . হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

শ্রীরাধার মানভঞ্জন (কীর্তন)

(শ্রীরাধার ভূমিকায়)

শুক্লা বন্দ্যোপাধ্যায়, নিখিল সিংহ, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, শিপ্রা বসু, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও সুবোধ দাস।

ই-পি রেকর্ড

হেমা চট্টোপাধ্যায় (মুখোপাধ্যায়)

একটি বর্ষা সারা ও আরতি কাহার

বাঁধনহারা (কাওয়ালী) . বিশ্বে চট্টোপাধ্যায় (বৈষ্ণব কীর্তন)

শ্যামল চন্দ্র বর্মন (আধুনিক)

সন্ধ্যা মিত্র ও আরতি মুখোপাধ্যায় (ভজন) . সুচিত্রা চট্টোপাধ্যায় (রবীন্দ্র সঙ্গীত)

৪৫ আর-পি-এম

স্ট্যাণ্ডার্ড প্লে রেকর্ড

আরতি মুখোপাধ্যায় . আলো চৌধুরী . মিতা বসু . বিশ্বেশ কুমার . শুক্লা বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্বেশ মুখোপাধ্যায়

সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়

নির্মলেন্দু চৌধুরী

নিখিল সিংহ . শিপ্রা বসু

সন্ধ্যা বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্যামলী দেবশর্মা

হিমাংশু . মান্না দে . মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

মিতা চট্টোপাধ্যায়

মাধুরী চট্টোপাধ্যায়

মান্না দে

শ্যামল মিত্র এবং

মান্না মুখোপাধ্যায় . সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়

গীতা মজুমদার . শ্যামল মিত্র

শিপ্রা বসু . শ্যামলী সন্ধ্যা

মুখোপাধ্যায় . সবিতা চৌধুরী

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

দি গ্রামোফোন কোম্পানী অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড

(ই. এম. আই. সঙ্গীতানুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান)

কলিকাতা . বোম্বাই . দিল্লী . মাদ্রাজ

CC 5409A

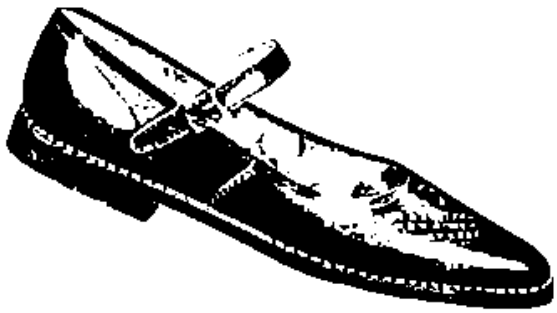

দাপাদাপি, হুড়োহুড়ি···
সকল রকম ধকল
সইতেই তৈরি
বাটার ছোটদের জুতো

পায়ের আরামে ও জুতোর গঠনে যখন যথার্থ মিল, জুতো তখনই হয় আরামের আধার, আর হাঁটিমতো চেকসই। বাটার ছোটদের জুতোর যে নকশা তার মূলে আছে এই আরামনীতি। তাই স্কুলের পথে বা খেলার মাঠে ছোটদের পায়ে বাটার জুতো আজীবন খাঁটি পায়ে চলতে সহায়। সামনে আঙুল খেলার যথেষ্ট জায়গা, বাঁধ থাওয়ানো গোড়ালির গদি, সব মন লক্ষণীয় তাই—বাটার জুতোর এইসব বৈশিষ্ট্যের পাশেই সুন্দর ডিজাইন বেছে ওঠে ছোটদের পা। বড়দের বাছবিচারে নবশাস্ত্র অসংখ্য জুতো এসে মজুত বাটার দোকানে। আজই নিয়ে আসুন আপনার মনোমতো, এদের খাঁটি পায়েই পরে ছোট পায়ের তোড়াতড়ো।

সাধা
১২.৯৯—১৫.৯৯

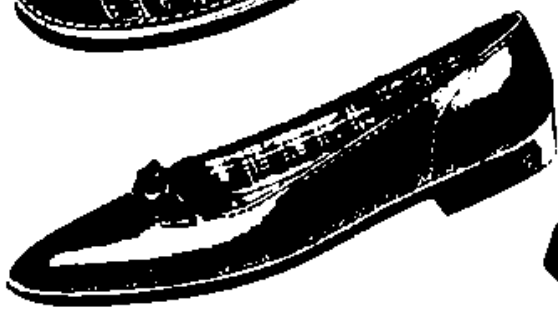

Bata

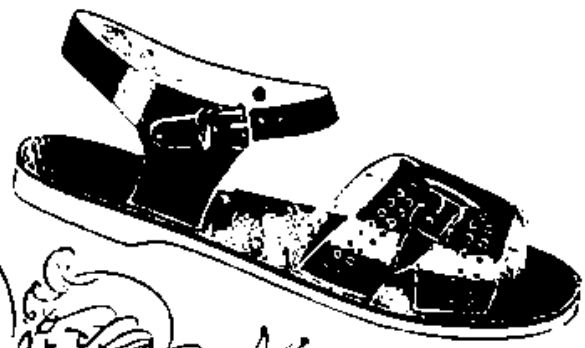

স্যান্ডাল
১৩.৯৯—২২.৯৯

ইউনিভার্সাল এর কর্মকাণ্ডের ব্যাপকতাতে

বিরাট পরিবর্তন

ছোট ছোট শিল্পোদ্যোগী, চাষী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, পরিবহন পরিচালক বা অন্যান্য কৃষি ক্ষেত্রের ব্যাপারে ব্যাঙ্কের যে সুবিধাটি প্রধান বলে গণ্য হয় তা হল ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা যার অর্থই হল

● কারিগরি বিদ্যা
●● পরিচালন পারদর্শিতা
●●● উৎপন্ন দ্রব্যের বা সেবার বিপণন-ব্যবস্থা
●●●● বাস্তবসম্মত দক্ষতা

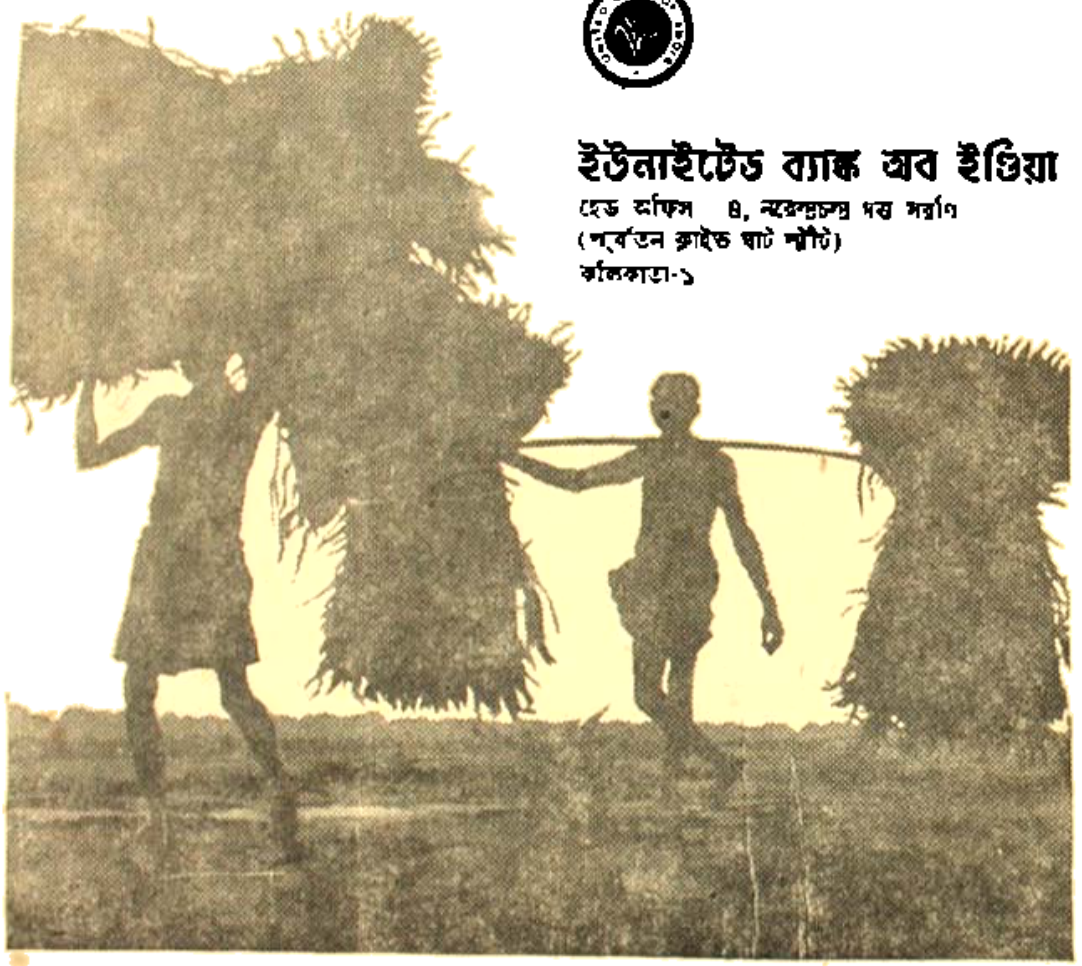

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া

হেড অফিস ৪, নরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত সরণি
(পূর্বতন ক্লাইভ ঘাট স্ট্রীট)
কলিকাতা-১

কোলে
লেমন পাফ বিস্কুট

কোলে বিস্কুট কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-১০

First to establish an automobile factory—1942

First to put on road a car partially manufactured in India—1949

First to achieve production of over 20,000 vehicles annually—1964

First to produce the 200,000th vehicle—1967

First to achieve 99% indigenous content in motor cars—1968

FIRST EVEN TODAY

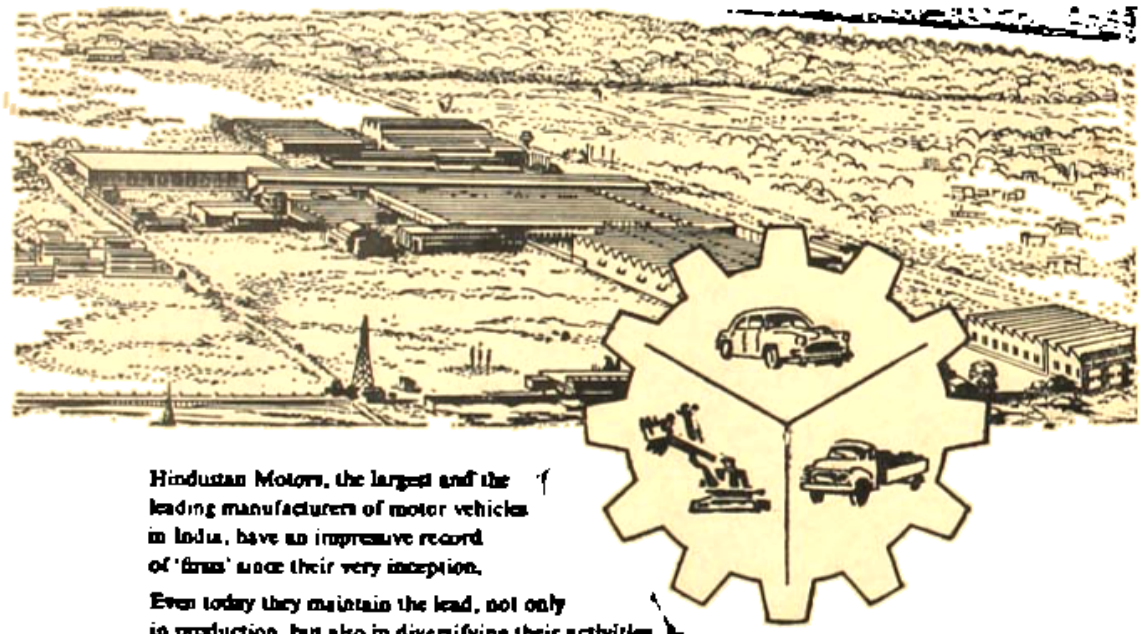

Hindustan Motors, the largest and the leading manufacturers of motor vehicles in India, have an impressive record of 'firsts' since their very inception.

Even today they maintain the lead, not only in production, but also in diversifying their activities, generating employment, boosting the development of raw material production and ancillary and allied industries.

Hindustan Motors are confident of maintaining this unbeaten lead.

HM HINDUSTAN MOTORS LIMITED, CALCUTTA

মলয়
স্যাণ্ডাল সোপ
ও
মলয়
স্যাণ্ডাল ট্যাল্‌ক

দুয়ে মিলে
আপনাকে সারাদিন
চন্দন সৌরভে
ভরপুর রাখবে

মলয় স্যাণ্ডাল সোপের ঘনফেনায়িত দীর্ঘস্থায়ী চন্দন-গন্ধ এবার মলয় স্যাণ্ডাল ট্যাল্‌কেও পাবেন। এই চন্দন-সুরভিত সাবান ও পাউডার একসঙ্গে মিলে আপনাকে আরো রমণীয়, কমনীয় করে তুলবে। মলয় স্যাণ্ডাল সোপের স্নিগ্ধ ফেনায় স্নানে [illegible] আপনি সতেজ হবে আপনার গায়ের ওই স্নিগ্ধ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। মলয় স্যাণ্ডাল সোপ মেখে স্নান সেরে সারাদেহে মলয় স্যাণ্ডাল ট্যাল্‌ক ছড়িয়ে দিন—দেখবেন দিন ভর ঘাম কমকরে ও দুর্গন্ধ রোধ করবে। মলয় স্যাণ্ডাল ট্যাল্‌কের চন্দন-সৌরভ প্রখর গ্রীষ্মের ঘর্মাক্ত মুহূর্তগুলিতেও আপনাকে ঘিরে থাকবে।

দি ক্যালকাটা
কেমিক্যাল কোং
লিমিটেডের তৈরী

[illegible]

This
advertisement
is directed to people who eat

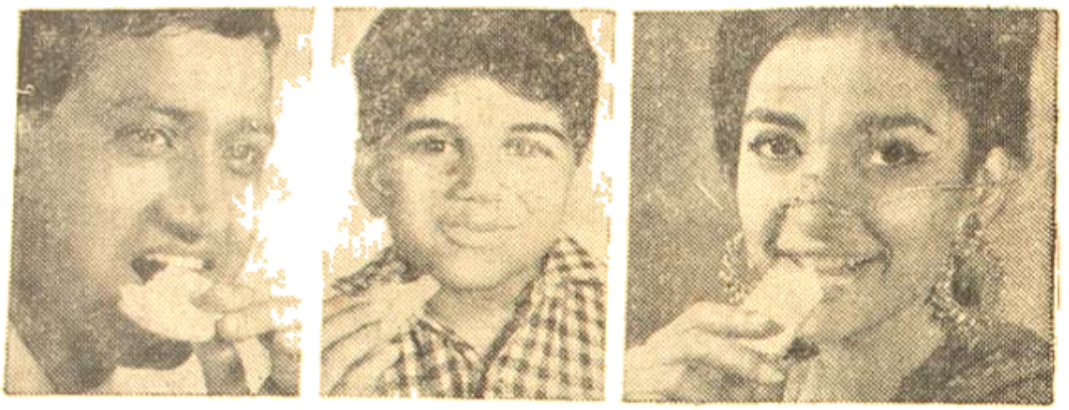

Be wise... Buy the best

BRITANNIA
BISCUITS

আমরা চাই লর্ডের

লর্ডেন্স ও টফি

জেমস লর্ড এণ্ড সন্স লিঃ কলিকাতা-১

JL-24B

আমার রেল ভ্রমণের ছাড়পত্র

যদি কোনও যাত্রী বিনা টিকিটে কিম্বা বেঠিক টিকিট নিয়ে রেলে চাপেন, তবে আদালত তাঁকে ৫০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করতে পারে। সবচেয়ে কম জরিমানা হলো ১০ টাকা।

সঠিক টিকিট না নিয়ে ট্রেণে যাওয়ার সময়ে রেল কর্মচারীদের হাতে পড়বার আগেই যদি কোনও যাত্রী রেলভাড়া মিটিয়ে দিতে চান, তবে খুব কমে তাঁকে ৫ টাকা জরিমানা দিতে হবে।

বিনা টিকিটে ট্রেণে যাওয়ার সময়ে যদি কেউ ধরা পড়েন, তাঁকে খুব কমে ১০টি টাকা জরিমানা দিতে হবে।

টিকিট কেটে ট্রেনে চলা আরও সস্তা

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে

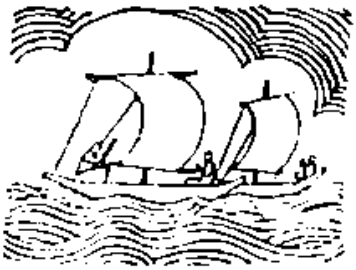

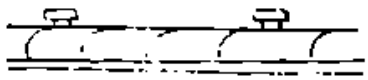

উৎসবের ঋতু শুরু হল।

নীল আকাশ আর
সোনা-সোনা রোদে
দূরের হাতছানি।
ক্লান্ত দিনগুলির স্মৃতিকে
পেছনে ফেলে এই তো
বেড়িয়ে পড়বার
সময়। আর, ঘরছাড়া
বাসুদেবরাও তো ঘরে
ফেরার জন্য উদ্‌গ্রীব।
তাঁদের যাত্রাপথ শুভ
ও নির্বিঘ্ন হোক।

পুরী বেলাভূমে

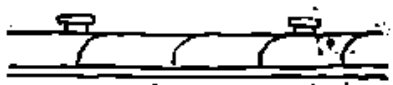

সূচী

উপন্যাস

রেশম বসু নারায়ণ সান্যাল

গল্প

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় । ২ । জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী । ৮ । নিরঞ্জন কর । ৩৭ । নরেন্দ্রনাথ মিত্র । ১০৬ । পঞ্চিলারঞ্জন বসু । ৮৯ । শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় । ১০৯ । সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ । ১৫৭ । অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় । ১৯২ । আশা দেবী । ১৮৬ । অজয় গুপ্তগুপ্ত । ১৮ । তুলেন্দ্র ভৌমিক । ১৫৬ । রমেন্দ্র রায় । ১৯১ ।

অনুবাদ গল্প

অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়

কবিতা

। ২০১-২০ ।

জলীলউদ্দীন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণ ধর, গৌরকিশোর ঘোষ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, রাম বসু, যোগিত চট্টোপাধ্যায়, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, তরুণ সান্যাল, বিজয়া মুখোপাধ্যায়, অমিতাভ গুপ্তগুপ্ত, সুধেন্দু মণ্ডিক, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, দণ্ডানন্দ ভট্টাচার্য, শান্তি লাহিড়ী, দেবারতি মিত্র, শংকর চট্টোপাধ্যায়, বেলাল চৌধুরী, শিবেন চট্টোপাধ্যায়, শান্তিকুমার ঘোষ, বিজয়কুমার দত্ত, অরুণ কর, রবীন সুর, তপন দাস, শ্যামলেন্দু রায়, ধীরেন গঙ্গোপাধ্যায়, জিতেন চৌধুরী, জিয়াদ আলি ।

আলোচনা

নিত্যপ্রিয় ঘোষ । ১২৩ । কৃত্তিবাস ওঝা । ১২৯ । মিহাই বসু ।
নীলরতন ঠাকী । ১৩৮ । রঞ্জনা সেন । ১৬০ ।
পূর্ব পাকিস্তান থেকে—মুর্তজা বশীর । ১২ ।
নূরবীন খাঁ । ১৯ ।

মাঠে ময়দানে

অজয় বসু । ১৪৪ । অরুণ বাগচী । ১৫০ । কালকেতু । ১৬৮ । চিরঞ্জীব । ১৫২ । তপন ঘোষ । ১৩৭ ।

চিত্র ও মঞ্চলোক

অভিজিৎকুমার ঘটক । ১৪৩ । দুলাল সেন । ১৭৭ । জ্যোতির্ময় বসুরায় । । ১৭৩ । সুরধুনী । ১৪৩ । নিরীক্ষিৎ । ১৭৯ । চিত্রশ্রী । ১৭৭ ।

কার্টুন কিচার

শঙ্কর রায় ও সুব্রত ত্রিপাঠী । ১৯০ ।
কার্টুন : রেবতীভূষণ । ১২২ ।

প্রচ্ছদ ও স্কেচ : রবীন মণ্ডল, অলংকরণ : সুব্রত ত্রিপাঠী, আলোক চিত্র : দণ্ডানন্দ ঘোষ

সম্পাদকের চিঠি

মা কোথায় আসছেন ?

[illegible] "অমুক ক্লাব বা অমুক লাইব্রেরি আবাহনে মা আসছেন।" কোন ডাকে সাড়া দিতে মা আসবেন—পুজো-কমিটির লাউডস্পীকার-ঢাক-ঢোল-কাঁসরঘণ্টা মুখরিত আবাহনে, না ভক্ত-হৃদয়ের আকুল আকুতিতে ? যার ডাকেই আসুন, প্রতিবারের মত এবারও অসুর-দলনী, দুরন্ত-প্রশমিনী মা আসবেন, কিন্তু কোন্ বাংলাদেশে, কোন্ ভারতবর্ষে ?

এ ভারতের পটভূমিকায় 'মা যা হইবেন', সে রূপ বর্ণনা করতে গেলে নব-কলেবরোত্তরে আবার কলম ধরে অনেক লিখতে হবে, অতিরেকের আবাহনও আমাদের সে চিত্র আঁকা যাবে না। এ ভারতের বর্তমান রূপ যথাযথ ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন মহাত্মা গান্ধীর ছোরা-বিদ্ধ বক্ষ আরক্ত পরকর যান। সারা ভারতে আজ যে ঘৃণা ও হিংসাত্মক পরিবেশ রাজত্ব করছে তার বিরুদ্ধে অনশনের প্রাক্কালে তিনি জিজ্ঞাসা করেন—"ভারত কেন আজ শান্তি ও মৈত্রীর পথ ত্যাগ করেছে ? ভারতীয় নেতারা কেন কোন পথে চলেছে, দেশে আজ কি ঘটছে, সে বিষয়ে ভালো ভাবে চিন্তাই করেন না।" গান্ধী জন-মত বা বহিরঙ্গ অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের তিনি উঠোর সমালোচনার কশাঘাত করেছেন—শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের আয়োজন করতে ইংরেজ-আমেরিকা দৌড়াদৌড়ি করছে, বিদেশীরা যে তোমাদের দুখে গান্ধীজীর বাণী শুনে যাবে ! তারা তো জানে, ভারতে এখন হিংসা, ঘৃণা ও অ-মানবীয় মনোবৃত্তির রাজত্ব চলছে।

আর পশ্চিম বাংলা ? সে উদ্যোগ বা সুরু করেছে শতবার্ষিকীর পূর্ণ সূচনার বিশ্বজনবন্দিত জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর মূর্তিতে মাল্যচন্দন করেছে সেও হয়তো আজকে বাংলার রূপটি ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিল ! বন্দুকধ্বনি, বুলেটধ্বনি, আর্তনাদ ও ঘৃণার এ রাজ্য কেবার আলোড়িত হচ্ছে। মহালয়ার আরাধনায় 'শান্তি' তার বাতিক্রম নেই। টিভিমোই 'সর্বজনীন' দুর্গাপূজাগুলিতে পাড়ায় পাড়ায় রেজারেমি সুরু হয়েছিল, এখন সেটা বিভিন্ন 'পাড়ার পূজোর মধ্যে সংক্রামিত হয়েছে।

এই উন্মত্ত হানাহানি ও ছোরাছোরি-মধ্যে মা আবার আসছেন। প্রার্থনা করি যেন তাঁর অভয়হস্তের স্পর্শে ভারতবাসী ও বাঙালীর চিত্ত-জড়ত্ব দূর হয়ে ঘরে ঘরে আবার শান্তি বিরাজ করে।

আবার কুণ্ডুমশাই। শুনেই দিবিয়া যেন ভয়ঙ্কর রেগে চিৎকার করে উঠলেন লোকটাকে।

'যতো সব লোক! যেখানে কি নেই নাকি ওর?'

দিবিয়া যেন কেন এত রাগ করেন বুঝতে পারি না আমি: কুণ্ডুমশাই তবু লোকমাল ছোটখাটো মানুষ। খুব আস্তে আস্তে কথা বলেন। দিবিয়ার সামনে এসে, হাতের ছাতাটা দু হাঁটুর ভেতরে চেপে ধরে, ঘন ঘাসের মধ্যে নামিয়ে।

আমি বলি, 'দিবিয়া, উনি যখন বাড়ীটা কিনেছেন, তখন আমাদের তো চলে যাওয়াই উচিত।'

'যাবার সময়ের কথা আপনাকে ভাবতে হবে না। আপনার কোনো কাজেও যেতে হবে না আমি—' দিবিয়া রেগে গেলেন: 'বলেছি তো, আমি ঘর ছাড়ব না।'

আর একটু চুপ করে থেকে, 'আচ্ছা' বলে, কুণ্ডুমশাই চলে গেলেন।

আমি বলি দিবিয়া। আমারা সব বাড়ীর কাজ থেকে কিরে কেউ টালীগঞ্জ, কেউ দমদম, কেউ পাতিপুকুর। মা দিবিয়ার একবার বেরে। দিবিয়া আমাদের সঙ্গে মা-কেও বাড়ীর কাজ ছিরেছিলেন। মা নিতে চান নি, যানপর জন্যে ছিরেছিলেন মাসাদের। বলেছিলেন, 'আমার কী দরকার, ওরাই নিক।'

তখন বাবা ভালো চাকরি করতেন। আমরা অন্য একটা ফ্ল্যাটে থাকতাম। মা মারা যেলেন হঠাৎ। বাবার যে কী হল তারপর—চাকরি-টাকরি ছেড়ে হঠাৎ কোথায় চলে যেলেন সন্ন্যাসী হয়ে।

তারপর থেকে আমি আর দিবিয়া।'

মামারা বলতে আরম্ভ করেছিলেন আগে থেকেই। ছোট মামা তিন তিন করেছিলেন, গত বছর ওঁরাও অন্য কিছু ছেড়ে চলে যেলেন পাতিপুকুর।

পরেরো আনা অংশের বাড়ী। সামনে, যখন আগে যখন লোভা ছিল, তুলে ফেলেছে। এখন ঢালা হয়ে আছে আর এক ফালতায় ঘাস হয়ে আছে যেন মলাইয়ের ছোটো গাড়ীটার লোহা লক্কড়। কেবল দুটো আমের গাছে মুকুল ধরে এখনো—ঢালুতে নারকেল গাছ ওপরে ফাঁকি।

এখন আর একাংশটা দিয়ে কেউ ঢাব দেয়ে যেতে দেয় না দিবিয়াকে। যতো যতো কুণ্ডু মলাইয়ের লোক এসে ফাঁকি মারায়। দিবিয়া বন্ধ করে যেন চালালা।

আমি বলি, 'দিবিয়া, আমরা চলে যাই।'

দিবিয়ার মুখ ভোম হয়ে ওঠে: 'কোথায়?'

দিবিয়া বলেন, 'কিনেছে তো বেশ করেছে। এত বড়ো ভেতলা বাড়ী, পনেরো-খানা ঘর। দুখানা নিয়ে তো আমরা পড়ে আছি একধারে। কী এমন রাজপের-সংসার ওর যে তেরোখানা ঘরেও কুলোবে না।'

আমি বলি, 'দিবিয়া, আমরাই বা থাকব কেন? বাড়ী যখন আর আমাদের নয়—'

'কিনুক না—এক ফোঁটা ছেলে। শ্বশুরের ভিটে, তিন পুরুষের বাড়ী, ছেড়ে দেবে হল?'

'কিন্তু মামারা তো সবাই নিজের জন্যে কিছুটা করে চলে গেলেন।'

'দায় পরিসনি ওদের, ওরা আমার ছেলে নয়, কুলোয়ার। আমি যাব না এ-বাড়ী ছেড়ে। দেখি, কী করে ওরা।'

তবু কুণ্ডুমশাই এলেন। বসলেন পুরোনো সোফাটায়। মাথা নীচু করে, দুটো হাঁটুর ভেতরে ছাতাটা গুঁজে চেয়ে রইলেন মোজাইক দেয়া বাগানা ভেতর দিকে।

খুব আস্তে আস্তে বললেন, 'কিনেন চৌধুরী, বাড়ীটা কিনেছেই—যখন একটু থাকাই-টাকাই করতে হবে। কিন্তু লালাতে হবে এবার।'

'বেশ তো লালান কিন্তু।'

'কিন্তু আপনি ঘর দুটো ছাড়লে—'

'আরো তেরোখানা ঘর তো রয়েছে, বড় দুটি লাগবে না।'

'তাতে তো সুবিধে হবে না। সবগুলো এক সঙ্গে হলে—'

'আপনাকে ছাড়তেই বলেছি, আর ঘর ছাড়ব না।'

'কিনেন চৌধুরী, এতে আপনার কোনো লাভ নেই, আমারও ক্ষতি।'

'আমার লাভের কথা আপনাকে ভাবতে হবে না। আপনার কোনো ক্ষতিও দেখতে না আমি—' দিবিয়া রেগে গেলেন: 'বলেছি তো, আমি ঘর ছাড়ব না।'

আর একটু চুপ করে থেকে, 'আচ্ছা' বলে, কুণ্ডুমশাই চলে গেলেন।

আমি বলি দিবিয়া। আমারা সব বাড়ীর কাজ থেকে কিরে কেউ টালীগঞ্জ, কেউ দমদম, কেউ পাতিপুকুর। মা দিবিয়ার একবার বেরে। দিবিয়া আমাদের সঙ্গে মা-কেও বাড়ীর কাজ ছিরেছিলেন। মা নিতে চান নি, যানপর জন্যে ছিরেছিলেন মাসাদের। বলেছিলেন, 'আমার কী দরকার, ওরাই নিক।'

তখন বাবা ভালো চাকরি করতেন। আমরা অন্য একটা ফ্ল্যাটে থাকতাম। মা মারা যেলেন হঠাৎ। বাবার যে কী হল তারপর—চাকরি-টাকরি ছেড়ে হঠাৎ কোথায় চলে যেলেন সন্ন্যাসী হয়ে।

তারপর থেকে আমি আর দিবিয়া।'

মামারা বলতে আরম্ভ করেছিলেন আগে থেকেই। ছোট মামা তিন তিন করেছিলেন, গত বছর ওঁরাও অন্য কিছু ছেড়ে চলে যেলেন পাতিপুকুর।

'আর কোনো ভাড়াটে বাসাল।'

চলে যেলে যাওয়া-পরার আমাদের যে অসুবিধে তা নয়। আমি জানি, সংসারী হওয়ার আগে বাবা কিছু টাকা রেখে গেছেন ব্যাঙ্কে আমার নামে। আমাদের আর্টিস্ট মশাই বলেন, পনেরো বছরের ফিক্সড ডিপোজিটে। কিছু গয়নাগাঁটিও রেখেন। দিবিয়ারও অল্প কাঁটা টাকা আছে। যা সুদ আসে মাসে, তাতে চলে যায় আমাদের। আমার বয়স ষোল এখন। তবু আমি জানি, তাতে আমার আর দিবিয়ার চলে যাবে।

ছোটো মামীমা এসে বলেছিলেন, 'আমাদের টালীগঞ্জের বাড়ীটা খুব ছোট নয়, আপনি টুটুলকে নিয়ে—'

দিবিয়া বললেন, 'মউমা, বাড়ী যাও। এখন আমার রান্নার সময়।'

ছোটো মামা বলেছিলেন, 'আমি আমার মতো রোজগার করি না ঠিক, তবু তুমি আর টুটুল—'

দিবিয়া বলেছিলেন, 'দূর হয়ে যা সামনে থেকে। তোদের যা নেই, মরে গেছে।'

ঝিলিমার ঘরে ঢোকে আর এই ছেলের চেহারাই ও বাড়ী ছেড়ে যাবেন না।

'আমি শান্তনাডাঙার চৌধুরী বাড়ীর বউ। বড়ো লোকের পাড়া আর বড়ো বাড়ী ছাড়া থাকি নি। কেমন যাব এখানে থেকে?'

আমাদের পাশের বাড়ীতে আসিস্টেন্ট। ও পাশে এক প্রস্থ সাহেব সামনে ডাক্তারের বাড়ীতে বাড়ী। ওদিকে এক মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী থেকে কাছে বেশ্যা চেহারার আর সব সাহেবের বাড়ীর ঝাড়ে ঝাড়ে ঘুরে আর ঝিলি ঝিলিয়ে। এখন তেই আসে না।

এই তো কেমন আমি আর ঝিলিমা অন্তর্গতভাবে সব কিছু ভাগ করে নিচ্ছি। তার সাহেবের চেহারা সামনে ওদের গাড়ী এসে দাঁড়াল। নামলেন বড়ো একটা প্রস্থ ঝিলিমা। সামনের দেওয়ার দেখতে পেলেন না।

বাড়ীতে ওদের কালো আলসেশিয়ানটা ছিল। তার নাম ডিকটর। তাকে ডেকে বললেন, 'ডিকটর, কুইক—কুইক—'

প্রভু—হবে না ছিলেন, তার সম্বন্ধেই হে কি, মালপত্র নেমে না এল, বড়ো মালা একটা মস্ত সেন্টারটেবিলে কিনেছিলেন, ওদের গ্রামে না আর বাবা এখানে কতদিন বেড়াতে আসতুম, দেখতুম লনে নেট খাটিয়ে মেয়েরা ব্যাডমিন্টন খেলছে। আমি ছোট ছিলুম, ব্যাডমিন্টন খেলতে পারতুম না—কিন্তু, একটা দোলনা দুলত ওদিকের আম গাছে। তখন আমারই বয়সী—পাঁচ-ছ বছরের মামাতো বোন চুমকি আর আমি ওই দোলনায় দোল খেতুম। আর তখন—তখন—আমার বেশ মনে পড়ে। এই রকম গিন্নী—এত মোটা ছিলেন না তখনো—এসে, বেতবনার ঢল ঘরের মেঝেতে ঝিলিমার সামনে পাতল-পাটিতে বসতেন। অনেকক্ষণ বসে থাকতেন। আহ্লাদে আহ্লাদে মুখ করে বলতেন, 'আমাই মা, বাবুর্চির রান্না খেয়ে মুখ পচে গেল, আপনার হাতের তৈরী ডালা দই আবার কবে খাওয়াচ্ছেন?'

এখন আর ঝিলিমা ডালা দই তৈরী করেন না। দোতলার হলঘরে কুণ্ডু মশাই মস্ত বড়ো তালা ঝুলিয়ে দিয়েছেন একটা। পাতল পাটিটা যে কোথায় গেল, জানি না। এখন খুব ছোটো হয়ে গেছেন গিন্নী আর চিনতে পারেন না আমাদের।

'ডিকটর, কুইক—কুইক—'

'ঝিলিমা, এ বাড়ী ছেড়ে আমরা চলে যাই।'

'কোথায় যাব?'

'যেখানে হোক ছোট একটা বাসা নিয়ে—'

'শান্তনাডাঙার চৌধুরীদের বউ আমি। আমি কখনো ছোট বাড়ীতে থাকি নি। পরদেশের পাড়াতেও না।'

কিন্তু, তোমা বলার কতদিন আমি জানি, আমরা গরীব। আমাদের গাড়ী নেই, টেলিফোন নেই, রেডিওগ্রামেও না। আমরা পরে ছাঁটাই। ঝিলিমা যেদিন কালীঘাটে যায়, সেদিন কেবল ভিড়-পড় চাপি।

পাড়ার বড়ো লোকেরা আর চেনে না আমাদের। ওই অ্যাসিস্টেন্টের বাবা তো ছিলেন অ্যাডভোকেট, সাদা মশাইয়ের ফ্রেন্ডিয়ার—ঝিলিমার কাছে শুনেছি। তখন ড্রাইভিং বসে থাকতেন গাড়ির ঘরে। আর সেদিন অ্যাসিস্টেন্টের ছেলে অর্চিতাদির বিয়ে হল, বই, আমাদের তো নিমন্ত্রণ করল না।

'ঝিলিমা, এখানে না থাকাই ভালো—' এর বেশি বলতে পারি না আমি।

ঝিলিমা ধমক দিয়ে বলেন, 'তুই চুপ কর্। এক রত্তি ছেলে, সব ঝিলিমের মধ্যে কথা বলিস কেন?'

আমি তাকিয়ে দেখি, ছয় নিম্নশ্রেণীর ছোট ছেলেটা একটা লাল রবারের বল ছুড়ে ছুড়ে ওদের লনের ভেতরে খেলা করছে। ওই ছেলেটা আমারই বয়সী—তখন ভতবার আসত সেইবার ছোটো—বলত। 'তোমের দোলনায় আমাকে চাপতে দেবা ভাই।'

এখন আমাকে চিনতে পারে না। শিস্ দিয়ে দিয়ে কী সব ইংরিজি গান গায়। ইচ্ছিল ঝিলিমার স্কুলে পড়ি। আর আমি যাই সাউথ সুবার্বানে।

'ঝিলিমা, এখানে আমার ভালো লাগছে না।'

'চুপ কর বলছি।'

ঝিলিমা বড়ো লোকের বউ। বড়ো লোকের পাড়া ছেড়ে কোথাও যাবেন না।

০ ০ ০

সে কি দত্ত এলেন। আমাদের আর্টনি। ওর মু-তিন আমেরিকার পাড়াটা দেখেই চিনতে পারলুম।

'বড়ো মা।'

ওই নামেই ঝিলিমাকে ডাকেন।

'আবার কী হল তোমের?'

'আমি যদি কি বড়ো মা—বাড়ীটা ছেড়েই দিন।'

'তুমিও ও কথা বলছ যোগেন?'

দত্ত মশাই খুব দুঃখিত হয়ে বসে রইলেন একটু।

'কী করা যাবে, বড়ো মা। বাড়ী তো বিক্রী হয়ে গেছে। আমাদের কোনো রাইট নেই।'

'ও সব বুঝি না। আমি যাব না।'

'সে বললে তো হবে না। আগে মশাই খুব নামী অ্যাডভোকেট ছিলেন, আপনি তার স্ত্রী। আইন যে একেবারে বোঝেন না তা তো নয়। ওরা ডোটের অনুমতি নোর করে বের করে দেবে।'

'জোর করে?'

'হাঁ, তাই।'

ঝিলিমার চোয়াল শক্ত হয়ে উঠতে লাগল।

'যদি না ছেড়ে চাই?'

'কেলেঙ্কারী বাড়বে।'

'বাড়ুক, দেখতে চাই সেটা।'

বড় মশাই একবার চশমাটা খুললেন, আবার পরলেন, আবার খুললেন। যখন খুব ভাবনায় পড়েন তখন আমি ওই রকম করতে দেখেছি ওঁকে।

'বড়ো মা—'

'আমি কোনো কথা শুনতে চাই না যোগেন।'

'বড়ো মা, তবু শুনতে হবে—' বড় মশাই আবার চশমা খুললেন, আবার পরলেন : 'এতদিন এ বাড়ীতে মানে মর্যাদায় বাস করছেন। আর যদি ওরা ডোর্ট থেকে লোক এনে সব জোর করে রাস্তায় টেনে ফেলে দেয়, ভালো হবে সেটা? চারদিকের লোকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবে, মজা পাবে, তাতে কি চৌধুরীদের—'

ঝিলিমা পাথর হয়ে গেলেন একটু সময়ের মতো। বোধ হয় প্রথম গিন্নীকে মনে পড়ে গেল তাঁর।

'সেই মতোই—'

ঝিলিমার চোখ মুখটা আর দেখতে পাচ্ছিলুম না আমি। মনে হচ্ছিল, কাপড়া হয়ে গেছে।

দিদিমা চুপ করে রইলেন।

দত্ত মশাই সামনে পেছে বললেন, এসব ছেড়েই আমি দু খানা ঘর ঠিক করেছি আপনার জন্যে। একতলা হলেও ভালো, আলোবাতাস যথেষ্ট—ভাড়া খুব কম, পঞ্চাশ। আপনারা ইণ্ডাস্ট্রিজ থেকে না পান, ওতে এ ভাড়া দিতে কষ্ট হবে না।'

'আর যদি আমি এই বাড়ীতেই ভাড়াটে হয়ে থাকি?'

'কিন্তু রাজী হবে কেন? আর রাজী হলেও হয়তো মোটা টাকা চাইবে। পারবেন দিতে?'

দিদিমা চুপ। না—মোটা টাকা ভাড়া আমরা দিতে পারি না।

'বাসাটা কোথায়?'

'ওই তো দেখছেন। হেঁটে যেতে দশ আট মিনিট। অমর বিশ্বাস লেন।'

'অমর বিশ্বাস লেন! সে তো ছোটলোকের পাড়া।'

'ছোট লোক নয়—' দত্ত মশাই হাসলেন। 'মধ্যবিত্ত মানুষেরা থাকে।'

'সেখানে গিয়ে থাকব পাহাড়তলার চৌধুরীদের নাতি হয়ে?'

কিন্তু একটা বলতে গিয়েও থেমে গেলেন দত্ত মশাই। চশমাটা খুলে আবার পরলেন।

'ভাববেন কেন? দিদিমা (হাসে, আমি বড়ো হোক, কুৎসী হোক, তখন আবার আপনাকে সুন্দর বাড়ী করে দেবে অমনি ওলো রাস্তায়। এর চাইতেও ভালো জায়গায় থাকবে সেখানে।'

দিদিমা বললেন, 'তাছাড়া আমাকে বাঁচতে হবে না।'

'কে বলছে?'—দত্ত মশাই হাসলেন আবার। 'সাহেবদের যুগ। একশো বছর বাঁচা তো কিছুই নয়। আমিই কি আশা রাখছি নাকি? সে বাড়ীর গৃহ প্রবেশে আমিও নেমন্তন্ন পাব যে।'

দিদিমা চুপ।

'তাহলে বাসাটার ব্যবস্থা করি বড়ো মা। মানে ব্যবস্থা করাই আছে—পাকা করে আসি।'

'আর থাক সোমেন। আমাকে ভাবতে দাও।'

'ভাবুন না, সময় নিন আরো দু-চার-দিন। আমি কুণ্ডুকে ঠেকিয়ে রাখব।'

আমি জানি, সারা রাত ঘুম হল না দিদিমার। পাহাড়তলার চৌধুরী বাড়ীর বড় মেওয়ালে পিঠ দিয়ে বসে রইলেন। ভালো করে ঘরগুলোর কোথায় জানলা খোলা ছিল একটা, সারা রাত হওয়ায় আছাড়াচ্ছিল তার পাল্লা—রুদ্ধ রুদ্ধ করে উঠছিল কাচগুলো, আমি ছেলে ছেলে উঠছিলুম তার শব্দে—আর দেখছিলুম অন্ধকারের ভেতরে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দিদিমা বসে।

ঠায় বসে।

o o o

ছেড়েই হল শেষ পর্যন্ত। না দিয়ে উপায় ছিল না।

কলটুকুই না রাস্তা। পুরোনো লোহা, বাঁশ, আর দু-একটা বাকস চলল ঠেলায় চেপে। আমি আবার স্কুলের ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিলুম কাঁধে। দিদিমার হাতে একটা ছোট ঘটে।

অন্য রিকশায় চালনা খুললেন, ব্যারিস্টারের এসে দাঁড়ালো বাসকম্পিতে। আমরা কেনো দিকে তাকালুম না। ৩৫ নম্বরীয় ছোট ছেলেটা একটা ইংরিজি গান দিল বিড়বিড়িয়ে। কিন্তুটার লাফাচ্ছিল মনে।

শুধু যে বুড়ো গাছটা আমাদের খুব প্রিয়, সেই-ই ওদে দাঁড়ালো মু চোখে চল নিয়ে।

'অতো না, চলে যাচ্ছি?'

দিদিমা উত্তর দিলেন না।

বললুম, 'অমর বিশ্বাস লেনে।'

'ও তো নতুনদিক। আমি যাব।'

আর কেউ একটা কথা বলল না—কেউ না।

আমরা চলে এলুম অমর বিশ্বাস লেনে। খোয়া-ওঠা রাস্তা। পুরোনো ছোট ছোট বাড়ী। তাদের মন নেই, কারো ছোটর নেই।

আমি সন্ধেরো নম্বর বাড়ী। দুলে যাওয়া লাল রঙ। একতলা। চারটে ঘর। দু ঘরে অন্য ভাড়াটে।

দিদিমা দাঁড়িয়ে রইলেন একটু। আমি চাইতে পারলুম না তাঁর মুখের দিকে।

ঠেলার কুলিরা তিনটে তুলেছিল ঘরে একটা বাক্স পড়ে গেল রাস্তায়।

অমনি ছুটে এল পাশের ঘর থেকে ধবধবে লাল পাড় সাড়ী পরা বউ একটি।

'আহা-হা, পড়ে গেল কাচগুলো! এই কুলি—কী করছ এ সব?' তেলেগু মিশিয়ে বললে, 'আপনি বুড়ো মানুষ, কিছু বলবেন না—আমরা ফার্নিচারের সব পুরিয়ে দিচ্ছি। খুকু—খুকু—'

খুকুকে ডাকতে হল না। ছিটের ফ্রক পরা আমারই বয়েসী খুকু আগেই এসে দিয়েছিল।

'যাও—যাও ওদেরো—'

আরো পাঁচ মিনিট পরে দেখলুম, খুব খুশি হয়ে দিদিমা বসে আছেন বউটির সঙ্গে। আর বউটি বলছে, 'আমাদের মা, আমরাও বামুন। আমার শ্বশুরও নিরামিষ খান। বোনো হাঙ্গামা করতে হবে না, বেলার ব্যবস্থা আমাদের হেঁসেলেই হবে এখন।'

'ভাতো লজ্জা' বেতে না তুলি—দিদিমার চোখ ছুটো চকচক করতে লাগল 'কী নাম তোমার?'

সেই সময় এক পাড়ার ছেলে এসে জড়িয়ে ধরল আমায়। সেখানেই ভর্তি হলুম আমরা সেই পড়ে মিত্র স্কুলে।

কবি জসীম উদ্‌দীনের

নক্‌সী কাঁথার মাঠ

রবীন্দ্রনাথের পরে কোন বাঙলা কবিতাই
দেশে বিদেশে এত আদৃত হয় নাই

ঠাকুর বাড়ির আঙিনায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স

কলিকাতা—১২

সুকান্তের পত্রের চেকসংখ্যক হতেই টুনি মুচকি হেসে ফেলল।

ইতি ওদের মাস্টার-দেওয়া বারান্দায় লিখিত হচ্ছে খাটুরোছিল। বাঁড়িতে দাঁড়িয়ে সামনের লম্বাপাতা, সব-ওঠা রোদ দেখছিল।

টুনি কাছে এসে বলল, "কখন উঠেছিস, ছোড়দি?" বলে আবার সেই মুচকি হাসি।

টুনির হাসি এবং পলকে বোনেটাই ইতির কাছে দুর্বোধ্য নয়। ইতি বলল, "এই তো, খানিকটা আগে—।"

টুনি একবার ইতির সর্বাঙ্গে চোখ ছোড়দি মেয়েই খানিকটা আগে ওঠে নি, বোঝার-মোছা চোখ, গায়ের শাড়ি আমা বাসি হলেও আয়োজনের নয় মোটেই, এমন কি ছোড়দির পায়ে চটি কোড়াও দেখা যাচ্ছে।

টুনি বলল, "চা খেয়েছিস?"

"না।"

"একটু দাঁড়া; আমি তাহলে আসি।" বলে টুনি চলে গেল।

বাড়িটা ভালো ছিল। খুব একটা বড় এলাকা জুড়ে বাড়িটা নিশ্চয়ই নয়, কিন্তু, ছোটখাটো কম্পাউন্ড, দেড়ী দুই লম্বা একা দেখবার গাছ, লোহার রেলিং দেওয়া ঝাঁক, কাঁটা ঝাউয়ের বেড়া—এই সব মিলিয়ে একেবারে ছোটও নয় বাড়িটা। কোম্পানির বাংলো বাড়ি, মাথার উঁচুতে ঢাল, পোড়ো-লম্বা মিলিয়ে যান তিনেক ঘর, তার ওপর একটা বাড়তি অংশ। পেছন দিকে গ্যারেজ, অল্প একটু চত্বরে ওপাশে চাকরের ঘর।

এখন বাড়িতে মাস চলছে। সামনেই মেওয়ালা। বিয়েতে এই মোটামুটি বড় সহরটার পাটের ছোঁয়া লাগছে।

বারান্দার একটা মাঝারী চৌকির অবস্থাই পাতা থাকে। ওখানে বসেই টুনি কুকুর পড়ছে, কখনও অঙ্ক। অবশ্য কোনো কোনো দিন দুটির একটিও নয়। কোনো ঘরে ওরা চার জনই যেন ওই চৌকিরই চারপাশ ঘিরে বসে হয়ে তাস খেলবে, না হয় লুডো। কখনও বেশির ভাগ সময় এ সবে খেলা থেকে বাঁচতে হলে গিয়ে চাই ফরমাস খাটে। কোনো কোনোদিন বা—সন্ধেবেলাতে ওদের বাসিয়ে রেখে মেয়েমেয়েরা।

টুনি মেয়েদের মধ্যে ছোট, ইতির চেয়ে বছর দুই আড়াইয়ের। অল্প, তারও ছোট। ইতির ওপরে এরা দুজন—মাথার ওপর আরও তিন। বড়দি, মেজদি আর দাদা। বড়দি থাকে কলকাতায়, জামাইবাবুর চাকরির জায়গায়। মেজদির বা বাংলো—কারও অবস্থা গন্ডীর নয়, তারাও একেবারে হালকা, হাসি খুশি স্বচ্ছন্দের। এ বাড়ির এটাই বান, কিংবা ধাত।

সামনা পরে বাইরের মেঝিলটাতেই ওরা চা নিয়ে বসল, ইতি টুনিরা। দাদা রেবতী আছে চাকরিতে। বয়স বেশি না, কিন্তু এ বয়সেই বেশ উন্নতি করে বিয়েছে চাকরিতে,

মেকানিক্যাল এঞ্জিনিয়ার, ফ্যাক্টরীর গজল এঞ্জিনিয়ারদের পরলা নম্বর।

রেবতী ইতির সামনে খাবার খেতে বসতে পারে না। সতটা পেরেছিল সামনে খেয়ে নিয়ে স্ত্রীকে দরার চা খেতে খেতে নিজের অফিস যাবার ব্যস্তচুড়ো ঠিকঠাক করতে করতে বলল, "টুনি, মাকে বলবি আমি যেন রাত্রে খেয়ে আসব। রাত্তিরে কিন্তু ডিমার হবে—" বলে ইতির দিকে তাকিয়ে চোখ মটকে হাসল। "কি বল, টুনি?"

টুনি হল মেজদির ডাক নাম, ডাক নাম মধুমালা; ইতির ডাক নাম, টুনি।

মধুমালা হেসে বলল, "আঃ, টুনির লোক আসবে, টুনিই বলবে যাকে। আমি কেন বলব?"

মস্ত একটা ঢেঁকুর তুলে রেবতী বলল, "তুই বড় বিচ্ছু, টুনি। টুনির লোক আমারেরও লোক।...তুই বল তো টুনি, সম্পর্কটা কি হবে?"

টুনি চা খেতে খেতে হেসে বলল, "তাড়াইবাবু।"

"তাই একেবারে একটা গড়ো!... তোর তাড়াইবাবু—তা বলে আমাদের আমরা বড়। আমি, টুনি, ইতি...।"

"ভগবতীপতি।" টুনি বলল।

"এইটু।" রেবতী এবার উঠে পড়ল। তার বাড়বানার সময় হয়ে যাচ্ছে।

মধুমালা বলল, "ইস্ত্রিনের জাইজটা একটু, ভাল করে চেনে নিস, দাদা। নতুন টেইল হয়েছে।"

রেবতী ঘরে চলে গেল। সামনা পরে বেরিয়ে বারান্দার এক কোণ থেকে তার স্কুটার বাইকের নিয়ে চলে গেল।

ঢুকিলে ওরা ঘরে তিন জন, মধুমালা, ইতি আর টুনি; অর্থাৎ ভিন্ন বোন। টুনি, টুনি আর টুনি। অন্তত পড়তে চলে গেছে আসেই। আসন্ন আসন্ন রোদ ছড়িয়ে পড়ছিল মাঠে।

টুনিরও ওঠার সময় হয়ে এল। তারও পড়াশোনা আছে। টুনি এখন সন্ধ্যা সন্ধ্যা অনেকে পড়ছে। বাড়িতে এখনও সে স্কার্ট ব্লাউজের পরে পড়ছে, বাইরে শাড়ি। এখনও রোগা রোগা বলে এখনও তাকে ছোট পোশাকে বেরোতে দেওয়া হয় না।

টুনি বলল, "আমার খুব মজা লাগছে, মেজদি!"

মধুমালা বলল, "কেন? তোর মজা লাগছে কেন?"

"বাঃ, কতদিন পরে হিমালয়কে দেখব। দু বছর।"

"তা দেখবি।"

"খুব মোটাসোটা হয়ে গেছে হয়ত। কলা।"

"কিলেতে গেলে তোকে ফরসা হয় নাকি? কোন কুয়োতে আছে সে টুনি? তাহলে আমি একবার যাব।"

টুনি অপ্রস্তুত বোধ করল সামান্য। বলল, "ধরে, এখানকার জলহাওয়াই ভালো। ঠান্ডা দেশ।"

টুনির কথায় আর বড় কান ছিল না মধুমালা; ইতির দিকে তাকিয়ে গম্ভীর হয়ে বলল, "সত্যি রে টুনি, যদি হিমালয়কে চিনতে না পারি। ওর পাঁচিনো ভাবীবিক্সগুলো দুপুরে একবার দেখিস তো রাখিস।"

টুনি হেসে উঠল।

আর একটু পরেই টুনি চলে গেল পড়াশোনা করতে।

সামনা চুলচাল থেকে মধুমালা ছোট বোনের দিকে তাকিয়ে বলল, "কী রে টুনি, তুই অত চুলচাল কেন, সকাল থেকে খুব দোষড়া। হাসছিল। আজ তো তোরই দিন।"

ইতি হাসছিল শুধু।

মধুমালা বলল, "কী ভাবছিস কি?"

ইতি কোনো জবাব দিল না।

মধুমালা এবার যেন বুঝতে পারল। "তুই সেই কথা ভাবছিস!...খুব পাগল, ওটা কি আবার ভাববার কথা। কে তোর ওখানে দেখতে যাচ্ছে ..।"

মনে হল না, মধুমালার কথায় ইতির বিশেষ কোনো ভাবান্তর হয়েছে। মুখ নীচু করে ইতি একটা ডায়েরি যেন মনঃসংযোগের সঙ্গে পড়ছিল। তারপরে প্রত্যহের মতো

মামার বন্ধু ঐতিও হিমাংশু তবু মামার চেয়ে বয়সে কিছু ছোট। কলেজে মামার চেয়ে নীচুতে ছিল। এ বাড়ির সঙ্গে তার আত্মীয়তাও তত নিকটের নয়। ইতি যখন সবে স্কার্ট পরা ছাড়ে ছাড়ে করছে তখন থেকেই আসা-যাওয়া। তখন ইতিরা এখানে থাকত না।

যতই হলো, ক'বছরের মধ্যে চুপি-চুপি কী হয়ে যায় কেউ বুঝতে পারে না। ইতি স্কার্ট ছাড়ল কী তার মনের কোথাও কিছু বদলাতে লাগল, মনের বাতাসে যেন ফুলগাছের শীষ ভাস দুলছে। কে— কে জানে। অথচ অন্তরঙ্গ হলেছে। এখনই ইতি বুঝতে পারল হিমাংশুকে তার হোস্টের বারে বারে থাকতে হয়। অন্যমনস্ক হয়ে।

এই করেই একদিন তালতোড়ার ব্যাপারটা বুঝিলের কাছে ধরা পড়ে গেল। সে যে কী সুখ, কী আনন্দ। ইতি ঘুমের মধ্যেই কতবার অস্ফুটে করে বলেছে তুমি খুব খারাপ ছেলে, সময় থেকেই তোমার রক্তিমাভি ধারণ ছিল। বহু অসভ্য। ইতি কতবার বলেছে কিনা ভেবেছে—কতবারই আদরে রোমাঞ্চিত হয়েছে।

এইভাবে তাদের ঘুমনের তালধারা স্পষ্ট পাতলা হয়ে গেল। বাড়ির লোকরা সবাই জানল। জেনে কেউ বিন্দুমাত্র অখুশী হল না। বরং ব্যাপারটা সবাইকে সুখী করল। হিমাংশু চমৎকার ছেলে। শান্ত স্বাস্থ্য, স্বভাব, কাজকর্ম কোনো দিক থেকেই এ ছেলে অপছন্দের নয়। মা খুব খুশী। বেজবরুয়া বা ঘুনিও নেহাতই বেঁকে বসেছে, নয়ত এতদিনে ঘুনিরও বিয়ে হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। ঘুনির পর মা ছেলের বিয়ে দেবে, তারপর ঘুনির। বোঝ হয় ঘুনি এবার খানিকটা নরম হয়েছে।

সারাদিনের এবং নিজের এইসব কথা ভাবতে ভাবতে ইতি বেসিনের জল খুলে মুখটা ধুয়ে ফেলল। গাল ভর্তি করে জল নিল, কুলকুচি করে ফেলল, আবার জল নিল।

বাথ রুমের ভিতর একমাত্র জানলার দিকে তাকাল ইতি। কাচের জানলা দিয়ে আলো আসছে। গায়ের শাড়ির আঁচলটা খুলে ফেলল ইতি। ছিলেন থাকার সময় হিমাংশু বলেছিল : 'আমি এ কী আমার নাক, ও তোমার নাক! তোমার কপালে আমার যা কিছু হচ্ছে। দাঁড়াও না, দেখতে দেখতে বুড়ো বয়স বেড়ে যাবে, ফিরে এসেই তোমার কপালে আর আমার কপালে ঠোকাঠুকি লাগিয়ে দেব।'

'কপালে কপালে ঠোকাঠুকি আবার কী।'

'ওই হল। এক সঙ্গে থাকলে, এক বিছানায় শুতে হলে কপালে কপালে ঠোকা লাগবে না। তাই বলছি।'

কথা শুনে কী হাসিই না হেসেছিল ইতি। হিমাংশুর কথাবার্তার ধরনটাই ওই রকম।

ছিলেন থাকার সময়, দেখের দিনে একবার ইতির ভয় হয়েছিল। কী জানি এখানে এক রকম বলছে, ওখানে গিয়ে আবার অন্য রকম না হয়ে যায়। ছিলেন দেশটা খুব খুব নয়, অনেক সময় মামাও যে ঘুরিয়ে দেয়। কে হোস্ট করে বলতে পারে—হিমাংশু মেজাজটা ছিল সেই রকমই থাকবে।

ইতির ভয় অমূলচিন্তা হয়েছিল। কিন্তু হিমাংশু ইতির মা ঘুমে বলেছে : 'তুমি পাগল আছি। চেখে তুমি ছাড়া কেউ নেই। আমি তোমার ঘুমে ঘিরিয়ে করে বাচ্ছি, তোমাকে ছাড়া আমি অন্য কাউকে কখনও ভাবে দেখতে দেব না। তুমিই আমার সব।'

যাবার সময় হিমাংশু বলেছিল : 'ভয় করো না, আমি কোনো খারাপ কাজ করব না।'

হিমাংশু তার কথা রেখেছে। আজ পনের দু বছর সে চেখের বাইরে ছিল। কিন্তু নিয়মিত চিঠি লিখেছে। কোনো দিন কোনো কথা লুকিয়ে রাখে নি। মাঝে মাঝে ছবিটবি পাঠিয়েছে, দু-চারটে উপহারও। হিমাংশু ফিরেও এসেছে। তবে সেটা ছেলে; এখনও ইতির কাছে ফেরে নি।

ওতক্ষণে শাড়িটা গা থেকে খুলে ফেলেছে ইতি। শাড়ি খুলে একটু সময় দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর গায়ের ব্লাউজটা খুলল। খুলে নীচের ব্রাজারটার ওপর হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত। শেষে সেটাও খুলে ফেলল। খুলে বুকের ওপরটা দেখল। তারপর কী মনে করে সরে গিয়ে দেওয়াল-লাগানো আয়নার কাছে দাঁড়াল।

ইতি নিজের মুখ দেখল না। মুখ দেখার বাসনা তার এখন নেই। বুকের ওপরটা দেখল। তার ভাল লাগছে না। সে আঙুল দিয়ে একটা স্তনবৃন্ত বারবার নানা-ভাবে দেখতে লাগল। দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়ছিল মোচড়ায়।

শেষে সাবানটা খুলে ফেলল। খুলে ফেলতেই পেটের কাছে বড় সরু দাগটুকু যেন তাকে ছুরির ফলার মতন খোঁচা দিল।

বুকের ওপরে এবং পেটের নাভির ওপর এই দাগদুটি দেখার পর ইতি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। তার নিঃশ্বাস ভারী এবং ঘন হচ্ছিল। ধরে উপরে বাস বা ঘুমা সে বুঝতে পারছিল না। কিন্তু এই দাগ ও ঘুমা যথার্থই সে করতে পারে।

শেষে অনেকক্ষণ নিজের মুখ ভাল করে দেখতে দেখতে তার মনে হল, জল চেখের কোলের তলায় খুব পাতলা করে অন্ধকার দাগ ধরে আসছে। চট করে বোঝা যায় না। কিন্তু ইতি মনে দেখতে দেখতে ওই দাগ স্পষ্ট হবে। বাড়বে। ছড়াবে। কী চেখের কোলের তলাতেও হতে পারে।

এটা সেদিনই। সন্ধেবেই বুকের তলার দেখা দিয়েছিল। হিমাংশু তখন ছিলেত চলে গেছে। মাসটা ফুরোর পর ইতি গনাগুনি করে নি। ছেড়েছিল সবসুদ্ধ কোনো এমনি বড়-জোর হবে। কিন্তু মাসটা বাড়ছে না দেখে তার সন্দেহ হল, ঘুনি। তারপর চোখে পড়ল—পেটে নাভির ওপরও, দাগ হয়ে আছে।

গায়ে ঘুনি হচ্ছেছে ছেলে কী রকম কোনাই হয়েছিল। কিন্তু মোটেই অন্য-ভাবনা হয় নি। দিন অন্তত লেবুর রস, তুলসীপাতার রস, ঠাণ্ডাটাকি আরও অনেক কিছু লাগানো। পেছে একটা ওষুধও। বাড়িতে কাউকে স্পষ্ট করে কিছু বলল না ইতি; বলল : গায়ে একটা ঘুনির মতন দাগ হয়েছে। এই করে করে মাস দুয়েক কেটে যাবার পর ইতি একদা সাহস হারাল। দাগ একটুও কমল না, বরং আরও স্পষ্ট, গভীর হয়ে উঠতে লাগল। মাসের ছেত্রে অনেকটা বেড়েই গেল। তখন একদিন ভয়ে ভয়ে মেজদিকে নিজের বুকের তলা, পেটের ওপরটা দেখাল। মেজদি বলল, তা হলে সেদ্ধতী-টেদ্ধতী হবে।

মনে হল উচিত ছিল। কিন্তু আর করে ওরা কথাটা লুকিয়ে গেল। বললে যা নিন্দুকের ভাবত; কিন্তু অন্যায় আর ভাকিয়ে লাভ কী। তাছাড়া মেজদি তেমন কোনো গুরুত্বও দিল না কথাটায়। শরীরের মধ্যে হয়েছে তো কি হবে যাবে। সুখে-দুখে তো হয় নি। মেজদি কেমন করে যেন ঘোঁয়া করে করে বুক-চকচকে ওষুধ এনে দিল, হোমিওপ্যাথি গুলি খাওয়াল। দাগ-গুলো কমল না, বরং যত দিন যাচ্ছে— অল্প অল্প করে ছড়াচ্ছে, আরও সাদাটে হয়ে যাচ্ছে।

এই তিনিসটা ইতিকে অনেক দিন থেকেই বড় উৎকণ্ঠায় ও ভীত করে তুলেছে। নিতান্ত এমন জায়গায় হয়েছে যেখানে লোকের চোখ পড়ে না, নয়ত ইতি কি আর কথাটা লুকিয়ে রাখতে পারত। চোখের তলায়, গালে, গালে, কপালে, ঘাড়ে, হাতে—সচরাচর এইসব জায়গাতেই সেদ্ধতী যেন সময়ে ধরে। ইতির যেন অন্তত এখনও সেদিক থেকে কিছুটা রক্ষে আছে। বুকে সেদ্ধতী হয়ে মেলে কী রকম হাঁতি! মেয়েদের বুকে সেদ্ধতী যে কী কাঁকরে তেয়ারা করে বেয় ইতি তা দেখেছে। বনানী ছলে এক স্কুলের বন্ধু ছিল ইতির —তার অমন সুন্দর বুকে একেবারে ভয়ানক দেখাত সেদ্ধতীর মনো।

হিমাংশুকে চিঠি লেখার সময় ইতি সব কথাই লিখত, কত তুচ্ছ কথা—কিন্তু কোনো দিন এই কথাটা লেখে নি। লেখা যায় নাকি? কি হবে লিখে? এখন নয় যে, এর কোনো ওষুধ-বিষুধও জানা আছে। তবু দেখের দিকে তার মন পড়ছিল, হিমাংশুকে

দেখা উচিত: তার চেয়ে মাথা ভাল। নরম পরে.....।

পরের কথা ভাবতে গেলেই ভয় করত ইতির। হিমাংশুর মনে নিশ্চয় খুঁত-খুঁতুনি দেখা দেবে সে কী, দেহটা। বড় বিশ্রী ব্যাপার তো। ওটা তাহির মোক্ষম রোগ, তোমার সারা গায়ে ছেপড়ে, করবে, তোমরা চেহারা নষ্ট করে দেবে। দেহটাকেই ঘৃণা করতে কি হিমাংশু তখন ছিঁড়ে ফেলতে চাইবে।

কিছুই বলা যায় না, বিশ্বাস অবিশ্বাসের পরেও দেখা দিতে পারে। এই দেহটা যে অনেক দিন থেকেই ছিল না তার পরমাণ কি? হিমাংশু কি দেখতে গিয়েছে? হয়ত আগে থাকতেই ছিল, এখন একটা সুযোগ বুঝে ইতি তা চালান দিচ্ছে।

সাত বছর ছেড়ে ইতি কতটা আর লেখে নি। এইভাবেই কেটে গেছে। কিন্তু এখন?

এখন হিমাংশু তার কাছে ফিরে আসছে। আসবেই তাদের বিয়েও হয়ে যাচ্ছে না। হয়ত আরও বছরখানেক কি তারও পরে তাদের বেঁধে করতে হবে। কিন্তু ইতি বুঝতে পারছে, হিমাংশুর এতদিনের আসা বাস্তবিক পক্ষে ইতির অনেক নিকটে আসা, পরের সবই এখন মিথ্যে হয়ে আসছে। যদি কোথাও কোনো অঘটনঘটন হয়ে যেত—তাহলে আসাই হত—হিমাংশু, যখন ফিরেছে ছিল, তখনই। তা হয় নি। হিমাংশু ফিরে এসেছে, তার কথা ভেবেছে, আর আজ সে ইতির কাছে আসছে।

এতখানি পথে হিমাংশু আসছে এই খবরে ইতির তো পাগল হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। টুনি জানছে, ছোড়দি ঘুমটুম ভুলে দুটী করে বসে আছে হিমাংশুদার জন্যে। মামা ভাবছে, টুনিরই আজ দিন, সুখের দিন; মা মনে করছে—টুনির আজ মন ছটফট করছে হিমাংশুর গাড়ির জন্যে। মেজদিও ভাবছে, টুনিটা সত্যই মন খুঁত-খুঁত করছে—এ কিন্তু নয়, হিমাংশুর পথ চেয়ে সে বসে আছে।

কিন্তু টুনিই জানে আজ তার মনের কী অবস্থা। কাল সারারাত সে ঘুমোয় নি, ঘুমোতে পারে নি।

ইতি আয়নার সামনে নিজের চেহারার ভঙ্গীটা ভাল করে দেখল। অন্য কেউ না পারুক, ইতি বুঝতে পারছে—তার চেহারার ভঙ্গীর সত্যিই একটা ঝিক—ঘর থেকে বার হলেই অজস্র আলো।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইতি শেষ পর্যন্ত ঠিক করে ফেলল

সন্ধ্যের পর ওরা সবাই গেলেন : মামা, মেজদি, ইতি, টুনি, অন্তু। ইতিকে চেয়ারে বসিয়েছিল। মেজদি পরায় মালা বিকেল করে ছোট বোনকে সাজিয়েছে। খোঁপা বেঁধে দিয়েছে অন্তু করে, নিজের পছন্দ মতন গভীর রঙের শাড়ী পরিয়েছে, মুখের সামনে ছোটখাটো ঝোঁপা দিয়ে দিয়েছে, গলায় হার কিংবা হাতের বালা পরতে পরিয়ে দিয়েছে। শাঁখ শাঁখ নাগাদিল করে পাড়ার একটা যাদুকরী বাড়ীওয়ালার হাতে কুলিয়ে নিয়ে এসেছে ইতি।

গাড়ি আসতে এখনও কিছুটা দেরী। মামা, মেজদি, টুনি স্নানঘরে হাস-হুল্লোড় করছিল, চা খাচ্ছিল, ইতিকে নিয়ে রসিকতা করছিল। শেষ পর্যন্ত ইতি একা একাই খানিকটা এগিয়ে গেল স্নানঘরের, যেন পাহারাদারি করে সময় কাটাবে। মামা বলল, বুঝতে পারছি রে টুনি, তোর এখন ভীষণ এক্সাইটেড অবস্থা...কি বোস খানিকটা।

স্নানঘরের দোর পর্যন্ত এসে ইতি দাঁড়াল। সামনে, কিছুটা দূরে লোকো-শেডের কারখানার ঘোরাল আর অন্ধকারে একটা পাহাড়ের মাথার মতন দেখাচ্ছে। তার এপাশ ওপাশে সিগন্যালের বাতি, ইয়ার্ডের আলো। হিমাংশুর গাড়ি ওখান দিয়েই আসবে। আসার সময় হয়ে গেছে।

ইতির কিন্তু ভাল লাগছে না। তার কৌতুক যা আসা ছিল, আনন্দ ছিল সব যেন ক্ষয়ে গেছে। তার বদলে সময় যত ঘনিয়ে আসছে ততই তার ভয় এবং হতাশা বাড়ছে।

ইতি অনেকবার ভেবেছে, আজই তার এত খুশি-চিন্তার কী আছে? হিমাংশুর সঙ্গে আজই তার বিয়ে হয়ে যাচ্ছে না। এখনই হিমাংশুর চোখে ইতির সমস্ত কিছু ধরাও পড়ছে না। ধরা পড়ার এখনও অনেক দেরি—অনেক। যতদিন না হিমাংশুর কাছে তার আবরণ খুলছে ততদিন। বিয়ের সময় পর্যন্ত কী ইতি চিন্তাটাকে সরিয়ে রাখতে পারে না? যে মোলম আছে থাক না, কী দরকার সেই মোলমতা বোঝার মতন পকেট করতে যাওয়ার। যখন নিজের থেকে তা পকেট পরে তখন হিমাংশু জানবে। কিন্তু তখন ইতি হিমাংশুর স্ত্রী।

না, না। ইতি মাথা নাড়ল। তখন হিমাংশু জানতে পারে, ইতি তাকে ঠেকে-শুনে ঠকিয়েছে, পরেকমা করেছে। গাছে পেতলীরা একটা মেয়ে মামা-কাপড়ের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে হিমাংশুর বউ হয়ে গেছে, ছি ছি।

ইতি বুঝতে পারছিল না, তার শরীরের কয়েকটা দাগ বড় না ভালবাসা বড়? হিমাংশু তাকে সত্যিই ভালবাসে। এত ভালবাসে যে মানুষ সে কী শরীরের কয়েকটা বাজে দাগ গায়ে করবে? অবশ্য বলা যায় না, বিয়ের আগে হয়ত মানুষও বাস দেখা দেবে ইতির। তখন আর লুকো-চুরি কিছু থাকবে না।

আচমকা ইতির কেমন মাথা গরম হয়ে উঠল। না, সে হিমাংশুকে স্পষ্টই বলবে সব। বলবে, আগে সে দেখতে চায়—মেয়ে-দের শরীরের ওপরের কয়েকটা দাগ—খারাপ দাগ—একজন পুরুষের ভালবাসাকে কত-খানি দেমড়ায়, মোচড়ায়। দেখাই যাক না—তোলটা টেঁকে, তোলটা টেঁকে না; শরীর না ভালবাসা?

ইতি ভেবে দেখল, সে আজীবন যা লুকোতে পারবে না—আর তা লুকিয়ে রাখবে কেন? বরং, আজ যা লুকোবে তা কয়েক বছরের মধ্যেই পকোপা হয়ে পড়তে পারে, তখন?

তার চেয়ে ইতির তরফ থেকে পরিষ্কার থাকা ভাল।

গাড়ি আসার ঘণ্টাটা যখন [redacted] তখন ইতি কিন্তু; ঘণ্টার শব্দ শুনতে [redacted] হয়ার অন্য রকম ভাবল। ভাবল : হিমাংশু, যেন না আসে। তার না আসাই ভাল। এলেই ইতিকে এমন একটা পরীক্ষা দিতে হবে, হিমাংশুকেও—যে-পরীক্ষার ফলাফল অনুমান করা অসম্ভব। কিংবা এ এমন একটা পরীক্ষা যা এখনও প্রচণ্ডে খর-দোষি চলেছে। ধারা বা রেওয়ার কথা বলা যায় না।

গাড়িটা আসছিল। অনেক দূরে ইঞ্জিনের সার্চ লাইটের আলো দেখা দিয়েছে।

ইতির বুক কাঁপছিল। ও আসছে। ইতির ভালবাসার মানুষটি। এখানে ইতি দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে আছে কী সুন্দর করে যেন। ইতির আচমকা মনে হল সে মুহূর্তে দু রকম ত্রিনিস নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। খুবই পুরোনো ত্রিনিস—তিনিস নতুন ভাবে। হিমাংশু কোনটা নেবে সে জানে না।

গাড়ি যখন আরও কাছে তখন ইতি খুব অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

সুখী যুবতী

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

মন্দিরাকে যে দেখে সে-ই ঈর্ষা করে কি?

তার ছিপছিপে লম্বা সুঠাম আদলের জন্য?

এমন লম্বা ছিপছিপে কাঠামোর মেয়ে তো কত আছে।

একটু তাকালেই টেরিয়ে যাবে যাদের তাদের লোকসের কাউন্টারে মন্দিরার মতন সুন্দর পরীদের প্রসন্ন মেলে দেখতে পাওয়া যায়।

তবে কি মন্দিরার চমৎকার খোঁপাটার জন্য? মেঘের মতন কালো কুচকুচে চুলের রাশি একত্র করে মাথার পিছনে তোমরার চাকের মতন খোঁপা বাঁধে বলে লোকে তাকে ঈর্ষা করে?

এমন চুল এমন খোঁপা অনেক মেয়েরই থাকে। নতুন কিছু না। এর চেয়েও সুন্দর চুল, এর চেয়েও আরো বড় খোঁপা বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতন খোঁপা পরা মেয়ে পথে ঘাটে চোখে পড়ে। তাকে?

তবে কি মন্দিরার উজ্জ্বল শাঁখের আলোর মতন ঝকঝকে শুভ্র গোড়া দেখে তার ওপর মানুষের ঈর্ষা?

মনে হয় না।

এর চেয়েও সুন্দর শুভ্রতর মেয়ে যে-কোন একটা চলমান, ফি সিনেমা হলের দরজার দাঁড়ানো, কি কোনো পার্কে ঢুকলে, একটা না, কয়েক জনের চোখে পড়বে।

কেবল উজ্জ্বল শাঁখের আলোর মতন শুভ্র না, পাখির বাসার মতন লম্বা পালক-মেলা কালো চোখের মেয়েও এক-পা, দু-পা করে হেঁটে যাবার পথেই একটিবার মাত্রায় তিনটি চোখে পড়বে।

হুঁ, যদি মন্দিরার সুন্দর চেহারার জন্য তাকে ঈর্ষা করার কথা ওঠে। এমন চোখ অনেক মেয়েরই আছে।

কয়েই বোঝা যায় যার যা কি নিয়ে সবাই মন্দিরাকে ঈর্ষা করে হিংসা করে।

এবং এটাও সত্য, তাকে যারা ঈর্ষা করে হিংসা করে তারাও তার কী দেখে যে হিংসা করে, নিজেরাও বুঝতে পারে না।

তবে একটা কথা আছে।

ভয়ানক হাসি-খুশি, ইংরেজীতে যাকে বলে প্রাণ— মন্দিরাকে দেখলে তাই মনে হয়।

যেন সারাক্ষণ তার মনে কোনও দুঃখ নেই। তার এই অত্যধিক খুশি ভাবটাই হয়তো লোকের ঈর্ষার কারণ।

অবশ্য যেন যে সে সব সময় এত হাসিখুশি, সদাই নাচিয়ে কুঁদিয়ে দুলিয়ে হেঁটে, তা-ও করো জানা নেই।

এই জন্যই আমার কৌতূহল হচ্ছিল, একবার দেখতে হবে ওই মেয়ের মনে এত সুখ কেন, সুখের উৎসটা খুঁজে বার করতে হবে।

কিন্তু, সুযোগ পাচ্ছিলাম না।

যেন কত দিন মন্দিরা বসে মেঘে নাচন দেখলাম, উপরন্তু একদা সে পথে চিত হয়ে একটু হোঁচট খাবে, তার পর একটা নির্দিষ্ট গলিতে ঢুকবে। গলির ভিতর পাঁচ ছটা বাড়ি পার হয়ে বাঁ-হাতি আর একটা গলি, সেখানে মোড়ে ট্যাক্স পড়বে এবং তার পরেই প্রথম বাড়ি। খোঁজখবর একটা ফ্যাক্টরি নিয়ে ওরা আছে।

আরো অ্যাটাচ আছে। ঘোড়লার তিন তলায় আর নিচে আটটা অ্যাটাচ।

একতলার ঘরগুলিতে দোকান। ওষুধের দোকান। মুদিখানা। জামার দোকান। এবং একটা ঘরে সরকারী অফিস ছিলো। চলতা পরা একটি মেয়ে বসে থাকে।

এখন কি অফিস ছিলো সেখানেও বাঁশিওয়ার চেয়ে কম সুন্দরী না।

চুলে ঢেউ তোলা ও ঠোঁটে বাঁশিওয়ার সঙ্গে টেক্কা দিতে পারে।

কিন্তু ঐ যে বলা হলো, বাঁশিওয়ার হাসিখুশি, চঞ্চল, হাওয়ায় দোলা লাগা অফিসার বাঁশিওয়া অফিস এই মেয়েটির কপালে নেই।

কেমন যেন নিস্তেজ নিষ্প্রভ বিরস ধরনের।

হয়তো আর পাঁচজনের মতন এ মেয়েটিও ডিপোর কাউন্টারে বসে বাঁশিওয়াকে দেখে ঈর্ষা করে।

যাক সে, বলা হয়েছিল বাঁশিওয়াকে যেন বয়া-দেওয়া যাবে না। পত্রপাঠের মতন সব সময় তাড়াতাড়ি যেতার নিয়ে কেবল এদিক ওদিক করে।

ঐ যে, অত দিন বাস থেকে নামল, বাড়ির কাছেও পৌঁছে নামল, কিন্তু বাড়িতে ঢুকল না, হুস্ করে আবার একটা রিকশায় চাপল, তাদের কী যেন একটা তাড়াতাড়ি কিনে আনা একটা রাস্তা দিয়ে রিকশাওয়ালাকে রিকশা চালিয়ে নিয়ে যেতে বলল।

আরো এরকম কিছু দেখা গেছে, যেন একটা দোকানে কিছু কেনাকাটা করতে ঢুকতে যাচ্ছিল ও, দোকানের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গেল, কিন্তু তখনি ঘুরে দাঁড়িয়ে রাস্তায় খালি ট্যাক্সিটাকে ডাকল।

ব্যস্, আর বাঁশিওয়াকে দেখা গেল না।

এভাবে দেখা দিতে দিতে বাঁশিওয়া সাজন থেকে কাঁকনহাট আর গেছে।

বাঁশিওয়া যেন আলোর আলো।

যেন ও শহরের ঘুম আকাশের মায়া মেঘের ফাঁকে ফাঁকে উঁকি মারতো একটি তারকা।

ও কিসের তৃষ্ণায় উড়ে বেড়ায় কিসের জন্যে, কিন্তু ওকে দেখে অনেকের তৃষ্ণা হয়, আর সেই তৃষ্ণা ও মেটাতে না পেরে মানুষের এত রাগ এত ঈর্ষা বাঁশিওয়াকে।

কিন্তু বাঁশিওয়া তৃষ্ণা নিয়ে ঘুরে বেড়ালেও তার তৃষ্ণা নেই, আর সেটা অবশ্যই কেশবের পরিচয়ে' বাঁশি, অফলাবেরর কোলের মতন টেবিলটে সুন্দর মৌমাছির পরিতৃপ্ত হাসি, হাওয়ার ঘুম, ঘাড় দোলাবার ভঙ্গি ঘাড় ঘাড় সে কথা মনে করিয়ে দেয়।

এইসব তাকে আরো বেশি ছিলো।

আমিও একটি যুবক। বাঁশিওয়ার পত্রপাঠ-প্রার্থী।

ঘরে, অফিসে আমি থাকি। ও যখন বাস ধরতে যায় তখনও দাঁড়ি নিয়েছি, ওকে তাকিয়ে দেখি। যখন বাস থেকে নামে তখন তাকিয়ে দেখি।

কিন্তু, আমার এই দেখা ও গভীর করতে কেন। অনেক দূরে থেকে।

আমার প্রকৃতি থেকে, আমার আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে আকাঙ্ক্ষা মিলিয়ে সুখ পেতে ও হয়ে থেকে।

তাহলেই কোনোদিন আমাকে ও দেখে পাবে না।

যেমন ও রাস্তায় দোকানগাট দেখার বাড়ি ঘোড়া দেখত রাস্তা মানুষকে চলা-ফেরা দেখত, তেমনি হয়তো একটি অলস মুহূর্তে কেবলা লাইট পোস্টের নিচে কি বাস-স্টপে দাঁড়িয়ে আছে তার চোখে পড়ত। এর বেশি কিছু না। ভালো ভালো দেখা।

কিন্তু, সেই মুহূর্তের মধ্যে যে আকাঙ্ক্ষার চলা অনুমিত আমনে মুনময়ে বাঁশিওয়া তা বুঝত না।

তার দোষ ছিল না।

আমি বলব আমার সাহসের অভাব। সৌজন্যের অভাব। কোনোদিন তো ওর সামনে গিয়ে আমি দাঁড়াই নি, সেজে নিবেদন করি নি। তাহলেই আমার বাসনা আমার কথা ও বুঝতে কেমন করে।

কিন্তু, বলতে কি, সাঁতা আমি যেন সুযোগও পাচ্ছিলাম না। কেন যে বাঁশিওয়া যেন এক মায়াময় কুয়াশা স্থির হয়ে দাঁড়াত না, আমার মনে হত, বাঁশিওয়া এক মায়াময় এক সেকেন্ডের বেশি স্থির চোখে তাকাতও না।

বাঁশির চঞ্চল নদীতে পা ফেলতে কে কবে সাহস পেয়েছে।

তাইতো আমি অপেক্ষা করছিলাম, অন্তত একদিন এরই সময়ের চলা ও মধ্যে যদি স্থিতি আসে।

তুলে তুলে ওঠা বাঁশিতে পত্রপাঠ যদি একটা গানের পাতার ওপর অন্তত বিন্দুকেন্দ্রের চলা স্থির হয়ে বসে।

একদিন বুঝি সুযোগ এল। আমি না চাইলে আমার পূর্ণিমা পূর্ণোদিল ছিলো। এক মাসাধে তিন ঘণ্টা মুহূর্তদর্শনের ঊর্ধ্ব হয়, কলকাতা শহরের অধিকাংশ রাস্তার জল জমা হয়, বাঁশিওয়ার পাড়ার সমস্যাই ডুবে গেল।

আহা, বাঁশিওয়া বাড়ি থেকে বেরোতে পারছে না, অথচ বেরোবার যেন তার জরুরী তাড়া। বেরোবার চেষ্টাই করছিল। মুখ ভরলো করে বাড়ির সামনে উঁকাল ঢেউ দেখছিল। তা হলেও এক সময় অধৈর্য হয়ে পাড়িয়ানা একটু পরীক্ষা নিয়ে নেল পরান সাহাটা অবশ্য সেতুদেরই পাশের পাতার ওপর কুলে রইল, সারা ঘরে ভেসে কি করে) ও বাড়ির সে বাড়ির ডক করে করে গলির মাথাটা পর্যন্ত সে এগিয়ে এল।

কিন্তু, তারপর আর রক নেই, তারপর যে সব বাড়ি সেগুলি লালা জলপাথ থেকে উঁচে গেছে, কাজেই বাঁশিওয়াকে পথকে দাঁড়াতে হল।

জলপাথে নামতে ভেলেই পা ডোবা পা, ওর হাঁটু ছাড়িয়ে উঠবে কথা নিয়ে চলে ঢেউবে।

এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে বিমল বাঁশিওয়া কখন ভেবে চারদিকে তাকাচ্ছিল, যদি কেউ ওকে সাহায্য করে—কোনো ঘরের গলির বাড়ি পর্যন্ত পার হতে পারলেই হয় ব্যস্তা, সেখানে চল নেই, বাস-স্টপে দাঁড়ে বাঁশিওয়া নিশ্চিন্তে ভাবে বাস ধরতে পারে।

গলির একদিকে ফেলেডাঙার দোকানটা চলে গিয়েছিল। সেখানে দাঁড়িয়ে আমি সব দেখছিলাম।

আমার হাঁটুর ওপর দিয়ে ঘোলা জল কলকল ছলছল শব্দ তুলছিল।

আমাকে সে দেখল। আর তো কেউ সে ভাবে চলে দাঁড়িয়ে নেই। ট্রানজিস্টারটা ঠুকিয়ে কে তার জন্য এভাবে অপেক্ষা করবে।

আমার চোখে তার চোখ পড়ল।

বুদ্ধিশুদ্ধি বড়াস করে উঠল, তত কাল ধনুর্বীক্ষণের মতন চোখ করে আমার মুখটা পর বাঁশিওয়া, ভালো ভালো চোখে নয়, বাঁশিতে অনুধাবনের মতন চোখ করে আমার মুখটা দেখল।

উত্তেজনায় আনন্দে আমার ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছিল। হাতের ইসারায় আমাকে সে ডাকছে।

তখনি জল কেটে কেটে তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম।

'এতটা রিকশা ভেকে নেবেন?'

'তত দূরে রিকশা গলিতে ঢুকবে না।'

'তাহলে উপায়?' হাত হাত করে উঠল যুবতী।

মনে মনে বলেছি, যদি আমার কাঁধে চড়ে বস, তোমায় আমি বড় রাস্তায় তুলে দিতে পারি।

কিন্তু, এমন একটা প্রস্তাব আর দেই কী করে। চুপ করে রইলাম।

বাঁশিওয়া চুপ থাকল না।

অনুনয়ের গলায় বলল, 'ভীষণ দরকার ছিল আমার কোথাও।'

তাই তো, বাঁশিওয়া কোন্ দিন বাঁশিওয়া চুপ করে বাড়িতে বসে থাকে। বেলা বাড়ছে, এতক্ষণে এই বাঁশিপাড়ার গলি পার হয়ে কত দূরদূরান্তে চলে যেত।

'শুনুন।'

'বলুন।' ভাবলাম সাঁতার আমার কাঁধে চড়ে বাঁশিওয়া গলি পার হতে চাইছে।

'একটা ফোন করে দেবেন?'

'কোথায়?'

'আমি নম্বর দিচ্ছি। বড় রাস্তার ধারের কিনারে টেলিফোন আছে। গলির ভিতর কারো বাড়িতে টেলিফোন নেই।'

'তা নেই আমি জানি।' আমি বললাম।

'আপনি অফিস থেকে গিয়ে আমাকে করে দেবেন।'

'অফিস?' একটু চিন্তা করে মনে মনে বললাম, 'ঠিকানাটা কত।'

ফোন নম্বর দিয়ে বাঁশিওয়া বলল।

'ওরে তো বাঁশিওয়ে থাকেন বন্ধু?'

'হুঁ।' বাঁশিওয়া ঘাড় কাত করল। 'ওকে ডেকে আপনি বলবেন, এখনি যেন গাড়িটা নিয়ে সে এখানে চলে আসে।'

'ওই গলিতে কি গাড়ি ঢুকবে।'

'কী মুশকিল।' যেন আমি কথা কাটাকাটি করছি, বিরক্তিতে চোখ করে মহিলা আমার মুখটা দেখল। 'আপনি তো ওকে জানেন। হাঁটুসমান গলির জল কখনও ঠেলে যেতে পারবে।'

'হুঁ, তা-ও বটে।' হিসাব না করে আমি অন্যমনস্ক বললাম, 'বালিগঞ্জ থেকে গাড়ি নিয়ে আসতে সময় ঘণ্টা খানেক লেগে যাবে।'

'হ্যাঁ তো বলছি, আপনি বরং করে দিন, গাড়ি নিয়ে ও বেরিয়ে পড়ুক। ততক্ষণে ও ফিরে—'

আমার বুকের ভিতর একটা বুদ্বুদের মতোন হালকা আরম্ভ হয়েছিল। কে এই মহিলা? নিশ্চয় এমন কেউ যার অনুপস্থিতে মন্দিরা দেবী এই যেনো দমটাও ফেলতে পারবে না। সমস্ত সংসার অন্ধকার দেখছে।

'যান আর দেরী করবেন না।'

'আপনি কি বাড়ি ফিরে যাবেন?'

'আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি—ওর সঙ্গে কথা বলে আসুন, পরে যা ব্যবস্থা করবার আমি করব।'

মহিলা ছোটো বড় রাস্তার দিকে এগোতে লাগলেন। একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম, মন্দিরা সেই অনন্তকালের মতন চোখ করে আমাকে দেখছে। হুণ্ডিগুলো বড়াস বড়াস করছিল। আমাকে দেখছে অর্থ কি। পরক্ষণে চিন্তা করলাম, আমি তাড়াতাড়ি করে বালিগঞ্জের কোনো এক বন্ধুর কুমারকে ধরব। তুলে করে গাড়ি নিয়ে মানুষটা এখানে চলে আসবে, আর সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরা আমাকে ভুলে যাবে। অর্থাৎ আমার কাজ এখানেই শেষ হল। তারপর সে আর আমার দিকে কখনই তাকাবে না। কেননা সত্যিই আর কথা বলবে না।

সেই সাঁঝ আমার কোনোদিন তিন ঘণ্টা করে মুখলতায় বৃষ্টি হত। গলিতে কোমর সমান জল দাঁড়ায়—

তা হলেও ড্রাইভার কিসুনিকে উঠে দিতে আমি তাড়াহুড়া করলাম। সঙ্গে সঙ্গে উত্তরও পেলাম। মন্দিরার মনের ইচ্ছা বুঝতে করার সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোনের ওপার থেকে ভেসে এল, 'অসম্ভব অসম্ভব, এখানে সমুদ্রের মতন চারদিকে জল থৈ থৈ করছে। গাড়ি বের করা মুসাধ্য।'

বললাম, 'একটু চেষ্টা করে দেখুন। উনি ভয়ানক অস্থির হয়ে পড়েছেন। যদি কোনো রকমে একবার গাড়িটা নিয়ে আসতে পারেন!'

'আমার তো হাত নেই দাদা।' মহুয়ে নামক পুরুষ শুকনো গলায় উত্তর করল। 'মিনুর বাবি জলের বেড়া দিয়ে আমাকে আটকে রাখছে, আমি কেমন করে এখান থেকে বেরোই।'

তা-ও সত্য, মনে মনে বললাম, কিন্তু মন্দিরা কি তা বুঝবে? হয়তো রাগ করবে, অভিমান করবে।

'কতক্ষণের মধ্যে আপনাদের ওখানে জল সরে যাবার আশা করা যায়?'

'ঘুরাশা ঘুরাশা, অত সারাদিন ধরে থাকবে। একবার এই ওলায়ে জল দাঁড়ালে, কি সহজে সরতে চায়। অত সারাদিন—হয়তো সারা রাতও থাকতে পারে। কাল সকালে যদি—'

'সে তো অনেক দেরি—' মন্দিরার মুখে অনুশোচনার ছায়া দেখলাম, 'ওকে দিয়ে তাহলে এখন কী করব?'

'যা বললাম ভাই। মিনুর আব্বাকে জলের বেওয়ানে কথা বলে রেখেছে। কেমনো উপায় নেই সেখান থেকে বেরিয়ে আসার।'

'ওই বলব।' টেলিফোন রেখে দিয়ে ড্রয়িংরুম থেকে বেরিয়ে এলাম।

এবার আর হাতঘড়ির খা না, আমার বুকের ভেতর যেন ঘুমন্তুরি খা মারছিল। মহুয়া কুমার মন্দিরাকে নিয়ে যেতে আসবে না। মন্দিরাও সেখানে যেতে পারছে না।

তাই তো, যদি কিসুনিকের মতো এ পাড়ার জল সরেও যায়, মহুয়ের পাড়া জলমগ্ন থাকবে। অত সারাদিন ধরে রাত। জল সরতে সরতে সেই কাল সকাল। তার অর্থ মহুয়ে আসতে পারছে না বলে মন্দিরা যে সেখানে ছুটে যাবে, সেটি হচ্ছে না। হয়তো গুরুনিপুর পর্যন্ত যেতে পারবে, হাজরা পর্যন্ত যাবে। তারপর মন্দিরাকে ফিরতে হবে। আর এগোতে পারবে না।

এখানে এই গলির মধ্যে কোথায় সমস্ত সেলাই বিক্রয় টাকেসি ঢুকবে না—বালিগঞ্জের সেই মধ্যে সমুদ্রে গাড়ি ভোকা তো অসম্ভব।

'ঘুরাশা' 'ঘুরাশা'—টেলিফোনের ও পাশে গলার স্বরটা আমার কানে বাজছিল।

'কি বলল?' মন্দিরা যেন এক ছেড়ে আমার কাঁধের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছিল।

মুখটা সরিয়ে ফেললাম। আমার ভিতরে যা-না বাজছিল, উনাসের জন্য ছিল না, তা বলে সেটা পরকাল করব নাকি। পুরনো চেহারা করে বললাম, 'গাড়ি নিয়ে আসতে পারছেন না।'

'কী মুশকিল।' মন্দিরার গলার স্বরে বাধা পড়ল। 'আপনি কি ওকে বলেন নি, এখনকার জল কিসুনিকের মতো সরে যাবে?'

চুপ করে রইলাম।

'ওঃ, কী বুদ্ধি আপনার—এটাই তো বলা, ও গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ুক, বালিগঞ্জ থেকে আসতে আসতে ঘণ্টাখানেক সময় লাগবে। এর মধ্যে বাঁশদ্রোণীর রাস্তায় জল থাকবে না। গলিতে ঢুকতে ওর কেন অসুবিধাই হবে না।'

আমতা আমতা করে বললাম, 'বাঁশদ্রোণীর কথা উনি ভাবেন না। বালিগঞ্জেই জল, সমুদ্রের মতন চারদিক থৈ-থৈ করছে।'

'বালিগঞ্জে জল ঢুকেছে।' অসম্ভব স্বর বেরোল মন্দিরার গলা দিয়ে। যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। জ্বালাজ্বাল করে আমার মুখটা দেখল।

'আমি বলছিলাম একটু চেষ্টা করে দেখুন, মন্দিরা দেবী ওরকম অস্থির হয়ে পড়েছেন।'

'তাহলে কি করব ও?' ভেতো বাঙালি একটা ভোজ মিলল মন্দিরা।

'যখন অসম্ভব অসম্ভব—কোনো উপায় নেই, মিনুর আব্বাকে চারদিকে জলের বেওয়ান তুলে বন্দী করে রেখেছে।'

'তখন জল সরবে?' সাপের ছোবলের মতন তীক্ষ্ণ তীব্র হয়ে গেল মন্দিরার দৃষ্টি।

'আর সারাদিন তো নয়ই,' মাথা চুলকাতে চুলকাতে বললাম,—'সারারাতই নাকি জল থাকবে ও পাড়ায়, সরতে সরতে সেই কাল সকাল।'

'মিথ্যাবাদী—ও একটা লায়ার

পুকোনা দিবালোকে। চোখ-মুখই সবই খোলা। মেয়েছেলে কেউ বেরোচ্ছিল না। জলের ঘনঘন শব্দ করে হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে অনেক পুরুষই গলির রাস্তায় চলাচল করছিল।

এর চেয়ে অবশ্যই একটা বাঁড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে মন্দিরা কেমন আর্তনাদের মতন সুরে কথা বলল।

বললাম, একটু বাড়িয়েই বললাম, 'কাল সকাল পর্যন্ত আপনাকে অপেক্ষা করতে বললেন উনি। জল কমবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি গাড়ি নিয়ে আসবেন।'

'জল কমবার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি নিয়ে আসবে' আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মন্দিরা কেঁদে ফেলল। রাগের মতন আকারে ধরে গেল মুখটা। 'ওঃ, ওর কত বড় মিথ্যুক—যত বৃষ্টি পড়ুক, বালিগঞ্জে কোনোদিন রাস্তার জল দাঁড়ায় না। আমি কি চিনি না—আমি কি বালিগঞ্জে যাই না।'

'মহুয়ে বলছিলেন, মিনুর বাবি জল দিয়ে বেরাও করে রাখে, সেখান থেকে তিনি কেমন করে বেরোবেন।'

'না না, মিনুকে যোগাযোগ করা যাবেনা।' মন্দিরা জোরে মাথা নাড়াল। জল ভরা চোখে মুখটা আরো সুন্দর দেখাচ্ছিল। সুস্মিতা—সুস্মিতা ওকে বন্দী করে রেখেছে, আমি ঠিক বুঝতে পারছি।'

স্তব্ধ হয়ে রইলাম।

এত সুখী মেয়ে যে এত দুঃখী হতে পারে ভাবা ছিল না।

'ওঃ, কেন কিনা জল হয়েছে, আসতে পারছি না—সুস্মিতা ওকে আসতে দিচ্ছে না, ও আমি করে বোঝাব।' যেন বুক ভেঙে যাচ্ছিল মন্দিরার।

পুকোনা দিবালোকে। যোগাযোগটা খোলা ছিল। জলের ঘনঘন শব্দ করে পুরুষের দল হাঁটাচলা করছিল।

ঐ অবস্থায় নিশ্চয় মহুয়ে কাঁদছিল।

'চলুন আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।'

মন্দিরা আমার হাত ধরল যেন একটা শক্ত গাছ পেয়ে। হাওয়ার খোলা ব্যাপ্ত নরম লতার মতন কান্নার ধাক্কে কাঁপছিল।

এখন আমার বিস্ময় না পেলে বুক থেকে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে ও রাস্তায় চলে পড়ে যেত।

চশমার ওপর দিয়ে তাকে ধরে ধরে ওপরের বারান্দার দরজায় পৌঁছে দিলাম।

আমি হাত ছেড়ে দিয়েছিলাম।

বন্দিতা আমার হাত ছাড়ল না।

যা হয়তো আমার আজন্ম ভীরু মনে দেখে তার হাত দিয়ে ও চোখের চশমা খুলল।

'আসুন, একটু চা খেয়ে যান। অনেকটা সময় আপনাকে একা দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে।'

চা হয়েছে, মনে মনে বললাম, তোমার জন্যই এত কষ্ট করলাম, কিন্তু মুখের চাকা এখন আর আমার সামনে নেই, তুমি হাত ধরার সঙ্গে সঙ্গে আমার পরাজয় হয়ে গেল।

তার ওপর চা খাবার আমন্ত্রণ।

আমার শরীরের মনে বসন্তের বাতাস খেলা করে উঠল।

ওর হাত ধরে টুকটুক করে সিঁড়ি ভেঙে ওপর উঠে গেলাম।

বন্দিতাদের বাড়িতে আমি কোনোদিন ঢুকি নি। কি অসম্ভব সাজান গোছান বাড়ি। বসবার ঘরটি যেন রাজপুরী সিনেমা।

একটা সিঁড়ি ভাঙার পরই বাঁকে লাইব্রেরি। তাকালাম বন্দিতা এই ফুল জানে। নিশ্চয় কোথাও না কোথাও এই ফুল খাঁটি দেখতে পাব।

তাই দেখলাম। একটা ঘরের চৌকিদার তুলসীগাছের মোলায়েম লম্বা কেশর ঝুলিয়ে দুধের মতন ধবধবে লম্বা পাপড়ির গুচ্ছ গুচ্ছ নিয়ে ফুটে আছে। বর্ষার ফুল। তাই এত সিগ্ধ, এত ঠান্ডা গন্ধ।

ওর তখনই বুঝতে পারলাম, এটা বন্দিতার ঘর। ঘরের দরজার সামনে হেলেনী রিস্টি গড়ন ছেলে একটা টাকা।

তার ছোটখাট ছোট্টসা চৌকিস দেখে ভিন্ন পাটনারের ছোট্টো চিরুনি চুলের কাটা ফিতে, আলনায় কুঁচিয়ে রাখা শাড়ি, ব্লাউজ, তাকিয়ে তাকিয়ে সব দেখছিলাম। কোনো কুমারী মেয়ের ঘরে এর আগে আমি ঢুকি নি।

একটা সোফার ওপর আমাকে বসিয়ে দিয়ে বন্দিতা চা করতে পাশের আবরায় চলে গেল।

বন্দিতার চৌকিদের সুন্দর ফুলদানিটা আবার মনোযোগ দিয়ে দেখছিলাম। যেন বন্দিতার ভিমহাম পাতলা করুণ কবিতের সঙ্গে ফুলদানির একটা চমৎকার মিল ছিল।

বন্দিতা দু কাপ চা নিয়ে ঘরে ঢুকল।

ছোট একটা বেতের মোড়া টেনে এনে সে আমার সামনে বসল।

এখন মুখোমুখি হয়ে বসে মেয়েদের সঙ্গে আমার চা খাই নি, খাব না কিন। আমার হয়ে দেখছিলাম বন্দিতার সেই কলসের মুখটা কত স্বাভাবিক সুন্দর হয়ে উঠেছে।

মনে হচ্ছিল, তার চেয়ে সুখী মেয়ে পৃথিবীতে আর একটিও নেই।

আমরা নিজু খুলার কথা বলাবলি করছিলাম।

চা শেষ হয়ে যাবার পরেও আমাদের গল্প শেষ হচ্ছিল না।

কিন্তু কেউ উঠে গেল।

যেন পাশের ঘরে কেউ শুয়ে আছে, অনুমান করলাম। শুয়ে থেকে কারও ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছে বন্দিতাকে বলেছে, 'কে, কে এলো ও বন্দিতা?'

বন্দিতা কথা কয় নি, উত্তর দেয় নি।

কিন্তু তৃতীয় বার আবার কেউ ও ঘর থেকে চেঁচিয়ে উঠতে বন্দিতা ও ঘর থেকে চেঁচিয়ে বলল, 'বন্ধু এসেছে, ঠাকুমা, বন্ধুর সঙ্গে গল্প করছি।'

কথা শেষ করে বন্দিতা আমার চোখে চোখ রেখে দুষ্টামীর হাসি হাসল।

যেমনি তার সেই হাসিও কত সুন্দর।

'যদি ঠাকুমা এবার এসে উঁকি মারে।' একটু ভয় পেয়ে আমি পরামর্শ করলাম।

'ধরে ফেলে,' সাহসের মতন বলল। তবু ধরে ধরে বন্দিতা ঠোঁট ওল্টাল। তার পর ফিসফিসে গলায় বলল, 'ঠাকুমা চোখে দেখতে পায় না যে। বয়সে ভুগে ভুগে অনেক দিন আগেই চোখের দৃষ্টি নষ্ট হয়ে গেছে।'

নিশ্চিন্ত হলাম।

ওদিকের ঘরে আমার গল্প করতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। বন্দিতা ঠাকুমার কথা মনমুখ। তার ঠাকুমা অনেক ভাকা রেখে গেছে।

সাত্যি বন্দিতা সুখী। তার সুখের তুলনা ছিল না।

কিন্তু তার সুখের মাত্রাটা যেন তখনও আমার পুরোপুরি জানা হয় নি। জানলাম পরে। বন্দিতা যখন ভুরভুরে পত্রোপাতির বকল ছুটে নিয়ে একটা সুইচের হাতে করল ঘরের একটা আলোর হাতে ঘরে আমার সামনে ফিরে এসে আবার মোড়ায় বসে পড়া। আমি উকিকে চেয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম।

বন্দিতা একটা একটা করে আলমারির পাতাগুলি উলটে উলটে আমায় দেখাচ্ছিল।

কত ছবি তুলেছে সে।

বন্দিতা শুয়ে আছে। বন্দিতা হাসছে। একটা ছবিতে বন্দিতা বেলার পন্ডার। একটা ছবিতে ছুলে এলো ঘরে বন্দিতা ছুটছে।

কিন্তু ছেলেদের ছবিতে বন্দিতা একলা নেই।

একটি পুরুষের সঙ্গে আছেই।

আলমারি বন্ধ করে আমার চোখে চোখ রেখে বন্দিতা মিটিমিটি হাসছিল। এই হাসি হাসছিল। একটুও অবাক হলাম না আমি।

বললাম, 'অনেক বন্ধু যে তোমার।'

তখন আমরা 'তুমি' 'তুমি'-তে এসে পৌঁছি।

বন্দিতা ঘাড় কাত করল।

'হুঁ, আমার অনেক বন্ধু।'

কথাটা বুঝতে পারলাম।

বললাম, 'অনেক বন্ধু যে তোমার। চোখের ওষুধে বন্ধু?' হেসে পরিষ্কার করলাম।

বন্দিতা মাথা ঝাঁকাল।

'আমিও এ ঘর থেকে পাশের ঘর চেঁচিয়ে বলি, বন্ধু এসেছে, ওর সঙ্গে গল্প করছি।' কথা শেষ করে ও খিল খিল করে হাসল। শুনে চুপ করে রইলাম।

আলমারী বেতের ওপর রেখে স্থির বন্দিতা আমার কোলের ওপর হাত রাখল।

'মাঝ বিকেলে একটা পড়ন্তবেলা স্থির বুঝবে কতো তুলবে।'

অতর্কিত সুখে আমি কথা বলতে পারছিলাম না। ঘাড়টা শুধু কাত করলাম।

গল্পে গল্পে অনেক বেলা হয়ে গেল।

এক সময় উঠলাম। বন্দিতা আমার সঙ্গে বারান্দায় এল। সিঁড়ি ভেঙে নিচে নামল।

দেখলাম সব ফুল সরে গিয়ে দুপুরের রোদে পালটা শুকিয়ে খট খট করছে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে ছুটতে ছুটতে একটি ছেলে এসে আমাদের সামনে দাঁড়াল। ছেলেই আমি চিনতে পারলাম। বড় রাস্তার সেই বতন' কিনুনিওয়ের দোকান কর্মচারী।

'কি ব্যাপার?' বন্দিতা তার দিকে চোখ তুলল।

'মালিক থেকে এইমাত্র মহুখবাবু ফোন করলেন। ওঁদিকের ঝড় সরে গেছে। গাড়ি নিয়ে উনি এখনি চলে আসছেন। খবরটা আপনাকে পৌঁছে দিতে বললেন।'

মুখটা থেকে উঠল বন্দিতার। অসম্ভব অন্যমনস্ক হয়ে উঠল সে।

আমার কাঁধে কাঁকুনি দিয়ে বলল, 'তুমি এখনি ছুটে ফিরে যাও কেন করে বলে ঝড় এখানে তাঁকিল হয়, গাড়ি নিয়ে কেউ আসতে পারছে না, আজ সারারাত তো আছেই, সারাদিনও হয়ে থাকবে। কাল সকালে সকালে সেই ভাল সকাল।'

সামান্য হেসে হাসি ঝাঁকিয়ে উপর্দিকে আমি বতন' কিনুনিওয়ের দিকে ছুটলাম।

খুকুরের কাগজের দ্বিতীয় পাতায় খবরটা ছোট্ট নয়। কিন্তু গিরীনবাবু চমকে উঠলেন। বলে উঠলেন, 'আবার!'

কাগজটা ভাঁজ করে, চশমাটা সামনে ভাল করে তুলে ধরে, শিরোনামাটা সহ আবার পড়লেন। সংবাদটা এই রকম, 'ইটের আঘাতে মৃত্যু।' কলকাতা থেকে আট দশ মাইলের মধ্যেই, শিয়ালদহ লাইনে, চলন্ত ট্রেনে, লাইনের ইট এবং পাথর ছুঁড়ে মারার ফলে, একজন যাত্রীর মৃত্যু ঘটেছে। হাসপাতালে মারার বয়স্কর দুর্ঘটনা, কারণ অধিকের সময়, গাড়িতে এত ভিড় ছিল, দরজার সামনে ভিড় করে না দাঁড়িয়ে ওপরে ওঠা গেল না। শিয়ালদহ লাইনে, যাত্রী সংখ্যা তুলনায়, ট্রেন এত কম, যে যাত্রী-যাত্রীকে এক কথায় ইনসাইডার বলা যায়। কিন্তু, তেমন কোন পক্ষের তাতে কিছুই যায় আসে না। সে অনেকটা যেন কালা আর পাথরের খেলার মত।

যাই হোক, একটি পক্ষ এসে, দরজার সামনে একজন কাগজ খুলিতে এসে লাগতেই, ঝুঁকি মেরে যায়, এবং যাত্রীটি সঙ্গে সঙ্গে, চলন্ত ট্রেন থেকে নিচে পড়ে যায়। মৃত্যু ঘটনাস্থলে। পাশের যাত্রীরা তাকে ধরবার আগেই, সে পড়ে গেছে, তা ছাড়া, একাধিক পাথরের আঘাতে, দু একজনের মোটামুটি আঘাত নিয়ে, সকলে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। গাড়ির সিকল টেনে, গাড়ি থামিয়ে দেওয়া হয়, অপরাধী কাউকেই ধরতে পারা যায় নি। যাত্রীদের বিবরণ অনুযায়ী, যা জানা যায়, তাতে, কয়েকটি অল্পবয়সী বালককে পাথর ছুঁড়তে দেখা গিয়েছিল।

গিরীনবাবুর মুখ, অন্ধকারে ঢাকল। তিনি চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তার-পরে, কাগজ ফেলে, এডিটোরিয়ালের পাতাটা দেখলেন। না, কোন রকম মন্তব্য করা হয় নি এ ঘটনার ওপরে। সম্ভবতঃ এরাও বিরক্ত হয়ে পড়েছে। হলেও তাই, এ সব সংবাদ ছাপতেও এখন লজ্জা করে। এর থেকে, জনক দুর্ঘটনার খবরের জন্য পাতাটা ছেড়ে দিতে হয়, সেটা হল, পত্রিকার দায়সারা নীতি।

গিরীনবাবু উঠলেন, একটা ফাইল টেনে বের করলেন তলার থেকে। ফাইলের ওপরে লেখা ছিল, পঞ্চম শ্রেণীর কুমটিদা।' খুলে, পর পর অনেকগুলো খবরের কাগজের কাটিং পড়লেন। হিসাব করে দেখলেন, পনের ষোল মাসের মধ্যে, এই রকম দুর্ঘটনার ঘটনা, এগারো লিখে, রাখা। গতকাল পঞ্চম দুর্ঘটনাটির মৃত্যু ঘটেছে। তা ছাড়া, এই রকম ঘটনার সংবাদ, ষোল মাসে তেরোটি। তাতে আহতের সংখ্যা এগার। সংবাদ পড়েই বোঝা যায়, সেই এগার জন আহতের মধ্যে, অন্ততঃ একজনের একটি চোখ চিরদিনের জন্য নষ্ট হয়ে গিয়েছে। কারণ খবরে বলছে, জেনারেটরের চলন্ত কাঁচের ওপর পাথরের আঘাত লেগে, কাঁচ ভেঙে চোখে ঢুকে গিয়েছিল।

পাথরটা যে কেবল দুষ্টুমিই ছোড়া হচ্ছে, তা না। গাড়ির ভিতরে যাত্রিদের, আঘাতটাও সেই পরিমাণ জোরে লাগে। পাথরটা আসে সোজা, গাড়িটা চলে যেতে। তখন পাথরের গতিরও সেই বেগ তার সঙ্গে। চোখ ছাড়াও, আরও নানা ধরনের আহত হওয়ার সংবাদ রয়েছে। তাদের মধ্যে যদি কেউ মারা গিয়ে থাকে, তবে সেটা চাঞ্চল্যকর কোন উপাদান নেই। সে খবর আর খবরের কাগজে আসে নি।

গিরীনবাবুর কপালটা কুঞ্চিত করে, গালে হাত দিয়ে চুপ করে বসলেন। চোখ বুজে রইলেন খানিকক্ষণ। অন্তত্তাল যা লোকটি মারা গিয়েছে, সম্ভবতঃ সে একজন সাধারণ চাকুরে। কে জানে, বেচারীর বয়স কত। বিবাহিত কী না, সন্তান-সন্ততি কটি বা। বিবাহিত, অবিবাহিত, যাই হোক, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, একজন চাকুরে

বাঙালীর স্বভাব দোষে। হয়তো, এই দোষটির ওপর জোরে ঝাঁপা দিয়া [illegible] করছিল। এক মুহূর্তের মধ্যেই সব শেষ হয়ে গেল। মৃত্যু তার জন্যে এতই আকস্মিক এসেছিল, সজ্ঞানে ফেরে আসারও অবকাশ পায় নি, কী ভাবে, কী কারণে তাকে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হল।

মৃতদেহ আগলে এই অজানা সংবাদটি কি, তাহলা সংবাদপত্র পাঠক [illegible] লোককেও ভাবিয়েছে। তাই কি কারণে একবারও চিন্তা করেছে। এটা কোন রাজনৈতিক হত্যা না কোন সময় পার্টিসেনদের নাম, একেবারে করে হত্যা না। এমনকি কোন অভিযোগ বা আদালতের বিচারও হবে না। কেন না, এ মৃত্যু কী ভাবে এসেছে, সে সম্পর্কে জনের কোন সিদ্ধান্ত নেই। এতে নিরস্ত এক-সিডেন্ট বলেও কেউ ভাবতে পারছে না।

বিপিনচন্দ্রনাথ চমকান, মানুষের [illegible] সমস্যার হবে। এ ছেলে একটি কথা জানাবার মাধ্যম মাধ্যে উপায় নেই। পরের পর্যন্ত মুহূর্তে, এই ঘটনার [illegible] মধ্যে এ ধরনের একটা কথা মনে করে রাখা চলে না। অথবা বিশেষ করে, মনে রাখা চলে না, এই ঘটনার পিছনে, আপাতঃ দৃষ্টিতে, কোন রাজনৈতিক বিষয় নেই। অর্থনৈতিক সমস্যা [illegible] তার কোন চিহ্ন; দেখা যায় না। এর চেয়ে কষ্টে লাভী করা চলে, এটা কেউ ভাবে না। যারা বাউকে করতে পারলে চমকা নিশ্চয় [illegible] হাত তাদের শাস্তি দাবী করত।

সমস্ত ব্যাপারটা একটা অসহায় বিশ্বয়কর ব্যাপার। [illegible] করার কিছু নেই। যে মারাত্মক, এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে, হয়তো রেল কর্তৃপক্ষ ও, একজনের [illegible], সেখানে পুলিস সাহায্যের ব্যবস্থা করবে। তাদেরই হয়তো দেখা যাবে, মাইল খানেক দূরে, আবার নতুন করে দুর্ঘটনা ঘটছে।

বিপিনচন্দ্রনাথ উঠে, পায়চারি করতে আরম্ভ করলেন। ভুরুটি তীক্ষ্ণ চোখে, মেঝের দিকে তাকিয়ে, পায়চারি করতে করতে ভাবতে লাগলেন, এর মধ্যে কোথায়। এর একটা মূলে নিশ্চিতই আছে, এবং সেখান থেকেই, এর কারণকে খুঁজে বের করতে হবে। দরকার হলে, অপরাধীকেও। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, এ অপরাধী, সমাজের [illegible] হত্যাপরাধী না। কিন্তু, এ অপরাধীও জানে, সে অপরাধ করেছে। তার মনের মধ্যে, নিশ্চিত অপরাধবোধ কাজ করছে।

এই ঘটনাটা অনেকটা, খেলতে খেলতে খুন করার মত। কোন কারণে, দুটো পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী দলের মধ্যে যে রকম পাথর ছোঁড়াছুঁড়ি হয়, এটা সে রকম না। বিশেষ [illegible] বিরুদ্ধে, বিশেষ ভাবে উস্কানো হয়েছিল, তাও না। অনেকটা অযোগ্য ব্যাপার। কেউ বলতে পারে না, কে কোনদিন কখন, চলন্ত ট্রেনের সামনে বা চলমান্ত্রার সামনে দাঁড়িয়ে পড়বে।

গতকাল যে ঘটনা ঘটেছে, কাগজে লিখছে, অনেকটি [illegible] বালককে লাইনের ধার থেকে পাথর কুড়িয়ে ফেলা দিতেছিল। তারপরে আর তাদেরই সেখানে দেখা যায় নি। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, ঘটনা নিশ্চিতই বিকালের দিকে বা সন্ধ্যার [illegible] ঘটেছে। ইস্কুল ছুটি না হলে, এ হতেই পারে না, হতে পারে না। [illegible] দিকে [illegible] হবে থাকে, নিশ্চিতই সেই সময়ে ছুটির দিন।

এই হত্যাসংবাদে খেলা যারা খেলে, তাদের সম্পর্কে [illegible] মনে, দেশের ভবিষ্যৎ। অর্থাৎ, একটা কথার কথা। [illegible] এরা কেউ তাদের সন্তান ছেলে কী না। বোধহয় কোন পরিবারের অভিভাবকেরাই চায় না, তাদের ছোটোরা পাথর ছুঁড়ে খেলা করেছিল। চালানেও, তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে কী না সন্দেহ। অভিভাবক নিজেই হয়তো ব্যাপারটাকে একটা ছেলেমানুষি মনে করে আর কোন গুরুত্ব দেয় নি।

কিন্তু একটা মানুষও কি আশে-পাশে ছিল না। একজনও কি ঘটনাটা দেখে নি। কোন বাড়ির মহিলার পক্ষে অন্ততঃ ঘটনাটা চোখে পড়া উচিত ছিল। অবিশ্যি যদি [illegible] কোনবাড়ি থেকে থাকে। যদি কেউ না না কোন দেখেও থাকে, সে হয়তো লুকিয়ে থেকে ভয়ে [illegible]। লোকের সামনে আসতে ভরসা পায় নি।

কিন্তু, অভিভাবক হয়তো নিশ্চিন্ত থাকতে পারে না তাও জানতে পারে। খবর যারা পাঠিয়েছে, তারা এবং [illegible] কর্মচারীরা, সবাই হয়তো এ ব্যাপার থেকে, নিজেদের [illegible] মুক্ত করে নিতে পারে। পারবে না তারা, যারা পাথর ছুঁড়ে খেলা করে। এই সব ঘটনা ক্রমে তাদের মনের মধ্যে চেপে বসছে। অপরাধবোধ দিনের পর দিন, [illegible] হতে হতে, তাকে এমন একটা ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, যখন অপরাধ বোধ বলে কোন চিন্তা আর তার মাথায় থাকবে না। সমাজকে আর মানুষকে সে ভিন্ন চোখে দেখতে শিখবে।

বিপিনচন্দ্রনাথ আবার এসে চেয়ারে বসলেন। আবার ফাইলটা টেনে নিলেন। সংবাদ পত্রের সমস্ত কাটিংগুলো বের করে দেখতে লাগলেন। যে দা আদ [illegible] ভাইন সম্পর্কের গাড়ির অটারা পাথর ছোঁড়ার ঘটনার আক্রান্ত হয়েছেন দেখা যাচ্ছে, সব গাড়ি-গুলোই বিদেশ সম্ভার গাড়ি। এবার তিনি খুঁটিয়ে দেখলেন, কোন কোন স্টেশনের [illegible] অঞ্চলে, ঘটনাগুলো ঘটেছে। দেখতে দেখতে তাঁর কপালে বিস্ময়ের রেখা ফুটে উঠল।

তিনি আবার কাটিংগুলো খুলে, একটা [illegible] নিয়ে, ঘটনার তারিখ আর স্টেশন-গুলোর নাম আলাদা আলাদা ভাবে লিখলেন। লেখা হয়ে গেলে, আলাদা আলাদা ভাবে লিখলেন। তাতে যা ফুটে উঠল দেখা গেল, ছেত্রিশটি ঘটনার মধ্যে, আটটি ঘটনাই ঘটেছে, বিশেষ [illegible] স্টেশনের [illegible] অঞ্চলে। বাকী পাঁচটি ঘটনার মধ্যে [illegible] ঘটনা আসা পাওয়ে [illegible] স্টেশনে। বাকী তিনটি পাওয়া [illegible] মাইল দূরে।

আটটি ঘটনা যেখানে ঘটেছে পরপরপর মৃত্যুর ঘটনা সেখানকারই। দেখা যাচ্ছে, পাঁচটি মৃত্যুর মধ্যে, তিনটি ঘটেছে এখানেই। আর মাইল দেড়েক দৌড়ে এক মাইলের আগে পিছনে। বাকী দুটি মৃত্যুও মধ্যে, একটি ঘটেছে, এই দুই স্টেশনের পরের স্টেশনের [illegible] মাঝামাঝি। সে হিসাবে দেখতে গেলে, চারটি মৃত্যু ঘটেছে তিনটি স্টেশনের মধ্যে। বাকী একটি ঘটেছে, [illegible] তার থেকে [illegible] মাইল দূরে।

বিপিনচন্দ্রনাথ তিনটি স্টেশনকে পেন্সিল দিয়ে গোল করে ঘিরলেন। মানচিত্রে তার মাইল এর [illegible] হবে। তিনটি স্টেশন [illegible] মধ্যে [illegible] পড়ছে। এই দূরত্ব [illegible] দু মাইল দু মাইল চার মাইল হলার সম্ভাবনা। এক মাস মাইল তার বেশি হতে পারে। চলন্ত গাড়িতে যারা পাথর ছুঁড়ে খেলা করে, মনে হয়, [illegible] চাঁপাতলার মধ্যে [illegible] মাইল [illegible] মধ্যে আছে। গত কালের ঘটনার পরে, আজ তারা কথা নিয়মে নিশ্চয়ই ইস্কুলে গিয়েছে, খাওয়া খাওয়া খেলাধুলাও করবে। এবং আবার কোন একদিন [illegible] হয়তো, পাকা ঘোঁড়ায় দেখতে তাদের ঘরে ডাকবে। কেউ হয় তো, তাদের খেলার খলি হবে।

কিন্তু, একটা কথা বিপিনচন্দ্রনাথের মনে [illegible] উঠছে। এই তিনটি স্টেশন বা দুটো স্টেশনের এলাকায়, এ খেলা কি তিন তিন দলের ছেলেরা করেছে। না কি একটা দলই এ কাজ করছে। তিন তিন দলের খেলা হলে, তেমন [illegible] [illegible] কারণ নাও থাকতে পারে। কিন্তু, যদি একটি বিশেষ গুপ্ত দল তৈরী হয়ে থাকে চলন্ত গাড়িতে পাথর ছোঁড়াও খেলাতেই একমাত্র তাদের আনন্দ [illegible] উঠেছে, তাহলে ভয়াবহ ব্যাপার। আর সে রকম একটা সন্দেহই ক্রমে তার মনে আসছে।

পরপরপর যে দুটি স্টেশনের মধ্যে, তিনটি মৃত্যু ঘটেছে, মতলবের মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে, সেখানে কি তিন তিন দলের [illegible] খেলা এটা সম্ভব? তাহলে বলতে হয়, পাথর ছোঁড়া দলে সাথে। বিশেষ করে, দুটো স্টেশনের [illegible] মাঝামাঝিই ঘেড়ে উঠেছে। কিন্তু সেটা বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে না। বিভীষিকা বাড়িও, ব্যাপারটা বিশ্বাস চোখে না দেখলে, [illegible] কিছু বলা যায় না, তবে মনে হয়, ছেড় দু মাইলের মধ্যে, বয় বছরের ছেলেরা, অধিকাংশই পড়ে নিজেদের ঘরে। কর্মচারী না থাকলেও, মুখ চেনে। তারা সবাই স্কুলে যায়। মাইল দুয়েকের মধ্যে, যে কটা স্কুলে থাকতে পারে,

নিশ্চয়ই তারা সকলে, সেব সব ১৯৫৫ই পারে।

কলকাতা থেকে, আই কল মাইলের মধ্যে। যে রকম ঘিঞ্জি বসতি হয়েছে, বিশেষতঃ রেল লাইন ঘেঁষে, তাতে এত বেশী মাঠ ময়দান নেই যে, দু মাইলের মধ্যে বসতি, এমন ছেলেরা, অনেকেই অনেককে চিনবে না। বরং স্কুল খেলাধুলো ইত্যাদি সব মিলিয়ে, তাদের অনেক কাছা-কাছি থাকবে।

যদি ধরে নেওয়া যায়, তিন তিন দলের ছেলেরা পাথর ছোঁড়ার খেলা খেলেছে, তা হলেও, নিশ্চয়ই, বিভিন্ন দলের জন্যে, দু একজন কখন ছেলে যাওয়া স্বাভাবিক। যে এ দলে বা ও দলে, কোন না কোন সময়ে ছিল। একেবারে বিচ্ছিন্ন আলাদা দল হতে পারে বলে মনে হয় না।

কিন্তু এ চিন্তাটাও, একটা নতুন বিপদের সম্ভাবনাকে মাথায় তুলতে চাইছে। সে রকম কোন কখন common ছেলে যদি থাকে, যে পাথর ছোঁড়া দলের সকলের সঙ্গেই খেলতে যায়, তাহলে সে তো মারাত্মক। তার মানে, চলন্ত গাড়িতে পাথর ছুঁড়ে খেলাতেই, তার সব থেকে বেশি উত্তেজনা, বেশি আনন্দ। তার তলাটের জন্যে, কেবলেই পাথর ছোঁড়ার খেলা, সেখানেই সে আছে। কিংবা ধরে নেওয়া যেতে পারে, এমন একটি কি দুটি ছেলে, সেই তল্লাটে আছে, যাদের কেবলে বা যাদের জন্য জানেলেই, যাকীরা চলন্ত গাড়িতে পাথর ছোঁড়ার খেলা শুরু করে দেয়। অর্থাৎ পাথর ছোঁড়ার লিডার এরা বা একজন।

সম্ভাবনাটাকে এভাবেও উঁকিয়ে দেওয়া যায় না। গিরিন্দ্রনাথ মনে মনে বললেন, 'আর আমি যদি ধরে নিই, আটটি ঘটনা ঘটেছে একটি দলেরই জন্যে, তাহলে সন্দেহ হয়, পরবর্তী স্টেশনের দু মাইলের মধ্যে, বাকী দুটো ঘটনাও তারাই ঘটিয়েছে। সেখানকার ছেলেদের মাথায় হঠাৎ পাথর ছোঁড়ার দেবতা ভর করবে না। এ রকম হঠাৎ ভর করে তখনই, যখন সেটা ইনফেক্টেড হয়ে ওঠে, অর্থাৎ যদি কোন দলকে তিন তিনটিতে দেখে থাকে, তাহলে একটা পরবর্তী তাদের মধ্যে আসতে পারে।

তার চেয়ে, গিরিন্দ্রনাথের মনে এই সম্ভাবনাটাই বেশি চোখে, আটটি ঘটনা যারা ঘটিয়েছে, (যদি সত্যি সত্যি একটি দলই হয়) তারা কোন কারণে, তাদের এলাকার বাইরে গিয়েছিল। হয়তো রেল লাইন ধরেই গিয়েছিল। হয়তো কোন খেলার ম্যাচ দেখতে গিয়েছিল। কিংবা, তিনের নবকরা কোন রাজনৈতিক নেতা এসেছিলেন মিটিং করতে। ছেলেরা না বুঝলেও, মাতব্বরদের আর কৌতূহল বলতা গিয়েছিল। আর যা হয়, নিজেদের তল্লাটে ছেড়ে, দূরের তল্লাটে, লুকিয়ে সিনেমা দেখতে গিয়েছিল। অনেক ক্ষেত্রেই তেতে পারে, এবং ফেরার পথে, চলন্ত গাড়ি থেকে ঢিলটা তাদের মাথায় চেপেছিল। আর খেলাতেও আরম্ভ করেছিল। পরবর্তী স্টেশনের এলাকার ছেলেরা কিছুই জানে না।

তবু এখনো কথা কিছুতেই ফোলা যাচ্ছে না। গিরিন্দ্রনাথ যতদূর জানেন, কলকাতা থেকে সাত আট মাইলের মধ্যেতেও, রেল লাইনের ধারে এত ঘন বসতি থাকা সম্ভবও, এ ঘটনা ঘটছে কী করে, এবং কেউ ধরাও পড়ছে না কেন। সেটা কি স্থানীয় অধিবাসীদের কোন রকম নিষ্ক্রিয়তা, নিরাসক্তি? সেটা যারো গভীর ভয়ের কথা।

তিনি টেবিলের ওপরে, টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিলেন। ডায়াল করলেন। একটু পরে বললেন, 'হ্যালো, কে আনার্জি? আমি গিরিন্দ্রনাথ বলছিলাম।'

ওপার থেকে ধুলি সন্তদের সুর ভেসে এল, 'নমস্কার দাদা। অনেক দিন পরে, কী খবর বলুন।'

গিরিন্দ্রনাথ বললেন, 'তোমাদের ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে আমার যে একটু দরকার আছে ভাই।'

ওপার থেকে ভাবার এল, 'আমাদের ডিপার্টমেন্ট বলছেন কেন দাদা, এ তো আপনার ডিপার্টমেন্ট।'

গিরিন্দ্রনাথ মাথা নেড়ে বললেন, 'বললে বলে, তোমাকে বলাবাহুল্য জানাচ্ছি। তবে চাকরি আর সইল নই।'

গিরিন্দ্রনাথের একটি দীর্ঘশ্বাস পড়ল। ওপারে নীরবতা। গিরিন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গেই আবার বললেন, 'যাক সে ও সব কথা, লাভারটা হচ্ছে, কোন একটা ব্যাপারে, আমি একটু তথ্যের অনুসন্ধান করতে চাই। হয় তো বেকার কল আছি বলেই, এ সব মাথায় ঘুরছে।'

ওপার থেকে প্রশ্ন এল, 'কী ব্যাপার বলুন তো।'

গিরিন্দ্রনাথ বললেন, 'টেলিফোনে সব কথা বলার অসুবিধা আছে। আই মীন, বুঝিয়ে বলতে অনেকক্ষণ লাগবে। তুমি কি ভাই সময় করে, আজ হোক, কাল হোক একবারটি আসতে পারবে?'

ওপার থেকে ভাবার এল, 'নিশ্চয়ই যাব দাদা। আজ যদি সন্ধ্যাবেলা থাকেন, আজই যেতে পারি।'

গিরিন্দ্রনাথের মুখে একটি বিরক্ত হাসি দেখা দিল। বললেন, 'আমি আজ কোথায় যাব ভাই। আবার তো সবই উলটো। যে কারণে লোকে কলকের মধ্যে ভুলে থাকতে চায়, সেই কারণে আমি নিজেকে গৃহবন্দী করে রেখেছি।'

ওপার থেকে আনার্জির গলা শোনা গেল, 'ঠিক আছে, আমি তাহলে আজ সন্ধে বেলাতেই আপনার ওখানে যাচ্ছি।'

গিরিন্দ্রনাথ বললেন, 'এসো।

রিসিভার নামিয়ে রাখলেন। তারপরে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে, যেন গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন।

এত বড় বাড়িটা, কোথাও একটু, সাড়া শব্দ পাওয়া যায় না। টেলিফোনটার একটা হোল, সারাদের জানালার পাশ দিয়ে উঁকি এসেছে। তার থেকে কতক দূরে দূরে বেল লাগু, গাছটাকে এখনো বিশেষ বলা চলে মাত্র পাঁচ ছ বছরের গাছ। এর মধ্যেই, ডাল ছড়িয়ে, আকাশমুখো হয়ে, ঘন ডালপালা পাতায় বেশ কাছ টৈরী করে ফেলেছে। পাতার ফাঁকে, গাছতর এসেছে। ছায়া বিবি, ঘাসে, ছেলে মেয়ে টেনটুনি, দল ছোঁয়ার খেলা খেলছে। গিরিন্দ্রনাথ দেখছিলেন।

গিরিন্দ্রনাথের চেয়ে, ছোট ছেলের ৬ বছর। চশমার মধ্যে, তাঁর চোখ দুটো দেখে, স্বাভাবিক অবস্থার থেকে অনেক বড় দেখাচ্ছে। চোখ দুটো তাঁর এমনিতে বড়ই। চওড়া কপাল, মাথার চুল সব চুল-গুলো কাঁচা পাকা মেশানো। চেহারার মধ্যে দেখলে বোঝা যায়, লম্বা পুষ্ট শক্ত হাতে বেশ বলিষ্ঠ মানুষ তিনি। কিন্তু, বয়সের তুলনায়, তাঁকে যেন একটু বেশি শান্ত মনে হয়। পঞ্চাশ যাহাদের মধ্যেই তাঁর বয়স হবে। হাঁটুমধ্যেই, তাঁর কপালে সরু তার পড়েছে। চুলগুলো কাঁচা পাকা, এই রকম পায়জামা পাঞ্জাবী পরা, লোকে লোকে লম্বা মানুষটিকে, পিছন থেকে হঠাৎ একজন বয়স ভুল ভুল করা মোটেই অস্বাভাবিক হত না।

মুখের অনেক রেখা ও ভাঁজে, তাঁর চেহারাকে রুক্ষ বা কঠিন করে তোলেনি। একমাত্র হয় তো একটি কঠিন বাক্তিত্বের ছাপ ছিল ওই মুখে। এখন কেমন যে একটি বিষণ্ণ ক্লান্তি সেটি হলে মনে হয় তাঁর ডানের চোখ দুটোর দিকে তাকালে মনে হয়, গভীর একটা ব্যথা বয়ে চিন্তায় তিনি দূরের এক জগতের দিকে চেয়ে রয়েছেন।

তিনি টেনটুনি পাখী দুটোর খেলা দেখছিলেন। তাকে মাঝে, ছোট্ট পাখী দুটি দেখবারবুর জন্যেই কাছ ছেড়ে, টেলিফোন টেলের, এ-ঘন পাতা ডালে এসেও বসছিল। পুচ্ছ নাচিয়ে নাচিয়ে, যেন এ ওকে কত কী বুঝাচ্ছিল। থেকে থেকে শিস দিয়ে উঠছিল হয়তো, নিজেদের ভাষা ওরা কিছু বলাবলি করছিল। কে জানে, এই সব পাখির ভাষা ওদের হাসিও জানার কিছুটা হয়তো কথাটা মনে হতেই, ওঁর কানে গেল কী গলায় খিল খিল হাসি কেঁপে উঠল। তিনি চমকে ঘরের দিকে তাকালেন। ঘর থেকে বারান্দার দিকে, তারপরে, রাকপথের খোলা জানালা দিয়ে পাশের ঘরে।

কিন্তু কোথাও কেউ নেই। শূন্য বাড়ি। সংলগ্ন ছোট বাথানে, টেনটুনির ডাক ছাড়া, এ বাড়িতে কোন শব্দই নেই। সমস্ত বাড়িটা নিঝুম। কোথাও একটা পিন পড়লেও বোধহয় শব্দ শোনা যাবে।

এ সময়েই, বারান্দার দিকে দরজায় একটা ছায়া পড়তে, গিরিন্দ্রনাথ সেদিকে তাকালেন। হাতে লাঠি ধরে, মোটা কাপড়ের পায়জামা পরা, মাঝবয়সী একটা লোক। ওর নাম বিশ্বম্ভর। এ বাড়িতে একমাত্র লোক, যে সর্বক্ষণ থাকে। এ বাড়িতে আর যারা থাকে

করে, তারা বাঁধাধরা সময়ে, বাঁধা বেলা আর করে চলে যায়। ঘরদোর ঝাঁট দেওয়া, ধোয়া, বাসন পরিষ্কারে ভজা, রান্নাঘরে ইতস্তত সাজ করা, সব কিছুতে প্রনাই আলাদা লোক আছে। তারা কাজ মিটলে, চলে যায়। বিহারী এ বাড়ির বাসিন্দা। গিরিন্দ্রনাথের সংসারে একমাত্র লোক।

বিহারী জিজ্ঞেস করল, 'চা কটি কিছু, দেব?'

গিরিন্দ্রনাথের চায়ের কিছু যেন এক মুহূর্ত দেরী হল। তারপরে বললেন, 'না থাক, ভাল লাগছে না।'

বিহারী মাথা নিচু করে, দোরের দিকে তাকাল। আবার গিরিন্দ্রনাথকে দেখল। তার পরে ঘরের ভেতর এসে, এক কোণের ছোট একটা চৌকিলের কোল টেনে, সেখান থেকে, পাইপ চৌকিতে তার লাইটার নিয়ে, গিরিন্দ্র নাথের সামনে বসল। জিজ্ঞেস করল, 'তামাক ভরে দেব?'

গিরিন্দ্রনাথ আবার বাইরের দিকেই তাকিয়েছিলেন। বললেন, 'না থাক। রাখো এখানে, ইচ্ছে হলে, ভরে নেব খন।'

বিহারী গিরিন্দ্রনাথের দিকে আবার দেখল। তার চোখে একটা অস্পষ্ট ভয় দেখা দিল। একটা বড় নিশ্বাস অন্তরতলে মিশে, তার মুখটা খুলে গেল। যেমন একটিক আসার তেমনি বেরিয়ে গেল। এমন সময় ঘোড়াগাড়ির খটিখট, চক চক করে নট বাজল।

ঘোড়া থামল, বইয়ের আলমারির ঠাসা। দেশ এবং বিদেশের, বহুবিধ বই সংস্কৃত ইংরাজি, বাংলা আর সংস্কৃত ভাষার বই। ঘরের পুরে বাসখানা একটা সেক্রেটারিয়েটে টেবিল। চেয়ারের পাশে, একটা বিতর্কাচ্ছি বইয়ের র‍্যাক্। পুরোনোদের সঙ্গে হাত বাড়ালেই যেমন, তরতাজি বইও পাওয়া যায়: আবার বইয়ের দিকে তাকালেই বোঝা যায়, সমাজ সংস্কার এবং ধর্মতত্ত্বের বইই-ই বেশি। বিভিন্ন এনসাইক্লোপিডিয়া আর অভিধান সমূহও রয়েছে। রাজনীতি এবং অর্থনীতি বিষয়ের বইও কম না।

ঘোড়া সব থেকে লক্ষণীয়, সেটা হল, বইগুলো ধুলো লাগানো বা অব্যবহৃত অবস্থায় চেহারাও না। অধিকাংশ ব্যবহারের লোকের বাড়িতে, যে জিনিসটা দেখা যায়। খুব সাজোবার মনো বই, তার সঙ্গে গৃহকর্তার একটা 'ইগো'-এর সন্তুষ্টি, এই সব পুস্তকের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা মনে রেখে যেন, অতিথি অভ্যাগতের দল কথা বলে। এইসব ভদ্রলোকদের চরিত্র বিশ্লেষণ একবার, বালীগঞ্জদের ছুতোমী ভাষাতেই হতে পারে।

এ ঘরে বইয়ের চেহারা আর গৃহকর্তাকে দেখলে বোঝা যায়, উভয়ে উভয়ের পরি-পূরক। এ ঘরে বই মানেই, রীতিমত কিছু। একজন মানুষের সমস্ত একাগ্রতা আর সুখ বাড়ির অন্যান্যদের পূর্ণ করে রেখেছে। এ ঘরে বই মানেই, বিভিন্ন সত্তা, চর্চার, ভক্তব্য। তার মানে অভিব্যক্তি। হাসি, গান্তীর্য, ক্রোধ, বিরক্তি, কোধ, বিদ্রূপ, সমস্ত কিছুই আছে। গিরিন্দ্রনাথ তাই, ঘরের মধ্যে একাকী হলেও, ঘরের মধ্যে আছেন।

গিরিন্দ্রনাথ দেখলেন, ট্রেনটুনি ঝুড়ো এখন উঠতে হচ্ছে। বোধা থেকে ঝুড়ো ঝুলবুলান এসেছে। ছেলেবেলার ডাকে বলে, তখনো গলায় লিল ছিড়ছে। তিনি উঠলেন। আস্তে আস্তে পাশের ঘরে এলেন। এক কোণে, ঢাকনা দেওয়া লিচু, চৌকিলের ওপর, পালাপাশি ঝুড়ো ছেলে, ঝুড়ো ঝুড়ো বসেছে। একটি ছেলে, ঝাঁটা মতুন কিশোরের ছবি। আর একটিতে, একজন ছাঁচল সাইত্রিশ বছর বয়সের মহিলার ছবি। সকলের ছবিই বেশ হাসি খুশিতে ঝলমলানো। কিসোর ঝুট ঝুলবুলের মুখের দিকে চেয়ে হাসছে। গিরিন্দ্রনাথ মুগ্ধ চোখে মনে হচ্ছিল, যেন একটা ঝাড়লে ছেন, গিরিন্দ্রনাথ ঝুলিতে হাসছেন।

চৌকিলের সামনে একটা ছোট ইজি-চেয়ার পাতা। গিরিন্দ্রনাথ আস্তে আস্তে তাতে বসলেন। স্ত্রী আর পুত্রদের ছবির দিকে, চুপ করে তাকিয়ে রইলেন। পান্তা আর সুনো মুনো। ঝুড়নের ডাক নাম টাই ছিল। ঘরের চলার ফেরার ছেলার হাসিতে, প্রায় একজনের ঘরকন্নাই এ বাড়ি সব সময়ে সরগরম থাকতো। যখন গিরিন্দ্রনাথ ছিলেন, ছেলে ডিপার্টমেন্টের একজন হোমরা চোমরা অফিসার।

এখন ঘরে এসে বসেছেন, আর কোথাও যেতে চান না। তখন বাড়ি নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলেন, পান্তা অভিযোগ করলেও বলতেন, 'যাব কাজ, কী করব বল, এত কাজ। তবু, তবুও শেষ নেই।' আসলে তখন সর্বক্ষণের সঙ্গীও, বন্ধুর মতো জেগে থাকত, একটি ছবিও সংসারের ছবি। কাজ করতে ভালবাসতেন, কাজের অনন্তর উৎসাহ তার অফুরান্ত ছিল। সব কিছুতেই কারণ খোঁজ হত, মনের মতো সব সময়ে জেগে থাকত, সেই একটি ছবি, খুশি ছড়ানো সংসার। ছাড়তেন, কাজ ছেড়েই তা ছুটে বেরিয়ে চলে যায়। সেখানে তো তেউ আমাকে ফাঁকি দিয়ে পালাবে না, আমার শান্তি, সুখ কেড়ে নিতে পারবে না। সেখানে গিয়ে তো, আমি আর একের মানুষ থাকব না। তখন আমি পরিপূর্ণ সংসারী আর কিছু। খেলা, খুনসুটি আদর আরও কত কিছু।

আসলে, এই চিন্তাটা ছিল একটা শক্তি। একটা বিশাল কাজের মানুষের শক্তি ছিল। আসল, যার, সেটাই মূল কথা। মোটা মাইনের চাকরিতে ঢুকে, কত খেলা খেলেছেন সুনো মুনোর সঙ্গে। পান্তা বলত, 'ও কি রোজকের ভাঙাচি খেলা বাপু। তোমরা তো মহাবাঁদর একটা।'

গিরিন্দ্রনাথ বলতেন, 'আজকা এখন সবাই ছোপ্পা। কে হবে কে ছেড়ে, কিছুই বলা যায় না। তিন জনের তিন পার্টি, হারজেতা কে উপরে করে দেখা যাক।'

বলে, পান্তাদের পরা খালি পা গিরিন্দ্রনাথ চোখমুখ আরোক্তিম করে, সজোরে গর্জন করে, এক ছেলেকে এমন তাড়া করে মাটিতে শুইয়ে ফেলতেন, যেন সত্যি কুস্তি হচ্ছে। পরমুহূর্তেই আর এক ছেলে তাঁর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ত, চিৎকার উঠত, 'ববরদার ভাতার।' অবিশ্যি, একজন ছেড়ে সর্বাপেক্ষা ভয়ানক লোকের ভূমিকায়ী অভিনয় করত, গিরিন্দ্রনাথের। সেইসব নাটকের দর্শক পরমানন্দে শান্তা। কখনো কখনো, ঝাঁটার ঝি-চাকরেরা। ঘাড় লুকিয়ে নিয়ে মেয়ে মহলে হাসাহাসি করত, আর বলত, সাহেব সত্যি ছেলেমানুষ।'

তখন গিরিন্দ্রনাথ ছিলেন সাহেব। শান্তা তো তিন পিতাপুত্রের খেলায় এক-এক সময় ধৈর্য হারিয়ে বিরক্তই হত। তিনটি পাগলকে নিয়ে, এক এক সময়ে একেবারে হিমশিম খেয়ে যেত। গিরিন্দ্র-নাথ ভাল এ্যাসথলেটও ছিলেন। চাকরির পরেও অনেককাল খেলাধুলা ছাড়েন নি। বিবাহের পরেই একটা ভাটা পড়েছিল। ছেলেদের জন্মের পরে, বাচ্চের বাঁধাছকের ভারে, আস্তে আস্তে সবই ছেড়ে দিতে হয়েছিল। কিন্তু, ছেলেদের সঙ্গে খেলাটা অনেকদিন ছাড়তে পারেন নি।

কতকগুলো ব্যাপারে অবিশ্যি, গিরিন্দ্র-নাথ প্রথাবিরোধী বড় চাকুরে ছিলেন না। তাঁর সহকর্মীরাই অধিকাংশই নাচে গানে পানে আসক্ত ছিলেন। কাজের পরেই, সেটাই ছিল সহকর্মীদের আনন্দ। কিংবা বলা যায়, কাজের শক্তি ওঁরা সেখান থেকেই আহরণ করতেন। মনের মতো অধিকাংশ দিনই বন্ধুদের পার্টি লেগে থাকত। অবিশ্যি, তাঁদের পরিবারের মহিলা, পরিচালী হওয়া ছিল না। গিরিন্দ্র নাথের সেইরকম কোন আসক্তি ছিল না। বরং বলা যায়, তাঁর আসক্তির ক্ষেত্রটা ছিল সংসার, শান্তা সুনো মুনো। অফিস ফেরতই সন্ধাইকে নিয়ে গাড়িতে করে কোথাও বেড়িয়ে পড়া। তা সে কল-চত্বরে, মাঠের ধারে, নদীর তীরে, সমুদ্রসৈকতে বা পাহাড় পর্বতে। ওঁর মন্ত্রীমন্ত্রণালয়, মাঝে মাঝে ঠাট্টা করতেন, গুরুতর কাজ ফেলে যাচ্ছেন। কিন্তু, গিরিন্দ্রনাথকে হেলপেলও করতেন।

তাঁর মনে এই যা, পরিব্রাজকে নিয়ে গিরিন্দ্রনাথ স্বার্থপর ছিলেন। সমাজ সামাজিকতা করছেন না, যা বন্ধুবৎসল ছিলেন না। আজ সমাজ সমাজ সামাজিকতা কলকাতা, সবই তখন ছিল। তবু এখনই সব গিয়েছে। এখন সমাজ সমাজ কিছু, কিছুই নেই। এমন কি কাজও নেই। অথচ, এখনই গিরিন্দ্রনাথের অসন্ত অবসর। আর এখনই তিনি বড়লোকী, একাকী।

আর সাত দিন অন্তর পিয়ানে, ছেলে-মেয়েই মারা গিয়েছিল। পাশের সুনো মুনো আইসিলেশন ঘণ্টায় আসছে। ছদিন পরে শান্তা। সুনো মুনো মারা গেল এই কলকাতায় বুকে। গিরিন্দ্রনাথের

চত লোক যদের যারা, যাঁর সর্বরকম চিকিৎসা সাহায্য পাবার সুযোগ ছিল। সুযোগ নেওয়াও হয়েছিল। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা এত আকস্মিক, চিকিৎসা যেন সাধ্যের মধ্যে সুসংবদ্ধ হওয়ার মেল না। ব্যাপার কতখানি গভীরে নিকট গেছে, এবা কত দূরে, প্রথমে সঠিক তার মাপ-জোখ, যেমন ঠিক করে ফেলবার আগেই, যেন কোন অদৃশ্য থাবা এসে, সুন্দর মানুষকে, ছবিটা ছিঁড়ে নিয়ে চলে গিয়েছিল। কেবল, অত্যাচারে দুই কিডনির আর কতটা পারমানেন্টেই সব শেষ।

শান্তার বিষয়ে ডাক্তাররা যাই বলুক, লোক এবং ঘটনার মুখোমুখি অন্তত একবা ভয়ংকর ব্যাধির মতই, অনেক সময়, মানুষের মৃত্যুর কারণ পর্যন্ত হয়ে ওঠে। শান্তারও তাই হয়েছিল, বিশ্বনাথের এমাই ধরে বিশ্বাস। অথচ সুন্দর মানুষকে হারাবার পরে, শান্তা আর ওঠে নি, ডাক্তাররা অনেক চিকিৎসা করেছিল, ওষুধ দিয়েছিল। সবাইকে ছেড়ে যাওয়ার, শেষ একটা কথা বলে না বলে, সে বিশ্বনাথকে ছেড়ে গিয়েছিল।

ঘরে ফিরেছেন কেবল বিশ্বনাথ।

মা, বিশ্বনাথের চেয়ে ভাল পড়ছে না। ফটো দুটোর সামনে বসে, সেইসব কথা ভাবতে ভাবতে, তাঁর মুখ বিকৃত দুঃখ উঠছে না। কেবল নিঃসঙ্গতা যেন একা হয়ে থাকতে চায়। পরস্পরকে এগিয়ে, ছেড়ে দিয়ে যেন বসে থাকা যায় না। আপনা থেকেই কেমন শক্ত হয়ে ওঠে। অনাধার যেন, মোটা পরাগরা ছোঁয়া ঠোঁটে উঠে। ধরে কোপে উঠলে, সেই উচ্ছ্বাস তিনি থামাতে পারবেন না। ছুটি নেবার মত হয় তো, সেই সময় তাঁকে মাথাতে আছড়ে ফেলবে, তাঁর চুলগুলে স্পর্শ করে, নিঃশব্দে করে তুলবে। তখনো আর জ্ঞান ফিরে পাবেন না। কেবল, খুব অসহায়ভাবে, হঠাৎ একবার একটু বাধা দাঁড়ালেন, আর উচ্চারণ করলেন, 'আশ্চর্য।'

অনেকটা বিস্ময়ের সুরে কেন শব্দটা উচ্চারিত হয়। যখন কোন মানুষ, সহসা কোন ঘটনায়, বিমূঢ়তাবিবশ হয়ে পড়ে, আর বিস্ময়ে কিছু বলে ওঠে। তেমনি শোনাল তাঁর গলা। একটা অসহায় বিস্ময় ছাড়া, সেটা কিছু না।

বিশ্বনাথ ঈশ্বর মানেন কী না, নিজেও জানেন না। কিন্তু একথা তিনি কোন দিন ভাবেন নি, তাঁরা যদি চলে গেল, তবে তিনি কেন রইলেন। এ কথা মনে হলেই তার নিজের ভিতর থেকেই একটা প্রবাব সব সময়ে পেয়েছেন, তখন সংসারের কোন কিছুকেই তার্থকারণবিহীন ভাবতে পারে না। হয়তো, আমার এই পারিপার্শ্বের মধ্যেও বিশেষ কোন তার্থকারণ রয়েছে। যদি তা আরো নিখুঁতভাবে কিছু হয়, তাকে সহজ-ভাবে নিতে হবে। এছাড়া, কিছু করণীয় থাকতে পারে না।

পারেন নি কেবল একটা তিনিস। পারেন নি আর করতে। চাকরিতে আগের সমস্ত শক্তি যেন তার ভিতর থেকে কেউ কেড়ে নিয়েছিল। সবাইকে হতাশ করে, কিছুকাল ছুটিতে করেছিলেন। অন্যরা এবা সহকর্মীদের, সকলেই তাঁর ওপরে অনেক সমবেদনা ছিল। সান্ত্বনাও যথেষ্ট সে-কথা অনুভব করছেন।

কিন্তু পারছিলেন না কিছুতেই কাজ করতে পারছিলেন না। তাঁর মত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, প্রখর মনযোগী কর্মী লোক, তাঁর অনেক আগের বিচার বিবেচনার ওপরে সকলেরই অগাধ ভরসা যার নির্ভর, সেসব কিছুই তিনি আর করতে পারছিলেন না। শুধু পারছিলেন না, বললে ভুল হবে। তাঁর আসলে কেউই ইচ্ছা করত না কাজের সম্বন্ধে কথা বলতে পারছেন না। তিনি চুপ করে থাকলেও তাকে কেউ বিরক্ত করত না। কিন্তু তিনি নিজে তো আর জীবনটাকে একেবারে ছাড়ায়ে ফেলেন নি। সকলেই সহানুভূতি এবং কর্তব্যবোধের, তাঁর কাছেও অত্যন্তভাবে, একটা সামাজিক আদায়ের ফল বলেই জানতেন।

বিশ্বনাথ জানতেন, তা মোটেই না তিনি থাকলে আসলের অনেক জোর করে। চলে যেতেন মানত তাদের। তাইলের মনে ভাইল পড়ে থাকত, খেলবার কথা মনে থাকত না। কোন অনুষ্ঠানের বা নিমন্ত্রণের সঙ্গে, তাতেও যা দেখা করতেন না। তাই সপ্তাহে তিনি বেশ কিছু দিনের জন্য ছুটি নিয়েছিলেন। ছুটি নিয়েছিলেন, বাইরে বেড়াতে যাবার জন্য না। বাড়ির থাকবার জন্য। বাড়িতে থাকতেই তাঁর ভাল লাগত। এ-ঘরে ও-ঘরে, রান্নাঘরে বাগানে ঘরে ঘুরে বেড়াতেই ভাল লাগত।

ছুটির সেই অবস্থায় আটদিন, অন্যান্য দিকে কোন চলে যাচ্ছিল। নানা ধরনের বই, নানা বিষয়ে পড়তে আরম্ভ করে ছিলেন। ধর্ম বা দর্শনের না। একেবারেই এসব ভিন্নতে ডুবে থাকতেন। তারপরে, শেষে তাঁর পেনসন পাবার কথা মনে। সাতচল্লিশ বছর বয়সে, সারা জীবন ধরে পেনসন মেনে নিয়ে, চাকরিতে অব কোন দিন ঘোষণা করেন নি।

পরদিন সকলেই বিশ্বনাথের জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছিল। তার চাকরি ছেড়ে দেবার পেছনে, অনেকে ভেবেছিল কোন ধরনের মানসিক অসুখ বিসুখের লক্ষণ কথা কিছুতে কী না। বিশ্বনাথ, সকলের সঙ্গে কথাবার্তা বলে, ভাল করেই বুঝিয়ে দিয়ে ছিলেন, সে রকম কোন ব্যাপারই তাঁর মধ্যে নেই। জীবনটাকে এখন তিনি অন্য ভাবে দেখছেন। তিনি নিজেকে নিয়ে একলা কাটাতে চান। যদি কখনো কোন কাজ তাঁর করতে ইচ্ছা হয়, তাহলে নিশ্চয় তিনি সেই কাজে এগিয়ে যাবেন। আপাতত এই অবস্থাতেই তিনি ভাল আছেন।

আসলে বিশ্বনাথের কথায় কোন ঊনিশ ছিল না। তিনি মনে মনে ভাবতেন, তার করব, কাজ এক সময়ে শেষ হবে, তারপরে কী করব, কোথায় যাব। সব-কিছুরই একটা কিনারা এবং পরিণতি আছে। কয়েক লেখে, বিশ্রাম কিন্তু মনে হবে। বিশ্রামই কিন্তু করতে ইচ্ছা করবে। কিন্তু সারা দিনের কয়েক পরে কি তিনি এই বাড়িতে ফিরে আসতে পারবেন। কোথায়, কাদের কাছে, কী জন্য।

তাই তিনি স্থির করেছিলেন, সারা দিন বাড়িতেই থাকবেন। যখন যে বিষয়ে ভাবতে বা করতে ইচ্ছা করবে, তাই করবে। আর এই পুনো নিকুঞ্জ পরিবেশের মধ্যেও, আমাকে অদৃশ্যে ঘিরে থাকবে, আমার ভিতরে ঘরা রয়েছে, তাদের আমি সব সময়ে অনুভব করব।

ওই স্থির সিদ্ধান্ত থেকে তাঁকে কেউ টলাতে পারে নি। তাঁর সবকাটি চৌকলে, ঘাইলের মধ্যে, তাঁর করের দেবার উন্মুখ ঘুণ্টোগুলো ছিল, সেগুলো এখন তাঁর সহকর্মীদের কাছে গলগ্রহের মত হয়ে উঠেছে।

বিশ্বনাথ তাঁর হাত বাড়িয়ে, দুটো ফটোতেই একবার স্পর্শ করলেন। তারপর আবার পাশের ঘরে ফিরে এলেন। চোখদুটো পরিষ্কার করে, পাইপে ভরতে লাগলেন।

সন্ধ্যাবেলা বানার্জি এল। অফিসের পোষাকে, সদ্যেই বছরের বানার্জির বয়স বিশ্বনাথের থেকে কিছু কম। মাথাটি লম্বা ছিমছাম চেহারা পরা, হোমরাচোমরা মানুষ। বিশ্বনাথ তাকে অভ্যর্থনা করলেন, 'এস বানার্জি, এস। তোমার সঙ্গেই তাই দেখা করলাম।'

বানার্জি বসতে বসতে বলল, 'মা না থাকা, দেখা হবে। অনেক দিন বাদে আপনার সঙ্গে দেখা হল, কেমন একটা মনে হচ্ছে।'

বিশ্বনাথ হাসলেন, 'আমার কাছে আর আনন্দ কিসের ভাই। সন্ধ্যেবেলা তোমাকে যে একটু ডিঙ্কে অফার করব তারও উপায় নেই। আমার অসুখ—।'

বানার্জি বাধা দিয়ে বলল, 'কোন ধরনের নেই। একটা সন্ধ্যে ড্রিঙ্কে না হলে মারা যাব না। রাত্রিটা তো এখনো পড়ে আছে।'

বিহারী এল। বিশ্বনাথ তাকে কাজ জানতে বললেন। সবে কিছু, খাবার। তারপরে তিনি নিজের ঘরে এলেন। চেয়ে পাশের ছোঁড়ার সমস্ত ঘটনাটা, তিনি যে-ভাবে ভেবেছিলেন, বানার্জিকে সবই বললেন। বানার্জি খানিকটা অবাক হয়ে, বিশ্বনাথের কথা শুনেছিল। অনুমান করতে পারছিল না, এরকম [illegible]। পরে নিয়ে, বিশ্বনাথ বললেন [illegible]।

বিশ্বনাথ ঘটনা বাধা করে বললেন,

নিশ্চয়।'

ব্যানার্জি বলল, 'নিশ্চয়। আপনার মুখ থেকে একথা না শুনলে, ব্যাপারটা কেমন বিশ্রী আমার কাছে এতক্ষণ মনে হত না। এখন আমি হাতেনাতে প্রমাণও দিতে পারব। জীবনে কোন দিন পিতৃপরিচয় ছাড়া বাঁচা বা মরার সামনে যেন কেউ পড়বে না। পরিচয় মুছতে আমার আপত্তি হবে।'

বিশিষ্টবাবু বললেন, 'তখনি হাতের হাতুড়ি ছুঁড়ে মারতে ইচ্ছে করছে। ও-কথা মনে করে ওদের কষ্ট দিতে ইচ্ছে নেই। সবচেয়ে ভাল হয় যদি ওদের ছেলেদের মানুষ করে তোলা যায়, তাহলে ওদের কষ্টের মাত্রা হয়তো কমে যাবে। কিন্তু ব্যানার্জি, আমার কথাটা মেয়েদের বেলায় নয়। মেয়েদের হয়তো মনে মনে একটা ঘর থাকতে পারে, কিংবা তার থাকে কী না সন্দেহ। ওদের পরিচয়ের কথাটা নিশ্চয় ভাববার বিষয়। কিন্তু ওদের কি মনে হয় জান ব্যানার্জি, পাপের বাপ ছোঁড়ে, টাকোড়াটা ওদের মতো বোধ।'

ব্যানার্জি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, 'ওদের কী টাকোড়া বাবা?'

বিশিষ্টবাবু বললেন, 'আমি ব্যানার্জি, তখন যখন তাকে দেখি, তখন তার মধ্যে একটা পরিণতির ছাপ। বিশ বছরের তার পকৃতি। সেই পকৃতি মুহূর্তের, মুহূর্তের মধ্যে সে দুর্বল হয়ে পড়ে। তার একটা ভয়ও হয়। পাপের বাপ ছোঁড়ে, ছুঁড়ে মানুষ খুন করে, একটি অল্পবয়সী বালকের মনে তার পতিক্রিয়া ভয়ঙ্কর। তার ওপরে নিশ্চয় কোন ঘটনা হয়, নিশ্চয় সে ওদের অসুখী। একবার ভাব, তার টাকোড়া কেন খুঁজে পেতে চলেছে সে নিজের পিতার হাত থেকে।'

ব্যানার্জি বিস্ময়ে বিশিষ্টবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। বিশিষ্টবাবু পাইপ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে তামাক ভরতে ভরতে আবার বললেন, 'কেন যে আমার মাথায় এরকম চিন্তা এল, আমি বুঝতে পারি না। আমার মনের মধ্যে কোন অপরাধবোধ ছিল না। অথচ আমার চোখের সামনে, ওদের একজনের মুখ বারে বারে ভেসে ওঠে। সেটাই আমাকে অমন বোধ অস্থির করে তোলে। তাই আমি ঠিক করেছি ব্যানার্জি, সেখানে গিয়ে কিছুদিন থাকব।'

ব্যানার্জি অবাক হয়ে বলল, 'কোথায়?'

বিশিষ্টবাবু বললেন, 'বিশেষ করে সেই মস্তো সেন্টারের মধ্যবর্তী ভায়গায় যেখানে আসি ঘণ্টায় এবং তিনটি মুখের ডেকর্ড আছে।'

ব্যানার্জি শুকনো মুখে বলল, 'সেখানে গিয়ে আপনি কেমন করে থাকবেন বাবা?'

'ওখানকার লোকেরা যেমন করে থাকে, তেমনি করে থাকব। কাছে পিঠে, একটা ঘর ভাড়া করে থাকব।'

ব্যানার্জি বিশিষ্টবাবুর মুখের দিকে চেয়ে একটু ভাবল। বিশিষ্টবাবু বললেন, 'আমার কোন অসুবিধা হবে না। বিদেশিও আমার সঙ্গে যাবে। তবে, লোকালিটিতে আমাকে নিয়ে হয়তো একটা কৌতূহল দেখা দেবে। আমি যে, কী করি, হয়তো ও-রকম প্রশ্নবাণ তুলেছি কেন, এসব ব্যাপারে লোকের সামনে দেখা দিতে পারে। তবে সেটা একটা খুব বড় ব্যাপার না। মাস-পরিচয়টা গোপন রেখে, একটা কিছু বলে দিলেই হবে। ব্যানার্জি আমি নিজেই খুঁজতে যাব। তোমাকে আমার যে জন্যে দরকার, সেটা হল, লোকাল থানার সঙ্গে তুমি একটু কথা বলে রেখো। লোকাল থানার ও সি'কে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। আর সেটা সব থেকে ভাল হয়, একেবারে হাইটার্স বিল্ডিং থেকেই, সরাসরি ও, সি'কে যোগাযোগ করে বলা।'

ব্যানার্জি বলল, 'নিশ্চয়, এতে কোন অসুবিধাই নেই।'

বিশিষ্টবাবু বললেন, 'আমার সঙ্গে আমার নিয়মিত যোগাযোগের কোন দরকার হবে না। আসলে, পঞ্চাশে, তথ্যানুসন্ধানটাই আমার আসল কাজ। যা কয় সিরাইণ্ড ফিল্ম মেন্ট, যা স্পেশাল এ্যাডাপ্ট ফ্যামিলি কাউন্সেলিং। যার সম্ভব হয়, বাবা মা ভাই বোন, সকলের সঙ্গেই যোগাযোগ করার চেষ্টা, এ্যাডপ্ট না হয়। ছেলেরাই আমার কাছে আসল। কীভাবে ওদের সঙ্গে পরিচিত হতে হবে, আমি এখনো জানি না। কীভাবে পা ফেলব, কী রকমের বাধা আসতে পারে, বুঝতে পারছি না। হয়তো এমন হতে পারে, কোন ছেলেকে আমার এপ্রোচ করা দরকার হয়ে পড়ল, কিংবা পাড়ার লোকেরা আমাকে হয়তো একটা কিছু সন্দেহ করে, এ্যাসাল্ট করতে সুরু করে দিল। এইসব নানান কিছু ভেবে, লোকাল থানাকে একটা দায়িত্ব দিতে হবে। তারা সব সময়েই আমার খোঁজ-খবর রাখবে, কিন্তু খোলা-খুলি ভাবে না। তোমাদের হোম ডিপার্টমেন্ট আর পুলিস বাহিনীর মত, এত অফিসার ,তা আর প্রশাসনযন্ত্রের কাছে কিছু নেই। মুখে তারা যা-ই বলুক, পুলিস-পুলিশ, শতাব্দীর সংস্কার। তোমরা, এদের বোঝাতে পারবে না, হিন্দু আমলের কোটাল, মুসলিম আমলের থানাদার সিপাহী, ইংরেজ আমলের পুলিশ, চরিত্রের দিক থেকে সবাই সমান।'....

বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেলেন। একটু ছেলে বললেন, 'যাক গে, পঞ্চাশোর্ধ্বে বলে যাচ্ছিল। পুলিস আমার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ যেন না করে। অথচ তারা যেন একটু সজাগ থাকে, আমার খোঁজ-খবর করে। তাহলেই হবে।'

ব্যানার্জি বলল, 'এতো এমন একটা কিছু ব্যাপারই নয়। আমাদের আই জি-কে বলে, চব্বিশ পরগনার ডি, আই, জি-কে দিয়ে, আমাদীকালই কথা বলিয়ে দিচ্ছি। আপনি যেরকম চাইছেন, সেই রকম ব্যবস্থাই করা যাবে।'

তার সময়ে বিহারী বাঁচে আর বাবাকে ঠেঁটে নিয়ে চলল। গিরিন্দ্রনাথ বললেন, 'বাঁবাদা আমার সঙ্গে বিহারী যাবে, তাই, সি, এ এগজ্ট সেক্রেটারি এক্স হোমার্স এই

বাদার্জি বিহারীর দিকে চেয়ে হাসল। বিহারীও একটু হাসল, কিন্তু তাতে তার মুখের গাম্ভীর্য কমল না। গিরিন্দ্রনাথ বললেন, 'বিহারীর অবিশ্যি যেমনই ইচ্ছা না যে, ও বাড়ি ছেড়ে কলকাতার বাইরে গিয়ে থাকবে। ওর ধারণা, ওইসব ছেলেরা একদিন আমাকেই পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলবে। তাই তো বিহারী!'

বিহারী বাদার্জির দিকে চেয়ে বলল, 'দাদা আর কী বলব সাহেব, বলুন। ওসব খুনী ছেলেদের ঘরে ছেলে পড়ে ফিলোই হারানো ভিটে যায়। ওখানে গিয়ে ফেকে ভাইদের সঙ্গে মিলে কী হবে, আমি বুঝি না।

বাদার্জির মুখের ভাবে বোঝা যায়, বিহারীর যুক্তি সে একেবারে নির্দয় না। কথাটা তারও ভাল লাগছে। কিন্তু সে কথা গিরিন্দ্রনাথের সামনে বলা যায় না। গিরিন্দ্রনাথ বললেন, 'বিহারী, দোকান চালিয়ে চালিয়ে তোর বুদ্ধিটা সিগনিফিসি-য়েন্ট হ্রাস হয়ে যাচ্ছে।'

বিহারী সে কথার কোন জবাব না দিয়ে, ঘরের বাইরে চলে গেল। গিরিন্দ্রনাথ বাদার্জিকে বললেন, 'এস একটু ঘুরে আসা যাক।'

কলকাতা থেকে আট মাইল দূরের একটা স্টেশনে, গিরিন্দ্রনাথ এসে ট্রেন থেকে নামলেন। সময় সকাল পৌনে দশটা। অনেকক্ষণ পরে, এমন সময়ে তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন। বহুকাল পরে, কলকাতার বাইরে, রৌদ্রালোকিত খোলা আকাশের নিচে, তাঁর চোখ দুটো যেন টনটন করছে। চোখে জল আসতে চাইছে। এত আলোয় আগে অনেক দিন আসেন নি।

স্টেশনে দাঁড়িয়ে রইলেন। ১৯৩৬, অনেক মানুষকে প্ল্যাটফর্মের শেষে, রেল-লাইন ধরে হেঁটে যেতে দেখে, সেদিকেই ওঁর চোখ গেল। রেল লাইনের ধারটাই খারাপ। কিন্তু হাঁটতে হাঁটতে অনেকে, এটা তো জানাই ছিল। বাদার্জি যারা স্টেশনের দিকে আসছে তাদের তো সিঁড়ি প্ল্যাটফর্মের শেষে পড়েছিল। লাইনের পাশ দিয়ে চলে আসছে। টিকেট কেনারও লোক নেই, কেনারও ব্যবস্থা নেই।

অনেক লোকের পরে পরে চলেছে প্ল্যাটফর্মের শেষে, গলায় ওয়াই সবজান্তা একজন লোককে বললেন, 'এখানে কেনটি টিকেট কালেক্টর নেই। যে যার ইচ্ছা মত চলে আসছে।'

লোকটি একটু সন্দিগ্ধ চোখে গিরিন্দ্রনাথের দিকে চেয়ে দেখল। লোকটির জামাকাপড় তেমন ময়লা না, তবে ধনী-মানী কারুর হবে। স্বরে কোন জবাব দিল না। মুখ ফিরিয়ে লোকটি আপন মনে চলতেই লাগল। গিরিন্দ্রনাথ আবার বললেন, 'সকলেরই বুঝি মান্থলি টিকেট আছে?'

লোকটি আবার তাকাল গিরিন্দ্রনাথের দিকে। মুখে-স্বরে বলল, 'সে খোঁজে আপনার দরকার কী মশাই? আপনার নিজের টিকেট আছে?'

গিরিন্দ্রনাথ বুঝলেন, লোকটি কোন কারণে রেগে আছে। তাই অল্পেই-তাতেই ক্ষেপে উঠছে। গিরিন্দ্রনাথ আস্তে আস্তে বললেন, 'আছে হ্যাঁ, টিকেট এ ছোট ব্যাপারে টেনে সে আবার কী কথা? এদিকে তো আসা হয় না, কিছুই জানি না। তাই জিজ্ঞেস করলাম: ভেবেছিলাম লোকজন মন্থলি-টিকিটের। তাতে এল, দাঁড়াইদের টিকেট লাগে কি না লাগে তাদের।'

লোকটি খোঁচাল গিরিন্দ্রনাথের সামনে। খিঁচিয়ে উঠল, 'সবার ওদের আছে কিনা, জানে কেউ-ই টিকেট দেখে না, কোথাও না। শুধু, শুধু, চেহারা দেখাবার দরকার, হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে থেকে কী হবে।'

গিরিন্দ্রনাথ অবাক হয়ে বললেন, 'কেউ-ই দেখবে না জেনে। তবেই টিকেট নেই বলছেন বাঁচি?'

লোকটি বলল, 'তা অনেকেরই নেই। আমার কিন্তু লোকের আছে।'

'নেই বলে বিনা টিকেটে চলাফেরা করছে?'

'এই লাইনে তো চলে।'

'সে তো মশাই, ছেলেমানুষে বা ভিখিরিরা ওরকম ফিরেই থাকে। ছেলে-মানুষরা ছেলেমানুষি করেই। তা বলে, বড়রা কি ওরকম করতে পারে?'

'কেন পারবে না। অনেকেই করে হাতে পয়সা না থাকলে কী করবে।'

'তা হলে বিনা টিকেটে?'

'দরকার পড়লে বিনা টিকেটেই যাবে। আর যদি ধরা পড়ে?'

'ধরা কি এতই সহজ। ধরবার দল তারি থাকলে, ঠিক ছেড়ে বেরিয়ে যাবে। টিকেট কালেক্টারের মাথের ভয় নেই?'

'মারছে?'

'তা মাঝে মাঝে মারধর হয় বৈ কি।'

লোকটি এমনভাবে বলছে, যেন একটা স্বাভাবিক কথাই সে বলছে। গিরিন্দ্রনাথ বললেন, 'ওসব নেহাত অল্পবয়সে ওঁচা লোকেরা করে থাকে। যা হয় ছেলে-মানুষরা।'

লোকটি গিরিন্দ্রনাথের দিকে আবার তাকাল। চাহনির ধরনটা ভাল না। বলল 'ওসব বড় বড় কথা রাখুন। অল্পবয়সে ছেলেমানুষ, সবাই ছাত্র দেখলে বিনা টিকেটে যায়। কী হবে রেল কোম্পানিকে পয়সা দিয়ে?'

গিরিন্দ্রনাথ বুঝলেন গোলমাল। বুঝলেন, তিনি একজন বিনা টিকেটের যাত্রীর সঙ্গে কথা বলছেন। রেল কোম্পানিকে পয়সা না দেওয়াটাই যখন ধর্ম, তখন কোন যুক্তিতে টিকেট কাটবেন। কিন্তু নিজের অনোভাবটা তিনি বুঝতে দিলেন না। বরং ভাল মানুষের মত মুখ করে বললেন, 'আপনি কি এটাকেই ধরেন নাকি?'

লোকটি জবাব দিল, 'প্রয়োজনে থাকি।'

গিরিন্দ্রনাথ হেসেমেনেও, বোকা-বোকা ভাবে গলাটা পরিষ্কার করলেন, 'আপনার চাকরি করেন বুঝি?'

'না, একটা কারখানায় প্রোডাকশনে কাজ করি।'

কেরানী। মনে মনে ভাবলেন গিরিন্দ্রনাথ। লোকটি এখন বাইরে কেন-কারখানা নিশ্চয়ই এখন ছুটি হয়ে যায় নি। ছুটি নিয়েছে বোধহয়। কিন্তু, ওত বড় কারখানা, চেইন স্মোকারও নাকি। এমন কি টাকা খরচ করে একটা মান্থলি কাটবে। নিশ্চয়, যা চাকরি করে, সব কিছুতে মনে একটা মান্থলি তাতা যায়।

কিন্তু আসল ব্যাপারটাই যে গোল-মাল। রেল কোম্পানিকে পয়সা দিতে হবে, এটাই তো লোকটার অভিমত: রেল কোম্পানি যে তার নিজের ছেলেরই অপদার্থ সে কথাটা না বললেও চলে। বললে, লোকটি আরো বিরক্ত হবে। কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। কিন্তু এ বয়সের একটা লোক ও এমন গুরুত্ব বিনা টিকিটে নির্বিঘ্নে যাতায়াত করতে পারে। কোথাও একটু, আটকায় না? বেশ তো স্বচ্ছন্দভাবেই বলছে। কেন কেন অপরাধবোধের বালাই নেই।

নেই বলেই অবিশ্যি পারছে, তা এ হলে টিকেট কাটত। এ লোকটার কি কোন ছেলেমেয়ে আছে। থাকলে, তারা বাপারটাকে কী চোখে দেখে। তারাও বোধহয় বাপারটাকে স্বাভাবিক ভাবেই নেবে নিয়েছে। গিরিন্দ্র নাথের একটা নিষ্পাপ পড়ল: মানুষের জীবনবোধকে তোমার টেনে নামানো হচ্ছে। এ বিষয়ে, সাধারণ মানুষের মনোভাবটা জানতে ইচ্ছা করে যা। কোন রকমে বেঁচে থাকাটাই যেখানে জীবন সংগ্রামের মূল, এরা মাঝে মধ্যে অন্যান্য খুলোবালির মত কতখানি। কিন্তু যারা এইসব সাধারণ মানুষের ঘাড়ের ওপর বসে শুধু ভাবে বেঁচে আছে, এদের জীবনবোধ নিশ্চয় আরো দুর্নীতিগ্রস্ত। বিশে-ষত: যারা দেশ শাসন করছে, দেশ চালাচ্ছে, তারাই আরো বিশেষ করে, মানুষকে ঠকিয়ে এইদিকে আরো ঠেলে দিচ্ছে। কিন্তু মুখে বলছে অন্য কথা।

গিরিন্দ্রনাথ দেখলেন, লোকটি একটা গুরুত্ব বহনের মত, পথ দিয়ে, কতগুলো ফাঁচা বাড়ির পাশ দিয়ে চলে গেল। গিরিন্দ্রনাথ একটু দাঁড়ালেন। একগুচ্ছ লোক ছিল রেল লাইনের ধারে ধারে, এখন দেখলেন পথে কেউ-ই নেই। সকলেই,

লাইনের ওপরে ওভারব্রিজ কোথাও বা কোথাও হয়ে গিয়েছে। কেবল, কয়েকজন মাত্র লোক তখনো যাত্রীদের সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে।

গিরীন্দ্রনাথ পিছন দিকে তাকালেন। স্টেশন থেকে পায়ে পথে মাইলটাক এসেছেন, এরমধ্যে চেয়ারম্যানের বাড়ির কোনো চিহ্নই দেখলেন না। দু দিকেই ধান্তক্ষেত। একটা গ্রামীণ ভাব আছে। কাছাকাছি বাড়ির সংখ্যাই বেশি। বেড়ার ওপরে, টিন বা টালির চালা। মাঝে মধ্যে, দুটার এক-আধটা দোতলা পাকা-বাড়ি। এই পরিবেশের মধ্যে হঠাৎ একটা সংস্কৃত শ্লোক মনে হয়। একটা বিষয় বেশ ভাল লাগছে। পায়ের পড়ন্তবেলা বাড়িগুলোর লাউ বা কুমড়ো বা চাল-কুমড়োর মাচা রয়েছে। নতুন নতুন সেগুলো গাছ উঠেছে কোথাও। কোথাও বাতাবেলু বা পেয়ারার লাগানো হয়েছে। নিম বেল কুল ইত্যাদি গাছ তো আছে, অন্যান্য গাছ মানুষ নিজেরাই লাগিয়েছে। বেশ দাঁড়িয়ে গড়িয়ে থাকার ইচ্ছেটাও এর মধ্যে ফুটে উঠেছে যেন।

উত্তর মুখ করলে, পশ্চিম দিকের পুকুরটা নিশ্চয় প্রয়োজনে কাটানো। দোষটা এদিকেই বেশ। পুকুরটা তেমন বড় না। তাও ঘরের ঘাটে কচুরিপানা রয়েছে ওপরের ঘাট থেকে মাঝামাঝি ঘানিকটা জায়গা পর্যন্ত কচুরিপানা তুলে দিয়েছে। একটু ঘাটের মত করে, গাছের মোটা গুঁড়ি ফেলে দিয়েছে। তাতে একজনের চলতে পারে। কিন্তু, তিন-চারটি মেয়ে বৌ, পাশাপাশি কাপড় কাচছে, বাসন মাজছে। গুঁড়ির ভাগ একজন পেয়েছে। বাকীরা, ইট পেতে, ঘর থেকে পিঁড়ি নিয়ে এসে, সাবধিক ঘাটের ভাগ চালাচ্ছে। যুবতী একটি বউকে বেশ সাবলীল মনে হল। সে হাঁটুর ওপরে কাপড় তুলে নিয়েছে। একদিকের বুকের আঁচল সরে গিয়েছে। কিন্তু তার এসবদিকে মন কথা বলতে বলতে, সে অবাধ্যভাবে কাজ করে চলেছে। পুঁটি চারেক ছোট ছোট ন্যাংটা ছেলে, জলে নেমে দাপাদাপি করছে, সাঁতার কাটছে। একে বলে বাঙলা দেশের ছেলে। ছেলেগুলোর বয়স, কারোরই সাত আটের বেশি না। অথচ কেমন সহজেই ডুব জলে সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে।

পূর্বদিকে একটা বড় লম্বা জলাশয় রয়েছে। দেখে মনে হয়, কোন কালে ধান-দুতে হয় না। কচুরিপানার বদলে, অন্য ধরনের জলজ গাছে সারা জলে ভরে রয়েছে। তার ধারে ধারে বেড়া দিয়ে তৈরী করেকটা পায়খানা। দেখে ভয় লাগে, ওর ভিতরে ঢুকলে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে জলে পড়ে যাবে। লম্বা জলাশয়টির ওপর পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীদের রেল লাইনের ধারে আসার জন্য বিধা আছে। তাছাড়া, পূর্বাঞ্চলের চেয়ারম্যান একটু ভিন্ন। পাকা বাড়ির সংখ্যাই যেন বেশি। আধুনিক বাড়ি তৈরীর ঝোঁক দেখা যায়। পূর্বদিকে, ঘানিকটা উত্তরে একটা কারখানা। কারখানার জন্য জমির ছেলের একটা ঘেরা রয়েছে। দেয়ের কয়েকটার, বাড়ি-ঘরদোরের বেশি। গিরীন্দ্রনাথ সেদিকেই এগিয়ে গেলেন।

ছেলে ঘেরা দু পরদুই লক্ষ্য করতে পারলেন। বাঁদিকে, প্রথম পশ্চিম দিকে, মস্ত দালান বাড়ী। তাঁর মা সামান্য প্রথম থাকলেও পরে নিশ্চয় বসতিই বলতে হবে। ছোটখাটো বাড়ি, বেড়া টিন টালিই বেশি। পাকাও আছে মাঝে মধ্যে, দোতলা পর্যন্ত নজরে পড়ে, ছোট ছোট চালাঘর, কাপড় কাচা, চান করা, দু-এক জায়গায় দোকান বা কিসের বেকারের মাঝারি, কোন কোন বাড়ির খোলা উঠোনে মেয়েদের জটলা, সব মিলিয়ে মাঝারী এই ধরন। বয়স বারো বছরের ছেলেও কিছু কিছু চোখে পড়ছে। কেউ কেউ গুলি খেলছে, কিংবা কোন কারণে নিজেদের মধ্যে মারপিট করছে। একটা বাড়ির উঠোনে চোখে পড়ল, দোড়ে বা পাখার বাটে দুটো একটি বছর দশেকের ছেলেকে মারবার চেষ্টা তারা করছে, পুর্ববঙ্গীয় ভাষায় বলছে, 'তরে তাকরা, খাওসাইয়া, তরে আজ মাইরা পাট পাট করুম, তবে ছাল গায়হন। তবে বড়রে, তরে ক্যান জন্ম দাছে নরে।'

তাড়া খাওয়া ছেলেটির মুখে হাসি, দুপাটি দাঁত বেরিয়ে মোড় নিচ্ছে। ছেলেটির মুখে চোখে হাসি হল, বুদ্ধিমান আর চতুর। গিরীন্দ্রনাথের কেন যেন ছেলেটিকে ভালই লাগল। ফরসা রঙ, কপালের ওপরে চুল। মাথার কোথে একটা মাঝারিকে গোলা-গাল এবং শরীরে একটুও চোয়াড়ে ভাব নেই। সম্ভবতঃ ও বয়স গাঁয়ের সে একটু, এবং মাকে ভালই চেনে। মায়ের মাথায় ঘোমটা ছিল না, গায়েও সে রকম ভাল করে কাপড় ছিল না। রেল লাইনের ধারে, চলচলে প্যান্ট সার্ট-পরা, চলমা চোখে ভাঙা ভদ্রলোকটিকে দেখে, তাড়া করা অবস্থাতেই ঘোমটা টেনে দিয়েছিল, গায়ের কাপড় সামলেছিল। তার ভালমানুষীই গিরীন্দ্রনাথের হাসির উদ্রেক করেছিল। ভাবছিলেন, এও বাঙালী মা বা মহিলার পক্ষেই সম্ভব।

যতই রেল গেটটা সামনে আসছিল, ততই পাকা এবং বড় বাড়ির সংখ্যা বাড়ছিল। রেল গেটের সামনে এসে দেখলেন, পাকা পিচের রাস্তা, গেট ক্রস করে পশ্চিমে চলে গিয়েছে। গেটের সামনেই, একটা অবাঙালী বস্তি। চায়ের স্টল ছেলেভাজার দোকান, এরমধ্যে রয়েছে, পশ্চিম দিকে রাস্তার একটা লম্বা বাঁকিয়ে অনেক। দোকান এখন বন্ধ। খোলা দোলে পুরো ঘরে জল ছড়ছে। পূর্বদিকের রাস্তাটা সোজাই চলে গিয়েছে। মনে হয়, কিছুটা গিয়ে জলাশয়ের দিকে মোড় নিয়েছে। এপারে ওপারে, দু পাশেই কয়েকটা সাইকেল রিক্সা দাঁড়িয়ে আছে। সম্ভবতঃ পূর্বপারের কারখানার শ্রমিক, রেলের কলোনী-এর সামনে কিছুটা ফাঁকা-ফাঁকা। এদিকটায় এসে পূর্বপারে বাড়ি কম, পশ্চিম পারটাই একটু ঘিঞ্জি।

কিন্তু এসব দেখা এবং গিন্নি বাড়ি-ঘর, গিরীন্দ্রনাথকে খুব উৎসাহিত করল না। মনে মনে বললেন, আমার কিসের সাংবেতা এসব জায়গায় থাকতে পারে, তাদের খেলার জায়গা একটা হতে পারে না। আর একটা খোলামেলা, একটু নিরিবিলি না হলে, তাদের খেলা জমে না।

ওভারসিয়ার তাঁর একথাও মনে হল, আবার সেই আসা যাওয়ার জন্য এ অঞ্চলেই খুঁজে নিতে হবে। তিনি পিছন দিকে তাকালেন। স্টেশনের দিকে তাকিয়ে মনে হল, পূর্বের যাত্রীরাই বেশি এসেছেন। অবাঙালী বস্তিটা রেল লাইনের ওপারেই এসে গিয়েছে। গিরীন্দ্রনাথ অন্যমনস্ক উত্তরে এগিয়ে চললেন। ঘানিকটা গিয়েই আর একটা কলোনির মত জায়গা চোখে পড়ল, পশ্চিম দিকে।

একটা কলোনি কী না, সঠিক বোঝা যাচ্ছে না। এর আগে, পশ্চিম দিকে যে কয়েকঘর দেখে এসেছেন, তার তুলনায়, এ জায়গা একটু আলাদা। এখানে রেল লাইনের ধারে ধারে, ফাঁকা মত কিছু, খালি জায়গা। তার পাশ ঘেঁষে ইঁট বাঁধানো রাস্তা। ইঁট বাঁধানো ছোট ছোট গলি ভিতর দিকে ঢুকে গিয়েছে। গলিগুলোর মোড় ঘোড়, লাইটপোস্ট দেখা যাচ্ছে। বাড়ি ঘরের চেহারা পূর্বের এক রকমই। কাঁচা আর পাকা বাড়ি, খাপরাপাতা, রাংচিতে বা তালিবনসার বেড়া, ইঁটের পাঁচিলও কোথাও কোথাও আছে, যে পাঁচিলের একটাও ছোটখুচরোর পরিবারের হাত থেকে বেহাই পায় নি। দু-চারটি পুরনো বাড়িও চোখে পড়ে। পাঁচিল দিয়েরা বড় আগের বা তারো আগের বাড়ি হতে পারে। পুরনো ফলের বাড়ি। দেখে কেমন একটা মিলিতে অধিবাসীদের কথা মনে হয়। পূর্ব-পশ্চিম মিলিয়ে আছে, একেবারে নিজস্ব বাস্তুহারা কলোনি না।

রাস্তাটা দেখে, কেমন একটা সন্দেহ লাগে। লোকালয়ের ভাবটাই দেখে মনে হচ্ছে, পূর্বদিকের মত বিশেষ বেলাবেলা নেই। পূর্ব দিকটা পিছন, পশ্চিম দিকের সঙ্গেই যোগাযোগটা বেশি। অর্থাৎ যি, ঠি যোগের সঙ্গে। অতএব, এদিকটা ছোটখাটো কাজকাই থাকে বোধহয়। রেল লাইনের ধারে ধারে ঘানিকটা ফাঁকা জায়গা। অনেকখানি পর্যন্ত গিয়েছে। তার পাশে-পাশে ইঁট বাঁধানো সরু রাস্তা। রাস্তাটা ঘানিকটা গিয়ে আবার পশ্চিমেই বাঁক নিয়েছে। ঘুরেই গলিও পশ্চিমেই ঢুকে গিয়েছে। গাড়ি ঘোড়া চলার রাস্তা না। অথচ বাঁধানো। ছোটদের জন্যে ছেলেদের পক্ষে বেশ ভাল জায়গা।

পূর্বদিকে ঘানিকটা ফাঁকা জায়গা। বোধহয় আগে জলাশয় ছিল, এখন ফেলে আর সেখানে গর্ত ফেলে ফেলে পোড়ো জমির রূপ নিয়েছে। কোন বাড়ি-ঘর ওঠে নি। তারপরেও উঁচু, নিচু, কিন্তু

চওড়া রাস্তা, দোষ ছোট ছোট চলাচল, কাল-কাসুন্দা বা বিকেকীদের চলন। তারপরে কারখানা। রাতদাতা কেমন সন্দেহজনক। পাথর ছোড়ার ঘটনা এখানেই কোথাও ঘাপটি মেরে আছে যেন। এখান থেকেই হয়তো হয় তো সে ঘাড়ে চাপে।

বিপিনবাবু রেল লাইনের দিকে তাকালেন। ঘরের পেছনে ঢালু রাস্তার ওপরে, রেল লাইনের পাথর ছড়িয়ে আছে ইতস্তত:। পাথর বিকেলের পাথর ছোঁড়ার খেলাটা কি এখানেই হয়েছিল? কাগজে উল্লেখ আছে, শিয়ালদহ আর সাদার্ন স্টেশনের, এই দুটো স্টেশনের প্রথমটা একটা মারমারেই, দুর্ঘটনাটা ঘটেছিল। সেটা কি এ রাস্তাটাই? তিনি দক্ষিণ দিকে, সাদার্ন স্টেশনের দিকে তাকালেন। স্টেশনটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সাদার্ন পিয়ারে, দুটো স্টেশনের দূরত্ব পনের মিনিট বলে মনে হচ্ছে।

বিপিনবাবুর মনে সন্দেহটা দৃঢ় হতে লাগল। পাথর ছোঁড়ার ঘটনার পটভূমিতে যোগ হয় এ রাস্তাটাই। যা এ রাস্তাটারই আশেপাশে। বিপিনবাবু এমনভাবে মাথার পাগড়ি ফেললেন, যেন পাথরছোঁড়া খেলার গন্ধ পাবেন। এই সময়ে ওঁর কানে, কয়েকটা গলার স্বর এসে ঠেকল। তিনি ইট বাঁধানো রাস্তার দিকে তাকালেন। রাস্তার ধারে, বাটিচতের বেড়া ঘেঁষে, তিনটি ছেলে কিন্তু একটা কথা বলছে। একজন মাঝবয়সী লোক সাইকেল চালিয়ে চলে যাচ্ছে।

বিপিনবাবু লাইন থেকে ফাঁকা জমি পেরিয়ে ইট বাঁধানো রাস্তায় এলেন। দেখলেন, একটু দক্ষিণে বাটিচতের বেড়া ঘেঁষে তিনটি ছেলে গুলি খেলছে। তিনি ওদের প্রতি অমনযোগী হবার ভান করলেন। ছুতোর জন্য যা দরকার, কোন কিছুতেই ছুতোর দোকান হওয়া উচিত নয়, ওদের প্রতি ওঁর যেন কোন রকম কৌতূহল বা দৃষ্টি আছে বা ওদের কথায় কোন রকম কান দিচ্ছেন। লক্ষ করে দেখলেন, ইট বাঁধানো রাস্তায়, যেন সুন্দর করে গুলি খেলার জন্য গিচ্ছু তৈরী করেছে। ছোট ছোট গর্ত মাঝে মধ্যে। যার মানে, এ রাস্তাটা গুলি খেলার জন্য নিয়মিত ব্যবহার হয়। আরো অনেক কিছু থেকেই এ রাস্তাটা ছোটদের ঘটনা বা ছোট-খাটো খেলার পক্ষে সুবিধাজনক, কারণ বিকালে এদিকটায় কিন্তুই নিবিড় ছায়া পড়ে!

দুজনে পাঁচজনকে, ওদের মধ্যে একটা সাধারণবোধ চলছে। একজন গুলি পকেটে ঢুকিয়ে নিয়ে, চলে যেতে চাইছে। তার বক্তব্য, আর দেরি করা যাবে না, এখুনি ইস্কুলে যেতে হবে, সময় নেই। বাকী দু-জনের বক্তব্য, ওকে আরো কিছু দিয়ে যেতে হবে। তাতে বেশি সময় লাগবে না। তারপর ইস্কুলে যাবে।

বিপিনবাবু দেখলেন, তিনজনেরই বয়স, বারো তেরোর মধ্যে। একজন একটু মোটা, বাকী দুজন রোগাটে। একজনের সর্দি, পাশ্চ, বাকী দুজনের দাঁত পাশ্চ। তিন-জনকেই বেশ চালাক চতুর মনে হচ্ছে। তিন জনের মধ্যে, একজন মাত্র বিপিনবাবুকে তাকিয়ে দেখল। সে যেন্টো ইস্কুলে যাবার জন্য, খেলার ইস্তফা দিতে চাইছে। বাকী দুজন দেখল না।

এদের কি জিজ্ঞেস করবেন, পরশু, বিকালের ঘটনাটা কোথায় ঘটেছিল। এই তিনজনের মধ্যে, কেউ কি তখন ছিল। কিন্তু জিজ্ঞেস করতে ভরসা পেলেন না। হঠাৎ কী ভাবে জিজ্ঞেস করবেন, ঠিক ঠিক ভরসা পাবেন, সেটা ভেবে উঠতে পারলেন না। তিনি ওদের পাশ দিয়ে চলে গেলেন।

কিছুটা দূরে, লোকালয়ের শেষ হয়ে গেল, পশ্চিম দিকে একটা ছোটখাটো মাঠ। মাঠটা খেলবার উপযুক্ত না, কারণ সমতল না, এবং উঁচু নিচু আছে। তবুও, এই মাঠেই দেখা গেল, দুজনে শার্টের গোল পেন্টের চিহ্ন হিসাবে এঁকেছে। দাঁড়িয়ে রয়েছে। মাঠের তিন দিকেই বাড়ি ঘর রয়েছে। মাঠের ওপর দিয়ে, একজন-এর মত পায়ে হাঁটা রাস্তার মত চলে গিয়েছে লোকালয়ের মধ্যে, আর কোথায় এসেছে বেল লাইনের দিকে।

বিপিনবাবু মনে মনে স্থির করলেন, আর অনুসরণ করে লাভ নেই। এখান লোকালয়ের মধ্যে ঢুকে, একটা খাবারের রাস্তানো দোকান করা দরকার। মনে হয়, ঠিক রাস্তাতেই তিনি এসেছেন। মাঠের ওপর দিয়ে হেঁটে, পশ্চিম দক্ষিণ কোন বরাবর হেঁটে গেলেন। ছোটখাটো বেড়া বা মাটির ঘর পেরিয়ে, কিন্তু পাতাবাড়ি চোখে পড়ল। রাই ক্ষেত বেশ ফেলে, রাস্তা তৈরী হয়েছে। এলোমেলো ভাবে হলেও, মোটামুটি বাড়ি ঘরের আশপাশ দিয়ে, রাস্তা ঠিক মতই তৈরী হয়েছে। নিবিড় বসতি এবং পাড়া। লোকজনের সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। লাল পাড় শাড়ি পরা একজন বেরোয়া চলেছে ইস্কুলে, মুখে তাদের অনেক হাসি কথা। এর মধ্যেই, দু একটা মুদির দোকান বা চায়ের দোকানও চোখে পড়ছে। সেখানে পাড়ার বড় লোকেরা আড্ডা বসিয়েছে। ছোট বড় সবই, ছেলেদেরও, অনেকে পথে ইস্কুলে যেতে দেখা যাচ্ছে। সকলের বাড়িই পশ্চিম দিকে।

বিপিনবাবু দক্ষিণে এগিয়ে, শিগের রাস্তা পেলেন, সে-রাস্তাটা রেলের কর্মীদের পাড়া হয়ে গিয়েছে। পূবে দিকে ফিরে, গোটটা দেখতে পেলেন। রাস্তায় লোক চলাচল কম না। পরে হেঁটে এবং রিকশায় চলেছে অনেকে। একটা ঝরঝরে মোটর বাসও দেখতে পেলেন, দক্ষিণ থেকে এসে, পশ্চিমে, বি, টি, রোডের দিকে চলছে। রাস্তার দু পাশেই বাড়ি। চোখ তুলে, কোথাও দেখতে পাচ্ছেন না, 'বাড়ি ভাড়া দেওয়া হইবে' লেখা আছে। তিনি শিগের রাস্তার ওপর দিয়ে খানিকটা পশ্চিমে এসে পা ছেড়ে দেলেন। যে কোন ছোটখাটো দোকানের মালিকই, কিন্তু, বুদ্ধের ধন আছেই। এরা বোধহয় বেকার। রাস্তার ধারে একটা একতলা মত পুরনো ঘরে, মাদুর, বিছিয়ে একজন বেশ চড়া গলায় কথাবার্তা বলছে। গলা ছাইয়ে বাস্তবের ইঙ্গিতটি বাদ দিলে, যা বলছে, তা হল, বলাই বাহুল্য রাজনৈতিক বিষয়। উৎপলবাবু কোন ঘটনা বোধহয় ঘটেছে।

কিন্তু, বিপিনবাবুর এদিকটা ঠিক পছন্দ হচ্ছে না। তিনি বি, টি, রোডের দিকে যেতে চান না। রেল লাইনের কাছা-কাছি, একটা আস্তানা হলেই ভাল হয়। তিনি আবার পূর্বদিকে ফিরলেন। খানিকটা এসে, যে রাস্তা দিয়ে পশ্চিমের রাস্তায় পড়েছিলেন, তার মোড়ে কারাকাছি, মুদির দোকানের কাছে গেলেন। দোকানে কিছু না কাস্তভা কিছুই নেই। ঘরের একটা কোণ ফাঁকা। তার এক কোণে, তিনটি ছেলে উবু হয়ে বসে সিগারেট টানছে। বোল সতর বছরের ছেলে হবে। দোকানের ধরদার বাইরে, অপরিচিত বিপিনবাবুকে দেখে, তিনজনেই একটু কৌতূহলিত হল, আর সিগারেট হাতের তালুতে ঢাকা দিল। হাতের তালুতে ধোঁয়া উঠিয়ে দিল।

বিপিনবাবু তাড়াতাড়ি দোকানীর দিকে তাকালেন। দোকানী খালি গা চুলকেতে চুলকেতে জিজ্ঞেস করল, 'কী চাইছেন সার?'

সার? মনে মনে ভাবই, অবাক হলেন বিপিনবাবু। শহরের উপকণ্ঠে, একজন মুদির কাছে 'সার' শুনবেন, তা যেন ঠিক আশা করেন নি। অথচ একটা অনায়াস আর নিখাঁদ বিনীত ভদ্রলোকের মত তিনি বললেন, 'কিছু চাইছি না। একটা কথা জিজ্ঞেস করব ভাবছিলাম।'

'বলুন।'

মুদি দোকানির খোলগাল খালি গা হলেও, কথাবার্তায় বেশ চালাকে মনে হচ্ছে। বিপিনবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'কাছে পিঠে বাসা ভাড়া আছে, বলতে পারেন?'

'বাড়ি ভাড়ার কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ।'

মুদি একবার ঘরের মধ্যে ছেলে গুলোর দিকে তাকালেন। তারপরে আবার জিজ্ঞেস করল, 'কাছের বড় বলুন তো। বড় আপিস, না ছোট আপিস?'

বিপিনবাবু বললেন, 'আপিস আর কী করে বলব বলুন। দুজন মানুষ, আমি আর আমার চাকর। স্ত্রী পুত্র অনেক আগেই দেশে রেখে এসে আছি।'

মুদি লোকটির মুখে যাদুর ছোঁয়া। সে করুণ চোখে বিপিনবাবুর দিকে তাকাল। তারপরে বলল, 'রেল লাইনের কাছাকাছি হলে আপনার অসুবিধে হবে!'

বিপিনবাবু সেটাই চান। বললেন, 'না, অসুবিধে আর কী। একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, তবু পরিবেশ হলেই হয়।'

মুদি একটু ভাবিত হল। তারপরে ঘরের কোথে তাকিয়ে, তাকে যেন জিজ্ঞেস করল,

ভাড়া, হরেকৃষ্ণ সাহার বাড়িটা খালি আছে কী না জান? বউটার তলার ভাড়াটেরা তো চলে গেছে।'

কোথায় কাপসা থেকে প্রবাব
এখনো খালি আছে দেখেছি।'

মুদি বলল, 'আপনি একটা বাড়ি পেতে পারেন। বাড়িটা ভাল, নতুন বাড়ি। নির্বি-বিলিও আছে। বাড়িওয়ালা লোকটা অবিবাহিত বলেই শুনেছি, তা তাতে আর আপনার কী করছে। ঠিক মত ভাড়া পেলেই সে রাজা। তবে ভাড়াটা বোধহয় একটু বেশি।'

হিমাংশুবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'কত চাইতে পারে?'

তা ধরুন মানুষের গলা একটু বেশিই। ঘর অবিশ্যি তিন খানা। বাথরুম ঘর আছে, স্যানিটারি পায়খানা আছে। এতগুলো একসঙ্গে এত কমে পাবেন না।'

হিমাংশুবাবু বললেন, 'আমিও সেই রকমই চাইছি। তার বেশি হলে মুশকিল হত।'

লোকানি আবার এধার ওধার থেকে ভাকাল। একজনকে ডেকে বলল, 'বলাই, হরেকেষ্ট সা'র বাড়িটা একটু দেখাবে তোমাদের বাড়ির কাছেই তো।'

'যেতে হবে।'

ঘোমটা কোথ থেকে প্রবাব এল। স্বাভাবিক, মোটাতাজা সমর্থ, এ সব জায়গা নয়। দোকানির মুখটা একটু বিকৃত দেখাল, বিরক্তি প্রকাশ করল নিম্নস্বরে। তারপরে হিমাংশুবাবুকে বলল, 'বেশি দূরের ঘোর পাবেন পথ না, আপনি এক কাজ করুন আগে। এই যে আমাদের সেজমে একটা রোড় দেখতে পাচ্ছেন, একটা রাস্তা উত্তর দিকে গেছে, সেদিকে তাকিয়ে, দেখতে পাচ্ছেন?'

হিমাংশুবাবু দেখতে পারছেন, দেখতেও পাচ্ছেন। মাঠের ওপর দিয়ে, যে পাড়াটায় হেতের দিয়ে উঁচি দিচ্ছে দাস্তার এসে শুরু-হিসেবে, দোকানি সেই রাস্তার কথা বলছে। বললেন, 'দেখেছি।'

দোকানি বলল, ওই পথে একটু গেলেই, দেখবেন ডান দিকে একটা বাধানো রাস্তা গেছে, সোজা দক্ষিণের দিকে। সেই দিকে একটু গেলেই দেখতে পাবেন, বাঁ দিকে একটা ঝোপঝাড় বাঁড়ির কম্পাউন্ড। মাথার পাথরের ওপর লেখা আছে, শ্রীহরিকৃষ্ণ কুটির। ওখানে গিয়ে কড়া নাড়ুন, বাড়িওয়ালার দেখা পেতে যাবেন।'

হিমাংশুবাবু হাত জোড় করে বললেন, 'অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে।'

মুদি লোকটিও তেমনিই বিনীত। তাড়াতাড়ি হাত জোড় করে বলল, 'না না সাহা, এতে আবার ধন্যবাদের কী আছে। এখানে থাকবেন, আপনাকে মালপত্র বেচব, হে' হে'. একটা বাড়ির খোঁজ দিতে পারব না।'

হিমাংশুবাবু হেসে ফেলে লোকটার আরিক না করে পারলেন না। বললেন, 'নিশ্চয়ই নিশ্চয়।'

হিমাংশুবাবু আবার রাস্তার পথেই, ওরা দিকে ফিরলেন। ভাবাকিতের ভাড়াটা বেশি হবে না। সেখান থেকে বেল লাইনও দেখতে পাচ্ছেন। মনে হচ্ছে, দোকান কুলিদের পরে, জবাড়ানো বস্তিটা পৌঁছে, পঞ্চম যে ইঁট বাঁধানো পথিটা দেখতে পেয়েছিলেন, ওটা সেটাই। যু, পাশে, ছোট বড় নানা রকমের বাড়ি। যু একটা কাঁচা বাড়িও চোখে পড়ছে। নানা রঙমের কপটসর, অধিকাংশই ছেলেদের আর শিশুদের গলা শোনা যাচ্ছে। পুরুষেরা এ সময়ে কমে একেবারে থাকে। ছোটরা ইস্কুলে যায়। মেয়ের বৃদ্ধেরা দাওয়ায় বসে গোঁজমে আছে। হাসি কথা ঝগড়ের কথা, সব রকমই শোনা যাচ্ছে।

হিমাংশুবাবু যু পাশে তাকাতে তাকাতে, খালি পঞ্চাশ পঞ্চের মাঝামাঝি দিয়ে, বাঁ দিকে শ্রীহরিকৃষ্ণ কুটিরের সামনে গেলেন। ফটকটা ভিতর থেকে বন্ধ। তিনি একটু থমে দাড়ালেন। বাড়িওয়ালা কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। আবার একটু জোরে কড়া নাড়লেন। এবার ভিতর থেকে খালার শব্দ শোনা গেল, 'কে?'

এতদূর থেকে মিশ্চয়ই প্রবাব দেওয়া যায় না। এবার ওপর থেকে জিজ্ঞাসা এল, 'কে?'

হিমাংশুবাবু ওপর দিকে তাকালেন। কৃষ্ণ কুটিরে গোত্রাম মুখ দেখলেন। কম বয়সের নতুন একটি লোককে, জোড়লার রেলিং-এর কাছে দেখা গেল। মাথায় শ্রীহরিকৃষ্ণ টাক। কপালে পাশে, আর মাথের কাছে লম্বা লম্বা কাঁচা পাকা চুল। খালি গা। লোকটির চোখে কী রকম একটা সন্দেহের দৃষ্টি।

হিমাংশুবাবু বললেন, 'আপনার নাম হরেকৃষ্ণ সাহা?'

'হ্যাঁ, কেন?'

পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণে পালটা পশ্নের এল। হিমাংশুবাবু বললেন, 'শুনলাম আপনার ভাড়া দেবার জন্য ঘর খালি আছে। তাই একটু দেখতে চাইছিলাম।'

লোকটি তবু, কয়েক মুহূর্ত হিমাংশু-বাবুকে দেখল। বলল, 'দাড়ান, আসতেছি।'

চন্দ্র বিশ্বের ব্যস্ততাটা নেই, সেটা স্বাভাবিক। অনেকেরই থাকে না। কিছুক্ষণ পরে, তাও বেশ একটু সময় নিয়ে। হরেকৃষ্ণ সাহা দরজা খুলে দাড়াল। অধিকন্তু তেমনি, খালি গা, ভুঁড়ির নিচে ধুতি পরা। বেটে আকার চোখে পড়ে নি, এখন সেটি দেখা গেল, গলায় তুলসী কাঠের মালা। ডান হাতে একটি মোটা লাঠি। গোল মুখে কালচে ঘুম। চোখে মনে হয়, ছানি তিনির পরীর। চওটি মতন্যান কলার মত ঝুলে চোখ দুটি হরেকৃষ্ণ সাহার আরেই। কিন্তু চাঁদোয়াগলের ব্যাপারটা কী রকম কে জানে, ছোলা ছোলা চোখের ছেলের ছবো, তার দৃষ্টিতে কেমন একটা কঠিনতা সন্দেহ, একটা ক্রুদ্ধিলতার ছায়া। সম্ভবতঃ লোকটার ঘরো ঠিক, নিষ্ঠুরতাও আছে।

হরেকৃষ্ণ সাহা। হিমাংশুবাবুর আপাদ-মস্তক দেখে, জিজ্ঞেস করল, 'ভাড়া কিন্তু অনেক বেশি লাগবে। আপনার লোক কয়জন লাগবে? ছেলেমেয়ে আছে? যত বড় ছেলে আছে নাকি?'

বাড়িওয়ালার হিসাবে দেখা যাচ্ছে, লোকটার ভেমন ভাড়া দেবার উপায় নেই, নিজের বাচ্চাকাচ্চাই আগে ভোগবে করছে। হিমাংশুবাবু বললেন, 'আমাকে নিয়ে দু-জন। আর আর আমার চাকর।'

হরেকৃষ্ণ ঠিক এ রকম একটা জবাব আশা করতে পারে নি, 'ও, তাই নাকি? আপনার ইস্তিরি পরিবার কেউ নাই?'

'না। তারা সকলেই দারা গেছে। আপনার অসুবিধা আছে?'

হিমাংশুবাবুর মুখ একটু শক্ত হল। হরেকৃষ্ণ তোমাদিনই ভাবতে পারবে না, সে এরই কত বড় পরিবর্তন আনছে, আমলার সঙ্গে কথা বলছে। সে বলল, 'না, হ মানে অসুবিধা হইল কি, মেয়েছেলে নিয়ে সংসার হইলে ভাল হয়, আমরা গৃহস্থ মানুষ তো।'

'গৃহস্থ মানুষ বলেই আমিও। তা আপনার যদি অসুবিধা থাকে, তাহলে থাক।'

হিমাংশুবাবু ফিরতে গেলেন। হরেকৃষ্ণ সাহার হঠাৎ কী মনে হল, ডেকে বলল, 'না, সেই কথা বলি না। আপনে একলা মানুষ লইয়া থাকবেন, আপনার তো একখান ভাল ঘর হইলেই হইয়া যায়।'

হিমাংশুবাবু বললেন, 'না, আমার আরো বেশি ঘরের দরকার। খান তিনেক হলেই ভাল হয়।'

হরেকৃষ্ণ বলল, 'বেশ, তবে দাহেন, আসেন, ভিতরে আসেন।'

লোকটার গলায় স্বরও একটু বদলেছে মনে হল। বোধহয়, হিমাংশুবাবুর ব্যক্তিত্বও একটু কাজ করেছে। তিনি ভিতরে ঢুকলেন। ছোট একটু উঠোন। দক্ষিণ মুখে, সারি সারি তিনখানি ঘর, সামনে একটু বারান্দা আছে। ইংরেজী এল্ অক্ষরের মত টান দিয়ে বাঁক নিয়েছে। সেখানে রান্নাঘর। বাথরুম তার পাশে আলাদা। চল কল আছে। ইলেকট্রিক আছে। হরেকৃষ্ণর সঙ্গে ঘর তিনটি ঘুরে ঘুরে দেখলেন। উত্তর দিকের খোলা চালাটা ছিরে, ছোট পাচিলের পাশ ঘেঁষেই. পর পর কয়েকটা বাড়ি। অধিকাংশই কাঁচাটে বাড়ি ভলে মনে হয়। অনেক লোকজন আছে। ছোট ছোট খুপরিতে জনাজাগি।

হিমাংশুবাবু দেখলেন, আলাদা কিচার আছে। জিজ্ঞেস করলেন, 'ভাড়া কত?'

হরেকৃষ্ণ বলল, একশো তিরিশ।'

'একটু বেশি মনে হচ্ছে যেন?'

'বাহেন, বেশি কই নাই। নতুন বাড়ি, কোন ঝামেলা নাই। এই রকম বাড়ি এই তল্লাটে, একশো তিরিশের কমে পাবেন না।'

হিমাংশুবাবু লোকটার সঙ্গে তথা বাড়াতে

চাইলেন না। মনে মনে ভাবলেন, কতটাকাই বা থাকবে।

বেশি কথা বলে কী হবে। জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার টাকা কত?'

হরেকৃষ্ণ কথাটা বুঝতে না পেরে বলল, 'কী বললেন?'

'ভাড়াটা আপনাকে কী ভাবে দিতে হবে?'

হরেকৃষ্ণ বলল, এ, হ, এক মাসের ভাড়া আগামে দিবেন, মাসে মাসে ভাড়া দিবেন। তখন জানিয়া যাইবেন, আপনের টাকাটা সেই মাসের ভাড়া বাবদ কতটা যাইব।'

'আপনের ছেলে আপনার কারবার চলে, বাকি ক্লাস দিতে হবে।'

'ক্লাসই ভাল। দোকানপাটের ব্যাপার আমাদের, অফিসি কারবার না। অমন টাকাই ভাল বুঝি।'

'বেশ, তাহলে পরশু এসে উঠব। একে-বারে সেইদিনই আপনার আগামে টাকাটা নগদ দিয়ে দেব।'

হঠাৎ হরেকৃষ্ণ হাত তুলে বলল, 'দাড়ান মাস্টার, একটা ভুল হইয়াছে। আগামে ভাড়া, যে মাসে ভাড়া আসবেন, সে মাসের ভাড়াটা দিয়া যাইতে হইবে।'

বিপিনবাবুও সেই কথা ভাবছিলেন, এমন সময় টাকার-এ হরেকৃষ্ণ রাজী হল কী করে। তিনি বললেন, 'তার মানে, ঢোকবার সময়ে আপনাকে দুশো বাই টাকা দিতে হবে, এই তো?'

হরেকৃষ্ণ ওই পঙ্কজ হাসল, বলল, 'হ, তাই কই।'

'তাই হবে। পরশু পরশু, পরশু দিনই আমরা একেবারে মালপত্র নিয়ে।'

হরেকৃষ্ণ বলল, 'এখন কিছু দিয়ে যাবেন নাকি?'

'দিতে পারতাম, কিন্তু ভেবে তো আপনার কাজ হলে না। নগদ টাকা বেশি নিয়ে বেরোই নি, কিম পঞ্চাশ হতে পারে। তাতে কি আপনার চলবে?'

হরেকৃষ্ণ তাড়াহুড়ো লোক। বলল, 'মনে বলতেছি কি, ধরেন যদি আপনে পরশু দিন না আসেন, তা হইলে, নতুন মাসে আমি কারোরে ভাড়া দিতে পারব না।'

বিপিনবাবু ভদ্রতাবশে পকেট থেকে পার্স বের করেছিলেন। গুনে পঞ্চাশটি টাকা তুলে দিয়ে বললেন, 'নিন। আপনার বাড়িটা যেন নিরিবিলি মনে হচ্ছে, সেটাই আমার আনন্দ। পুরো টাকাটা কখন পাবেন, তখন রিসিট দেবেন তো?'

হরেকৃষ্ণ যেন লজ্জা পেল। বলল, 'নিশ্চয়ই, কী যে কন। তা হইলে, পরশুই আপনে আইসা পড়েন। আমার বাড়িতে বেশি লোকজন নাই। আমার ইস্ত্রিটির আর বুড়ি মা। একটা আধ বইসি মাইয়া লোক কি আছে, সে-ই সব কামকাজ করে। আপনার নামটা কী কইলেন?'

বিপিনবাবু বললেন, 'আজ্ঞে বিপিন সাহা।'

ঘুনে আসলার খুশী এবারে কাকে পাঁচকার ভিন্না কথা বলতে পারেন, সে-আনন্দ অনুভবই। হরেকৃষ্ণ আর একটু ঘুনি হল। বলল, 'ও আপনেও সাহা। আপনার বাড়ি কোথায় আছিল?'

বিপিনবাবু বললেন, 'ঢাকা, পুরনো কলকাতায় আছি।'

হরেকৃষ্ণ আরো খুশি, 'তাই কন। আমাদের বাড়িও ঢাকা, লেছিরহাট.....।'

বিপিনবাবু তখন উঠোনের দিকে পা বাড়িয়েছেন। হরেকৃষ্ণ আবার জিজ্ঞেস করল, 'এখন নিবাস তা হইলে কলকাতা?'

বিপিনবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, সেতুকে বাড়ি নিয়ে, তাদেরই সঙ্গে মামলা মোকদ্দমা চলছে তা না, তাই আর থাকতে পারছি না। কলকাতার বাইরে থাকবার ইচ্ছেও।'

এমন সময় ওদের দুজনের কথা শুনে, বিপিনবাবুর ওপরের দিকে তাকালেন। একটি কন্যা মেয়ে না বউ। বয়স উনিশ কুড়ি হবে। চেহারাটি সুন্দর, খোমটা খোলা। সিঁথের সিঁদুর, চোখ দুটি ওদের। বারান্দা দিয়ে হেঁটে চলে যাচ্ছে। চলার ভঙ্গী, একটু দৃপ্ত ভঙ্গি আছে। দৃষ্টিতে একটু যেন ঘর অটাক বা অবহেলার ভাব। কে হতে পারে, কে জানে। বিপিনবাবুর চোখ নামিয়ে নজরটা নিচে এনেছিলেন। বুড়ো হরেকৃষ্ণর 'ইস্ত্রিটি' নাকি? সর্বনাশ। এই লেছিরহাটের ওই তরুণী স্ত্রী? হরেকৃষ্ণ তো তাই বলল, স্ত্রী বা আর কি ছাড়া তার বাড়িতে আর কেউ নেই। হরেকৃষ্ণ নিশ্চয়ই সন্ধান পেয়েছে।

কিন্তু সে ভাবনা ভেবে, তাঁর কোন লাভ নেই। যদিও, এমন বাড়িওয়ালার বাড়িতে থাকতে, মনে মনে একটু অস্বস্তি লাগে। বিপিনবাবু যেন, একটা কথা মনে এল, তাই বললেন, 'পরশুকাল তাহলে সন্ধ্যে-বিলায়, আপনাদের বুঝি স্টেশনের কাছখানে, লোক্ত গাড়িতে পাথরের ঘরে কে একজন মারা গেছে।'

ওপরের দিকে তাকিয়ে, হরেকৃষ্ণর মুখ চোখ একটু বদলে গিয়েছিল। গলার স্বরে লক্ষণ দেখা গিয়েছিল তার মুখে। বিপিনবাবুর কথা শুনে জ্বলে উঠল, 'হ হ, আরে মনুর, এই আমার বাড়ির কাছেই তো। এই সাজনেই, রেল লাইনের ওপরে কাণ্ড হইছে। তার বলবেন না, শুনি, সব শুনি এইখানে।'

বিপিনবাবু অবাক হয়ে বললেন, 'সে কি মশাই, সব শুনি?'

'শুনি ছাড়া কী কমু, কন। ইটাইয়া বলতে যাইয়া ফালায়। কথায় কথায় মুনির বাইর করে, মোরা মরুম, শুনি কম, না তো কী কমু।'

বিপিনবাবু মনে মনে বললেন, যা ভেবেছিলাম, তাই। ঠিক তাতেই আমি খুঁজে পেয়েছি। আমার পাথর ছোঁড়ার সাধনাটা কাছে পিঠেই রয়েছে। বলা যায় না, সে ছিনতাইকে খুনি খেলতে দেখেছিলও, তারও হয়তো সেই বলের।

মনে মনে উত্তেজিত হলেন।

হরেকৃষ্ণ তাকে তাড়া দিতে তাড়াতাড়ি কাপিয়ে হাসল, 'হে হে বলতে পারেন। এইখানকার লোকেরা আমাকে খুনিই কয়।'

'সে কি মশাই, কেন?'

'কিয়েরা খুনি যে, তাই আমাকে খুনি কয়। আমি নাকি কসাই। বোঝালেন না, হিংসা হিংসে, হিংসায় সব কুকে ফাইটা মরতেছে। আপনে আসেন, থাকেন দুই দিন, তারপরে সব বুঝতে পারবেন।'

বিপিনবাবুর যে কিছুই বুঝতে পারছেন না, তা না। হরেকৃষ্ণ সাদা, ভাল লোকই। খুবই অপিসে। স্থানীয় লোকের সঙ্গে তার দলিলনা নেই, বোঝাই যাচ্ছে। কী কী তার কারণ, কে জানে। পরে নিশ্চয় জানা যাবে। কিন্তু, প্রথম বলিকা বলেই যায়। বলিকা বলতে হবে। মেয়েটির বয়স উনিশ কুড়ির বেশি না। এবং হরেকৃষ্ণর সাহার যদি অমন একটি বধূ থাকে, তা হলে পাড়ার লোকেরা তার পিছনে লাগবে, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

হরেকৃষ্ণর সঙ্গে তিনি গাড়ীতে এসে পড়লেন। বিদায় নিয়ে, রেল লাইনের দিকেই এগিয়ে গেলেন। যেমন ভাবে এসেছিলেন, সেইভাবেই স্টেশনে ফিরে ট্রেন ধরে কল-কাতায় ফিরবেন। গলির মোড়ে, লাইট পোস্টের বাল্ব-এর দিকে তাকালেন। বাল্ব নেই। কেন যেন এ কথা তাঁর মনে হল, বাল্ব নেই নিশ্চয়। অত রাত্রিবেলা পাথর ছোঁড়া যায়, কোন রাস্তাঘাটেই বাস থাকে না।

ইঁট বাঁধানো রাস্তার ধারে, ঘাসে ঢাকা ওপরে, ইতস্তত: ছড়ানো রেল লাইনের পাথরগুলো তিনি দেখলেন। কিন্তু, পথের আশ লাইনে যদি গাড়ি থাকে, তবে এত কাছে থেকে পাথর ছোঁড়া যায়। নিরালাহয় ত্রিভিন্নের এই লাইনে, দুটো সুবাহবন লাইন, দুটো মেইন লাইন দুটো আপ, দুটো ডাউন, চারটে লাইনেই গাড়ি যাতায়াত করে। পরশু দিনের পাথর ঘটা হয়েছিল, চলন্ত আপ ট্রেনে, কলকাতা থেকে ঘরে ফেরা যাত্রীদের ওপরে। তা হলে মোট-মুটি, গাড়িটা যাচ্ছে লাইন দিয়ে চলছিল একটু, ঘুরে না গেলে, পাথর ছোঁড়ার অসুবিধা, এবং পাথরের আঘাতটাও মোক্ষম হবার সম্ভাবনা। অন্তত: মেরে ফেলার জন্য, সজোরে আঘাত হানতে পারবে না পাথরটা সেই গতিও পাবে না।

লাইনের দিকে অনেক দূর এগোতেই, ইঁট বাঁধানো উঁচুর ঘুপচি রাস্তায়, হঠাৎ একটি ছেলেকে, বিপিনবাবু দেখতে পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে, তাঁর মনটা চমকে উঠল, বুকটা ধক্ করে উঠল। এমন অসময়ে ছেলেটি এ রকম নিরালা, রেল লাইনের ধারের রাস্তায় ঘুরঘুর ঘাঁড়িয়ে কেন?

বিপিনবাবুর পা আপনা থেকেই থেমে গেল। কিন্তু, ছেলেটির কাছে তিনি যাওয়া দিতে চাইলেন না। তিনি যে ওকে দেখেছেন, সে কথা বুঝতে দিলেন না। এমনভাবে

উত্তর দিকে, কপালে হাত রেখে তাকালেন যেন ঘুরে বিশেষ কিছু লক্ষ্য করবেন। চশমাটা তাঁর দৃষ্টির কর্মের মত ওয়ে করে। কাঁচের ভিতরে তাঁর বড় বড় চোখের দৃষ্টি ভোলাদিকে, বাঁয়ের থেকে না হলে বোঝা যায় না।

ছেলেটি দাঁড়িয়েছিল, দাঁচিলের ধারে, খাড়াইলার ছায়ায়। বয়স বারো। ভেবের রোদ বেশ না। মাথার চুল কপালে এসে পড়েছে। শরীর তেমন লেখন, খুব রোগা লম্বা না। দাঁচিলে হেলান দিয়ে, পা দুটো সামনের দিকে এগিয়ে দিয়েছে। ওর পিছনে, দেওয়ালে লেখা আছে, 'রাইফেলই পরিষ্কার চলে, নির্বাচন করুন।' ছেলেটির পায়ে একটা হাফপ্যান্ট, ছোটাদলুনো। সারা খোলা। হাত দুটো, মুঠলা মুঠলা। পায়ে ধুলোর ধাতা মাখানো। ঠোঁট দুটি বেশ কাটা কাটা, বাঁয়েলা ভাবে আছে। চোখ দুটো কালো, ভাসর। পায়ের গড়ন লাগলা।

ছেলেটি এখন দিগিন্দ্রনাথকেই লক্ষ্য করে দেখছে। দিগিন্দ্রনাথ উত্তর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে, দক্ষিণ দিকে একবার দেখলেন। একটা নিঃসন্দেহই, ছেলেটার মনে একটা বিশ্বাস সৃষ্টির জন্য, ঘটতে ও কিছু, না বুঝতে পারে। ভাবলেন, ছেলেটা কি এখানে লুকিয়ে সিগারেট খেতে এসেছে। অসম্ভব নাও হতে পারে। কিন্তু সিগারেট বা খোয়া কিছুই তিনি দেখতে পান নি।

ঘড়ির দিকে দেখলেন, সময় বয়েছে বসতে চলেছে। তখন ফিরে যাবার গাড়ি, কিছুই আসেন না। শুধু এইটুকু, জানেন, গাড়ি কিছুক্ষণ অন্তর অন্তরই পাওয়া যায়। মন স্থির করলেন তিনি। উত্তর দিকে আবার ফিরে তাকালেন। শুধু উত্তর দিকে না, আশেপাশে চারদিকেই এমন ভাবে তাকাতে লাগলেন যেন, খুবই অসহায় ভাবে, কিন্তু ভঙ্গীটা খুবের বের করার চেষ্টা করছেন।

ছেলেটি এখন আর ওঁকে দেখছে না। দূরদিকে তাকিয়ে আছে। ও যে বিশেষ কোন কিছুই তাকিয়ে দেখছে না, তা বোঝা যায়। কিন্তু, ও বয়স বয়সের একটা ছেলে, অসময়ে স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে কেন। এখন তো ও ছেলের ইস্কুলে থাকার কথা। ছেলেটিকে দেখে, পরিচয়হীন, অসময়ের বা অপার কোনোওয়ালা বা দূর গাইন ঘর কলে মনে হয় না। দেখে মনে হয়, সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। কিন্তু এখন অসময়ে ছেলেটি, রেল লাইনের ধারে, নিরালায় দাঁড়িয়ে কেন। ওঁর মনটা কেমন করে উঠল। তবে কি—তবে কি....।

তাবতেই, তাঁর মনটা আবার চমকে উঠল। অন্তরাত্মার সেই চিরন্তন লাঞ্ছনা কি। হত্যাকারী একবার তার হত্যার স্থানটা দেখতে আসে, অপরাধ বিজ্ঞান তাই বলে। ওর কি তা হলে তাই। এই ছেলেটির বয়সের আবাতেই কি পরদূর বিকলের মনটা, লাইনের ওপর পড়ে আছা বিছেদে! যে ঘটনাই পাথর দুটুকুক, যার সাথে সম্পর্ক, সেকেটি আবার সাথ, আর সাথে যাবে, সে নিশ্চয়ই এখনে। ছলনার ছোঁয়া সাথরের থেকে, তার নিজের ছোঁয়া সাথরের দিকেই যেন লক্ষ্য থাকে, এবং সাথরেটা ঘোমাতে কী ভাবে ঘাচ্ছে সেটা সে দেখতে পায়।

ছেলেটার সঙ্গে, কথা বলবার জন্য, মনে মনে স্থির করলেন। পকেট থেকে রুমাল একটা বার করে নিয়ে দেখলেন, তারপরে সামে সামে এগিয়ে গেলেন। ছেলেটির কাছাকাছি গিয়ে, হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন। ছেলেটি যেন একটু, চমকে উঠল। সোজা হয়ে দাঁড়াল, কপাল থেকে চুল সরিয়ে দিল, আর দিগিন্দ্রনাথের দিকে সোজাসুজি জিজ্ঞাসু, কৌতূহলের দৃষ্টিতে তাকাল।

ছেলেটির চেহারাটা তিনি লক্ষ্য করে-ছেন। ওঁর হাতের বাঁয়ের দিকে, ছেলেটি চোখ বুলিয়ে নিল। দিগিন্দ্রনাথ খুব সহজ গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি এদিকে তোমার মামার?'

ছেলেটিকে একটু সন্দিগ্ধ মনে হল। চোখ মুখের ভাব সেই রকম, এবং যে কোন অবস্থায় ছোঁড় পালাবে, এই রকম একটা সতর্কতার ভাব। বলল, 'হ্যাঁ।'

গলার স্বরে এখনো, বয়না ধরে নি। বড় হবার মুখে, ছেলেদের গলায় এমন একটা ভাঙা ভাঙা ভাব আসে। স্বর ছোট্ট হবার লক্ষণ নেই। এর গলা অনেকটা যুবতী মেয়েদের মত। দিগিন্দ্রনাথ, ক্ষুণ্ণ হবে সন্তুষ্ট ভাব করলেন। আবার ছেলে বললেন, 'আচ্ছা, এখানে ধরেকাছে সাধু বলে কাউকে চেন?'

ছেলেটি কিসের সতর্ক আর অন্তর্ভেদী মনে হচ্ছে। আর একটু, চঞ্চলতা আর ছেলেমানুষি কৌতূহল থাকলেই যেন ভাল হত। বলল, 'চিনি।'

দিগিন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করলেন, 'তার বাড়িটা কোথায় বলতে পার?'

ছেলেটি হাত তুলে, ঠিক ঠিক রাস্তাটাই দেখিয়ে বলল, 'ওই রাস্তা দিয়ে গেলে, ডান দিকে পড়বে। হলদে রঙের তেতলা বাড়ি।'

দিগিন্দ্রনাথ ক্ষুণ্ণ ভাবটা বজায় রেখে বললেন, 'ও। কখন থেকে খোঁয়াগুড়ির জন্যে দাঁড়িয়ে পড়েছি।'

'তোমার নাম কী খোকা?'

খুব ভালবেসে নামটাকে যেন গড়িয়ে দিলেন। ছেলেটি দিগিন্দ্রনাথের দিক থেকে, অন্যদিকে মুখ ফেরাল। বলল, 'সতাবতে চক্রবর্তী।'

'আচ্ছা, বেশ।'

এবার ভাল করে ছেলেটিকে দেখে-ছিলেন। ছেলেটি হঠাৎ চোখ ফিরিয়ে, দিগিন্দ্রনাথের দিকে তাকাল। দিগিন্দ্রনাথ চোখ মুখের ভাব বদলাবার অবকাশ দেখালেন না। ছেলেটা ওঁর চোখের দিকে, সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল। দিগিন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিতে পারলেন না। ওঁর মনে হল, সত্যবতের চোখে যেন একটা কে মিনতির অনুনয়ের ছায়া। দিগিন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি আবার মনে ভাবলেন, আর একটা সময়ের আলোয়াকে ছেড়ে দিলেন, 'ইস্কুলে যাও নি আজ? ইস্কুলে পড় তো?'

'পড়ি।'

'কোন ক্লাসে পড়?'

'ক্লাস সেভেন।'

'আজ বুঝি ইস্কুলে যাও নি?'

ছেলেটি চুপ করে রইল। রেল লাইনের দিকে তাকাল। দিগিন্দ্রনাথ দেখতে লাগলেন, কী গভীর দৃষ্টিতে, রেল লাইনের কোন দিকে ছেলেটি তাকিয়ে আছে। ছেলেটি তাকিয়ে আছে, একটু দক্ষিণ দিক ঘেঁষে, রেল লাইনের সমান্তরাল ভাবে। এর দ্বারা অবশ্য কিছুই বোঝা যায় না। জিজ্ঞেস করবেন নাকি কিছু, পড়ল্ড বিকলের ঘটনার বিষয়ে? তাতে আসল ব্যাপারটা ছেলের জানা না হতে।

ছেলেটি হঠাৎ চমকে, দক্ষিণ দিকে তাকাল। দিগিন্দ্রনাথ দেখলেন, একটা গাড়ি আসছে। ছেলেটি ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল। তার-পরে আচমকাই উত্তর দিকে ফিরে হাঁটতে আরম্ভ করল। দিগিন্দ্রনাথের মনটাও চমকে উঠল। তিনিও হাঁটতে লাগলেন। ছেলেটা ইঁট বাঁধানো একটা গলির মধ্যে ঢুকে পড়ল। ছেলেটা তখন অনেকখানি এগে পড়েছে। দিগিন্দ্রনাথ তখন সেই গলিটার মোড়ে এলেন, অবাক হয়ে দেখলেন, ছেলেটি ছোটছুটছে। কেন? ছোটছুটছে কেন ছেলেটি?

গাড়িটা এসে পড়ল, শব্দ করে, ঘাটি কাঁপিয়ে চলে গেল। তিনি ছেলেটিকে আর দেখতে পেলেন না। গলিটার দু পাশে, সর, নর্দমা, ড্রেন আর বাগান। একটুখানি এগিয়ে বাড়ি ঘর শুরু হয়েছে। কিন্তু এখন আর তিনি এগোতে চান না। বড়-কাতর দিকে ফিরলেন।

দক্ষিণ দিকে হাঁটতে হাঁটতে, ছেলেটির এই অদ্ভুত আচরণের কথা ভাবতে লাগলেন। কেন ইস্কুলে যায় নি, সে কথা নাও বলতে পারে, অস্বাভাবিক কিছু না। না যাওয়ার অনেক কারণ থাকতে পারে। হয়তো পালিয়েছে পড়া না করার জন্য, কিংবা বাড়িতেই কিছু হয়েছে, ভেতে বাবন করেছে। কিন্তু, সে এখানে এসে চুপটি করে দাঁড়িয়েছিল কেন, এক অন্যের পাশে। দু নম্বর পাশে, ট্রেন আসবে ভেবে, ও ছোটে চলে গেল কেন। শুধু তা-ই না, ও লক্ষ্যই করে নি, দিগিন্দ্রনাথও ওর পিছনে পিছনে হাঁটছেন। ও দিগিন্দ্রনাথের সামনে ছোটে গিয়েছিল, গলিতে পড়েই ছোট। তার মানে, ও যে ছোটছুটে, এটা দিগিন্দ্রনাথকে জানতে দিতে চায় নি। কিন্তু, ঘটনাটা কী।

তিনি যে ভাবে স্টেশন থেকে এসে-ছিলেন, সেভাবেই লাইনের ধার দিয়ে দিয়ে চলতে চলতে, এ সব কথা ভাবছিলেন। তাঁর বিয়ের পড়াশোনার সাধার মতো, কিন্তু, বনস্পতিচক্রের ঘরের কথা তাঁর মনে

পড়ল। এ রকম কোন ঘটনার সামনে এর আগে কী না, চিন্তা করতে লাগলেন।

ইংরেজি মাসের গণনা তাঁদের নেই, তবু মনে হচ্ছে বাস চাপিয়ে, গিরিন্দ্রনাথ কলকাতা থেকে, আট নাইল দূরে, হরেকৃষ্ণ সাহাং শ্রীশ্রীকৃষ্ণ কুটিরে এসে উঠলেন। বলতে গেলে, মালপত্র সঙ্গে কিছুই আনেন নি। একটি ঘটি, বিহারীর একটি বাটিয়া, একটি ছোট তক্তপোশ, একটি টেবিল, একটি চেয়ার, আর সামান্য বিছানা। রান্না বান্নার যিনিসপত্র বিহারী যতটুকু, কুড়িয়েছে, এনেছে। একটা আনাও আনা হয়েছে। আর এসেছে পড়ার বই।

গিরিন্দ্রনাথ জানেন, বিহারীর কাছে সমস্ত ব্যাপারটা দুঃসাহস। সে কিছুই জানে না। এ রকম একটা উদ্যোগ নেবার, সময়াভাবের কোন হয়েছে, অনুমান করতে পারছে না। কলকাতার যখন প্রায়শই নিজের বাড়িকে ছেড়ে, কেউ যে এমন শ্রীশ্রীকৃষ্ণ কুটিরে থাকতে আসে, সে ভাবতে পারে না। গিরিন্দ্রনাথের এটা একটা খামখেয়ালি বলেই ওর মনে হয়েছে। তাই মনে মনে একটু বিরক্তও হয়েছে। সহদেবকে দিয়ে, ও আগেই জানিয়ে নিয়েছে, কোনই একবার জন্যে কলকাতায় আসবে, বাড়িঘর পরিষ্কার করিয়ে, দেখা-শোনা করে আসবে। গিরিন্দ্রনাথ তাতে আপত্তি করেন নি। তার প্রয়োজনও আছে। তা না হলে, বাড়িটা মরুভূমি হয়ে পড়ে থাকবে। গিরিন্দ্রনাথের মতো, দাদা আর সুনেত্রা বউদির ফটো দুটো এনেছেন। ওই দুটো গিরিন্দ্র কোথাও রেখে তাঁর চলাফেরা করা সম্ভব না।

দু, তিন দিনের মধ্যেই, গিরিন্দ্রনাথ বুঝতে পারলেন, হরেকৃষ্ণের বাড়িটি একটি ছেলেখেলা বিশেষ। কারণ, তত্ত্বাবধায়ক। বি, টি, রোডের ওপরে, তার মতে বড় রাস্তাতে দোকান, সামান্য দরিদ্র সেলাই করও আছে। বাজারের মধ্যে, বেশ চালু একটি মুদি দোকানও আছে। বেশ বিক্রয়ের পরে, দোকান থেকে এসে, মুদি দোকানটাই ছিল তার বাসনা। তারপরে আরো ছড়িয়েছে, বাড়িয়েছে, আর তার বেশ ভালই।

সময় যখন সে এখানে এসেছিল, তখন তার সঙ্গে ছিল, উপযুক্ত তিন ছেলে। বড় ছেলে, তখনই বিবাহিত। একমাত্র মেয়েরও বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। তার সময় স্ত্রী তখনো বর্তমান। মেয়ে আর ছোট ছেলেটি অল্প সল্প লেখাপড়াও শিখেছে। বছর দুয়েক আগে, তার স্ত্রী মারা যাবার পরে, সময় বছর খানেক হল, ঘাসবাটি থেকে একটি সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করে এনেছে। তার জন্য যে মূল্য দিতে হয়েছে, সেটা নিয়েই ছেলেদের সঙ্গে সময়ের ঝগড়াটি। দ্বিতীয়পক্ষের শ্বশুরের মনাইকে, বেশ মোটা টাকাই দিতে হয়েছে। রাধাবাজারে একটি ছোটখাটো বাড়িও নাকি করে দিয়েছে।

কিন্তু ছেলেদের মনে বনিবনা হল না। তারা বাপকে ছেড়ে, আলাদা বাসা নিয়ে থাকে। হরেকৃষ্ণ তাদের ব্যবসা থেকে সরিয়ে দিয়েছে। ছেলেরা যে যার নিজের রোজগারে চালাচ্ছে। বাইরের লোক দিয়ে কাজ চালায় এখন। কিন্তু হরেকৃষ্ণের লোন দৃষ্টি, কেউ একটি পয়সা ফাঁকি দিতে পারে না। ছেলে-দের তাড়নটাই বোধহয় হরেকৃষ্ণের সব থেকে বড় অন্যায় হয়েছে।

বড় রাস্তার ওপরে যে মুদি দোকান হরেকৃষ্ণের বাড়িও ছোট্ট বিরোধিল গিরিন্দ্র-নাথকে, তার দোকান থেকেই বিহারীকে পরোক্ষভাবে খবর জানতে বলেছেন। তার কাছেই তিনি শুনেছেন, হরেকৃষ্ণের ছেলেরা নাকি তাকে বলেছে, তাদের গায়ে খুনির রক্ত আছে। তারা সহজে ছাড়বে না, বাবাকে দেখে নেবে। দোকান থেকে যখন এখানে হরেকৃষ্ণ আসে, তখন তার সঙ্গে, তার এক ছোট ভাই ছিল। পুলিসটা সারাক্ষণ যা ছিল, দু ভাইয়ের সামান। দরজা বন্ধ, সামান্য পুলিসটার চলা হরেকৃষ্ণ নাকি তার ভাইকে খুন করেছিল। তখন এই দোতলা বাড়িটা ওঠে নি, মাটির দেওয়াল আর টালির চালের ঘর ছিল।

একদিন বেলা টালির মাটির ঘর চাপা পড়ে, রামকৃষ্ণ মারা যায়। সে একটা আলাদা ঘরে একলা শুত। সকলের ধারণা, ভাইকে বিষ খাইয়ে, হরেকৃষ্ণ আগেই তাকে মেরে ফেলেছিল। পরে বৃষ্টির মধ্যে, টালির চালাটাকে ধসিয়ে দেয়। তখন এ পাড়ায় বিজলি বাতি ছিল না। ভীষণ অন্ধকার থাকত। বর্ষার সময় তো কথাই নেই।

পুলিস এসেছিল, মৃতদেহ দেখেও ছিল, কিন্তু কোন রকম হুজ্জোত করে নি। হরেকৃষ্ণের সঙ্গে কথা বলে আর স্টেটমেন্ট নিয়েই তারা সন্তুষ্ট ছিল। হরেকৃষ্ণ তিন ভাইকে মিলে, ভাইকে শ্মশানে জ্বালিয়ে এসেছিল। গিরিন্দ্রনাথের জেরোনির বক্তব্যে হচ্ছে, হরেকৃষ্ণের ছেলেরাও একদিন বাপের গতি ঘটাবার মতলব করছে। এবং আরো বক্তব্য, ওই সুন্দরী স্ত্রীটিই বউটিই হরে-কৃষ্ণের কাল হবে।

কাল বলতে কী বোঝায়, গিরিন্দ্রনাথ জানেন না তবে, বাড়িটার জন্যে যে সব সময়ে একটা অস্বাভাবিক আবহাওয়া বিরাজ করছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ধারণা, গিরিন্দ্র-নাথের তাতে কিছুই যায় আসে না। তিনি তার নিজের জায়গাতেই আছেন। তথাপি এক বাড়িতে থেকে, বাড়িওয়ালার পরিবেশ থেকে, একেবারে মুক্ত থাকতে পারেন না। দু তিন দিনের মধ্যেই, একটা আন্দাজ করেছেন, যা অত্যন্ত স্বাভাবিক, হরেকৃষ্ণকে সেই সন্দেহ বাতিক পেয়ে বসেছে। সন্দেহের তীব্রতা, এখন বোধ হয়, খানিকটা কমে এসেছে।

সময় যেদিন এলেন, সেদিন সন্ধে বেলাতেই শুরুতে গেলেন, হরেকৃষ্ণের স্ত্রী তীব্র চিৎকার, 'হ্যাঁ, দেখেছি, তোমার বাপের মুখ দেখেছি।'

একটি ছেলে গলায় এ রকম তেজী কথা শুনতে, গিরিন্দ্রনাথ প্রস্তুত নন, স্বভাবতই উৎকর্ণ হয়েছিলেন। তারপরেই তিনি হরেকৃষ্ণের গলা শুনতে পেলেন, 'আমার বাপের মুখ দেখতে তোমাকে, সে তো অনেক কাল হইয়া গেছে। কও যে, কারো ভাতারের, এক ভাতারের মুখ দেখতে পেছিলা।'

কথাগুলো কটু, গিরিন্দ্রনাথের প্রথমে শোনা যায় না। লজ্জা করলেও, জীবনের এক রূপ দেখছেন বলে, এই বয়সে কেমন একটা অস্বাভাবিক কৌতূহলও অনুভব করলেন।

হরেকৃষ্ণের স্ত্রীর গলা শোনা গিয়েছিল, 'দেখবই তো, হাজার বার দেখব। তোর ভাতার থাকলেই লোকে দেখে।'

পর মুহূর্তেই হরেকৃষ্ণের গর্জন, 'গলায় পা দিয়া মাইরা ফালামু।'

প্রত্যুত্তরে শোনা গিয়েছিল, 'ইস, মুরোদ কত বুঝোর।'

তারপরে আর কিছুই শোনা যায় নি। গিরিন্দ্রনাথ একটু চিন্তিতই হয়েছিলেন, সাঁঝা আলোর সময় হয়ে গেল কী না। কিছুই শোনা যায় নি। ঘণ্টা খুলেক পরে, হরেকৃষ্ণের ছোল বেরে উঠেছিল। তার সঙ্গে 'হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম' নাম গান শোনা গিয়ে-ছিল। বরং, ছেলে শুতে যাবার আগে, আর ভোর বেলা ঘুম থেকে উঠে, হরেকৃষ্ণ এই পারমার্থিক ব্যাপার। উচ্চারণে সে হরেকৃষ্ণ করে নি। তার নাম গান শেষ হয়ে যাবার পরেই, রেডিও বেজে উঠেছিল, আধুনিক গান বেজে উঠেছিল। সেটা নিশ্চয়ই হরেকৃষ্ণ বউয়ের ব্যাপার। মন ভোরাল ভাল থাকলেই সে রেডিওর নব ঘুরিয়ে দেয়।

ঘণ্টা খুলেকের বেশী কী, গিরিন্দ্রনাথ বোঝেন না। সন্ধি একটা সামাজিক ব্যাপার বোঝা গিয়েছিল। তবে সামাজিক সন্ধি ছাড়া চির সন্ধি বোধহয় কোনদিন সম্ভব না

মনের সম্পর্ক যে জাল না, সেটা সকাল-বেলাতেই বোঝা যায়। হরেকৃষ্ণ ঘুম থেকে উঠে, যাবে যায় দোকানে। ঘণ্টার প্রহরে ফিরে আসে। আবার যায় বেলা। চারটে-ছটা নাগাদ ফিরে আসে। তারপরে যায় আড্ডায়, সাড়ে নটার মধ্যে ফিরে আসে। চোখে লেগে থাকে সব সময়ে সন্দেহ। যার সাড়া শব্দ করে, আসে নিঃশব্দে। সময়কে হেরেকৃষ্ণও মাঝে মধ্যে করে।

হরেকৃষ্ণের স্ত্রীর বাইরে বেরোনো নিয়ে নানাও সমীহিত। তবু, তার মধ্যেই, দু, একবার তাকে, গিরিন্দ্রনাথ দেখেছেন। গিরিন্দ্রনাথের মনে হয়েছে, মেয়েটির সবটাই যা যৌবন আর রূপ আছে, তা তাদের সুখের হয়ে উঠতে পারত, যদি বেচারী একটু মনের সুখে থাকত। এখন, সুন্দর বলে তো মনে হয় না। অমন সুন্দর মুখটা যেন কেমন ঘর আর বারান্দা দেখায়। মনের পাখা সব সময়ে ঝুলে আছে, চোখের দৃষ্টিতে যেন সব সময়েই কিসের ভয়। চলা ফেরায়

ভাঁর ওপর যেন তলা উঁচিয়ে চলেছে গাছের সব পাতাই। পচুরের সোনার গহনা চলতে ফিরতে টুং টাং বাজে। আঁচলের চাবির গোছাটাও ছোট না।

এখন একটি মেয়ের এখন, আগের মতো মেয়ের মতো চলনে বাবার কথা। বড় জো, চারটিন তাজমহল সিনেমায়, অন্ধকারে একটু, চাঁদের মতো, সুন্দর পরিবেশ হয়ে উঠতে পারত। তা যোগেশের আর সময় না, বয়ও একেবারেই উপযুক্ত।

বিপিনচন্দ্রদের একটা নিজস্ব ঘড়ি। সুনেত্রা যেদিন জন্মাল, হরেকৃষ্ণের স্ত্রীর মতো সময় বড় হয়ে উঠেছে। সুনেত্রা এখন সতের ছোলে ছেলে দুই। হরেকৃষ্ণের স্ত্রীকে দেখে, নিজের সন্তানের জন্মে ছাড়া, আর কিছু ভাবতে পারেন না। মনে মনে ভাবেন, একটি সন্তান হলে যোগেশের মেয়েটির পরিবর্তন হবে। নিজের বিশ্বের আর খুশী কেউ দেখতে পাবে। সে মানে, তখনকে কী মানে।

বিপিনচন্দ্রের সকাল বেলা উত্তর দিকের জানালা খুলে, অবাক হয়ে গেলেন। দেখলেন, তিন চার ভাড়াটের বাচ্চারা, একটা ঘরে, কয়লার কাছে মেঝের ওপর ঝুঁকে একটি ছেলে, খাড়ার যেন কী টুকছে, এই দেখে দেখে। ছেলেটি তাঁর চেনা। একেই সুনেত্রা জোর একলা, পাঁচিলে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলেন, গাড়ি আসতে দেখে ছুটে পালাতে দেখেছিলেন।

আশ্চর্য, এত কাছে থাকে ছেলেটি, অথচ এই এক সপ্তাহ হতে চলল, রাস্তায়, বাড়ে একদিনও দেখতে পান নি। সকলে বিকলে, রোজই তিনি বেল লাইনের ধার ঘেঁষে ঘুরে বেড়ান। অনেক ছেলেকে দেখতে পেয়েছেন। একে দেখতে পান নি। অবিশ্যি, তিনি যে বিশেষ তাকতে চাইছেন, তাতে বিশেষ একটি ছেলের প্রতি লক্ষ্য রাখার কিছু নেই। সমীক্ষা অতীব, জো তিনি করতে চাইছেন, তাতে একাধিক ছেলে ফাঁকির সন্দেহ নেই। কিন্তু, এই ছেলেটির মুখ তিনি একবারও ভুলতে পারছেন না। এই ছেলেটি তাঁকে যেন কেন চিন্তিত করে তুলেছে।

বিপিনচন্দ্রের যেন একটা অস্বস্তি হচ্ছে। সেদিন ওর পালানোর ব্যাপারটা আর কিছুই না, ছোকরা টেনিসের সামনে ও থাকতে চায় নি। যদি ধরে নেওয়া যায়, ছেলেটি সত্যের জোড়া মলের, তাহলে, এটা অনুমান করা যায়, মলা একটা ঘটনার পরে, চলন্ত ট্রেনের সামনে সামনে, নিজের জোড়া সে মুখোমুখি হতে চায় না। যদিও বৃদ্ধি দিয়ে বিচার করলে, এটা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, বিমলেন বাড়ীর বাঁধিক ও পুলিশী পরিষ্কার ওরই ছেলের জন্যে হয়, মুনেত্রার ছেলের তা হয় না। সে সময়ে, বিপিনের মনের বিপিনে থাকে। একটি সময়ের ছেলেটি পালানোর ব্যাপার নয়।

তবুপরি, একটি পাকার ছোকরা ছেলের এ কথা মনে হতে পারে, একটি মেয়ের ওকে দেখে হয় তো কেউ চিনে ফেলতে পারে যদি কেউ আড়ালে ঘোমটার ফাঁক দিয়ে ফিসফিস করে ওঠে, 'ওই যে সেই ছেলেটা।' এ একটা চিন্তা ওকে খেকেই আসে, আর কারো আসে অসম্ভব খেকেই।

এই ছেলেটি কি সেই রকম কেউ। তিনি জানালার পাশ খেকে ছেলেটিকে দেখতে লাগলেন। সাধারণতা উত্তর দিকের জানালা তিনি খোলেন না। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের এই সব ভাড়াটে বাড়িগুলো, অধিকাংশ সময়েই বেপরোয়া থাকে। নিজেদের কাজে কর্মে, এদের বাড়ীর, জানালা দরজায়, নিজেদের নিয়ে সদাই ব্যস্ত। তিনি নিজে সব সময়ে সে ব্যাপারে থাকেন, সেই ঘরের উত্তরের জানালা বন্ধই থাকে। গোলমালও লাগে, অস্বস্তিও হয়। জানালা বন্ধ থাকে বলেই যোগেশ, ছেলেটিকে তিনি আগে আর দেখেন নি।

ওর থেকে আর একটি ছোট ছেলে, ঘরের ভিতরের অন্ধকার থেকে এসে, রাস্তায় কী যেন বলল। দেখতে অবিকল ওর মতই। ও ছোটটিকে ভাঙচকনা দেখাচ্ছে, ঠোঁট বেঁকিয়ে কিছু একটা বলল। ঘরের মধ্যে বলেই, বিপিনচন্দ্রের শুনতে পাচ্ছেন। ছোট ছোটটি, ওর গ্রামার পকেটে হাত ঢুকিয়ে ছিল। ও এবার ঘুরে, ছোটটির হাত টেনে নিয়ে জোরে মুচড়ে দিল। ছোটটির গলায় কান্না ঝরা আর্তনাদ বিপিনচন্দ্রও শুনতে পেলেন। কিন্তু, আশ্চর্য, ছোটটি হাতে ধরল না। যে হাতটা ভাঙা ছিল, সেটা দিয়ে ওর চুলের কুঁটি টেনে ধরল। তার পরিবর্তে আরো আর্তনাদ হল। চুলের থেকে ছোটর হাত সরিয়ে দিয়ে, এবার মেরে কাঁধের কাছে কুঁদি মারল, ছোটটি একেবারে মেঝেয় চিৎ হয়ে চিটকে পড়ল। আর তখনই, ওকে একটি শক্ত মোটা হাত, ঘেঁচা টেনে নিল। বিপিনচন্দ্রের দেখলেন, একটা বছর পঁচিশের লোক, স্বাস্থ্যটা বেশ ভালই, খালি গা, লুঙ্গি পরা, ওরে বেধড়ক মারতে আরম্ভ করল। লোকটির মুখ, দাঁতে দাঁত পেষা ভয়ংকর বিকৃত দেখাচ্ছে। তার গর্জন শুনতে পচ্ছিলেন তিনি, 'হারামজাদা, বড় মাস্টারওয়ালা ছেলে হয়েছে তুমি। শুয়ার, তোর মলের নাম আর তুলিয়ে দেব।'

মারগুলো এমন শক্ত আর নির্মম, যে, বিপিনচন্দ্রও মুঠে হাত চালালেন। তিনি সহ্য করতে পারছেন না। লোকটি বোধহয় ওর বাবাই হবে। ছোটটি তখন কাঁদতে কাঁদতে কী সব বলছে। ইতিমধ্যে ওর মায়ের আবির্ভাব হল। ছেলে একটি বচ্চা। মুখের ওপর বাসিকাপড়ের দাগ। এপাশে কাপড় সিঁদুরের ছোপ। পরনে আলতার আভাস। ঘটনাটা যেন রাম বেমানান ভাব নিয়েই, শাসন দেখতে লাগল, এবং আশ্চর্যটা বোধহয়ও একটা ছোপ ধরে ফেলল।

কিন্তু, বিপিনচন্দ্রের অবাক আরো বাকি ছিল। যাকে এই পর্যায় দেওয়া হচ্ছে, মারিতে আছতে আছতে ফেলা হচ্ছে, সে কিন্তু দাঁতে দাঁত চিপে মার খেতে যাচ্ছে। কোন চিৎকার আর্তনাদটি শোনা যাচ্ছে না। ইতিমধ্যে, অন্যান্য ভাড়াটেদের ছোট ছেলেমেয়েরা সেই ঘরের দরজার কাছে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। তার মধ্যে খেকেই, এক মা এসে, একজনের কান ধরে টেনে নিয়ে গেল। অন্যদিকের ঘরের বারান্দায়, এক গৃহিণী তরকারি কুটতে বসছে, আর একজন কিবারায় সবে কথা বলছে। দেখে, বোঝাই যায় না, তাদের কারুরই ও রকম কোন ঘটনা ঘটছে।

মার এক যা খেকে, এবার একজন বেরোল, ঝাকঝকে ধুতি পাঞ্জাবী পরা লোক। চেঁচিয়ে বলল, 'ঘরে ও মশাই স্বিরেনবাবু, ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন, আর মারবেন না।' স্বিরেনবাবুও তখন জেরে ফেলেছে, ঘামিও তার স্বাস্থ্যটা ভালই। চিৎকার করে বললেন, 'মশাই, একটু ঘরে টিকতে দেবে না, খালি মারামারি আর কাড়া। ইতটুকে এমন মেরেছে, চিটকে পড়েছে একেবারে।'

ইতিমধ্যে স্বিরেনবাবু আসে ভদ্রলোকের সঙ্গী, ধুতি পাঞ্জাবী পরা ভদ্রলোকটিকে দেখে খোনটা টেনে ফিরেছিল। সামনে থেকে সরে যায় নি অবিশ্যি। তার কথা হতে, ছেলেটি মারের চোটায় অমূল্য হয়ে গেল। ধুতি পাঞ্জাবী পরা লোকটি, কয়লার সামনে ভিড় করা বাচ্চাটিকে ধমক দিল, 'এই যা, যা সব এখান থেকে। পরের মার দেখতে এসেছিস, নিজেদের পিঠ সুড় সুড় করছে বুঝি?'

সবাই ফাঁকা হয়ে গেল। বিপিনচন্দ্র শুনতে পেলেন, ধুতি পাঞ্জাবী ঘরের দিকে তাকিয়ে বলছে, 'হাঁ রে বিতু, জানিস তো বাবা, তোর বাবা বেরে গেলে আমার বাঘ। একটু চান্তা থাকতে পারিস না?'

আমার বাঘ স্বিরেন বলল, 'চান্তা থাকবে ও? এই আমি থাকিতে না থাকলে দেখতেন, তুলকালাম কাণ্ড লাগিয়ে দিত। ছোটটাও যদবাইস, ওটাই এসে লাগিয়েছে আগে। কই, সেটা কোথায় গেল, সে হারামজাদা কোথায়।'

আমার বাঘের আবার গর্জন শোনা গেল। ধুতি পাঞ্জাবী বলল, 'যাক যাক, এখন আর মারবোর কাজের না। বাকীটা ইস্কুলে গিয়েই হবে। আমি আর ওর পড়া ধরব, তা হলেই হবে।' বলে, লোকটি খুব হাসা করল। স্বিরেনের সহিতকে হাসা করতে দেখা গেল। সে সরে দেখে। দেখা গেল, ধুতি পাঞ্জাবী পরা লোকটি ইস্কুলের মাস্টার। কিন্তু, এই সময়ে, হাসার কী হল, বিপিনচন্দ্রের বুঝতে পারছেন না। তিনি জানালার পাশ থেকে সরে এলেন। মনটা অতিরিক্ত মায়ায় বিষণ্ণ হয়ে উঠল। যৌবনে মানুষের আশা একটু বেশি থাকে, সন্দেহ নেই। কিন্তু, একটি মাত্র ছেলে অসহায় ছেলেকে, অতখানি মেরে মারা যায়, তার

(১৯০ পৃষ্ঠার পরে)

নারায়ণ সান্যাল

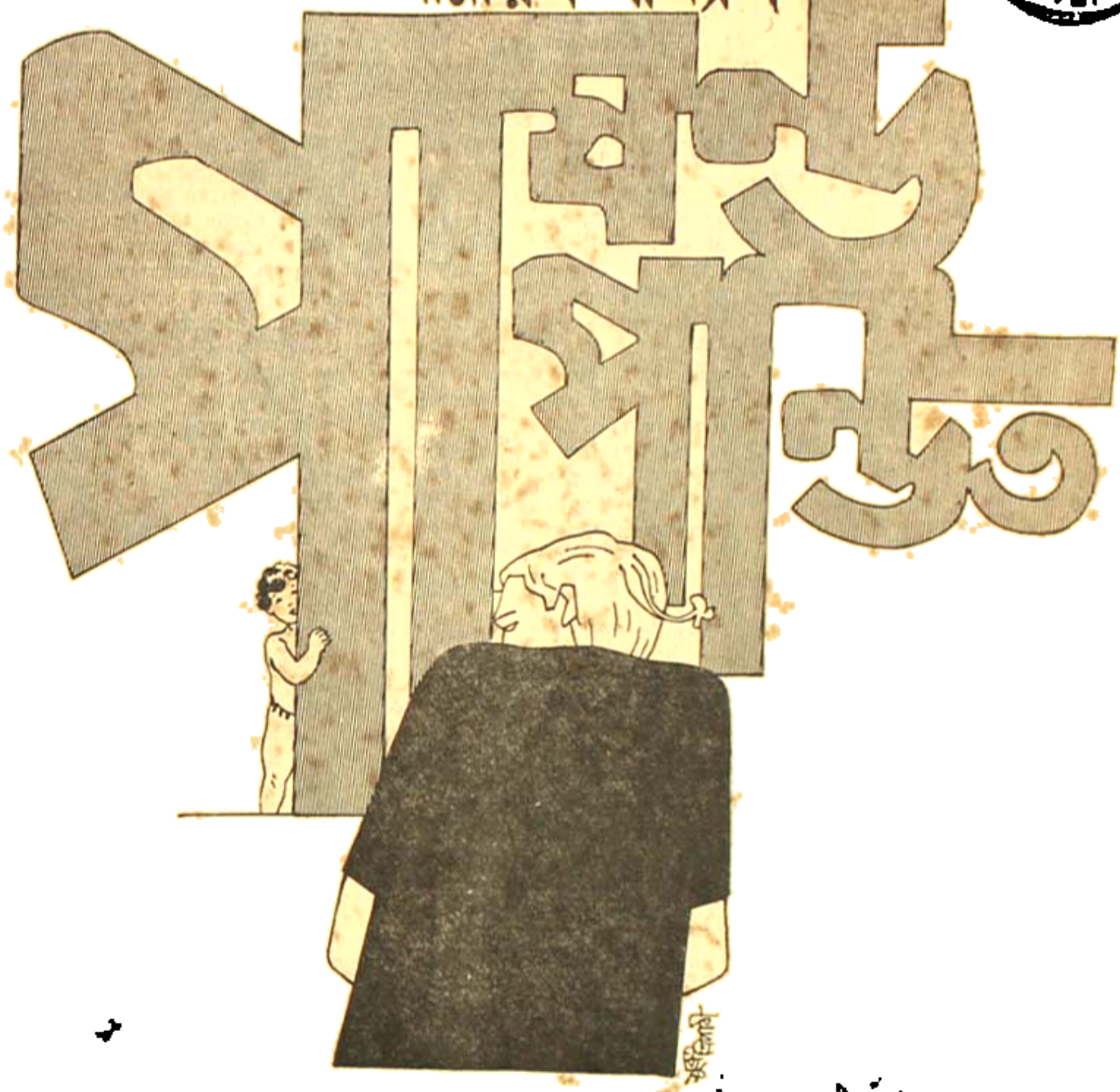

শ্রীমতী আপন মনে খেলা করছিল।

পরিবেশটা খেলার উপযোগী মোটেই নয়। মা স্নান, মা জান—কিন্তু পাড়া বেড়ানোর বাই তার খেলাধুলার চেয়েও বেশি। কেওড়াতলার শ্মশান ঘাটে আদি গঙ্গার ধারে পাথর দিয়ে উঁচু করে গোড়া একটা কবর ঘিরে ঘুরে ঘুরে আপন মনে অনেক মায়ার রচি আঁকবার চেষ্টা করছে। মায়ের ঘুমের সুযোগটা নিয়ে কি যেন কিছুদিন—হ্যাঁ, চুলদুলো ঝাঁট পাকিয়ে উঠেছে, চুলে তেলের বালাই নেই, এমন কি

পরনের কাপড়টাও রাঙিয়ে নিয়েছে। দু হাতে দু গাছি কাঁচের চুড়ি, গোড়া ভাঙা কয়েকটা দিয়ে সিঁথির ধারে ছবি আঁকবার অবকাশে চৌখিয়ে চৌখিয়ে দেখছিল আত্ম-বিভোর ভিখে, শুনেছিল তার ইনিয়ে বিনিয়ে গাওয়া। ঘুরে ঘুরেই গাইছে, এমন করে কেন কাঁদছে কতদিনই। দু-একবার বুড়ির আঁচলটা টেনে নিয়ে তার ভিজে-পড়া চোখ মুছে। মনিরুদ্দি ধিরে বলছিল—ছি। কাঁদে শুধু বকাটী মেয়ে, চুপ কর, লক্ষ্মীসোনা হয়ে

কাত্যায়নী কর্ণপাত করে না। গঙ্গা

থেকে যে হাওয়া বইছে তা, সুরে টেনে টেনে অনর্গল বকবক করে চলেছে। কান্নার ভাষা না বোঝার ভাষা সহজে ঠাওর হয় না। আর এই শ্মশান গঙ্গার মানুষ এতে এতই অভ্যস্ত যে কান পেতে কেউ শোনেই না তার অর্থ। পরিত্যক্তা অতি বুড়ির অনেক মূল্য বোঝাচ্ছে। ওরে তুই আজ কী হারালি, তা যে মানুষেও পারবি না।

তা ঠিক। খুকুর বয়স পাঁচ। মৃত্যুকে সে চেনে না, জানে না। এখনে যে নিত্যনাস্ত নাটকটা অভিনীত হচ্ছে তার

পাঠিত কেন আসছে সেই মুহূর্তে তাকে এই কাহুবুড়ির হিসাবের খাতায় রেখে যাবে কোথায় রেখে, এটুকুই সে জানে।

কাহুবুড়ির গা ছেলে পড়েছিল একটা [illegible] মুহূর্ত চোখে ভাল দেখে না। সে চৌখ পায় নি। না হলে এখন খানিক এসে পোওয়ায় বসানো সে মুহূর্তে ঝিন্ত এ ছেলে-

ওখানে নাম ছোল পরা, সিঙ্গুরের [illegible] একটা কাজ। এক জমাদার এসে আছেন উপর [illegible] পেয়ার মুখোপাধ্যায় আসা, সাদা একটা পুরুষ। আর কয়েকজন। মাঝে মাঝে আলবিলাসী হাক পড়তেছে [illegible] মজুমদারী, বাজো।

কাহুবুড়ির কানের পাশ দিয়ে ফিসফিস করে [illegible] সে আওয়াজ। প্রথমে কানে বিরক্তি। পরক্ষণেই সে বুঝে, কেউ ওকে না সে শিরীষবিটির মতো ডাকছে না। তবে ওরই [illegible] ছোকরা ছেলে কেমন করে ওর নাম জেনে গেল সেটা ভেবে তিন [illegible] তার সে ওর কানে ঠোঁকেছে, তাই এমন সম্মোহনের মতো করছে।

একজন সেটা অনেকক্ষণ ধরে নজর করছিল কাছে, বুঝিতে। তার আসার [illegible] সেই, যখন উঠতে পারছিল না দাঁড় হয়ে তাকে সাহায্য করে কোন কথাও [illegible] তা ভোলা যায় না। একবার সাহস [illegible] এগিয়ে এসে বলে, তোমার কই না [illegible]?

কাহুবুড়ি বলবে বলে আঁচল দিয়ে মুখটা মোছে [illegible] মুহূর্ত চোখ তুলে আগন্তুককে একবার দেখে নেয়, তারপর মনে—আমার কেউ নয়।

সেটা পায় বসে ওঠে, কেউ নয়, তাহলে তখন ছেলেটাকে ফেলে কাঁদবে কেন না?

কাহুবুড়িও উঠে বসতে লাগায়, কাঁদব কি? তুমি বলছ কি গো তাল জানুষের ছেলে? এই একবারি ছেলেটাকে ফেলে তুই যে এমন ভাব তোমার সংগে চলে গেলি। এখন এঁদের দেখে কে।

সেটা পাঁচ বছরের মুকুল দিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিল, উর-মা?

—মা তো বলছি কি গো? লক্ষ্মীর পিদিমে গো, সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর পিদিমে এই কি তোর সংগে যাবার পারেন?

সেটা অবাক হয়ে বলে—এই যে [illegible] ছিলেন ছিলেন ছিলে একজনে [illegible]।

মুহূর্ত সেটাকে ওঠে, আমি কি বলি আর তুমি, এঁকে শোন! তার কথা বলা [illegible] সেটা? মুহূর্তে এর বাপের কথা? [illegible] বলছে সেটাকেমুখো ঝিনুকের কাঁকরাটি [illegible] —কী বিপদ! মা বাপ মরা [illegible] ছেলে! মরণ কালে সে কথা বেরোল [illegible] হল নি? যাও। এখন বাপ মুছে চলে যাও।

—আর ছেলেমানুষ নেই?

—হবে কোথেকে? হবার কি সময় ছেল? মায়ের পরের তো যে মুছেছে। এই একটি মায়ের শিশির টিপ্ টিপ্ করছে,—এখন তুই ছেলে করে ও [illegible] রাখিস দেখব আমি।

—কি বলে ওরা বল?

—বলবে আবার কি, ছেলেমায় ওদিকে ছোল ঢুকে যাবে ইস্কুলের মার্ক পাঁচতরিণি। কিন্তু, মেয়েরা ছেল আটকড়ায় জোলাজায়। ছোলার চেয়ে কেউ ডিসিমানার ছেলে না। ঠৌকিকটা মিনুকের সাতার মুখো না গা ভাগিনেয়ও। মুহূর্তে ছেলেকে দুনিয়াদারীর মানুষের ভুল করে বেড়ানোই সে কাজ। ওরে আমার নিধুচুল ছেলে-বাছুরে। সাবাস। সাবাস। মহাপাপড়।

সেটার বোধকরি বিশ্বের ঞ্জাক্ত ছিল; ওসব ছোঁড়ুলে আবাদিক ছিল না তার। আমার ঠৌকিতে সে নিজের সাহ ধরে। তবে গলার দিকে উৎক্ষেপ একবার মুখভঙ্গ ভাবার ঠাঁয় ছোট একটি মন্তব্যও করে যায়; বলে এ মতন।

তা ঝিনুক বিয়েই তো পড়াশোনে ভাল সাহ. ঠাঁকেকে এখানে সোঁয়ে কে? ঐ বুঝি আবার একজন এসে মজলের [illegible] যোগাড় করতে করতে—

। বলবাবি, হরিবোল।

কাহুবুড়ি হাত মুঠো কপালে [illegible] ঠেকায়।

সকলে [illegible] আর একবার হিংকার করে ওঠেন। তারপর [illegible]

কুকুরেটার গলা যোগাড় কার না পড়েছে, কাঁকে করে ওঠে সেটা।

শিয়রে [illegible] উঁচু, পাঁচিলের ওপার থেকে উঁকো ঝোঁয়ার কুণ্ডলি পাকিয়ে ঠেলে। [illegible] ঝাঁটকরানাঁকিমা' ফেলে দিয়ে সেটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল। এবার কাহুবুড়ির কাছে ঘনিয়ে এসে বলে, এত বেলা কেন রে বিধি?

কাহুবুড়ি ওকে বুকে টানিয়ে ধরে। ঠোঁট মুঠো কেঁপে ওঠে তার।

একজন কাজেরওয়ালা, ঝোর কাঁর মুখাগ্নির ঘটোনাকার, কাহুবুড়িকে পলাশ করে, 'ঠকো বোলাবেন না মা, একখানা লেপ মতো!

কাহুবুড়ি মাথা নাড়ে করে ওঠে। লোকটা পালাবার পথ পায় না।

ও পাশ থেকে মুখান ব্যারীদের মধ্যে কথা বলতে বলতে এগিয়ে আসেন পলাশন্ত ভট্টাচার্য, ছেলেমানুষ, ওদিকে কোন এক স্কুলের [illegible] পণ্ডিত। বয়স পঞ্চাশের নিচে হলেও খুব নিচে নয়। চুল্ল চুল, বুক ঘাল, মধ্যে ছোড়াতাল গায়ের ছোপান। [illegible] সেদে, অল্প একটু কুঁজে চলেন সামনে। পরনে [illegible] সাতাশিনের না-কাচানো ধুতি—সাদার কাছাকাছি। চুলগুলো কদমফুলের মত ছোঁটা ছোঁটা, মাথার সামনে ওঁ শিখরে একগোছা। সেই সাতাশিনী মন্তকের শিখরদিকে একছত্র-নায়কের ভঙ্গি ছেল [illegible] অকস্মাৎটুকুতেই [illegible] ছেলেছে।

একটি দীর্ঘ অর্থকলা, তার পরেতে একটি [illegible] [illegible] এ [illegible] উপরে নিজেদের প্রাণান্তকর সাধনের উপরিতে একটি চাবি বাঁধা। আলি না, [illegible] কাহুর ধারাধারি। কাপড়ের [illegible] অল্প একটু; মিছে—কাজের কাছে অনেকটা [illegible] ছেলে। মুখচোখ ভাবে ছেলে [illegible]।

পলাশ ধারীদের মুখোপাধ্যায় ছোকরাটি আসছিল পাশে পাশে। ছোকরার একটা ভাগো নাম। উদ্দাসে হাতটায় ঘোচা মাথায়, চুলগুলো পাখির বাসার মত। [illegible] একখানা লাল গামছা টাইয়ের মত বাঁধা। মুখে [illegible]। [illegible] ছোপধর। বিনীতভাবে গলাটাকে যথাসম্ভব নম্র করে বলল, পণ্ডিতমশাই, সভাসে এসে এক্ষেত্রের মুখে মুখে থাকতে নেই, মোটা পাঁচেক টাকা দিন; বিধি নিয়ে জানি।

পলাশন্ত [illegible] পড়েন। কি যেন ভাবেন; তারপর বলেন, আমি কিন্তু ভাবনা আমাদের, তোমরা যেতে চাও, যাও খেয়ে এস। পাঁচ টাকা আমার মনোযোগ অতিরিক্ত; এই [illegible] টাকা দিচ্ছি—

পকেট থেকে মুঠো করে [illegible] টাকার নোট ফেলে ধরেন।

—বা, টাকা তো দাদা পাঁচতরমশাই, আমরা [illegible] চাঁদা।

—আমাকে মার্জনা করতে হবে বাবা লক্ষ্মণ। আর একটিবার টাকা অর্থলিপ্সা [illegible] আমার কলাটির [illegible] কিন্তু, আছার্য—

বাবা দিয়ে ছেলেটি বলে ওঠে, বেশ, বেশ, তাহলে ঐ একটা টাকাই ছাড়ুন। তিন টাকা না হলে [illegible] চাঁদার সে গলাটাই ভিজবে না।

—যদ্দা ভিজবে না। কী বলছ তোমরা? এই যে বললে, মিষ্টি মুখ করবে?

ও পাশ থেকে আর একটি ছেলে এবার এগিয়ে আসে, ইলে—পাঁচতরমশাই, এ সব লাপারে নিয়ে আপনি মাথা ঘামাবেন না। তিনটে টাকা ছাড়বেন বলেছেন, তাই ছাড়ুন বস। ভদ্দর লোকের এক কথা। পাঁতে হাত পা ঝাঁপিয়ে পেল মশাই, ঘ. [illegible] ঠেলতেন [illegible] টাকা দিন বাবুর তোমার মেঁধ—

—বাল! কী বুঝব তোমরা। তাদের একটা ঐ থাকবে তো?

এবার আর ধৈর্যচ্যুতি ভদ্রতা রক্ষা করা সম্ভবপর হয় না। ছেলেটি [illegible] করে বলে, আছে ছ্যা নাই, মাজা। খাটি দেশী মাল। যোতরে জীত হয়ে দেবে, নেবেন না? আপনি বৈষ্ণব ঘরানার কিনা, তাই তেমার সনে আলাপ পরিচয় নেই। সাজ্জাত্য [illegible] কারবারি। তবে আপনি পণ্ডিত মানুষ, সোমরস [illegible], শুনে যাবেন। সনাতন এস—

পণ্ডিত প্রভাত বিরক্তিত হয়ে বলেন,

বারবার সমানে সমানে বলছ কেন? শ্মশানে বসতে পার না? আলবাত পার। তবে উচ্চারণ করতে পার না।

এরপর ছেলেটি নিচু হয়ে কী যেন বলে। লাল মুখে সমানে পাল্লা দিচ্ছে ইলে—

তাতে পাল্লিয়ে ফিরে এগিয়ে আসে প্রথম দলটার মুখে, তবে চুপ করে যায়।

পণ্ডিতের দিকে ফিরে হাত দুটি জোড় করে অতি বিনয়ের সঙ্গে বলে, ঠাকুর-মশাই, ও মানার কথা ধরবেন না। ছেলেমানুষ আমার সঙ্গে সঙ্গে ঠিকমতন উচ্চারণ করতে পারে না। মুখপুড়ি মেয়ের থেকে শুনতে শুনতে ওরও হয়ে গেছে। কিন্তু মশায়, যা বলেছেন, তাই কিন্তু। তিনটে লাকাই মারবেন।

পলাশের পণ্ডিতেরও বোধহয় সংযমের সীমা অতিক্রান্ত হয়েছিল। সেও এক টানায় নোটখানাকে দুভাঁজ করে সযত্নে পকেটস্থ করে সমস্বরে চীৎকার করে ওঠেন।

কাতুরিয়ার কোলের মধ্যে থেকে তখন চুপ করে শুনে যাচ্ছিল।

মেয়ে কুকুরটা উঠে পেছন থেকে। আর তিনটে কুকুরের সঙ্গে শ্মশানের ধুলোতে তছনছ করতে লেগেছে। ভীত, ভীষণ সাহেবের খাঁচাকারে দাঁড়িয়ান-পলিন সচকিত হয়ে উঠেছে। কাতুরিয়ার একটা মেয়েমানুষ চেঁচিয়ে কেঁদে উঠেছে। ভাঙনের-ও উপরও বোধকরি শেষ হয়ে গেছে তার। পাড়ার লোকে যে পণ্ডিতের পক্ষপুটে ঘেরে থাকে। একটি বস্তুতেই। মেঁয়ের মুখো শ্মশানে পণ্ডিতের কাঁচি গোঁফকে ভয় করত, আর ঐ ভয়ঙ্কর মেয়েটা ওর মাওটা হয়ে উঠেছিল তাই এই তোলপাড়। যাতে হাত তিনজনা মেয়েকে ছেঁচড়াতে ছেঁচড়াতে এই বাওড়াতলা শ্মশান-ঘাটে পর্যন্ত এনেছিল। অথচ সোনার পরিমা পড়ে রইই হয়ে রাবে অথচ তার জন্য, কেউ ঐক, ফোঁটা চোখের জল ফেলবে না। ও যন্ত্রণা অন্তর্যামীর বোধকরি বরদাস্ত হচ্ছিল না। তেরে না কেন এরোস্তী মানুষ,—স্বামীর পায়ে মাথা রেখে, একমাত্র সিঁদুর পরে, আলতা পায়ে এমন ভাগ্যেতিরে স্বর্গে যাওয়া হোক না কেন ভালোর। তবু—তবু মরেও কোন মানুষ শান্তি পায় না, যদি না সে চিতায় পুড়তে পুড়তে দেখতে পায় তার জন্য ওই ছেলে যাওয়া দুনিয়ায় কেউ ফেলবে জল ফেলছে। ঐ দু-ফোঁটা চোখের জলই হবে তার শেষ পাথেয়নি। মুখপুড়ি কাতুরিয়ার এই একমা। এ এ হতভাগীর জন্য কাঁদবে কে বল? তিনকুলে তার কে আছে যে কাঁদবে। বাপ নেই, মা নেই, বোন নেই—আকুর ছেলে ভাই আর ভাজী। তারা তো কোনদিন উঁকি মেরেও দেখল না, খোকা মরল না বাঁচল। আর থাকবার মধ্যে আছে ঐ বাদে-সোড়া ভাল-পাতের মত এক সোয়ামী। তাও চোখে তো কেউ কোনদিন জল দেখে নি। বই মরণে আর জলজ্যান্ত মানুষটা আর কি করে মরতে পারছে। বাঁচিয়ে রাখতে না, ও একেবারে কাতুরিয়ার দিকের চেয়ে দেখেছে! 'সেতার' না হয়, মল, কাতুরিয়ার ঐ গহনার দিকে মুখ করে স্বীকার যাবে? আর কে কাঁদবে? হ্যাঁ কাঁদবে, সেটের মেয়েও কাঁদবে—তার যে নাড়ির টান। দশ মাস যে সে বাস করেছে ঐ পেটের ভেতর, যা আর পড়ে রাই ছিল সেল: কিন্তু, কি হলুদ বল—ও যে মুখের ভাষা। ও কি বুঝতে পারল কত বড় সর্বনাশ হয়ে গেল তার? তাই কাতুরিয়ার এলোচিত্ত মন। পিসি পিসি করে মেয়েটা আশে-পা-আশে ঘুরে আসছে। ও পিসি একটু, বাবাকে, ওঠাবি চেয়ে দেখ, ও পিসি, তোমার ভাই লো আজ ঘরের থেকে একটা পক্ষে লাগে এনেছিলেন, এই দেখ গোলাপ ফুল-টুলগুলো, মুখে দিও। ওমা, সেই সোনার পাপড়িগুলো মাটি মেখে হয়ে গেল। তাই তার এত কান্না। মাতৃনি ছেলে নিয়ে করতে কাঁদতে বাড়ির এতক্ষণে একটু বিদ্ব'ন এসেছে। মেওয়ালটার ঠেস দিয়ে বিমুচ্ছে। সে জগতটা শুধু ঘিরে গেছে।

পলাশের পণ্ডিত উদাসী দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে ছিলেন শ্মশানের ঐ বেল গাছটার দিকে। তাঁরও মনের গভীরে প্রশ্নের বহুমের কথাই চিন্তা করছিলেন, তন্ময়তা। শ্মশানকর্মের দলের সকলেই ওঁর অন্তর্যামিত। এটা ওদের অভ্যাস। খবর পেয়ে যাঁর ছুটতে এসেছে: নালের সন্ধানে তারা অনেকক্ষণ চলে গেছে। কুকুরগুলোও কলহ বিবাদ থামিয়েছে। একটা নৈঃশব্দ ঘনিয়ে এসেছে চারাং। বেল-গাছের ডালপালা থেকে পণ্ডিতের দৃষ্টি নেমে এসে শ্মশানের উঁচু পাঁচিলটার উপর। চুনকাম করা শুভ্রতার কালো কয়লায় লেখা অনেক অক্ষর। নাম, নাম আর নাম; আর ঠিকানা। কেউ কেউ দু এক লাইন পদ্যও লিখেছে। বিষয় শ্মশান বৈরাগ্য। এ মহা-শ্মশানে যুগ যুগ ধরে যত মানুষ এসেছে তারা যেন রাখবার রেখে গেছে ওখানে। মোর নামাবলী, কুঞ্চিত হয়ে ওই পাঁচিলের পরতটির উপর একটি লেখার দৃষ্টি আটকে যায় তাঁর—চীরঞ্জীব সরকার, বালারাম অক্রুর দত্ত লেন।

পণ্ডিত নিচু হয়ে কুড়িয়ে নেন এক টুকরো কাঠ কয়লা। পরে পরে এগিয়ে এসে চী'-টাকে কেটে লেখেন: 'চি'।

পাঁচিলের ওপার থেকে এবার এগিয়ে আসেন একজন শ্মশান পুরোহিত। গলে নামাবলী, তাঁরও অক্ষকলায় বাঁধা একটি রক্তকরবী। বলেন, ও কি করছেন আর-পণ্ডিতমশাই, বুড়ো বয়সে শেষকালে আপনিও দেওয়ালে নাম লিখছেন?

একটু লজ্জিত হলেন পণ্ডিত। কুণ্ঠিত হয়ে বলেন, না, মানে নিজের নাম লিখছি না। একটা অন্যমনস্ক নিজের নামের বানানটা পর্যন্ত জানে না, তার বর্ণশুদ্ধির সংশোধন করে দিচ্ছিলাম মাত্র। পিতামাতার মাত্রকরণ করেছিলেন 'চিরঞ্জীব'—তবু শ্মশানে এসে সে চিরঞ্জীবী হয়ে থাকতে চায়। আর বুড়োমা দেখুন, নিজ নামের বানানটা সে পর্যন্ত লিখেছে 'চীরঞ্জীব'। চীর মানে তো জানেনই, ছিন্ন-বস্ত্র।

পুরোহিত মশাই একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন পলাশের পণ্ডিতের দিকে। কে বলবে, এঁর সঙ্গে প্রতীকোপ হয়েছে। আর সেই স্মারি চিতাটা এখনও জ্বলে জ্বলে নিভিয়ে দেওয়া হয় নি। পুরোহিত অবশ্য পণ্ডিতকে চিনতেন। কথা না বাড়িয়ে বলেন, যাক ও সব, শ্মশানে, শ্মশানীর অনুষ্ঠান এখনও কিছু বাকি আছে।

—বলুন।

: বলছি। হরিবোল।

আবার একটা ধ্বনি তোলে।

চিতাভস্মের ভিতর থেকে অস্থির অন্তিম অংশ নারিকেলদলটিকে, মুটি বাঁশের সাহায্যে তুলে নিয়ে পুরোহিতের সঙ্গে সঙ্গে পায়ে এগিয়ে যান ছেলে। সঙ্গে করে নিয়ে এসে বাঁধান এক জোয়ার জলে। পুরোহিত প্রথম শেষ মেয়েদের গলায় বিসর্জন দেবার মন্ত্রোচ্চারণ করতে থাকেন।

ঘনশ্যাম ঘনশ্যাম করে পলাশের পণ্ডিত প্রথম শেষ মেয়েদের গলায় বিসর্জন দেবার জন্য প্রস্তুত হন। ধর্মসভিনীর পরিত্যক্ত দেহ ধর্মচেলে। যার সাত বছর সে একেবারে পণ্ডিতের ঐ অভাবের সংসারে। শুধু পয়া দুটি হাতে সে ঐ পণ্ডিতকুলের দুঃখ-কষ্টের মাঝখানে গড়ে তুলেছিল এক মধুমান। নিবলস সেবায়, আন্তরিক ভালবাসায় সে পণ্ডিতের মাঝখানে টেনে এনেছিল এক পরিত্যক্ত সেতারাঙ্গনাকে। মাতৃত্বহীনার শ্রবিন-দর্শনেই আসতে শুরু করেছিল এক অন্তুত পরিবর্তন। কিন্তু তার প্রারম্ভ সাধন সম্পূর্ণ হল না। অকালেই সে চলে গেল। পণ্ডিত মনে মনে বললেন—এই পর্যন্তই তোমার হাত ধরে এগিয়ে দিতে পারি পতিব্রতা, এরপর তোমাকে ছেড়ে হবে একলা চলার পথে। আমার যে এখনও তোগান্তি শেষ হয় নি, শ্মশানকে ফিরে যেতে হবে, এখান থেকে, সংসারের অরণ্যে। ওঠ এগিয়ে যাও, তোমার পথ কর, এরপর তোমার পায়ের শব্দ, তোমার পদ্ম, তোমার পায়ের শব্দ, তোমার পদ্ম, তোমার ধর্ম।

কিন্তু, মনকে কি একমাত্র করার উপায় আছে? পাশ থেকে শ্মশান পুরোহিত কন্যাদাতা ভুল উচ্চারণে আবৃত্তি করে চলেছিল, তাঁকে ধাক্কা দিতে নিয়ে করছিলেন ঐভাবে, পতিব্রতার শ্রবিন ভেঙে। তার আতঙ্কে ও সময়ে বিধির হতে দেবেন না। কিন্তু, আর সহ্য হল না পণ্ডিতের। ফেঁকিয়ে ওঠেন তিনি কী যা তা বকছেন? 'ভ্রান্তি' নয়, ওটা 'ভ্রান্তি'! অন্তঃস্থ 'ব' উচ্চারণ হয় না আপনার?

পুরোহিতেরও বোধহয় সহ্যের শেষ

সীতা পার হয়ে গিয়েছিল। বিষ্ণুর ছেলে ফোঁফরে ওঠে তিনি : কেমনতর জানুষ মশাই আপনি! অমন সোনার পরতিমা পুড়ে ছাই হয়ে গেল, আর এখনও আপনি এইসব ছেদো কথা চিন্তা করছেন?

সোনার পরতিমা!

পণ্ডিত সাহেব বিস্মিত বিরক্তে। বিষ্ণুর উচ্চারণে বললেন, 'বিষ্ণুর মাধবা মূর্তি, বর্ণাশ্রমটুতি কেবলম্।

পুরোহিতের তখনও জ্ঞান পায় নি। আসন ছেড়ে পড়ে গায়ে করছে কাতর। এই সেনাই লোকে আপনার নামে পঞ্চকথা বলে। কোথায় দু-ফোঁটা চোখের জল ফেলে মরা হালকা করবেন, তা নয়, ভদ্রলোক তখন থেকে আমার উচ্চারণের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করছেন।

সত্যিই চোখের জল তাঁর ফেলা উচিত ছিল। কিন্তু কিছুতেই লোক দেখানো কান্নাটা আসছে না চোখে। অত্যন্ত কুণ্ঠিত হয়ে তাই পণ্ডিত মৃদু বললেন, তা ঠিক কিন্তু কথাটা উচ্চারণ, উচ্চারণের নয়।

পুরোহিত চমকে ওঠেন। হঠাৎ মুঠো হাত তুলে রোষ ভরে বলেন, সোনার আপনাকে—মানে, সোনার নয়, পরতিমা, পরতিমা। বেশ বেশ পণ্ডিত মেয়েটি ফুলাই, কিন্তু বউটার মুখে আগুন দিতে এসে পুলিসের দেওয়াল বন্দুক পুড়ে ছাই হয়ে ছাইকে দেখিনি!

পণ্ডিত একেবারে মরমে মরে যান। কুণ্ঠিত স্বরে বলেন, দেখবেন তো!

—আর কুন মশাই আপনার দেখা-টাবা! স্থানীয় ভদ্রলোকের চেয়ে তাবটাই বড় হল আপনার কাছে? নিন, নাড়ি-কুড়কানীটা তার ঘরে ফেরেছেন ফেন। পাখার ফেরে দিন। স্টাকে তো বকুনি দিয়েইছেন, এবার আমাকেও বকুনি দিন।

পণ্ডিত এ তিরস্কারে কর্ণপাত না করে বলতে আবার একমনে করেন। পরিত্যক্তা দেখে দেখবেনের আদি-গলদ ক্রমে বিসর্জন দিতে উদ্যত হলেন। কিন্তু এ কী! সম্বন্ধেই পথের ধুলো বিধা আসছে! নাসারন্ধ্র কুঞ্চিত হয়ে উঠল পণ্ডিতের। কোথায় বিসর্জন দেবেন পরতিমার দেব চিহ্ন? এ বিধার উপর!

এমন যে পতিব্রতাশিরোমণী গঙ্গা তাকেও জলকাদা সহ্য করতে হয়েছে অত ফেলেছি।

ক্রুদ্ধ নিজেকে ফেলে তুলে নিয়ে পণ্ডিত ঘাটের পথ ধরেন। বারে বারে দেহটিকে টানতে টানতে কাদাবিধিও চলতে লিছন লিছন। বেশীদূর যেতে হয়নি। কালীঘাটের একটী কণ্ঠীতে পরতুত পণ্ডিতের উদ্ধারের ব্যবস্থা। অন্তর্জলীর আগে মাটিতে পায়ের বুড়ো আঙুলের খানিকটুকু স্পর্শ করাবার নিয়ম। কিন্তু কাতরানীর আর কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে না। বুড়োর উপর রাগ হচ্ছে তার। হতভাগা তার চোদ্দ এক ফোঁটা জল করল না দেখে, অথবা হতভাগা পুরোহিতের সঙ্গে বুড়োর ষড়যন্ত্রে, ভাবে বিরোধিল বুঝি।...

পণ্ডিত সব চলতে চলতে ভাবছিলেন ঐ পুরোহিতের একটা কথা, 'অমন স্ত্রীর ভালবাসার চেয়ে ভাবটাই বড় হল আপনার কাছে?'

কথাটা বড় বেঁধেছে পণ্ডিতের। অনেক দিন অনুশোচনার একটা কথা মনে পড়ে যাচ্ছে তাঁর। তা সময় থাকতে পাঁচের অনোয়ার কথা পরিত্রাণের সিঁড়িকরণে বিলম্ব কেউই ছিল না। বাবা-মা বিয়ের আগেই গত হয়েছিলেন, তাই মোর হয় পণ্ডিতেরও, নব ভবানন্দী পাত্রের হাতে তাঁকে সমর্পণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন পরিত্রাণ পান। তা সে যাই হোক; সন্তান সম্ভাবনা দেখা দেবার পর সেই যাদব সন্তানেই আশাটি বিসর্জনের পরিত্রাণ দেব দুই দিন। বিয়েটের পর সেই তার শ্বশুরবাড়ি বাড়ি যাওয়া। কলাই এসে নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে পৌঁছে পুরিত্রা নিয়ে, দেখাশুনোর সবাইকে পণ্ডিতকে একখানা চিঠি লিখেছিল। ঐ একবারই তার স্ত্রীর কাছ থেকে পণ্ডিতের চিঠি লেখেছেন, সেই শেষের এক সেই দেব। তারপর দীর্ঘ তিনমাস পরিত্রাণ মাসের কাছে ছিল। কিন্তু আর দ্বিতীয় পত্র লেখেনি। পণ্ডিত পর পর তিনখানি পত্র লিখলেও তার একখানি পাঠ নি। শ্বশুরকে নিয়ে ফিরে আসার পর এ প্রসঙ্গটা উত্থাপন করেছিলেন পণ্ডিত, তার জবাবে কিন্তু ঐ স্ত্রীলোক কী একটা কথা চেপেছিল বলেছিল পরিত্রাণ। পরিত্রাণ পণ্ডিত আরও ঘুরে উঠে পুরোনো তাঁর অসহায়তা কি ইতিহাস। স্ত্রীর পত্রের উত্তর দেওয়ার সময় তার অনিচ্ছুকতি-পূর্ণ সংযোজন স্মরে সে কাজটাও থামে, ফলে স্ত্রীর পাঠানোর প্রশ্নে অন্তরায়টা কি হল? ঐই 'অন্তর্লক্ষ্মীর বিষয়ে একটা বিমাতা করার উপলক্ষ্য পরিত্রাণটা চন্দ্রকান্ত বাবুর কাছে একবার উত্থাপন করেছিলেন। চন্দ্রবাবু, চেতলা স্কুলের ইংরাজি শিক্ষক, পণ্ডিতের সহকর্মী। ঐই একটি মানুষের সঙ্গেই নানান ব্যাপারে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল পণ্ডিতের। ওঁর সঙ্গে তবু দু-চারটে পরিত্রাণ কথা হত। আর কেউ ঐই 'পাষণ্ড-পণ্ডিতের ত্রিসীমানায় ঘেঁষতো না।

বৃত্তান্তটা আদ্যোপান্ত শুনে চন্দ্রকান্ত-বাবু বলেন, স্ত্রীর পত্রে বর্ষাপুরিবর্তনটির পুরু সংযোজন করেছিলেন না তাবলত্ত্বটিও সংযোজন করেছিলেন?

—না তাবান্তরেন কিন্তু, ভ্রান্তি ছিল না, দু-চারটি বিশেষণে গুরুচণ্ডালি দোষ ছিল পুরুষের।

—বুঝলাম। সংশোধনে পত্র কি ছিল মনে আছে?

—ঐীরমকল্যাণেষু,—তিনি অবশ্য চরণে কথা পরে ঐসব লিখেছিলেন, সেই কিন্তুটুকুর বিরোধিলাম আমি।

চন্দ্রকান্তবাবু গম্ভীর হয়ে যান। ঐীমান, বুঝিয়ে। তা আপনার স্ত্রী এই পরে কি বললেন, কেন তিনি ঐীতীয় বার চিঠি লেখেন নি?

—সেটাই তো সমস্যা। তিনি কেবলই হেসে, পরমেশ্বর করেছেন না...

চন্দ্রকান্তবাবু বলেছিলেন, দেখুন পণ্ডিতমশাই, সংসারকে সব কথা বুঝবার ক্ষমতা তো ভগবান দেন না; এই এতুন একটা কাপড়ের জন্যে দুর্গতির সূক্ষ্ম আপনার যে আপনাকে আদি দুষিকে হাত দিতে পারে না।

পণ্ডিত অর্থকথা সমের তত্ত্বকথা-টাই মাথায়ে নেছেছিলেন শুধু।

এ সমস্যার, সমাধান আজও হয়নি আজকের।

কলাঘাটের একটা ঔষধ দোকানের সামনে মাটির তেজপাত্রে ঘেরা বাগানের ঘরে পণ্ডিত পুরোহিতকুমার ভট্টাচার্য নারায়ণ মহাশয়ের এক অনন্যসাধারণ সাক্ষাৎ পুরোহিত ছেলে বাড়ছাড়া সন্ধান, তাঁর ঘিরে এসেছেন কলাকে নিয়ে। বুড়ি এখনও ঘুমোচ্ছে। পুরুষের সেই যে ঘুমিয়ে পড়েছে এখনও তার ঘুম ভাঙেনি. রোদের উত্তাপ বিছানাটা ছাড়াই ছিল। পাইয়ে দিয়েছেন ঘুমোও [illegible]। কোন ঠুনিবে, নিজানাটা বাইরে আরও কি কি সব অন্তর্ধান দেব ঘরে ভাড়াবাড়ী নিয়ে ঢুকেছে তার হিসেব ঘরে। কিরকম ভল ধরার ভাড়ার বাড়ির কথা ঘরানি বন্ধু পুরুষকে গাল শুনতে হল ভতক্ষণ। তারপর সেসব কথাবার্তা মিটে যায়। সন্ধ্যাহ্নিক আদি সারা পণ্ডিতের আর কুর্তি ঘরে নিয়েও পুরো পড়েছেন ঠিকিতে কলার পাশ নিয়ে। ঘোর ঘরা, কোনকমে একখানি ঘর ঠোঁক পাতা সিয়েছে। সেটিতেই শয়ন করেন পণ্ডিত কলাকে নিয়ে পরিত্রাণ মাসিতেই পুরুষতো। দিনের বেলা ঐ আলতাকুতেই যে রান্নার সকল কাজ সারতে হত পরিত্রাণকে।

আজও পুরো ঘর পালন আসেন এখানে। কলকাতার দক্ষিণ দিকে মফস্বল-মজিলপুরের কন্যাকাটি কেন্দ্র এক আর পাড়াগাঁয়ে পণ্ডিতের আদি বাস। সোনারদী চলমান গ্রাম। পুরুষের সাঁবিধরের সঙ্গে নানান কাজে কলকাতিবাস করে সব ছেড়ে-ছুড়ে চলে এসেছিলেন এখানে ঘাটের ঘিরেছিলেন এই আগতির-গতি কলকাতা শহরে। সাত পুরুষের সে ভিটেখানা এতদিন টিকে আছে কিনা তাই খবর রাখেন না। বছর পাঁচেক আগে, খুড়ু মেয়ের হত, পুরুষের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার সঙ্গে হালিয়া রোদের মেতে হবার ঘাঁটাঘাটের দেখা হয়ে যায়। তার মুখে তখন শুনেছিলেন পুরু-দুয়ারি বসবাসা দেখে. উত্তরদুয়ারি চন্দ্রপাটাও ভেঙে পড়েছে। টিকে ছিল। তারপর আরও পাঁচ-পাঁচটা বর্ষা একমাত্র পঞ্চিমদুয়ারি চালাখানা তখনও দেখে অনাদরে অবহেলায়। সেখানাও এত-দিনে নিশ্চয়ই ভেঙেপড়ো হয়েছে। ঘোর ঘোরাতর ঘুম ও মলে ঘোর পাঁচিল ঘেরে সত্ত্ব সত্ত্বেও পরিত্রাণের মাঝী ফোকল করে নি। গ্রামের মানুষ ঘরোপাড়কে ঘরও ওর করে নিশ্চাবান বাসিন্দের মনে,

কিন্তু যন্ত্রণা অসহ্য, বোঝাচ্ছে সে ওর নেই। আশঙ্কা, কালকালান্তর অথবা পেরালকাঁটার মতোও অনেক ছোট্ট সেই ছোট্ট জন্তুগুলি একযোগে যেভাবে তর্ক-যুক্তি তর্ক সন্ধানের পদ্ধতি পড়ত। একটা যেন আর একটা খোঁচানির গন্ধ পেয়ে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে উত্তাপে। তা সে দৈহিক ক্ষিদের কথা ভেবে কি হবে। পণ্ডিত তো আর রোজদিন সোনারায়ের ফিরে যাবেন না। দৈহিক ক্ষিদে থেকে মনের মত চলে এসেছেন। একটা ছাইপো-ভাতেন থাকলেও নেমন্তন্ন করে ব্রাহ্মণ ইস্তান্তর করবেন—আর কিছু নয়, অন্তত সন্ধ্যাবেলায় ক্ষিদেটা যাবে। একটা পয়সাও সম্বল নেই; কিন্তু ভগবান যে সুখও লেখেন নি কপালে, তাও কুলে পণ্ডিতের কেউ নেই।

পিতা এবং পিতামহের বৃত্তি ছিল—অধ্যাপন-অধ্যাপন, যজন-যাজন। কুলোচ্চত্ত লিখে নামের উপাধি গ্রহণ করেছিলেন পদ্মনাভকুমার। পিতার দেহান্তের পর নিজের পূর্ব-পুরুষের ব্যবসায়ে একটি পাঠশালা খুলে বসেছিলেন। সৌভাগ্যের মা ঘরের যাবতীয় ভার করে দিয়ে গেছে—ধান ঝাড়া, সোহালো পর্যন্ত। স্বপাক আহার করতেন। পাঠশালা নিয়েই দিন কেটে চলে তাঁর। সুখ বলতে এটি ছিল চতুষ্পাঠি। বিশুদ্ধকুলে পদ্মনাভ পণ্ডিত নিজেও বেশকয়েক পিতৃ-দেবের চতুষ্পাঠিতে পুঁথি বিনচার, ছাত্র থাকত। তারা গরু গরুহে বাজ করত, সন্ধ্যেবেলা যাবতীয় ভার করত, কিছু সন্ধান মরিতো। তারপর অংকৃত পড়তে আসার রেওয়াজ ছিল। এই বিশে পড়াশুনা শেষে পরেও ও অঞ্চলে অধ্যাপন-যাজনের বৃত্তিটার একটা মর্যাদা ছিল। সমাজের একটা বাঁধন ছিল তখনো ক্ষমতাও ছিল অনেক প্রজাদের। অদূরবর্তী ভ্রমনগর-ঘড়িলপুরের স্বয়ং শিব-নাথ শাস্ত্রীকেও সে সময়ে এই অঞ্চলের পর্বের বিদ্যুৎবাচস্পতি করার সাধ্য হয় নি। তখ ছিল না, কিন্তু সম্মান নিয়ে বাস করে গেছেন পিতা, পিতামহ। তারপর পদ্ধতিগত হঠাৎ-আলোর ঝলকানিতে বর্ণিয়ে গেল সেইটা। সংস্কৃত পড়ার আগ্রহ স্তিমিত হয়ে এল মানুষের। পড়ার চাল-জমা-টিকেলে পেটও ভরে না, মানও যায়। এ বৃত্তিতে আর সম্মান থাকল না। দৈহিক চতুষ্পাঠি উঠে গেল। পদ্মনাভকুমার চতুষ্পাঠি তুলে দিয়ে পাঠশালা খুলে বসলেন। পড়ত সংস্কৃত নয়, ইংরাজিও পড়াতে শুরু করলেন সেখানে। 'মৈনাবাসাধিপসেবং' কমিয়ে দিয়ে বাড়িয়ে দিলেন—'এ পলাই ফক্স মেট এ হেনা' মারা দেশেই যে 'মৈনা'র স্থান গ্রহণ করেছিল ঐ 'পলাই ফক্স'। নাম বৃত্তি কেউই দিত না, তবে 'চিরকালের পদ্ধতিনুসারে সিধা পেতেন ছাত্রদের ঘর থেকে। চালটা, কলাটা, মুলাটা নিয়ে যেত গ্রামের মানুষ। গাঁয়ের পথের এঁচড়, অথবা মোচা-থোড়-চালকুমড়া নিতে এলে পণ্ডিত হেসে বলতেন, স্বপাক-রন্ধন বলি আমি একবার সন্দেহে—এসব কি হবে বাবা সকল?

ছাত্রসংখ্যা হতো পনেরো-বিশ। গ্রাম ছাড়াতো না। গাঁয়ের পথের ধুলোটা পাইকে দিতে কোন দিগন্তবান যজমানের বাড়ি। কোন সাহিত্যিক বিষয় হতো জানা করবেন সেই ব্যবস্থাই, নিয়মিত করে যেতেন পণ্ডিতকে। ওদের মনে আঘাত করতে মন সরত না নব-নৈয়ায়িকের। আহার গ্রহণ করতেন সভাবেশীর বাড়িতে।

এমনি ভাবেই দিন চলে যেত বেশ, কয়েক বছর। তারপর একটি ছিমিসতের ভালছেলেটিকে—অধ্যান। কতকগুলি হতুক লেখা পুঁথি, আর কতকগুলি অলঙ্কার গ্রন্থই ছিল ওঁর সবচেয়ে শিক্ষাকর; তাদের আঁকড়েই জীবন কাটছিল। আর একটি বাসনা ছিল, অনেক—কয়েকটি ছাত্রকে মনুষ্য করে যাবেন। তাদের কীর্তির মাধ্যমেই বেঁচে থাকবেন তিনি। পণ্ডিত নয়, বিদ্বান নয়, পাকৃত মানুষ গড়ার স্বপ্ন ছিল তাঁর। একদিন। এত সহজ সহজ না তাঁর বাসনা।

কিন্তু সব কল্পনা ধূলিসাৎ হল অতি সামান্য কারণে। তিনি স্থানীয় মন্দিরের সংস্কারকার্য চলেছিল বিরাটভাবে হয়ে গড়ছিল। সোনারায়ের ক্রীমদারের বাড়িতে, সেদেবীর বাজনে। ক্রীমদারের তাঁর একমাত্র পুত্রটির উপনয়ন উপলক্ষে। পণ্ডিতকে একদিন ডেকে পাঠালেন তাঁর বাস-কামরায়।

ঘরে তখন চার পাঁচজন সোনারায়ের লোক উপস্থিত। সুরেন্দ্রনাথ সোফার উপর ডাকিয়ার ঠেস দিয়ে বসে ছিলেন হাতে তাঁর ফরাসীর নল। অন্যেরা

সুরেন্দ্রনাথের হাতে ফরাসীর নল

তখনো ভবানন্দ পণ্ডিতের পাঠশালা ছেড়ে চলে এসেছিল। সুরেন্দ্রনাথ তার পাইকেট টিউটার রেখেছিলেন। তাঁরা বেতনই নিতেন শুধু, পড়াতেন না—মোহ তাঁদেরও নেই, ভবানন্দকে পড়ানোর উপায় ছিল না বাপ-মায়ের অতি আদরে ছেলেটি একেবারে বিগড়ে গিয়েছিল। ছেলেটির সম্বন্ধে পদ্মনাভ কুমার বিলক্ষণ খবর রাখেন। মাত্র ষোলো-সতের বছর বয়স, কিন্তু এরই মধ্যে যাবতীয় পাপকার্যে হাত পাকিয়েছে।

পুরুষ আসনে বসলেন পদ্মনাভকুমার। বাঁদিন বছরের দয়া পণ্ডিত তখন। তিনি এমন কাজে পড়েন নি যা সাহসের দিকে। মেরুদণ্ড সোজা রেখেই বললেন।

সুরেন্দ্রনাথ বাঁকাভাবে বললেন, নায়েরকে বলাই ভবেনের গলায় এক গাছা মুক্তা পরিয়ে দেবার আয়োজন করেছি। বক-লেস না হলে ওকে আর ধরে রাখা যাচ্ছে না। কলে ছিয়ের বাঁকাভাবে নিজেই ছো ছো করে ছেলে ওঠেন।

অবশ্য মোসাহেবের দলও যোগ দেয় সে হাসিতে।

'মুখটা বুঝে নিয়ে সুরেন্দ্রনাথ পদ্ম-পুরুষ করেন, আমার বাইশে বৈশাখ ওর উপনয়ন দেব স্থির করেছি; আমার অনুরোধ আপনি ওর ক্রিয়া আচার্য হবেন।

পদ্মনাভ পণ্ডিতক্ষণেকক্ষণ কোন জবাব দিতে পারেন নি।

ভবানন্দ ক্রীমদারের একমাত্র পুত্র। তাঁরই পাঠশালায় একদিনও পড়তে না, পড়ত না, তার পাঠশালায় অভ্যাগত ছিল ছেলেটির। পড়াশুনায় তার একেবারেই মন নেই দেখে বাবা হয়ে পণ্ডিত নিজে প্রাইভেট করেছিলেন—আসলে ছেলেটির অধ্যয়নে একেবারেই মন নেই। সে কুসঙ্গে পড়েছে। তাকে শাসন করা দরকার। সুরেন্দ্র, সাধু হেসে বলেছিলেন, পড়াশুনা না করতে চায় নাই করুক, দুর্দিন বাড়াবাড়ি করুক না। তাতে পরলে আপত্তি করেছিলেন পণ্ডিত : না, তাতে অন্যান্য ছাত্রদের ক্ষতি হবে।

সকালে মাতলামি করতেও তার সাহস নেই। অধিকার বলাই এসব কুকর্মে কখনো না, কেউ অনুযোগ জানালে তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠেন, মারমার কাটকাট করে ওঠেন। তবে হ্যাঁ, ও হেন উদারতাও সকলকে হারিয়ে দিয়েছে। তবুও যে বয়সে এত হাত পাকিয়েছে সে বয়সে ও সাহস শুধু কল্পনাতেই সাহস পায় নি প্রসন্ন। তবে সাহসই তো বলবে, শিবা এক পায়ের হাতে পরাজয়ই কাম।

পণ্ডিতকে চুপ করে বসে থাকতে দেখে সুরেন্দ্রনাথ একটু চিন্তিত হয়ে বলেন, আপনি আমায় কিছু বলবেন না কি?

পণ্ডিত ক্ষুণ্ণ স্বরে বলেছিলেন, আপনি মার্জনা করবেন, তবে আমাদের এ সমিতি বিনা বাক্যে—গ্রামের যারা ছোট বড়দের, তো আমরা অনেকে আছেন—

সুরেন্দ্রনাথ তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, গ্রামের মানুষ কী তা আমি ভাল জানি। সে কথা আপনার ভেবে আমি ভার নিই। আপনার আপত্তিটা কোথায়? পাঁচ ছিদে ভাল লাগে-তাই মাঝি আপনাকে বলেছিলাম বিচারে, এক বস্তা ধান, গরুর জোড়, সাদরো, ধুতি এবং নগদ একটি টাকা।

পণ্ডিত মৃদু হেসে বলেছিলেন, তাহলে দেখছি, উপরন্তু আমার সেই এ কাজে আপনার কোনই অসুবিধা হবে না—

সুরেন্দ্রনাথ হাসের পাতটা হাতে তুলে নিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বলেছিলেন, সে কথা আলোচনা করবার তো আপনাকে ডাকি নি ন্যায়রত্ন বলাই। আপনার আপত্তিটা কোথায় সেটা করে বলবেন কি?

পণ্ডিত ধীর মৃদুকণ্ঠে বলেছিলেন, বিধাতাবশে আমি কারো নয়, আপনি তা জানেন; কিন্তু অসদুপায়ে কিছু হয়ে এবং অসদুপায়ে কথাই বা আমাকে বলতে যাবা কারণ কৈন?

ভোলানাথের দেওয়ানীর যে কটি প্রাণী সে ঘরে উপস্থিত ছিলেন, তারা স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন ব্রাহ্মণের এই অসম সাহসিকতার ধৃষ্টতায়। সুরেন্দ্রনাথ চক্ষু উঁচুতে গ্রামে না চেনে কে? কত লোককে ছিটে মাটি থেকে উচ্ছেদ করেছেন তিনি তার হিসাব তো অজানা থাকার কথা নয় স্তম্ভিত পণ্ডিতের। তাঁর একটিমাত্র মুখের কথায় ভদ্রেশ সর্বায় ভোটা গ্রাম উচ্ছিন্নে যেতে পারে—উঁচুকর্তে কে না জানে।

সুরেন্দ্রনাথ পাশীয়ান্ত গলায়াকরণ করে বলেন, না আমি আপনার বৈশিষ্ট্যটা জানতে চাই।

—বৈশিষ্ট্য! বৈশিষ্ট্য কিসের? আমি তো অপরাধ কিছু করি নাই যে তার বৈশিষ্ট্য দেব।

—অপরাধ করেছেন কি কখন কি সে বিচার করব আমি। আপনি কেন অযথা-অকারণে হতে অসদুপায়ে কাজটা করলেন তাই বলতে আমাকে বলুন।

প্রশান্ত পণ্ডিত বলেছিলেন, কারণ প্রকাশ একাধিক বার করা। তার কিছুর একটি হচ্ছে এই যে ভগবানদেয় নিষ্ঠুরতার আকৃষ্টতাই ক্ষুণ্ণ নি। এখনও সে মুখোশ খুলে উচ্চারণ করতে পারে না তার সাম্প্রত পদে আপনি কেন্দ্রমোহ ঘটা গ্রহণ করেন নাই; ফলে গ্রামের বর্তমানে তার সেকে উচ্চারণ উঁচাই অসম্ভব।

পণ্ডিতের ক্ষমায় স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন সুরেন্দ্রনাথ, ভুলেছিলেন—এ ন্যায়রত্ন ক্ষুব্ধকণ্ঠ শ্রী পণ্ডিতমশাই। বামুনের ছেলে গায়ত্রী জপ করতে পারে না; তা বলছেন আপনি?

—আজ্ঞে না, কারণ 'বামুনের ছেলের' মেনে-থাকার মনটা সৃষ্টি হয় নাই, ঈশ্বরই বহুজনের অধিকারচ্যুতে। বামুনের ছেলে গায়ত্রী জপ করতে পারে না; তা বলছেন আপনি?

—আজ্ঞে না, কারণ 'বামুনের ছেলের' মেনে-থাকার মনটা সৃষ্টি হয় নাই, ঈশ্বরই বহুজনের অধিকারচ্যুতে। বামুনের ছেলে গায়ত্রী জপ করতে পারে না; তা বলছেন আপনি?

সুরেন্দ্রনাথ গর্জন করে উঠেছিলেন, আপনার খুব তেজ হয়েছে দেখছি। আপনার মত পণ্ডিতজনেরা থাকলেই কি করে সমাজটা উচ্ছন্নে যায় আমি জানি।

প্রশান্ত পণ্ডিত স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। ধীর সংযতকণ্ঠে বলেছিলেন, আপনার উচ্চারণও বিশুদ্ধ নয়, শব্দটা 'পণ্ডিতজনেরা', পণ্ডিতমশাই নয়।

আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন সুরেন্দ্রনাথ। হাঁক দিয়ে উঠেছিলেন—মহেশ!

লাঠিয়াল মহেশ ঘোষ ছোটখাটো লাঠিখানা হাতে দরজার পাশেই এসে দাঁড়িয়ে ছিল সেলাম দিয়ে দাঁড়ায়। বাইশ বছরের উদ্ধত জোয়ান।

নবা মৌলিকও তার অনুচরদের বলিষ্ঠ দেহখানি নিয়ে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ান। আত্মসম্মান রক্ষা করবার মত বল তখনি তাঁর বাহুতে ছিল। ঐ সুবর্ণ লাঠিয়াল মহেশকে পরাজিত করবার মত দৈহিক ক্ষমতা অবশ্য ছিল না নিরস্ত্র পণ্ডিতের; কিন্তু এটুকু আত্মবিশ্বাস তাঁর ছিল যে ঐ লোকটা তাঁর গায়েই হাত দিতে পারে—অন্যে নয়।

সুরেন্দ্রনাথ কোন হুকুম জারি করবার আগেই মোসাহেব দেওয়ানীর একজন বলে ওঠে, কর্তা মহাশয়ের অনুমতি ব্যতীত কিছু করবেন না—তাঁরা বাকদিন।

সুরেন্দ্রনাথ সম্বিত ফিরে পান।

দরজার দিকে তর্জনী সংকেত করে পণ্ডিতমশাইকে শুধু জানান, বেরিয়ে যান।

প্রশান্ত পণ্ডিত বিনা বাক্যব্যয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন ঘর ছেড়ে। মাথা সোজা রেখেই। শুধু ঐ ঘর নয়, পঞ্চায়েতের চত্বর ছেড়ে, গ্রাম ছেড়েও চলে গেছে ঐরাবত ব্রাহ্মণদের অহংকার; কিন্তু মাথা সোজা রেখেই এবারও গ্রাম ছেড়ে ছিলেন। তখন সকলের শুদ্ধ উপনয়নের দিন যখন সুদূর ভূখণ্ড থেকে গ্রামে নানান রোগের মালগু আসছিল তখন একজন, একজন পণ্ডিত চলেছিলেন বিপরীত দিকে গ্রাম কলকাতার দিকে।

সে আজ পনের বছর আগেকার কথা।

আপনি নিরোধিলেন কালাজ্বরের এই এবং-মরা থাকবার ভয়ে। এলো ধন্বন্তরি। গ্রাম থেকে এলোছিলেন সামান্য কয়েকটি তৈজস, কিছু বস্ত্র এবং ধর্মগ্রন্থ পিতৃ সঙ্গে নিয়ে। এখানেও সর্বনাশ প্রকৃতির আয়োজন। বাধা জুটেছে নিরোধিলেন। কাজের একটা সুযোগ। চেতলার ভাড়াবাড়ির বাসা নিজের জন্য ভরে গেছেনা যখন নিজের আত্মাদেই জীবন থেকে ভরে সর্বস্বে পনেরটি বছর।

কিন্তু কেনজন্যই কেন শেষ হল না প্রশান্ত পণ্ডিতের ইতিকথা? একা এসে-ছিলেন একদিন এই দুনিয়ায়, সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে একাই আবার চলে যাবেন এই দুনিয়া ছেড়ে। সেই তো মানুষের নিয়তি। তাহলে, কেন ওভাবে নিজেকে চাঁচরে ফেললেন সংসারের জালে! কেন ঘর ভেঙে আনলেন দোসরকে? সাতটি বছরে ঐ মেয়েটি, ঐ পতিতা যে এসে সব ওলটপালট করে দিয়ে গেল। সে নিশ্চিন্ত নির্ভরতার কথা, সে সহজ সহানুভূতির কথা ভাবতেই ভুলে নি কখনও ওকেই যে, অত্যন্ত হয়ে পড়লেনা তখনের কথা আর চিন্তা করতে হয় না, সময়ে আহার উপস্থিত হত সময়ে, ঘর-দোর সব সময়েই, ঝকঝক তকতক করত। পরিচ্ছন্নতাকে ভালবাসতেন, কিন্তু আর সিনেমে যে নানিকর পরিশ্রমে ছিল পরিবারিবাহ প্রবিনে সেটা সম্পূর্ণরূপে বিধা সাধি করত—পতিতা তাঁকে সে সমস্যা থেকে মুক্তি দিয়েছিল। বিধা বাদায় তিনি শাস্ত্রালোচনাই করতেন; সংসার কিভাবে চলত কখনই জানতেন না। কিন্তু সাত বছরে পাঁচজনের একক জীবনের অভ্যাসটাকে বিলুপ্ত করে দিয়ে, হঠাৎ পতিতা একদিন পালালো। পতিতা অকূল না। পতিতা থাকে না। সংসারও তাই নিয়ম। আবাহন আরাধন-বিসর্জন। এই তো পতিতার নিয়তি, সুখের পতিতার। তাঁর জীবনের পতিতাকেও একদিন আবাহন করে এনে-ছিলেন এই ঘাসরায় হাওয়া একেবারের সংসারে; সুখের সে সেরোছিল তিনা অ সেই বলতে পরিত; তারপর আর তাকে চিরদিনের মত বিসর্জন দিয়ি এলেন আমি গাঙ্গার।

বিসর্জন?

কিন্তু বিসর্জনের ব্যাখ্যাতিগত এর তো তা কৃত্য বি-পূর্বক সৃজ ধাতু অনট্। ফলন-জ্ঞানে বিশেষভাবে ত্যাগ্রহণ। সুখের অন্ত যখন সুখের পতিতার নিয়তন ঘটি তখন বস্তুতঃ তিনি পর বছরের ছিল। সেখ

গভীর করুণা। আসামী কলেজের পরিচালনার মধ্যবর্তী পরিচালককে একলে নিক্ষেপ করার ব্যাপারে তলেই বিদ্যালয়ের, তাতেও 'সত্য' প্রকাশও তাই 'পরমেশ্বরবর্ণাই চ'।

আর আমি গলার আর কোমর ছলে তিনি কি ভেমনিভাবে পরিচালা বিদ্যালয়ে দিয়েছেন? পরমেশ্বরবর্ণাই চ? আচ্ছা সেই অবিনশ্বর? আর এই আমো অন্ধকারে কি, আমার এসে দাঁড়াতে পারে না তাঁর জ্ঞানদ-পরিচালা? তিনি তাহলে তাকি 'একবার বিশ্বাস' করতেন—

কিন্তু কী আর হত তাতে? কত রাতই তো সে পড়েনে অন্ধকারে। অন্ধ হেসে এড়িয়ে গিয়ে পরিচালা পরমেশ্বর পাঁচ সাত দিন ঘর করেও বুঝতে পারেন নি পরিচালা ওকে পেয়ে সুখী হয়েছিল কিনা। পরিচালা তার চেয়ে অনেক বড়ের ছোট। তার যখন ভরা যৌবন তখন পরমেশ্বর ভট্টাচার্যের শরীরে লেখেছে পৌঢ়ত্বের অস্তরাগমান আলিনা। কতবার কত ভাবে পরমেশ্বর দেখ করেছেন, বুকির মাকে পরিচালাই হেসে এড়িয়ে গেছে, বলেছে—আপনাকে বললে তো প্রত্যয় বিশ্বাস করেন না, মামকে নিয়ে বলতে চান কেন!

হাঁ, বুকির মা তাঁকে চিরকাল 'আপনি' বলে এসেছে। সাত বছরে নৈকট্যের অভাব হয় নি। সুখ দুঃখের অনেক গোপন কথা হয়েছে দুজনের। পরিচালের অন্তরালকে সে অনেক বারই করেছে, রাত্ত স্বপ্নে পরিষ্কার করে তুলেছে। কিন্তু ঐ সেই সম্বোধন বিনেয়ে 'আপনি' আর কোনদিন 'তুমি'তে পরিণত হয় নি।

অন্ধ বিছানায় উপবিষ্ট কলেজ ব্যাগে বাইরে পার্শ্ব বসলাচ্ছে। পরিচালের মনে পড়ল এ সময় বুকির মা ওকে একবার ডিমি করিতে আনত। এক্সেসারে পরমেশ্বরবর্ণাই ঘরে পড়ার পর পরিচালকে ঘরে করিয়ে দিত। আপনি এখন একবার বুকিকে বাইরে নিয়ে যান, নাহলে বিছানা নষ্ট করবে।

আর আর বুকির মা সে কথা মনে করিয়ে দেয় না। কেবারে ছোট বিছানাটা পাতা থাকত সেটা কেনা পড়ে নেই। কখনটা অবশ্য পাওয়া যায়। পরিচালের মাসে তার বাবলিল মাসের উপরে নিজে বাবলিল সরিয়ে নিয়েছিলেন। কখনটা পড়েই ছিল, এখনও পড়ে আছে। কিন্তু মনে করিয়ে না দিলেও রাত্তীর পরিচালা মনে করে নিলেন। রাত সরিয়ে নিলেন। থাক বুকার্য, কি জানি যদি তিনি করতে গিয়ে ঘুম ভেঙে যায় ওর? যদি পরমেশ্বর করে, মা কোথায়? কী জবাব তিনি? যদি বলে, মিথ্যে পরমেশ্বর? কী ভেবে ফেলেন? ঘরে কোথায় কি আছে কিছুই তো জানেন না।

বাইরে ছোটের রাস্তায় গাড়ির আনাগোনা এখনও চলেছে। তারই আলো ছেলেটা ঘরে ঢুকেছে জানালা দিয়ে। জানালার পাল্লাটা অনেক দিন ভেঙে গেছে। বাস্তি-ওয়ালা মেরামত করে দেয় নি। পরিচালা একটা ছিঁড়া শাড়ির টুকরা দিয়ে পর্দা করে দিয়েছিল। আর কিছু না, তাতে ঘরটা আলা কিছুটা কম হয়েছে তাতে। পরিচালা হাত দিয়ে পর্দাটা সরিয়ে দেখে, আরও কিছুটা আলো ঢোকে ঘরে। পরিচালা কলেজটার উপর, ঘড়ির বাসিকের ভিতর, চৌকিটার নিচে টিনের কৌটাগুলোর ভিতর হাত চালিয়ে চালিয়ে ঘুরিয়ে নিলেন কিছুক্ষণ। তারপর কিছুতেই যেখানে হল—এ সব স্থানে বুকির মা কোন বাস্তুদ্রব্য লুকিয়ে রাখবার সুযোগই পেয়েছিল না কি? আর পরে পরমেশ্বর কিন্তু সে তো আসার সুযোগই ঐ বিছানাটায়। আবার তিনিস কিছুই নেই বলে বুকির মা উঠে আসে যেতে চায় তাহলে বিপদে পড়তে হবে। আচ্ছা ও বেলা বুকির মা কী খেয়েছিল? আজো কিছু খেয়েছিল কি? মনে পড়ল না। তিনি নিয়ে কিছু খান নি। খাওয়ার কথা মনেও হয় নি, সুযোগও হয় নি। মাসে চার পাঁচ দিন তাঁকে এমনিতেই উপবাস করতে হয়। উপবাসে তাঁর কষ্ট হয় না, ওটা সহ্য হয়ে গেছে। বেলা নটা বাজিতে অস্থির নিশ্বাস পড়েছিল বুকির মায়ের। তারপর বাকি দিনটা কোথা দিয়ে কেটে গেছে টেরও পান নি। স্কুলে গিয়ে যখন কিলে হয়তো হাতের অক্ষর হত না, ব্লাকবোর্ড মনাইয়াও 'হয়তো কেউ কেউ আসতেন, কিন্তু উপন্যাস করে সাহসা চাওয়াটা তাঁর ধাতে নেই। নিজেই বাটিটা কিনে এনেছিলেন। না ডাকতেও শয়নকক্ষটা যোগাড় হয়ে গেল —ঐ নাকি তাদের ধারণা। সমস্যা অফিস-টাইমা পরিবেশনীরা আর বাড়িয়ে দেখতে নিতে আসতেন। আর অন্ধ, অফিস-টাইম বলে মনে, পণ্ডিত মানেন, তাঁকে বিপদে আপদে কেউ কোনদিন সাহায্য করতে আসে নি, আসবে না। পরিচিতিবর্গীয়ের সঙ্গে তাঁর খুব একটা সদ্ভাব নেই, কথা-বিবাদও নেই অবশ্য ওদের কারে তিনি তো আর পরমেশ্বর ভট্টাচার্য নন, সাধারণ পণ্ডিত। তা অতএব রাত্তার অন্ধেও লোকে ভাইনি বলে, পরমেশ্বর পণ্ডিত যে পরমেশ্বর পণ্ডিত হয়ে থাকবে, এ আর বিচিত্র কি! সেই জন্যই আর তের রাত চৌদ্দ দিন রোজগেরের মতো পরিচালকে কোন পরিচিতিবর্গীয়ের ডাকে ডাকার বিদ্যি করতে হয় নি—সে তেমন আছে, ডাক করে আছে কিনা, কোন কষ্ট হচ্ছে কিনা। কোন পরিচিতিবর্গীয়ই পণ্ডিতকে ছেড়ে পড়িবন করে নি, আর আপনার স্ত্রী কেমন আছেন। একবার রাতবিরাতেই মনে মনে করছে নিতে আসতো খুলিটা ভাল কিনা জানতে, অসুখ করে বেশী হলে পরিচালা মশাইও বাইরে যিত।

পরিচিতিবর্গীয় ঘড়ির দিকটের এক দিন থেকে ঘা ঘা করে রাত এগারোটা বাজল। এই ছোলার কলকাতা শহরের এই এক বাহাদুরি। কলকাতা শহরের এই এক বাহাদুরি। ধনী ও দরিদ্র পাশাপাশি বাস করতেও পারা যায়।

গলির মধ্যে মদের দুকান বিকালের কোলাহল উঠেছে।

দ্বিতল বাড়ির আর এক ঘরে বেঁচেও বাস করছিল। রাত, এগারোটার ছেলে উঠল চাতীর সমীত, অনাসক্ত অধিব্যক্ত—

চাতীর সমীতের সুরকে ছাপিয়ে একটা মাতাল কণ্ঠে যেন অধিয়া আবার গালাগাল দিতে দিতে গলির ঐ পাশের ছেলে ও পাশের মধ্যে গেল।

পরিচালের মনে পড়ে গেল আবি গলার মধ্যে আনন্দময় কণ্ঠস্বরটিকে।

আকাশ বিষি পাল করে কলকাতা শহর দিব হয়ে গেছে।

পরিচালা উঠলেন। কলসী থেকে জল গড়িয়ে মাথেন বলে। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও মাটিটাকে উপরার করতে পারলেন না। মাত্রা আলোর তাক থেকে একটা কাঁসার গ্লাসবাটি নিয়ে এগিয়ে আসেন কলসীটার কাছে। কুড়োগাই বলতে হবে, কলসীতে এক ফোঁটা জল নেই। মতোর পরে অন্ধটি জলটা খেয়েছিল, আর জল আনবার কথা তার মনে নেই। তার দোষ নেই। কলসীটা খালি করাই বাঞ্ছিত ছিল তার—বুকের পরিচালনের, মার। নতুন করে জলের মাসটা আবার মতোর মত, জীবনের। সে দুটি পরমান্ত পরিচালের। হোগে তো সেই অন্ধকে। তা কিনুক, উপবাস অভ্যাস আছে পরিচালের, আবার অন্ধকার পাশে পরিচালের, আবার অন্ধকার পাশে পরিচালের তিনি।

কিন্তু, হায় অন্ধ, বড়ই উৎসুক হয়েছে।

হঠাৎ মনে হল ছাদের দরজায় কে যেন খুব মৃদু টোকা দিচ্ছে। কাঁপ কেঁপে ওঠে বুকের মধ্যে সে কি এসেছে? পুনরা-পুনরায় চু? উঠে বসেন পরিচালা। না, ভুল তাঁর হয় নি, আবার কে যেন টোকা দিল মৃদু কাঁপা কাঁপা হাতের উপর। খালিপেনে নিয়ে দেশলাইটা আছে। হাত বাড়িয়ে সেটা নিতে গিয়েও হাতটা টেনে নেন। নাঃ থাক। আলো জ্বালিয়ে নয় সত্যই সে যদি এসে থাকে তবে এই আলো-আধারিতেই তার মুখো-মুখি হবেন। সহজ আলো হয়তো সে সহ্য করতে পারবে না। না, ভয় তিনি পান নি একটুও। বুকির মাকে তার পাওয়ার কথা মনেও হয় নি কখনও। সন্তর্পণে উঠে এসে দোরের খড়কা খুলে, আলোটা নিবিয়ে দিলেন।

দরজা খুলতে চুপিসারে ঘরে ঢুকলেন ভাতুপিসী।

—এত রাতে পিসি তুমি!

—চুপ, কথা বলনি! সন্তর্পণে এই সাবধান করিয়ে।

—সন্তু? কে তোমার সন্তু!

—কে আবার? যে মুটো হতভাগাকে দশ মাস গুমে রেখেছিলাম। আজ যে সে জাগী তাদের অপদার্থ বাপটাকে গলায় করছে।

—আর পিসি! কী ভয়ানক তারা

তোমার! নিজের পুত্র পুত্রবধূকে—

—থাম দিকি তুই! ভাষা শেখাস্ তোর পোড়ারমুখো ছাত্তরদের! এই নে, এই দুটো রাখ। খুকি রাতে কিছু খায় নি। রাত-বিরেতে যদি উঠে খেতে চায়—

—কি ওগুলো?

কাত্যায়নী জবাব দিল না। পণ্ডিতের জ্ঞান হাতটা টেনে নিয়ে তাতে গুঁজে দেন একটা পাকা কলা আর কাগজের ঠোঙায় খান কতক জিলিপি।

—এ তুমি কোথায় পেলে পিসি?

অন্ধকারের মধ্যেও মাড়ি-সর্বস্ব হাসি ফুটে ওঠে দন্তহীনার মুখে। বলে, বলি বটে শত্তুর, তবু প্যাপ্‌লোটা আমাকে এখনও ভক্তি ছেদ্দা করে। কাল একাদশী তো তাই বউকে লুকিয়ে আমাকে দিয়ে গেছল মাঝরাতে। আমি খুকির জন্য সরিয়ে রেখে-ছিলুম।

পণ্ডিতের চোখে জল এসে যায়। গোপাল আর নেপাল বুড়ির দুই উপযুক্ত পুত্র। কিন্তু সংসারে দুই দজ্জাল বধূর সামনে তারা কাঁটা হয়ে থাকে। দুই বধূতেও নিরন্তর চুলোচুলি-মারামারি-ঝগড়া-বিবাদ লেগেই আছে; প্রতি বিষয়েই দুজনের ভিন্ন মত। শুধু একটি বিষয়ে তারা একমত—এই বিধবা বুড়ি যে এসে ওদের সংসারে অন্ন ধ্বংস করছে এটাতে দুজনেরই ঘোরতর আপত্তি। বুড়ির ছোট ছেলে নেপাল তাই বধূদের দৃষ্টি এড়িয়ে একাদশীর আগের রাত্রে বিধবা মায়ের জন্য একটি বাঁচকেলা আর এক ঠোঙা জিলিপি এনে দিয়েছে মায়ের কাছে। আর সেই খাবারটুকু কাত্যায়নী লুকিয়ে নিয়ে এসেছে খুকির জন্য, এই মধ্য রাত্রে।

পণ্ডিতকে কোন কথা বলার অবকাশ না দিয়ে কাত্যায়নী খুকিকে উঠিয়ে নিয়ে বাইরে চলে যায়।

পণ্ডিত কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। জ্ঞানতঃ তিনি কারও কাছে প্রতি গ্রহে হাত পেতে নেন নি। সুরেন্দ্র-নাথের উপযাচক হয়ে দিতে আসা পাঁচ বিঘে ব্রহ্মোত্তর প্রত্যাখ্যান করেছিলেন বলেই ভিটে মাটি থেকে উচ্ছেদ হয়েছিলেন এক দিন। তবু আজ এই আসন্ন একাদশীর পূর্ব রাত্রে ঐ বিধবা বুড়ির স্নেহের দানটা প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না।

যা ভেবেছিলেন, ঘুম ভেঙে গেল খুকুর; কিন্তু ভয় পাওয়ার কিছু নেই। কাত্যায়নী ওকে খাটে বসিয়েই কলা আর জিলাপি খাওয়াল। কলসিটা নেড়ে তাতে এক বিন্দু জল নেই দেখে গজ গজ করে কাকে যেন গাল পাড়তে থাকে। পণ্ডিত লজ্জিত হন। ত্রুটিটা তাঁরই—কন্যার জন্য পানীয় জল সংগ্রহ করে রাখা উচিত ছিল তাঁর; কিন্তু একটু কান করতেই শোনেন কাত্যায়নী গালাগাল দিচ্ছে তাঁকে নয়, তাঁর স্বর্গগতা স্ত্রীকে : এমন ভ্যাংভেঙ্গিয়ে বড় যে আগ বাড়িয়ে সঙ্গে গেলি তুই, একবার আক্কেল হল না এই পোড়ারমুখো মিন্‌সের! খাবার জলটা কে ভরে দেয়।

খুকুকে খাইয়ে, জল খাইয়ে মুখ মুছিয়ে আবার তাকে বিছানায় শুইয়ে দেয়, : শো এবার, বলে বুড়ি বিদায় নিল: ঝাঁপের দরজাটা বন্ধ করে পণ্ডিতও শুয়ে পড়েন : বাসুদেব! তুমিই সত্য!

কিন্তু ঘুম ভেঙে গেছে খুকুর। অবোধ দুটি চোখের দৃষ্টি মেলে সে চারিদিকে একবার তাকিয়ে দেখে। মায়ের শূন্য বিছানাটার দিকে তাকিয়ে বলে—মা কোথায়?

পণ্ডিতের গলায় কি যেন একটা আটকে যায়।

—বল না বাবা, মা কোথায়?

—তোমার মা স্বর্গে গেছেন মা-মণি!

—সঙ্গ কোথায় বাবা?

পণ্ডিত জানালার ফাঁক দিয়ে উঁকি

খুকু অনেকক্ষণ আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে জ্বল জ্বল চোখে

মারা ঐ একমুঠো আকাশের দিকে শীর্ণ তর্জনীটা তুলে বলেন, ঐখানে।

খুকু অনেকক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থাকে। আকাশে জ্বল-জ্বল করে জ্বলছে একটা নক্ষত্র। একদৃষ্টে সেটার দিকে তাকিয়ে থাকে খুকু, তার জ্বলজ্বলে চোখে। তারপর বাপের দিকে ফিরে বলে, আবার কবে আসবে মা?

বৃদ্ধ একটু ইতস্ততঃ করেন। মিথ্যা কেমন করে বলেন? শেষে বলেন, তিনি তো এখানেই আছেন মা-মণি। আমরা তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না শুধু!

খুকু বলে : যাঃ! মার যে অসুখ! মা কি এখন লুকোচুরি খেলতে পারে?

পণ্ডিত চিন্তা করে দেখেন, এ-অবোধ শিশুকে ঐ দার্শনিক ব্যাখ্যার শান্ত করা যাবে না। ওর কাছে অমৃতভাষণে অন্যায় নেই কিছু। পরিণত বয়স্ক মানুষ এবং অবোধ শিশুর কাছে সত্যের সংজ্ঞা অপরিবর্তনশীল নয়। সত্যধর্ম এত স্থূল নয় যে, জগতের তাবৎ উপকথাকে সে অস্বী-কার করবে। শিশুর মনোজগতে যে সাতরঙা ইন্দ্রধনুটা রূপে-রঙে তার মন ভোলায় সেটিকে কালিমালিপ্ত করার কোন ইচ্ছা নেই সত্যধর্মের। পণ্ডিত বলেন, তোমার মা স্বর্গের দেবতাদের কাছে গেছেন মা-মণি। আবার একদিন তোমার কাছে ফিরে আস-বেন। তুমি লক্ষ্মী হয়ে থাকলে, আমার কথা শুনলে, খু-ব তাড়াতাড়ি ফিরে আস-বেন তিনি। তুমি লক্ষ্মী হয়ে থাকবে তো?

খুকু একগাল হেসে বললে—থাকব।

—এবার তাহলে চোখ বন্ধ কর।

—তুমি গান কর।

চমকে ওঠেন পণ্ডিত। গান? গান করবেন তিনি! প্রশান্ত পণ্ডিত!

—কই গান কর, কিসের মাসি, কিসের পিসি, গান কর....

উপায়ান্তরবিহীন হয়ে বৃদ্ধ নৈয়ায়িক তাঁর কর্কশকণ্ঠে একবার শেষ চেষ্টা করেন : 'কিসির মাসি, কিসের পিসি কিসের বৃন্দা-বন! এতদিনে জানলেন মা বড় ধন!' মুখ গুঁজে ঘুমিয়ে পড়ে।

না খুকু জানল না, এতদিনে পণ্ডিতই এটা মর্মে মর্মে জানলেন।

পণ্ডিতও ইষ্টনাম স্মরণ করে শুয়ে পড়েছিলেন হঠাৎ হাতে এক খণ্ড কাগজ লাগল। আটা আটা। সেই জিলাপির ঠোঙাটা। কাত্যায়নী খুকিকে খাটে বসিয়েই জিলাপিটা খাইয়েছে। হাতটা ধুয়ে ফেলতে উঠতে হল আবার। ঠোঙাটা জানালা দিয়ে ফেলে দিতে গিয়ে গ্যাসের আলোয় হঠাৎ নজরে পড়ল সেটা 'স্তবকুসুমাঞ্জলির' একটা ছেঁড়া পাতা। সের দরে কেউ হয়তো বিক্রয় করে দিয়েছিল পুরানো কাগজওয়ালাকে। তা থেকে ঠোঙা হয়েছে; আজ জিলাপি বেষ্টিত হয়ে ফিরে এসেছে পণ্ডিতের ঘরে। কৌতূহলী হয়ে মেলে ধরেন গ্যাসের

[illegible] আলোয় আবছা পড়া যায়। ফাঁক-[illegible] বন্ধ সে জানালাটার ভাঙা [illegible] দেখতে পেলেন, না—কিন্তু, পাতিটা যে তার কণ্ঠস্বর [illegible]

কেমন যেন বিহ্বল হয়ে পড়েন নাথ [illegible]। মনে হল ঐ মন্ত্রমন্ত্রের আলোড়ন। [illegible] রাত্রিকে এই ভোরটা তুলে এঁদেলেন বটে, কিন্তু বিনাতের এই ভোর মুহূর্তে তাঁর ভাঙা [illegible] গেলেন। তারতনিষ্ঠাতার বন্ধনী [illegible] তিনি হাতড়ের অন্ধকারীয় আলোয়ালে ডুবে যেতে শুনেছেন, গভীর পঙ্কিল জলকে পুঞ্জিভূতবায়ুর বিস্তার দূষিত হতে দেখেছেন, পাতিব্রত্যের নির্লিপ্ত উদাসীনতা, এবং পুরুষাধারীদের মাতলামোতে ঘৃণায় বিঁধিয়ে উঠেছিল; কিন্তু এই তো জীবন নয়! এখানে নেপাল তার বউকে লুকিয়ে বিধবা মায়ের চোরা চোঁয়ার করে মাংস রস আহরণ করে খায়ে, এও তো সত্য। আবার সেই চোঁয়ার চড়ানো মাংসে রস সেই বিধবা [illegible] পাতিব্রত্যের মা-হারা মেয়ের চোখ লুকিয়ে নিয়ে আসে তাও তো অসত্য নয়। তাই বিনাতের ঐ কথাটা তিনি পাণ্ডিতকে শুনিয়েছেন এই 'মধুলক্ষ্যে'।

ঘুকুতকর কপালে চৌকিয়ে নারায়ণ উচ্চারণ করেন সেই মন্ত্রটিকেই, বিনাতের শেষ পরমশিবায়ন। মধুরাতা ভঙ্গিতে, ঘুকু অর্চিত শিবঃ মাঙ্গল্য সংস্তবমস্তু।

নিস্তব্ধতা রাত্রি নেই। সব ঘুমে [illegible] তখনও জাগে; পাণ্ডিতের সেই মধুমাখা ঘুমপাড়ানীও শেষ হল। ঘুমন্ত পূর্ব-আকাশে ফুটে উঠল সোনার স্বাক্ষর—, বালক-সূর্যের আলোক বন্যায় ভেসে গেল নিশাচরাচরী। এমন যে সর্বশক্তিমান হিমাদ্রি-শৃঙ্গ সূর্যদেব তাঁরও ঘুমে থাকার সময় নেই —তাঁকেও পাতিটি মুহূর্তে বিশ্বচরাচর ভাল রেখে এগিয়ে চলতে হয় দক্ষযজ্ঞপালনে, চরৈবেতি মন্ত্রে দীক্ষিত তিনি।

অতি ভোরবেলায় ওঠা পুরোহিত পাণ্ডিতের চিরদিনের অভ্যাস। গত সমস্ত রাত্রিই জাগরণে ছিলেন তিনি, মাঝে মাঝে তন্দ্রাচ্ছন্ন এসেছিল, কিন্তু পাতিব্রত্যের ভাবনায় ঘটিতে সহস্রের পর সহস্র অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে সুরেন্দ্রনাথ: ঘুকুরা কলকাতা থেকে পশ্চিমাকাশে পালান হয়ে গেছে। তবু পাতিব্রত্যের মত অভ্যন্তরীণ, পরা-ভাষা করেছেন পাণ্ডিত। পুরোহিতভাষি সেবে মনোবিজ্ঞানী আর আধিক নেই, তাঁর অপেক্ষা, একমনী চিত্তিতে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন যা, পাতিব্রত্য দুটি মুখের ভাল ভিন্নে, কিন্তু ঘাতাসা, দুজ তো দুটি পলায় কড়ি মেলে ধরত। আর পাতিব্রত্য নেই, তা হলে অন্নবসনের ব্যবস্থা হতে পারে না, ঘুকি কার কি খেয়েছে ঘুমেন না, আর না হয় ঘুমে। ভাতে-ভাত রাঁধতেই হবে।

ঘুকু তখনও ঘুমাচ্ছে। পাণ্ডিত চাদরটা টেনে ওর গায়ে ঢাকা দিলেন। সকালের ঘুকুও সকালে [illegible] ঘুমের পুনঃ, আর তাই এখনও ঘুমাচ্ছে। মনের বিকলতা ভুলে গিয়ে পাণ্ডিত বারান্দার পথে রওনা হলেন। বারান্দা অন্ধকার। বেলা হয়ে যেতে হবে না। [illegible] করেই আছেন, ঘুমো কাজ করা, কিন্তু আলু আর নৈবেদ্য লক্ষ্য কিসে ফিরে আসছেন—হঠাৎ [illegible] হওয়ায় থাম চায়ের লিলি বিস্কুটও কিনে নিয়ে এলেন। ঘুকু তখনও ঘুমাচ্ছে।

অন্তরাত্মা হাতে ভোলা উনুনটা বাঁধরে [illegible] রেখে ফিরেছিলেন। বারান্দার থেকে ফিরে এসে দেখেন বেলা বাড়ে উঠেছে। চিন্তাটে ফিরে বসে সেটাকে ঘরে নিয়ে এলেন। চালটা ধুয়ে আনতে আনতেই ঘুকুর ঘুম ভাঙল। বড় বড় দু-চোখে চারিদিকে তাকিয়ে কি দেখল, তারপর বাবার দিকে তাকিয়ে বলল, বাবা তুমি কাঁদছ কেন?

পাণ্ডিত চোখ মুছে হাসতে মুছে গেল, বলল, কাঁদিনি মা, ঐ উনানের ধুমে চোখে জল এসেছিল।

ঘুকুকে মুখ ধুইয়ে দিয়ে নিয়ে একটু বিব্রত হলেন। নিয়ে তিনি নিজের খাটের নিয়ে আসেন পাতিব্রত্যরা ছেলে থাকতে উঠে কত নিয়ের ভাল ভেঙে নিতেন। সে সুবিধা কলকাতা শহরে নেই, কিন্তু অভ্যাসটা আছে। কিন্তু ঘুকু কিভাবে শীত মানছে? এ সামান্য দায়িত্বের তথাটাও জানা ছিল না তাঁর, সুরেন করেন—তুমি কি পাকেরে মুখ পাঁকালন তব?

ঘুকুর বোধগম্য হয় না 'পাকেরে' সেই চলকাতে চলকাতে মুখটা উঁচু করে বলে—এ্যাঁ?

সুরেনটা আর একটু সহজ ভাষায় পাকেরে করার পর ঘুকু সহসা বলল—তুমি কিছু মনে না বাবা, আমি রোজ উনুন দিয়ে দাঁত মাজি, মাও—

হঠাৎ কি মনে হওয়ায় মাঝপথেই থেমে যায়।

পাণ্ডিত ওর ছোট ডালকে এক ছোট্ট টেনে এক হিমশৈত নৈবেদ্য লবণ রেখে দিলেন। ঘুকু একটু ইতস্তত করে। তার চৌদ্দ বাপের দিকে একবার তাকিয়ে নেয়। [illegible] কোন কথা না বলে নিজেই [illegible] চেষ্টা করে। বাবাকে আর কষ্ট না দিতাইর পাণ্ডিতের অন্তর্ভুক্তিতে ঐ ছোট পাকেরে, পাকিয়ে সে নিয়ে হাতে এত দিন করেনি।

পাঁচ বছরের শিশুও কি বুঝিতে পেরেছে এখন থেকে তাকে আত্মনির্ভর হবার চেষ্টা করতে হবে? কেউ তাকে কিছু বলে নি। নিজেই ঘটিতে করে চলে নিয়ে যাইয়ে যায়। মুখটা ধুয়ে ফিরে আসে।

পাণ্ডিত তার হাতে চারখানি বিস্কুট তুলে দিলেন, খাও মা-মণি।

ঘুকু ঠিক বুঝে ফেলেন মনে মনে,—ঘরে পালাল। আমি কি বিস্কুট খাই? তুমিই সবগুলো খাও।

দ্বিতীয়বার অনুরোধ করতে হল না। ঘুমের বোধকরি ক্ষোভি এখনিতেই ভাতার ছিল। চারখানি বিস্কুটই খেলা-ঘরে বসে।

উনুনে জলটা গরম হয়ে উঠেছে। মায়ের সিংহাসনে যোগমায়া রূপ বসিয়েছেন। স্বপাক রান্নাঘরে একজনে অবশ্য অভ্যস্ত ছিলেন। শেষ বয়স সাতেক অবশ্য অন্যান্যাহীত হয়ে-ছিলেন, একেবারে অভ্যাসটা যায় নি। পাতিব্রত্য মধুন চারদিন তাঁকে স্বপাক খাওয়ার করতে হত। নিশ্চাবান হওয়ার [illegible] ঘুকুকে আর আলু, কেউ এনে ছেড়ে দিলেন জলে, [illegible] চালটাও দিলেন। ঘুকু তার ভাঙা পুতুলের ডালটা চৌকির তলা থেকে টেনে বার করবার উদ্যোগ করছিল, বাবা সাবধানে পাণ্ডিত বলাই : না মা মণি, পরেতাকালে খেলা চলবে না; তুমি এখন পাঠশালে বসবে। বই নিয়ে এস।

এদিকে ছেলেটা বেশ বাধ্য। কিন্তু পাতিব্রত্যের খেলার ডালটা আবার চৌকির তলায় ঠেলে দিয়ে নিয়ে আসে তার পড়ার বই। মুক্তাক্ষরের তর্কালঙ্কারের সেই সনবদ্ধ নীল-ধলাটের 'সেকেন্ড ভাগ'। উনুনের ঘরে বসে ঢাকনা ঘুরাতে ঘুরাতে ছেলেকে পড়াতে থাকেন। সবেমাত্র অক্ষর পরিচয় হচ্ছে ঘুকুর। পাতিব্রত্যের মত এই খোলার আগে ঘুকু বলু হয়ে বসে চোখ বুজে সরস্বতীর স্তবমন্ত্র মুখস্ত বলে যায়। এটা ওকে দিয়ে কণ্ঠস্থ করিয়েছেন। হাতা দিয়ে ডালো-[illegible] যোগমায়া নাড়তে নাড়তে পাণ্ডিত বলেন, 'ত্রিনয়নায়ঃ' নয় মা-মণি, বল 'ত্রিনয়নায়ঃ'— বল : 'মা যে আমার ত্রিনয়না; বীণা পুস্তকধারিণী।

ঘুকুর আপ্রাণ সচেষ্টায় বিদ্যার উচ্চারণ করতে পারাল পরে।

তারপর সুরু হয় : র ও অক্ষর জ্ঞানের খেলা।

ঘুকুকে বাইরে বাইরে এটো সামলে ডাল যোগমায়া মেয়ে রেখে মুখ হাত ধুয়ে নিলেন পাণ্ডিত। এতক্ষণে হঠাৎ খেয়াল হল নিজের কথা। কী আশ্চর্য। সমস্ত সকালটা ও কথা একবারও মনে পড়ে নি। তিনি এখন কি খাবেন? এতক্ষণ তিনি ভাল গ্রহণ করেন না—কিন্তু দুধ, কলা, বাতাসা, মুড়ের ভাল ভিজে কিছুরই তো ব্যবস্থা করেন নি পাতিব্রত্য [illegible] বা একটু, ঘরে চাল ছিল বটে। [illegible] থেকে কি কি আনতে হবে ঘুকুর মাই তা বলে দিত। সবই; তবে ছিল না, তাহলেও মানুষটাকে বাঁচতে বারে বারে বাজারে দৌড় করাচ্ছে না হয়, তাই একটা টাকার [illegible] ফর্দ লিখে হাতে গুঁজে দিত। আজ সে নির্দেশ কিছু না। সকালটা ভাঙিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তার বদলে হয়ে একাধিকবার অন্তরাত্মা পকেটে হাত চালিয়ে সেই ছিকটেখানা খুঁজেছেন—সব-শেষে মনে পড়ে গেছে সে নির্দেশ আর নেই। ঘুকুর কথাই মনে ছিল তাঁর। তাই ওর জন্য বিস্কুট পর্যন্ত নিয়ে এসেছেন:অথচ নিজের কথা কিছুই আনেন নি।

একটু মধু হলে সবচেয়ে ভাল হত মুখে তো পাতিব্রত্যই থাকত বাড়িতে। যা কেউ

নেই না। না পণ্ডিত, না পণ্ডিত-গিন্নী কেউ, খুকুকে ঘর থেকে বেরোতে বহুবার পাকা-বিবাহ-প্রাঙ্গণে অবতরণ করে দুই তিন বছরের, দুধী-ফলে একটা ঘোমটা তাকে বেশ মানাবে বলে দুইটা দিয়ে নেওয়া। ঘুমটিতে দাঁত দিয়ে দেখেন নি, পাড়িয়া নিশ্চয়ই দুধীকে ঘাড়ের দিয়েছে কিন্তু তার বদলে কোন ঘোমটাকে বহাল করেছিল? অনেক ভিতরে করেও কোন ঘোমটা-মুখ-দিয়ে-বাচ্চার এ ছবি মনে জাগল না। হয়তো তিনি ফলে বেরিয়ে ছেলে ঘোমটা খুকুটা দিয়ে যেত।

পণ্ডিতেরবাড়ি আসার মিনিট দশ-পাঁচ পরে দলটা বাহন। সভায় দলটার সকলে একসঙ্গে প্রবেশ করে থাকেই। ছোটো ছেলে দুটি মিনিটও লাগে না, পণ্ডিতের সামনের ঘর লম্বা লম্বা পায়ে। কাল রাত্রে কলকাতার আত্মজনরা চলে গেছেন, তাই বিছানা তখনও আছে। সেই বাসী চাদর একটানে ঝেড়ে একটা দল থেকে ছাড়ানো তুলে নিলেন, তোলা থেকে। দাঁতের আমেজ এখনও আছে। মাথার কোন পরোয়া নেই, দুধি হওয়ার কোন আলস্য নেই, তবু মিঠা অভ্যাসবশে মাথাটা ঢুকে নেন। ঘাড় ছুটি করা। একটি রাস্তার দিকে চকচকীটা ভিতরের উঠানের দিকে যাবার পথ। পণ্ডিত বাইরে যাবার দরজাটা খোলাই থাকল। চুরি যাবার মত সম্পদ অবশ্য তেমন কিছু ঘরে নেই। তবু কাপড় বাঁধার বাসন করটা তো আছে। দু-চারটে কাঁথা-বিছানাও আছে। কিন্তু দুধি দরজা তাই বলে বন্ধ করে রাখা যায় না, অমনি সকলকেই খুকুর খুকুকে বর্ষীয়ান জীবনে বাসন করতে হয়। তেমন অমানুষিক অত্যাচার। দিদি বলেন, যাহার সময় কাছাপিঠকে বলে যাবেন, ভিতর দিকের ঐ দরজাটা খোলা থাকল, একটু নজর রাখতে। ভিতরেই ঐ দরজার উপর শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলার একটি ছবি যেমন বাঁধানো। ও পাশের দেওয়ালে একটি দেওয়াল-পঞ্জিকে নবীচোরা বালগোপালের ছবি। খুকুভিতরে দুটি চিঠিরেই সকাল চালিয়ে বসে অমনুষ্ঠে কী বলেছেচোরন করেন তারপর চলতে গিয়েও ফিরে আসেন খুকুর কাছে। তাকে আবার ভয় করেন, লক্ষ্মী হয়ে থাকবে মা-মণি। [illegible] রাখে। তোমার কাজকর্ম তো সবই নিজেই থাকছে, পরমেশ্বর ওঁর সাহায্য ভিক্ষা করবে।

দুধিবাবুদের কীর্তনের দরজাটা টেনে দিয়ে উঠানে নেমে পড়েন। পাশাপাশি দুটি সাত-বাসা খোলার চালা ঘিরে এই এক চিলতে একখণ্ড উঠান, তার একদিকে দরজা-ঘোরা একটি গোয়ালার, এমবাদি সম্পত্তি সবশুদ্ধ বন্দীবাসীর, স্ত্রী এক পুরুষের। পানীয়-জল আনতে হয় রাস্তা থেকে সেখান থেকেই লাইন পড়া। পণ্ডিত সাদের দাওয়ায় উঠে পড়েন। কাতুপিসি আছ নাকি?

কাত্যায়নী সাড়া দেন না। কাঁসের গ্লাসে থেকে বাসার ঘোমটা টেনে একটি বহু ব্যবহৃত কাঁসার ঘটিসহকার ঘোমটাদের ঘরে বসে: মা সেই সাতসকালে কোথায় বেরিয়েছে?

মা, তা বৌমা, খুকু একলা থাকল। সাড়ে দশটার দিকে বিশ্বম্ভরবাবুর উঠানে ফিরে যেয়ো। একটু দৃষ্টি রেখ! ও গোপাল মেসোমশাইকে দেখছি না যে?

ওরা আজকাল যেইছে।

তা বটে। ছেলে উঠেই দু ভাই বেরিয়ে পড়ি কারখানার কাজে। টালিগঞ্জে ওদের কি-একটা ইলেকট্রিক-জ্বাম তৈরীর কারখানার তারা কাজ করে। নারায়ণ বাড়ির সঙ্গে ওদের সম্পর্ক নেই। সন্ধ্যায় পর কালিঘাট ফিরিয়ে ফিরে আসে দু ভাই। মধ্যরাত্রে উঠতে উঠতে বাড়ি ফেরে। এ কদুটি গোপাল অথবা মেসোমশাই কী কিরকম জানেন না। দুধি বড়ই পরম সমবয়সী। তাদের ঘরকন্নাতেই ঐ বাড়ির বাসিন্দা হলে জনাকুড়ি কলাতে পারে; কিন্তু কেনাটি তার স্বামী সে খবর ঠিক জানেন না।

খুকু আর ঘোমটাকেও দেখছি যে—

ও তি জানি কোথায় গেইছে।

: বাই হোক, খুকু সম্পর্কে একটা ভাবনা। আমি বিদ্যালয়ে যাচ্ছি। একটু দৃষ্টি রেখ মা।

ঘরের ভিতর ঘোমটা মুখেত গোপাল কুধবা মেসোমশাইর স্ত্রীর গ্রাম্যটা নড়ল।

: বাসুদেব। তুমিই সত্য।

দুন্ দুন্ করে এগিয়ে চলেন ছেলেমেয়েদের ধার্মিপণ্ডিত তাঁর কর্মস্থলের দিকে।

সারাটা দিন ঘরে ঘরে খুকুর কথা মনে পড়ছে। অন্যমনস্ক হয়ে যেতেন বারে বারে কাঁচকলের একটি নিশ্চিন্ত মুখে ভেসে উঠছে রাজনগরে। পাড়ার কেউ স্ত্রী-ছিরুদের কাছে সহানুভূতি জানাতে আসে নি; কিন্তু সকলে খবরটা জানাজানি হলো। ফলে অনেকেই এসে পণ্ডিতের সঙ্গে দুটো সুখদুঃখের কথা সংযোজিত... যেতেন। সময়ের কথা গোপালের [illegible] এই ভালোমানুষ হল। ইতিহাসের শিক্ষক মানুষ বাদু জানতে চাইলেন শেষ সময়ে পণ্ডিত-গিন্নীদের কোন কষ্ট হয়েছিল কিনা। পণ্ডিত জানালেন, না, কোন কষ্টদায়কের তাঁর কষ্ট না পড়ার শেষ সময় পর্যন্ত জ্ঞান ছিল তাঁর। একথাও বলেছিলেন স্পষ্টা কর্তৃ মাস্টারমশাই বলেন, ছেলেদের আসলার সময়ে ছেড়ে আসবে বরং, এখানে কেমন করে আসবে তুলবেন এতটুকু, বাচ্চাকে?

আর হেসে পণ্ডিত বলেন, খুকুকে কবে সে জ্ঞানেও কৈছই নাই।

ঘোমটাদেরকে মাঝিতে বড়ই বলোনে জানাতে বলেন, ঘোমটাদের মনি [illegible] যেন না। এইক, নিশ্চয়ই কেমই যা তিনি বললেন এই দুনিয়ায়, আর যদি জানলেনই [illegible] এতদিন ভিতরদীন করলেন কেন?

সে কথার কেউ জবাব দেয় না।

ছেলেমাস্টারমশাই বলেন, আর যা হোক পারতেন—

পণ্ডিত কুণ্ঠিতস্বরে বলেন, কর্মহীন জীবনের পরে অবসান করেই যা কি লাভ [illegible] আর এ যা হবে, অন্যায়ভাবে তো আসতেই হত—

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে ছেলেমাস্টার, চমৎকার কথা।

অন্যমনস্কভাবে সংসারটা দেখে নেন। কী করেই কুলান দিতে গেলেন, ছেলে-মেয়ে একটা পাকা সংসারের, ছাত্র সংখ্যা কমেছে অনেকটা। দিনু ছেলের দুধীমী, লক্ষ্য নেই, যার তার চিন্তামাত্র নেই। মাতৃহীন একটি [illegible] পড়াশুনা কিলোর ও বালকদুটির [illegible] হয়ে গেছে। উঁচু ক্লাসের ছাত্রেরা কিন্তু হয়। একজন কী দুঃখিত বলেছে, আর আজ পড়তে [illegible] যেতে না পারা। আপনিও এতদিন কামাই, আর বরং আসনি, দু-একটা ভাল উপদেশ দিন।

পণ্ডিতমহাশয়ের চোখটা জল-জল করে ওঠে, তবু সেবার গোপন করে বলেন, কিন্তু তোমাদের পাঠ্যসূচীর অধিকাংশ এবার আলোচনা—

ছেলেটির একটি পূর্ব পরিচয় মনে পড়ে যায়, সলজ্জে বলে, আর আর সেসব হয়ে যাবেন না স্যার। আমরা অনুরোধ করেছিলাম। খানিকের মধ্যেই করবেন।

এত দুঃখেও অলক্ষিতে হাসি ফুটে ওঠে পণ্ডিতের মুখে।

এর পিছনে একটি ছোটো ইতিহাস আছে—

পরলোকগত পণ্ডিতের একটা নিয়ম ছিল, পরীক্ষার ফলাফল বার হবার আগে একটি সংস্কৃত পরীক্ষা করে নেওয়ার। তিনি কোন ঔপচারিক করতেন, ছেলেরাও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে করত। এই ব্যাপারটির বাধা করে ছিলেন তিনি তারপর পঠনসূচীতে মনোনিবেশ করতেন ছেলেরা আড়ালে বলত, এও পাকস্থলী পণ্ডিতের একটা জড়ং! একবার পণ্ডিতের উপর ক্ষেপে গিয়ে এটার ছেলেরা বিদ্রোহ করে বসল। এই ব্যাপারেই ছেলেরাও ওসব খুচরো ঢুকে নেবে না। মাইনে দিয়ে ওরা সংস্কৃত [illegible] এসেছে, ঘোড়া-ডাক-সেকে [illegible] কেন ওরা কেটে পড়েছে, তার বাইরে [illegible] এসব 'অং-বং' পড়তে রাজি নয়। [illegible] সঙ্গে মতানৈক্য। ছাত্রদের ছেলেরা যখন ঘোরে ছেলেমাস্টার রঘুনাথবাবুদের কাছে গিয়ে [illegible] করেছিল। ছেলেমাস্টারই আর ছাত্রদের ছেলেদের চেনেন। এখনই হয়তো ছেলে-ছোকরা ভাড়া পড়ে হয়ে যাবে। তাই ঘোমটাদের একবার ছাঁকিয়ে না দিয়ে বললেন, কিন্তু আমরা [illegible] নয়, ছোমটাদের এত অপত্তিই বা কেন?

—এসবের সব মানে [illegible]

...সব ভারতবর্ষ সেকুলার হয়ে যাবে, আপনি ...এসব কথা না বলেন, অন্তত ...ই-তে লিখবে আমরা ধর্মটা রাখব।

প্রমদানন্দবাবু আপাতত যৌক্তিক ...ধর্ম-পণ্ডিত পলাশতরু ভট্টাচার্যকে ডেকে পাঠালেন। পণ্ডিতমশাই এলেন। ইতস্তত বলেন, এই শুনুন ছেলেরা কি বলছে; আপনি ঐ শ্লোকটা বাদ না করলে ওরা ধর্মটা রাখবে।

পণ্ডিত বলেছিলেন, একটু ব্যাকরণের প্রসঙ্গটি রয়েছে। অর্থের বিচ্যুতি ঘটতে পারে। ধর্মটা হতে পারে না 'অধর্মটা' বলুন। তা পাঠ্যবিষয়ের অপরাধ?

একটি মুসোহসী ছেলে পুনরায় তার মুক্তি পেশ করেছিল, ওগুলো হচ্ছে হিন্দুশাস্ত্রের মন্ত্র। ভারতবর্ষ সেকুলার স্টেট, তাদের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। সরকারী সাহায্যে পরিচালিত স্কুলে আপনি যদি হিন্দুধর্ম থেকে শ্লোক শোনান। তবে মুসলমান ছেলেরা কোরানের মন্ত্র শুনতে চাইবে। ক্রিশ্চিয়ানরা বাইবেল থেকে শুনতে চাইবে, বৌদ্ধরা ত্রিপিটক থেকে শুনতে চাইবে—যারা নিয়ে পণ্ডিত বলেছিলেন, অসহযোগ আর বঙ্গভঙ্গের যৌথ আন্দোলনের যে সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন তার নাম ত্রিপিটক, ত্রিপিণ্টক নয়। ত্রিপিণ্টক শব্দের অর্থ তিনটি পিঠে।

—বেশ ভাই হল, তারা ত্রিপিটক থেকে শুনতে চাইবে—

পণ্ডিতমশাই বলেন, উত্তম। তোমরা তো বলয় শ্রেণীর ছাত্র। তোমাদের মধ্যে অ-হিন্দু কয়জন ছাত্র আমার সংস্কৃত পাঠ নিতে চাও?

ছেলেটি জবাব দেয় না।

পণ্ডিতমশাই ছেলেটির শিরদাঁড়ায় তীব্র বাক্যবাণে ছেলেদের উস্কানো করে বলেন, তোমাদের মধ্যে বৌদ্ধ-ক্রিশ্চান-মুসলমান লাগসে কনসুসিয়াস, কিম্বা চার্বাকপন্থী যদি কেউ থাক তো হাত তোল।

ছেলেরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে

পণ্ডিত তখন ক্রমাগামী ছেলেটিকে বলেন, তোমার যুক্তিটা বাস্তব অভিজ্ঞতার পরিপন্থী। আমি জানি, তোমাদের স্কুলেই একটিও অহিন্দু ছাত্র নাই।

কিন্তু কুরুক্ষেত্রে কখনও অভাব হয় না। অন্ত সহপাঠীর ছাত্র গহনে নি ওরা। সঙ্গে সঙ্গে পাশের ছেলেটি বলে উঠেছিল, ওরা তো ক্রিশ্চান-ফ্রিশ্চান তো আমাদের সিলেবাসে নেই। এভাবে পনেরোটি পিরিয়ডে আপনি পাঁচ মিনিট করে সময় নষ্ট করেন। ইন্ডাস্ট্রি আমাদের ব্যাপারে ক্ষতি, অথচ আমাদের বিশ-মিনিট করে নষ্ট হচ্ছে।

পলাশতরু পণ্ডিত বলেছিলেন, তোমার যুক্তিটি কিন্তু অকাট্য।

ছেলেরা সবাই বলল, তাহলে?

প্রমদানন্দবাবুকে ডেকে এনে ছেলেরা বলেছিল, আমার মনে হচ্ছে পড়াশোনার তোমাদের আদৌ আপত্তি নেই, সময়টা নষ্ট হচ্ছে বলেই তোমরা এই পরিবাদ জানাচ্ছ, তাই না?

ওরা বুঝতে পেরে ছেলেটি খুশী হতে বলে, তা তো বটেই। ভাল ভাল উপদেশই তো দেন আপনি; কিন্তু কি করব বলুন। পরীক্ষা তো আমাদের পাশ করতে হবে। তাই ওগুলো বাদ দিতে বলছি—

পণ্ডিত এতক্ষণে প্রমদানন্দবাবুর দিকে ফিরে বলেন, এরা যা বলছে তা যুক্তিসঙ্গত কথা। তার প্রতিবিধান আমি করব। বাড়ুজ্জের ঐ ধর্মঘটা সময়কালে আমি বিনষ্ট করতে চাই না, সে আমি নাচারঃ ধর্মঘট পারিও না। তবে শনিবারের শেষ ক্লাসটা আমিই নিই। আমার পরিবর্তে, অতঃপর পরিত শনিবার আড়াইটার পরিবর্তে তিন ঘটিকায় ছাত্রদের ছুটি দেব আমি। অর্ধ ঘণ্টা কাল বেশী পড়িয়ে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব।

প্রমদানন্দবাবু হেসে বলেন, এ প্রস্তাবে আমার আপত্তি নাই। আপনি এ অর্ধ ঘণ্টাকালের ক্লাস যখন প্রতিবিধেয় পারিশ্রমিক চাইছেন না, আর ছাত্ররাও তাদের দাবী আদায় করিয়ে আরও আধ ঘণ্টা—

কুশিলমান ছেলেটি বুঝে নেয়, কী সর্বনাশ হতে বসেছে! প্রমদানন্দবাবুকে মাঝ পথেই থামিয়ে দিয়ে বলে, না না স্যার। পণ্ডিতমশাই পরোপকারিতা-টিতার কী বলেছেন। পণ্ডিতমশাই যেমনভাবে মানুষ তিনি কোন পাপই করতে পারেন না। না, না, পলাশতরুচিত্তের কথা বলব একমাত্র উপরে ওপর শনিবার আমরা কিছুতেই বেশীক্ষণ থাকব না। তা নিন, পণ্ডিতমশাই পাঠ্যবিষয়ের জন্য কিছু সময় দিন না। আমরা তো ভালোই। আচ্ছা। আমরা আসি স্যার।

সেই বেদনাদায়ক ঘটনার ইতিহাস করেছিলেন পলাশতরু পণ্ডিত।

আর ছেলেটি সেই জন্যই অন্তর্যামী দিনে তাকে থামিয়ে দিয়ে বলেছিল আমি আর সেসব কথা বলবেন না স্যার। আমরা প্রার্থনায় করেছিলাম, আমাদের মার্জনা করবেন।

গুরু পতনের মুহূর্তে আর কি ভাবে তাঁকে সান্ত্বনা জানাতে পারে? কোন সহানুভূতির কথাই এ ক্ষেত্রে শোভন শোনাবে না; ওরা তাই পণ্ডিত মশায়ের কাছে আর কিছু উপদেশ শুনতে চায় আজ, এতেই অনেক শান্ত হবে বুঝের।

পণ্ডিত মুক্তার কথাই বললেন। যম এবং নচিকেতা সংবাদ। অমর কার কাছ থেকে নচিকেতা মৃত্যু-রহস্য জানতে চাইছে। শেষকেও পর শেষকে আউড়ে, অশ্রুর ঝরে, বাঁধা ঝরে মৃত্যু মুহূর্তকেই বিচার বিশ্লেষণ করতে থাকেন। ঘণ্টা কোথা দিয়ে পার হয়ে গেল। মুখে বলে নি, কিন্তু এক ক্লাস ছেলের নিষ্পলক দৃষ্টির আড়ালেই পণ্ডিত শুনছেন সেই পাঠ্যবিষয়ক : প্রবত, যান, ধর্মিত, ক্ষুত্তারয়।

হে ঈশ্বর, তুমি আমাকে করুণা কর, আমাদের গুরুদেবকেও করুণা কর!

ক্লাস থেকে বেরিয়ে এলেন যখন তখন অত্যন্ত দুর্বল লাগছে শরীর। সেই-কাল নিরম্বু উপবাস গেছে, আহারের কথা সারাকাল মনেও পড়ে নি। আজ অবশ্য মনে পড়েছিল, কিন্তু অসময়ে। আজ এই পঞ্চাশ বেলা পর্যন্ত মুখে কিছু পড়ে নি। মনের ভাল থাকতে হয় নি। মাথাটা ঘুরছে। এমন আধঘণ্টাখানে মাঝেমধ্যে আজকাল পড়েই কষ্ট পান। বুঝতে পারেন, বয়সটা বাড়ছে। শরীর আর কিছুর সাক্ষাতের অভ্যাচার বিনা প্রতিবাদে মেনে নিতে রাজি নয়।

চন্দ্রকান্তবাবুর লক্ষ্য হল টিচার্স-রুমের একপ্রান্তে কলাপের রঙ্গ ঘুটো টিপে ধরে একটা হাতলভাঙা চেয়ারে বসে প্রমদান পণ্ডিতমশাই। তাঁর আরও একটি পিরিয়ড ক্লাস নিতে বাকি আছে। শেষ ঘণ্টার চন্দ্রবাবুর ক্লাস ছিল না। তাই খাতাপত্র গুছিয়ে তিনি বাড়ি যাবার উদ্যোগ করছিলেন।

ঠং করে শেষ পিরিয়ডের ঘণ্টা বাজতেই ধোড়া হয়ে উঠে দাঁড়ান পলাশতরুবাবু। চন্দ্রকান্তবাবু চন্দ্রকান্ত এগিয়ে এসে ওঁর না চন্দ্রবাবু, দেহে কোন বিকার নাই, শুধু কি ভাল লাগছে না, পণ্ডিতমশাই?

ম্লান হেসে পলাশতরু পণ্ডিত বলেন, না চন্দ্রবাবু, দেহে কোন বিকার নাই, শুধু মাটির দেহ কিছু চিত্তচাঞ্চল্য বোধ করছি, একাকী আছে কিনা—

—তার মানে? আর কেউ নেই বাড়িতে?

—আছে না, স্যার উপরুক্তই রেখে

—দরজা বন্ধ করে রেখে এসেছেন বাড়ি?

—আজ্ঞে না, স্যার উপরুক্তই রেখে এসেছি।

চন্দ্রবাবু চমকে ওঠেন। বলেন কি! পাড়া-পড়শিদেরও, আরও ফিরবার ওকে রেখে ঘরে তালা দিয়ে আসা উচিত ছিল আপনার। আজকালকার দিনকাল, সমস্ত চুরি হয়ে যেতে পারে যে—

—আমার গরুছাগল আর কি সম্পদ আছে বলুন?

বকে ওঠেন চন্দ্রবাবু, আরে মেয়ে-ছেলেও তো চুরি করে নিয়ে যেতে পারে। পাশেই তো মাতলেদের আড্ডা।

—মা-বাছাকে?—আকাশ থেকে পড়েন পণ্ডিত।

—কেন? ছোট ছেলে চুরি যায় কলকাতা শহরে একথা কখনও শোনেন নি?

পণ্ডিত জবাব দিতে পারেন না। চন্দ্রবাবু বুঝতে পারেন, একথা শোনার পর ঐ সরল মানুষটির পক্ষে ক্লাসে বসা সম্ভব নয়। পণ্ডিতের পিঠে আবার একখানা হাত রেখে বলেন, ঠিক ওভাবে বসে পড়লেন কেন? আসুন, বাড়ি যান, আপনার বন্ধুটা আমিই নিচ্ছি। সেভেন-বি ক্লাস।

পণ্ডিত উদ্ভ্রান্তের মত ব্যাগটা একহাতে নিয়েই চন্দ্রবাবুর মাকে ডাকেন। মেসো থেকে ছাতিটাকেও নিতে ভুলে

নি—চন্দ্রবাবুকে জানানো হো। সুখের কথা। অবশ্য ভয় লম্বা-লম্বা ঐ। ফলে তিনি হৃদ্রোগীর মতো ছটফট করে বাড়ির দিকে।

চন্দ্রবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, সুখের কপালে এখনও অনেক দুঃখ আছে।

অক্ষয়বাবু বলেন, ছেলেদের দোষ কে দিত? মেয়েটা দাঁতাই পাকত। বেয়াদিপ কথা বললে তোর কী করবার ছিল বল একটা বাঁচি বউ হবে আমার?

ক্ষেত্রবাবু বলেন, মুন্সিফেও মাসিক্ত হয় অক্ষয়বাবু ওতো পাকত।

কিন্তু না। পরলোক পণ্ডিত সে কথা মনে করেন না। মতিভ্রম তাঁর হয় নি। মানব চরিত্রে বড়াবিপুর পড়াব অনস্বীকার্য; কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রামকে সবলে রাখার সাধন তাঁর আয়ত্তেরেবা। বলে যি বলেন্দ্রিয়গ্রাম হয়ে পড়া পণ্ডিতাঁতা। তিনি অবশ্য নিজেকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলে কখনো না। সুখের মন উদ্বিগ্ন হয়, দুঃখেও সম্পূর্ণ বিচলিত নন তিনি। কিন্তু তাই বলে পাত্রিহরকে বিয়ে করতে যাওয়ার মূলে কোন 'রীতভ্রম' ছিল না তাঁর। সে সেবেবার মূলে ছিল না ভূতীবিলাসের নির্দেশ। ক্রিয়োবের পথেরেই তিনি যাত্রাপ্রতিবাদী। সংযোজক না সংযোগী ছিল না তাঁর। সেবের-সেবে-তার্ক-ইয়ের স্পর্শে ধন্য হয়ে উঠিবার সুযোগ তিনি পান নি ঠাকুরের আদি পর্বে অবশ্য অধ্যাপন-জ্ঞান-ভাজন। উনি একটি বস্তুতন্ত্রি অভিক্রম করে তিনি এসে উপনীত হয়ে ছিলেন যৌবনের দেবদারুতলে। পরে যেটা তখন তিনি চলে পাবু হাতে পরু করেছে। দেহবর্ষি কিন্তু বড় ঘুরে তখনও। কালি-ঘাটের ঐ একরাত্রির ছুরে কলকাতা বক্স স্বপ্নাত ঢাকনে অজ্ঞান হয়ে গেছেন। একরাত্রি ছিলেন যথাযথ। এক বেলাই অপ-পাক করলেন। সন্ধ্যার পর ফলারের নিমন্ত্রণে ছিল আঁ-ব্যবস্থার আয়োজন। জনে আছে, এই সময় একদিন পিতৃদেবের বাল্যবন্ধু সত্যেনের দিন গাঁতাপাঠের অবসানে ঐকটি মেয়েকে হাঁস আইকে নিয়েছিলেন। 'পতাতি পিতরো হোষাং' ,লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ। অর্থাৎ পুত্রপৌত্রাদি বিনা লুপ্ত পিতৃ-পুরুষরা—নরকে পাতিত হন।

বন্ধুবার এ মেয়েটি পড়েছেন, কিন্তু এভাবে মনে হয় নি। বাল্যিগত বাঁচি-ভাঁতি থেকে মেয়েকে বাচাই করে ছেলেন নি। আজ হঠাৎ কেমন যেন বিচলিত বোধ করেন। গীতা বন্ধ করে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে-ছিলেন। পরপর পুরনোর পিতৃদেব 'গঙ্গাধর ভট্টাচার্য, তর্কবাগীশ এবং মহামহোপাধ্যায় পিতামহ 'সুবর্ণন ভট্টাচার্য তর্ক-পঞ্চাননকে ক্রমান্বয়ে দেখতে পেলেন। তাঁর বিয়ের ব্যাপারে পর এঁদের কি গতি হবে?

সমস্ত দিন ঐ চিন্তাচঞ্চলতা দূরীভূত হয় নি। সে রাত্রে স্বপ্ন দেখলেন পিতৃ-পুরুষেরা। দেখলেন, সুখের পা ছেড়ে তাঁরা সকলে একত্র পরস্পরের গলা ধরাধরি—ভাব হয়ে বাড়িতে অবস্থানের সুখের সমাপ্তি ও আরম্ভে একা করতে বসছেন। মিলনোৎসব দেখলেন সবার মাঝে ঠিকে গেছে। আনন্দে, শুধু সে রাতেই নয়, পরদিনও আবার ঐ একই স্বপ্ন দেখলেন।

প্রাণিত হয়ে উঠেছিলেন পরলোক কুমার। নিরুপায় হয়ে অকপটে সমস্ত কথা স্বীকার করলেন চন্দ্রবাবুর কাছে। নিজ চিত্তচাঞ্চল্যের কথা, স্বপ্নদর্শনের কথা। চন্দ্র-বাবু ইংরাজির শিক্ষক, নব্যপন্থিত। তবু এরকম তাঁর কাছেই মাকে মাঝে মনের কথা বলতেন সনাতন পণ্ডিত। সব শুনে চন্দ্রবাবু মিটি হেসে বলেছিলেন, বয়স বত হল আপনার?

পণ্ডিত মনে মনে হিসাব করে বলে-ছিলেন, আগামী পৌষ নবমীর পরের বসন্তীতে বা-চল্লিশ বসন্ত হবে।

চন্দ্রবাবু পুনরায় হেসে বলেছিলেন, বা-চল্লিশ? তবে আর কি? আপনি কোন চিন্তা করবেন না। এ রোগের ঔষধ আমার জানা। আমার পরিচিত একটি সর্বসুলক্ষণযুক্তা কন্যা আছেন। ও তাঁর বয়সও আপনার বা-ত্রিপুণ্ড। আপনারই পালটি ঘর, নৈকষ্য কুলীন। কি বোল আপনার? অবশ্যই তো?

পণ্ডিত গম্ভীর হয়ে বলেছিলেন, আপনি কি পরিহাস করছেন?

—পরিহাস! যেখানে পিতৃপুরুষের 'উনষষ্টিতম' সেখানে কি কেউ পরিহাস করে মশাই?

—কিন্তু এই বয়সে—

—কিসের বয়স মশাই? বা-চল্লিশ মাইনাস বা-বিংশতি ইজ্‌কোয়ালস্ টু বিংশতি ওতো নাস্যা। সতাব্দীর পঞ্চমাংশ! এর চেয়ে অনেক বেশী বয়সের ফারাক যাদের সেরেছেন আপনার পূর্বপুরুষরা। আপনি কিছুমাত্র উতলা হবেন না। আগামী পিতৃপক্ষে তাঁরা কিসের বাদিপঞ্চমীর দিনটায় তিনিও পণ্ডিত হবেন বলেন। অমনলোক বলা গিয়েছেন আর বড়র পরিচয়। অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পাত্রিবারা তাঁর স্ত্রী তাঁর পূর্বেই গত হয়েছেন। কন্যাটি বর্তমানে তাঁর ভাইয়ের ঘরসংসার। তাই সামান্য কেবানী। তাঁদের কৌলীন্যের দেবারও আছে। ফলে, পাত্রীটিকে পাত্রস্থ করতে পারে নি ভাইয়েরা বহু আবার একটি খাতার। তার সংসারের মাসীবৃত্তি করেও অবশ্যই পতি-নিন্দত নিলজ্জ পাত্র করে চলেছে। দুটো সিঁদুর ছাড়া আর কিছুই দিতে পারবে না অবশ্য—

বাধা দিয়ে পণ্ডিত বলেছিলেন, না, না মনের কোন পরদেই উঠছে না। বিবাহ যদি আদৌ করি তাহলে পরিণয়ে দিব; পরমেশ করব, না আমি। সে কথা নয়, আমি জানতে চাইছিলাম—

—আর তাহলে ভাবনার কিছু নেই পণ্ডিতমশাই। এ সম্প্রদায়ের নিবেদন ছেলেটি আমাকে বলেছে। এই বলিন আগেই সে আমাকে একটি পত্রের সন্ধান দিতে বলেছে; আর আজ আপনি বললেন সমস্ত জঞ্জালের কথা। আমি বলছি আপনি এখনেই বিবাহ করুন। মেয়েটি অত্যন্ত লাস্যময়ী। দেবদ্বিজে ভক্তি অচলাভক্তি। ডাক্তার অবশ্য হবে না। তাছাড়া, আজের ওর হচ্ছে তার জীবন বিবাহের ব্যবস্থাও না করতে পারলে, অন্তত্বর্ষ গঙ্গাস্নানে মেয়েটি না শেষ পর্যন্ত আত্মঘাতী হয়ে পড়ে!

—বলেন কি! এ যে নিদারুণ সাধ্য।

—নিদারুণ বলে নিদারুণ! একেবারে মন বিদ্যেরক্ষয়ে নিদারুণ। সব কথাই আপনাকে খুলে বলছি মশাই, এরকম মেয়েটি যদি আত্মঘাতী হয়ে তবে সে স্ত্রী হত্যার পাপ আপনাকে স্পর্শিবে ফিনা সে আলাদা বিষয়ে। মন, সাহিত্য যেটে দেখবেন, আমার কিন্তু বলার নেই—

আতঙ্কে আঁতকে উঠে পণ্ডিত বলে ছিলেন, এ কী দুশ্চিন্তায় আমাকে ফেললেন, চন্দ্রকান্তবাবু!

—দুশ্চিন্তা কিসের মশাই? আপনার দুশ্চিন্তা আমি ঘুচিয়ে দিলাম আমি। তেমার আমাকে বিশ্বিতমুখ করবেন, তা এর বদলে কি চাইছেন? আপনার ইচ্ছতত বজায় রাখার কি রাস্তা? আপনি কি ভন্ডী সন্ন্যাসী? আপনি তো গৃহস্থী। চলিতত্ত্ব নয়, পণ্ডিত মশাই, খাঁটি কথা বলছি, এখনও সময় আছে। এর পর কিন্তু পিতৃপুরুষের পরলোক-গতিনাথের কোন ব্যবস্থাই আপনি করে উঠতে পারবেন না।

পণ্ডিত আর আপত্তি করেন নি। চন্দ্র-বাবু একটা ছুটির দিন পণ্ডিতমশাইকে পাত্রী দেখাবার জন্য নিয়ে যাবার আয়োজন করলেন, বললেন—আপনি নিয়ে যতবার-বার পরিচয় দেখে নিন। দেবকালে আমাকে দায়ী করবেন না।

পণ্ডিত শশব্যস্ত হলেন, না না, সে কি?

—না না সে কি নয়। এ অত্যন্ত গুরুতর ব্যাপার। আপনি নিজে পাত্রী দেখতে না গেলে আমি এ বিয়েতে নেই।

পণ্ডিত একটু চিন্তা করে বলেছিলেন, ঠিক পরশুরাম; আমি পাত্রীর জ্যেষ্ঠতাতের ভবনে যাব, পারস্পরিক কথাবার্তা বলতেই যাব, কিন্তু এক সর্তে—

—কী সর্ত বলুন?

—পাত্রী আমার সম্মুখে আবির্ভূতা হবেন না।

—সে আবার কি কথাই? আপনি তো ছেলে দেখতেই যাচ্ছেন। মেয়ে যদি আপনার সম্মুখে 'আবির্ভূতা' না হয় তবে তো ঘরে বসেই, মনশ্চক্ষে তাকে আপনি পরীক্ষা করতে পারেন।

প্রশান্ত পণ্ডিত ভেবেছিলেন, আপনার একটি ভ্রান্তির হদিস পেয়েছেন চন্দ্রকান্তবাবু। আসল সেই কন্যাকে দেখতে যাচ্ছি না, তাঁকে নিজেকে প্রমাণিত করতে যাচ্ছি। তবুও আমাকে দেখুন, এবং আমি আশা করব অন্তরাল থেকে কন্যাকেও তাঁরা দেখার সুযোগ দেবেন। আমার বয়স, আমার আকৃতি,—ব্রাহ্মণের একটু হেলে দোষ ধরেছিলেন আমার অকপটতাই তাঁরা। পুনর্বার করুন। বিবাহ যাকে করি নাই, তিনি আমার জননী। তাঁহার দিকে আমি ঐ ভাবে দৃষ্টি-পাত করতে পারব না। আপনি আমাকে, মার্জনা করবেন।

পাষণ্ড পণ্ডিতের কাঁচা-পাকা মেশা-ছাঁটা চুল, লিখা, খড়্গনাসা সত্ত্বেও পক্ষ থেকে কোন আপত্তি উঠল না। পণ্ডিত তাঁর গুণগ্রাহী। পতিতাকে নিয়ে এসে ওঠেছিলেন তাঁরা সেই কালীঘাটের এক-কামরার মকানে। পতিতেরা উঁকি ঝুঁকি মেরেছিল, কৌতূহলী হয়েছিল। বুঝেছে ভদ্রপল্লী আর এই হচ্ছে কলকাতাবাসীরা আলো-চনায় একটা বিষয়বস্তু পেয়েছিল মাত্র। তার বেশী কিছু নয়। ক্রমে তাও গা-সওয়া হয়ে এল সকলের। সে আজ সাত বছর আগের কথা।

কিন্তু ভিতরে ভিতরে অন্তর্ভেদী ঝড় বয়ে গিয়েছিল ঐ এক-কামরা মাসাগারের পতিতা। ঐ একঘরাবাসীর জীবন। পণ্ডিত সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করেছিলেন তাঁর প্রাণ সঙ্গিনীর উপর। চিন্তিত হয়েছিলেন সামাজিক বিষয়ে। কলের পুতুলের মত কাজ করে যেত পতিতা। কোথা থেকে কি করত, যাকে বলে রেশন আনাত, কেমন করে সংসার চালাতো কিছুই খবর রাখতেন না পণ্ডিত। মাসান্তে মাহিনার টাকা, টিউ-শানির টাকাটা ওঁর পাখা-সর্বস্ব হাতে তুলে দিয়ে এবং পরদিন সকালে ফর্দ-অনুযায়ী বাজারটা এনে দিয়েই তিনি মুক্ত হতেন। এতদিন যে মানিক বাজার অবাধে ঘুরেছিলেন তার থেকে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে জীবনযাত্রা শুরু হল তাঁর। তাতে অসুবিধা তো কিছু, অনুভব করেননি বা বলা আরাম পেয়ে-ছিলেন। অধ্যাপনা, পূজা আর জ্ঞানচর্চায় পরিপূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করতে পেরে-ছিলেন। মাঝে মাঝে অবশ্য স্ত্রীর নির্দেশমত, ওঘরে ওঘরে যেতে হত। এটা ওটা কিনে আনতেন, চুলকাটার দোকানে যেতেন,—নির্দেশমত কাপড়টুকু পাল্টে পরে তাঁরপর পায়না ওর হাতে সমর্পণ করে আবার তাঁর গবেষণার জগৎ, তালিয়ে যেতেন।

তবু বাসঘরে আর আহারের আয়োজনেই ব্রাহ্মণের স্ত্রীজনের সবকিছু নয়। তার বাইরেও স্ত্রীর একটি ভূমিকা থাকে। এ বিষয়ের পণ্ডিতের অভিজ্ঞতা অল্প। তাই পতিতাকে তিনি বুঝে উঠতে পারেন নি। পতিতা কি সুখী হয়েছিল? কোন দিন তিনি তাকে কোথাও বেড়াতে নিয়ে যান নি। কোনদিন, ঐ যে কি বলে, 'সিনেমা'. তা সেই সিনেমা দেখতে নিয়ে যান নি। এ একবার দুর্গাপুজা। অন্যরা কালি পুজোর জন্যেও সপ্তাহ গিয়েছেন অবশ্য। বাস, তার বেশী নয়। পতিতেরানীদের সঙ্গেও কোনদিন পতিতাকে ঘনিষ্ঠ হতে দেখেন নি। তাদের সঙ্গে কিসে মেশে কোথাও যেতে দেখেন নি। ঔৎসুক্য দেখেছি শুধু সাসারের কাজ করে যেত। পণ্ডিতও তাকে মতে বলতেন, আমার ও সব ভাল লাগে না, কিন্তু তুমি তো ওই বেলার-গোপালকে স্টীমের সমভিব্যাহারে ওখানে যেতে পার।

অবাক দৃষ্টি তোলার দৃষ্টি মেলে পতিতা বলত—তোমার?

—ঐ যে কি বল তোমরা, সিনেমার।

পতিতা, হয়তো খুব ছিপে হেসে বলত, আর হঠাৎ আপনার সিনেমার কথা মনে হল যে? আমি কোনদিন ও কথা বলেছি?

—বল না বলেই তো বলছি।

—আমার ও সব ভাল লাগে না।

পণ্ডিত যে সত্যের মানুষ তাতে পতিতা যে তার নাগাল পাবে না এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেখানেই তো এর শেষ নয়। স্বয়ং পণ্ডিত পরশুরাম ভট্টাচার্য ও এ অল্প শিক্ষিতা গণিকা মেয়েটির কোন নাগাল পান নি। সে কী চায়, সে কী ভাবে? সে কী সুখী? পরশুরাম ভেবেছেন খোলাখুলি। হেসে এড়িয়ে গিয়েছে পতিতা।

না, পতিতার অন্তস্তল পর্যন্ত দৃষ্টি যায় নি পণ্ডিতের। দুজনের সম্পর্ক যেন স্বামী স্ত্রীর নয়, দুই বন্ধুর। না, তাও নয়, স্ত্রীকে কোন বিষয়দান করতে বসতেন না তিনি। পতিতাও কোনদিন এসে বলে নি। বেনারসী, নাকছাবি, হেরোইন কিম কুমারী? সে শুধু নিরলস সেবার পরিচর্যা করে গেছে তার স্বামীকে; কোন পরিত্রাণ চায় নি—ঔষধ উপায় আশ্রয়ে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েই যেন তার তৃপ্তি।

তাই, বলে সে সুখী ছিল না। আত্মজ্ঞান না থাকলেও উত্তরজ্ঞান তার ছিল। মনে আছে, একদিন পরশুরাম পণ্ডিত রহস্য করে বলেছিলেন, তুমি যে বিবাহ করে শুধু এই সংসারের কথা পরপর করে যাচ্ছ, তপ-তপ-পূজা-আহ্নিক কিছুই করছ না, এর কি পরিণাম হবে জান?

কাজলকালো দৃষ্টি মেলে পতিতা পরশুর করেছিল, কি?

—মৃত্যুর পর আমরা দুজনে এক স্থানে থাকতে পারব না। আমার পূজা-অর্চনার পুণ্যফলে আমার যেখানে স্থান-নির্দেশ হবে, তোমাকে সেখানে পরমেশ্বরীরূপে দেবে না যমদূতেরা, বলবে, এ ব্রাহ্মণী তো নিত্য পূজাই করত না—

সেই একদিনই পণ্ডিত দেখেছিলেন পতিতার চোখে মুখে ভীষণার ঝড়ে দাঁড়িয়ে সে বলেছিল, বেশ, আমিও দেখে নেব সে কত বড় যমদূত! আমাকে আপনার কাছে যেতে না দেওয়ার জন্য। যমদূতের চোখে চোখ রেখে বলব আমি।

পণ্ডিত তখন রসিকতা করে যৌক্তিক আলোচনায় তুমি যমদূতকে করতে পারবে?

—আমার চোখে কেন? তুলসীর পুনো ঘরে তাকে সাহায্য করব আমি। স্বামী সেবায় আমি তো কোন অবহেলা করি নি। যমদূতের যদি সত্যের মাত্রা থাকে তবে সে আমায় ফিরিয়ে আনতে পারবে না।

যমদূতের সত্যের মাত্রা থাকে কিনা এ তথ্য জানা ছিল না স্বয়ং পণ্ডিতের। কিন্তু তিনি অবাক হয়ে গিয়েছিলেন পতিতার আত্মবিশ্বাস দেখে। এমন কথা, এমন দৃঢ়প্রত্যয়ে সে ঐ চোখমুখভাবা মেয়েই বলতে পারবে এটা ভেবে আগাই করেন নি তিনি। হঠাৎ পতিতা লজ্জা পেয়ে যায়। নিজের আচমকা সত্যালোকতায় সংকুচিত হয়ে দৃষ্টি নামিয়ে নেয়। মাথার ঘোমটা টেনিয়ে দেয়। চলে যাবার উপক্রম করতেই পণ্ডিত বলেছিলেন, তুমি মহাভারত পড়েছ?

—না, কেন?

—তুমি সেই মহিলাটির কথা শোন নি, যিনি যোগবলপ্রভাব সন্ন্যাসীকে বলে-ছিলেন, আমি কোশিকের নই, আমার দিকে ক্রোধদৃষ্টি নিক্ষেপ করো না, আমি ভস্ম হয়ে যাব না।

পতিতা মাথা নেড়ে বলেছিল, না, কী জানি?

পণ্ডিত তখন মহাভারতের উপাখ্যান শুনিয়েছিলেন পতিতাকে।

হনহন করে চলেছিলেন পণ্ডিত। গাড়ো মোড়ে গাড়োয়ানরা বলে ওঠে—ওই যে পণ্ডিত মশাই। এতক্ষণ কোথায় ছিলেন? বসি হাসী আকুলেন আপনার? ঐ কাঁচ ঘন্টাটাকে অমনভাবে একা ফেলে যেতে হয়?

একেবারে কুঁকড়ে যান পণ্ডিত, বলেন, কেন কি হয়েছে?

—কি হয় নি? একঘেঁয়ে মেয়ে ভরসা-ভেকারের তলায় সেঁদিয়ে যাচ্ছিল আর! এতক্ষণ মায়ের কোলে উঠে বসে থাকত!

আর্তনাদ করে ওঠেন পণ্ডিত, কোথায় কোথায় মা-মণি?

—যান বাড়ি যান। হাসপাতালে নিয়ে যায় নি, বাড়ির দিকেই গেছে। অমন ভাবে একলা ফেলে আর যাবেন না কোনদিন। কী? অমন হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকেন কেন? বলি, বাড়ি যান।

বাকি পথটুকু দৌড়েই চলে যান তিনি।

বাড়িতে ঢুকতেই সবাই তাঁকে ঘিরে ধরল সানান ঘাটের মানুষ।

—কী মানুষ মশাই আপনি। মানুষ না পাষাণ?

—যে-ওষুধির বাক্সটা চেয়েছেন সাহি? সেটা কোথায় থাকে বেয়াল ছিল না।

—ও সব মুখে বললে তো হবে না। হাত চালাও। সাপটানি খুলে ঘর সাফাই থাকে সাফ করে ফেলো।

সমস্ত অপমান মাথায় নিয়েই পণ্ডিত এগিয়ে গেলেন না। তাঁর মুখের ভিতরে কি হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন না তিনি।

ওইখান থেকে ঘাড় ঘুরিয়ে পণ্ডিত চীৎকার করে ওঠে আত্মরক্ষার, ওগো ভাল-মানুষের মেয়েরা, মুখটুখে ধরে আসতে যাও কেন? সাদন পরে কর, এখন বাপটাকে বেঁচিয়ে করে আগে যাও।

এ কথায় কাজ হয়। ছাড়ো ওষুধ পাল্টা হয়ে সব ছেড়ে দেয়।

সত্যেন্দ্রকুমার খুব এগিয়ে আসেন। খুকু মুখে আঁচল চাপিতে। কপালে একটা কাটা দাগের উপর টিঙ্কচার বেঞ্জইন দিয়ে লাল করা। খুবই অপমান উপর দিয়ে গিয়েছে। টের সে পায় নি। যাবার বেলায় দেখতে পেয়ে হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলে খুকু। পণ্ডিতের দুই চোখ কপালে হয়ে আসে। উঠে হয়ে পড়েন ঐ একটি মা-হারা মেয়েটার উপর। মা-মরা আমার।

নানা রকম উপদ্রবে এবং অসুবিধা সত্ত্বেও পল্লিবিলাসীরা তাদের মানসিক ঘর গড়ে করে একে একে ফিরে এলেন। পণ্ডিতের মাথার ঘরো তখনও উলোরা পণ্ডিতাই কি ওকে ভয় করে টেনে নিতে পেরেছিল? সে কি বুঝতে পেরেছে, সন্তান সামনে অসহায় পণ্ডিতের হাতে খুকু, খুব ভালোই ভোগ করবে? তাই কি সে পণ্ডিতকে নিষ্কৃতি দিতে চেয়েছিল? কিন্তু, এসব কি ভাবছেন তিনি? এত কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ছেন কিনা? মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্বে পণ্ডিত স্বীকৃত, কিন্তু তার পরকীয়া পরলোক কিছুই জানেন না। মৃত্যুলোক অজ্ঞাত রাজ্য। সে তো চক্ষুর্গোচর না যাদের-চক্ষুর্গোচর হো হবে। সেখানে চক্ষু গমন করে না, বাক্য গমন করে না, মনও সেখানে নাগাল পায় না। না জিহ্বা না বিমানী মো:—তাঁকে শোনি যা, তাঁর কথা কিভাবে বোঝানো যাবে তাই জানি না। ঈশ্বরের মত মৃত্যুও অজ্ঞাত। পণ্ডিতা ওকে ফেলেছিল, এ কথা ভাবছেন কেন?

—ও বেলা খাবে তো তুমটাই কাটিস্ নি। এ বেলাও কি উপুস দিবি নাকি?

খুব হেসে বলেন, উপুস যদি কেন দিসি, তখাতো উপবাস।

খাক করে ওঠে কঁউনিসী। খাক যাবা খাক। উপুস করতে কইতে ছিল কাঁ? উপল আজার, এখন আর আমাকে উপুস দেখাতে আসিস্ না। তা আমার কথা না হয় নাই রাখলে মে। তাই কি খাবি, মুখটে কি দেতে দিবি?

পণ্ডিত বিহ্বলের মত এদিক-ওদিক তাকাতে থাকেন।

—ও সিকদারদের কি বেখাইছস্? ভাঁড়ে মা ভবানী। সবই বাড়ন্ত। যাও, বাজার থেকে দুটো তরকারি বা পাও কিনে এস।

খুকুর চোখে বেশী নজর নি। তবে চাঁচাটা কেটে গেছে খুব। পণ্ডিত ওকে নিয়ে অনেক উপদেশ দিলেন, সব তার যাওয়ার বিপদের কথা বুঝিয়ে দিলেন। জানলাটা বন্ধ করতে গিয়ে দেখেন চিমনিটা ভালো হয়ে আছে, পলতেটাও কেমন যেন বেঁকে গেছে। শীষ উঠিয়ে একটিবার দিলো দিনের বেলা মেরামত করে নেওয়া উচিত ছিল।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। মাস্টার মোড়ে ওদের উঠিয়ে দোকান বাড়িটা। মুদলকাপির কাজা নিয়ে একটা লোক হাঁকতে হাঁকতে চলে গেল গলি ধরাবর। রিকশার ঠুং-ঠাং শোনা যায়। এ সবু গলির মধ্যে প্রবল হিমশু ঢোকে না, কিন্তু গলিটা হাত পনের এগোতেই গিয়ে পড়েছে অপেক্ষাকৃত। একটা বড় গলিতে। যেখানে রিকশা কেন গাড়িও চলে। ছোট গাড়ি, রিকশা আর মোটর গাড়িতে পৌঁছাই সেখানে মটলা বেধে যায়। পদাতিক যানচালক ভ্রুক্ষেপ করে না, সেই গাড়ির ফাঁকা ভেদ করে ফুটপাতে আসতে চেষ্টা করে। বড় গলিটা যেখানে বাস-ট্রাম রাজপথে গিয়ে পড়েছে, ঠিক আটা কলের পাশেই ভালিভারা ভোবিল। চায়ের দোকান। বাস কতক বেঞ্চি পাতা আছে; ভেতরে—ওটা যান-করদের আরামকক্ষের ভৌবিলও। রোজ সন্ধ্যাবেলায় একজন হিন্দুস্থানী ঐ দোকানটা ঝেঁপে ভোলে। উনুন নিয়ে আসে, আলু-কপি, পেঁয়াজি, ফুলুরি বিক্রি করে সে। চায়ের দোকানে যাদের খুশি খাবেন, ভিড়ে অন-ভোটে, কেনা বাসের পয়সা আর চা'র ভাঁড়ি ফেরী ভেন্ডিনের আসল রহস্য ঐ চায়ের সর্বত্র ওপরে। ভোলাইবাবু পাওয়া-যায় ওখানে। মাইলেজ অবশ্য নেই, দোকানের ভালিকের, তা হক নিজের ওখানে. দিয়ে যুক্তি-এক, তাঁর ভরত সেবন করতে পারেন। কোন হামাম-খুলের হবে সাফ দোকানে এ আনুষঙ্গিকটা চালু আছে আর বিল-পাঁচিল বন্ধন। দোকানের মালিক অন্তরাত্মা কিন্তুন মানুষ, বাস-মালের পয়সাবাবদ এ দোকানটির আয়ে কোনো না হয় সেজন্য অন্যখোনা স্থানে নির্বাচিত পয়সাটা দিয়ে আসে। অধিকাংশই নির্বিরোধী মানুষ। কাড়া-কাড়িরা যে কখনও হয় না, তা নয়—তবে খুকু অধিকাংশই সেটা মাঝিয়ে দেয়। গাড়ির পয়সা বন্ধ করে একপক্ষকে রিকশায় তুলে বাড়ি পাঠায়।

কোথাও কিছু, সেই ছোট ঘুরুঘুরে ওই পণ্ডিতের ঘরের চৌকাঠের উপর ঘুরিয়ে ঘেরে পড়ে মতীন মাস্টার। কম কাঁচের মলাটের উপর হাত ঘুরিয়ে আঘাত করে চলে—পণ্ডিত আর নাকি ঘরে—বোধহয় এবার ঘোল মতন—চাঁদমুখটা খোঁজ—

পণ্ডিত লাফিয়ে উঠে পড়ে সন্ধিগ্ধান। আর আবার মতীন এসেছে। কেন এখন খুকুকে বোলে তুলে নিয়ে পিছন দরজা দিয়ে উঠানে নেমে পড়ে। তাকে নামিয়ে দিয়ে বলে, তোর কাজটিয়ির ওপরে গিয়ে বসে থাক। খুকু, অবিকলের মতোই এগিয়ে যায় পাশের ঘরখানার দিকে।

—ও পাপড় পণ্ডিতমশাই, চোরটা খোল না যাওয়া—

পণ্ডিত এসে বাইরের দরজাটা খুলে দেয়, বলে—আবার এসব অধানা কেনো?

মতীন সত্যর হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসে। দাঁড়িয়ে বসে-পড়ে মাইতো একটা হোঁচকি সামনে দিয়ে বলে: হুঁ-হুঁ, যাওয়া। আর পণ্ডিতের বাকরুদ্ধ ও-গ ধরেছি। 'অধানা' কথাটা অপূর্ব সমোচ্চারণ বলোদরী, খাদা নয়, পানীয়। One can't eat liquor, one drinks! খানা নেই হয়, পানা। সাবাস্—

পণ্ডিতের মুখটা কয়ন হয়ে যায়, বলে, এতবার বারণ করেছি, এই করে দাঁড়িয়েছি—তবু ঐ বদ নেশা পরিত্যাগ করতে পারলে না?

মতীন একগাল হেসে বলে—ছাড়ব কি করবে সন্ধ্যা? অনেক ঘাটের এ-ঘাটে এসি। এ পানা সহজটা আমাদের পাপে ঢোকি, একটি হরিসভাসাধনের ভিতরে। এখান থেকে বেরুতে পারতে চাই, তা পানার সহজটা আমাকে আস্টেপৃষ্ঠে নাগপাশে জড়িয়ে ফেলেছে। বুঝেছ? সাধের বেলা তাই এখানে পালিয়ে আসি। সব ভুলে থাকি খানিকক্ষণ। তা সে যাকগে, তোমার খবর কি? পুলোনার মিত্তির পণ্ডিত ও-ওয়েন্ট-গন্?

পণ্ডিত জবাব দেয় না।

—আহা, অত কাছুমাচু হচ্ছ কেন? যাওয়া? বেশী তো করে নি, অল্পের ওপর। আমার ঘরে পানী মরলে আমি দুইয়ে-দুই দিই। তুমি পানী ভালবাসো। যাও, যাও বাইরে...ওকে, সারের বুলো-ঘাও—

বলা করে পণ্ডিতের এক্তুনো পা ছেড়ে করে মতীন। পণ্ডিত প. ছাড়িয়ে নিয়ে সরে দাঁড়ায়।

মতীন আর অনেক দিন পরে এসেছে। অনেক অনেক দিন পরে। পণ্ডিত যখন এখানে একেবারে একা থাকতেন তখন সে সপ্তাহে সন্ধ্যায় আসতো তারপর পণ্ডিতের ঘরে বৌদিদি আসার পর তার আসাযাওয়া কম হয়ে যায়। তবে চলে হয়ে থাকলেও মতীনের এটুকু বোধ অবশিষ্ট থাকত যে পণ্ডিত বিধবার উপস্থিতিতে সে এই এক কারণেই আসতে পারে না। দীর্ঘ দিন তাই মতীন সাধু বা পণ্ডিতের বাড়ি আসে নি। সুদর্শন ছেলেটা গত সাত বছর

যাই সে পরিচালন সম্বন্ধে। এদের এ পাড়ায়। আর কালিতারা কোম্পানি পাণ্ডিতের স্ত্রীকোম্পানির সংবাদ দেবে নেতে টানতে এসে হাজির হচ্ছিল। ঘাবড়ে আলাপ সে করে এসেছিল, ঐ পাকড়-পাণ্ডিতই এ অঞ্চলের আমার একমাত্র কর্তা এ সময়ে তাকে চাতলা দেওয়া উচিত আমার। আছা কোম্পানির বউটা মরে গেল! সত্যই চোখের জল ফেলেছিল বতীন ঐ ঘটের মৃত্যুর ওপরে। এত পাণ্ডিতের প্রত্যেক ঘটেছে জানা। অবশ্য এসবে আসতে আসতে তার সান্ত্বনার ভাষা পালটে গেছে।

পাণ্ডিত জানতেন, বতীন সাধু খাঁ বটে, কিন্তু সে যে কত বড়লোক এ সম্বন্ধে তাঁর ঠিকমত ধারণা ছিল না। পাঞ্জাবাবা-পাঞ্জাবি আর চপ্পল। সন্ধ্যার পর তাকে প্রায়ই দেখা যেত এ পাড়ায়। নিত্য নিত্য তাকে দেখা যাবে ঐ কালিতারা কোম্পানির ইঁটের উপর বসে মাটির ভাঁড়ে মদ্যপান করছে। কুটুম্বদের বাড়ির থেকে মদ ছেলে দেওয়া হয় মাটির ভাঁড়ে। তু-একটা ব্যতিক্রম বতীনের এই সাদা-সিধাকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে না। পার্টিটা সেদিন পরম ভক্তির এক ঘোরের মধ্যে ঘোলা হলার ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ হয়ে যায় সেদিনও শুদ্ধ ধোপ পাঞ্জাবি-পাঞ্জামা পরে বতীন হাজির হয়। অনেকদিন আগে ট্যাক্সিতে, সেদিন ঘোড়ার চেপে। কালিতারা কোম্পানির মালিক বন্ধুবরই একদিন পাণ্ডিতকে বলেছিল, লোকটা শুনেছি টাকার কুমীর। ঠিক বিশ্বাস হয়নি পাণ্ডিতের। টাকার কুমীররা এ পাড়ায় ইঁটের উপর বসে মাটির ভাঁড়ে ঘোলাই মদ খেতে আসে না। ঠেলা-ওয়ালা, ট্যাক্সির ড্রাইভার আর মেথোপ-মোশায়েদের মত ফিয়ার-টীয়ারিংদের এ পাড়ায় তারা মদ খায় না। ও পথের কিছু না জেনেও পাণ্ডিত এটুকু জানেন যে, অভিজাত মুখপাত্রদের জন্য চৌরঙ্গী-পার্ক-স্ট্রীট অঞ্চলে অনেক অনেক আস্তানাগারের ছড়াছড়ি নেই কোন। তবে লোকটা নেহাৎ মনগড়া করেও মদ বোধ হয়। ফুটফুটে রঙ আর ঘড়ি নেই, হাতে নেই আংটি, পকেটের মোটাও হয়তো তেমন—কিন্তু, পরিচিতন ট্যাক্সি করে অফিসে যে মাটির মালিক হওয়ার মত বড়লোক সে নিশ্চয় নয়, তাহলে ট্যাক্সি চাপবে কেন; কিন্তু ইংরেজবাবু বলে ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে লোকটা ফোর থাউজ্যান্ড টাকার নোট বার করে, বেজায় ভাঙ্গ থাকলে ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বলে—তোফানি আপ্ বাপ মিলিয়ে সর্দারজি।

পরলোকগত পাণ্ডিতের সঙ্গে বতীন সাধু-খাঁর পরিচয় আলাপ হয়েছিল অন্তরঙ্গভাবে। সেও আট সাত-আট বছর আগেকার কথা। স্কুলে খবর এসেছিল, ও'দের ক্লাস টেনের একটি ছাত্র টাইফয়েডে ভুগছে মারা গেছে। সেদিন স্কুলের সময় ছুটি হয়ে গেল। ছাত্রটি বিজ্ঞান-বিভাগের। পরলোকগত পাণ্ডিতের ক্লাসে নিজে না; তা হলে ছেলেটিকে তিনি চিনতেন। পরেরদিন দেখা হলে ছেলেটি হাত তুলে নমস্কার করত। ছাত্রের পাওয়া ছুটিতে ছাত্রেরা হৈ-হৈ করতে করতে যে-যার বাড়ি চলে গেল। উঁচু ক্লাসের কিছু ছেলে চলল হাসপাতালে দেখতে—এখনও লাইফ। তাদের মাস্টারমশাইরাও যে-যার বাড়ির দিকে রওনা দিলেন। ছেলেটি হরিণ চাটার্জি স্ট্রীটে তার মামাবাড়িতে থেকে পড়ত; কিন্তু, মারা গেছে তার বাবার বাসায়। বাবা ছাত্রটির নামের ধারায়। সেটা অনেক দূরে। তবুও আর কে যায়? কেউই সাহী হতে রাজি হল না। টাকার জোরে বিশ্বে অনেকেই একঘরে করেন পাণ্ডিত। অঙ্কের বললেন, তাঁর শরীরটা ভাল নেই, চন্দ্রকান্তবাবু বললেন, সন্ধ্যের পর একটা জরুরী কাজ আছে। পুরুষোত্তমবাবুরা বলেন, সে বাড়িতে একটি মানুষই যাদের চিনত, সেই রোগা আর চলে গেছে। কি লাভ? তাছাড়ের শনিবার ছুটির পর যাওয়া একটা লোকসভায় মিলিত হয়ে তার আত্মার শান্তি কামনা করব।

পরলোকগত পাণ্ডিত অফিস থেকে টাকা নিয়ে একাই রওনা হলেন। স্কুলের গেটের কাছে হরিণ কে যেন পিছন থেকে ডাকল—পাণ্ডিতমশাই।

পাণ্ডিত ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখেন মোলতী সরখেল।

—আমি বিদেশী, আমার যাওয়াটা কি হেপোজন হবে?

—নিশ্চয় না। আসবেন আপনি? চলুন না, তবু একজন সঙ্গী হবে।

—চলুন।

সংস্কৃত এবং ভারতীয় দুই বিষয়ে অনার্স হয়েছিলেন বিজ্ঞানের ঐ ছাত্রটির শেষ ফুটবলের সময়। ফুটবলে সর্দারী করে মুকুলে ফিরে এলেন সাইড-শোর ব্যাক্তিরা ফেরেনা যায়ে। পরলোকগতবন্ধুর হাতের মোড়ে নেমে গেলেন। পাণ্ডিতও ট্রিবেকি স্টপে নেমে ট্রিবেক গলিটা দিয়ে ঘিরে এলেন হরিণ দেখতে পেলেন গলির মাঝামাঝি ঠেলান দিয়ে একটা লোক পড়ে আছে। অন্ধকারে লোকটাকে পড়ে থাকতে দেখে পাণ্ডিত ধরে পড়েন রাস্তার উপরেই। না, বাড়ি ঠিক চলছে। বেঁচে আছে লোকটা। পাণ্ডিত তাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে এলেন। ট্রেইয়ে দিলেন তাঁর চৌকিতে। তত্ত্ব-তাবে ঘরে তালা দিয়ে ডেকে নিয়ে এলেন পাড়ার ডাক্তারকে, এবং সেজন্য ভর্ৎসনা শুনতে হল তাঁকে। লোকটার কিছুই হয়নি, অত্যন্ত মদ্যপান করে বেহুঁস হয়ে গেছে মাত্র।

যাই হোক পরদিন জ্ঞান হবার পর মাতালটা আবাক হয়ে গেল। সে পড়ে আছে একটা চৌকিতে, আর মাটিতে মাদুর বিছিয়ে একজন অদ্ভুতদর্শন মানুষ শুয়ে আছে।

পাণ্ডিত বলেন, এখন কেমন বোধ করছেন? নিজেকে সামলাবার সময় বোধ হয়েছে?

বতীন উঠে বসে বলল, আমার কোথায় এনেছিলেন আমাকে?

—ঐ পরলোকগতীর পাড়ায়। কেন, আন এসব? আন বাড়ি আন। আর কখনও এমন দিতে প্রলোভন না।

বতীন উঠে পাণ্ডিতের পায়ে হাত দিয়ে বলেছিল, বাঃ শালার! মাথাব্যথাটা ঝোড়া গেছে। একটা টাকা হবে? বাড়ি যাওয়ার ভাড়া? তাও দেখ দিয়ে যেন, মাইরি।

বাবা দিয়ে পাণ্ডিত বলেছিলেন, আপনার চিকিৎসা আমরা করি নাই; আমিই নিজের স্থানে নিয়ে গেছিলাম, এমন—ওরকম ভাববেন।

যাওয়া হতে দেরে বতীন বলে ওঠে। বলেছে টাকা ছাড়া মানিব্যাগে একশ টাকার নোটও ছিল কটা। সবশুদ্ধ-টিক আছে।

—আমাকে দুইটি টাকা দেবেন, কাল অতিরিক্তভাড়িত হয়ে একজন চিকিৎসককে নাইবন করেছিলাম। তাকে পারিশ্রমিক দিতে হবে।

বতীন মানিব্যাগ থেকে একখানা একশ টাকার নোট পাণ্ডিতের দিকে বাড়িয়ে ধরে।

পাণ্ডিত মাথা নাড়ি ওঠেন—অথা-নেই টাকা আমার কাছে নাই। দুইটি টাকা দিতে বলছি, বুঝলেন না? ঐ তো বুঝলা নোটও রয়েছে—

বতীন গম্ভীরভাবে বলেছিল, আপনি আমার যে উপকার করেছেন টাকা দিয়ে তার মূল্য নির্ধারণ করা যায় না। এটা রাখুন, তাড়াতাড়ি দিতে হবে না আপনাকে।

পাণ্ডিত শুদ্ধ ওকে মাফতে বার বলেছিলেন।

সেই থেকেই বন্ধুত্ব।

পাকড় পাণ্ডিত আর বতীন মাতাল।

এবং সেই থেকেই বতীন মিশিত তাঁর কাছে নিত্য রয়ে। আকণ্ঠ মদ গিলে, গুনও কখনও ইংরাজি ফরিত। আবৃত্তি করত। কখনও বা গাইত আপন খেয়ালে। আর সেই বাঁচ-খান আবৃত্তির মূল বক্তব্যটা হচ্ছে : ঐ শালার সহরটায় শুধু হারামী-জাদ্ভা। এখানে ভদ্রলোক থাকতে পারে না, শুয়োর, শুয়োর সব শালা শুয়োর। বতীন নিজেও এখানে থাকবে না। সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে চলে যাবে। সব শালা চোর-বদমাস-গুণ্ডা-বেজি-জোচ্চোর আর

নিজেকে হারাবো। এই হচ্ছে
মানুষের জীবনদর্শন।

যতীনের হাত থেকে পালাবো কোন
দিকে পণ্ডিত ভাবলেন. এতদিন পরে আবার
আমাদের পথ বন্ধ করতে এসেছ তুমি?

—কথা বলছে না বন্ধু কথা বলতে
আসে নি; নিজেই আসি 'সাবিত্রী'
হয়েছে—if that be grammatically
correct! তিন দিন ধরে ভেবেছেন,
পণ্ডিতজীর মনের নিভৃতে যে রয়েছি আমি,
সেকথা জানাবো কি

—তবে কি আমার মনের সাবিত্রীকে
নিজেই ওরা এনেছে?

—না ভাই নয়। আমি বন্ধু বলতে
চেয়েছি—তুমি কোনদিন পড়েছ পণ্ডিত?
পড় নি কোনদিন বুঝলেন

"Death is the liberator of her whom freedom cannot release; the physician of her whom medicine cannot cure; the comforter of her whom time cannot console."

—এ কথার অর্থ

—তোমার ধর্মপত্নীকে আমি যেটুকু
দিয়েছি তিনি বলেন বিশ্ব জয়ের চেয়ে
বিরাট তোমার। তোমাকে আমি
ভয় করে চলি পণ্ডিত। তুমি আমার
নিজেদের নিতৃতের একটি সাথক। তোমার
but stay bright সন্ধ্যাতারাটিই আমার
দরকার এ পদ্মলোচনি বললেন।
তা হলে তবু তোমাকে কোন বন-
কন্যেরা প্রার্থনা করলে তার বুকে জ্বলই
হবে বন্ধু! বন্ধুর কাছে না পাওয়ার; তোমার
স্ত্রী মুর্ছিত হয়েছেন।

ওঁর কথাগুলো এ মানুষ ভাবতেও
পারে না। হঠাৎ যতীনের বন্ধুর জন্য উতলাতে
ভরে ভিতর বন্ধু পাগে পাগে ফিরে
এসেছে. যতীন বলে, ওরে আসে, এ আমার
বন্ধু?

যতীন না, হয়তো বন্ধুত্বের বন্ধুকে
ওরা। বন্ধু ওকে ওর পাই না। পাগে পাগে
এগিয়ে এসে তার বাহুবেষ্টনে ধরা দেয়।
পণ্ডিত বলে, আমার কন্যা!

—কন্যা? daughter? সে তাহলে কি
হয়! আগে এ কথা তো জানতাম না। বাহানে
যাহা, পণ্ডিত! এর পর যে তোমাকে হিংসে
করতে ইচ্ছে হচ্ছে পণ্ডিত। এ্যাঁ! আমার
বইএর আলমারী ধরলাম। মনে হয় না সে।
তাহলে তার দেহ ফিরে হবে যাবে। তুমি
তো আমার চেয়ে জানবান। পড়ে বইই ধরে
নি. আলমারী আছে। সাইকে পড়ে পণ্ডিত?

"call not that man wretched, who, whatever ill he suffers, has a child to live (এ্যাঁ)?

বন্ধু বললে, আমার সঙ্গে খেলবে
তুমি?

By all means!
খেলব, কী খেলা হবে?

—ছাপাবাড়ি।

যতীন হতভম্ব যায়। বন্ধু আর
যতীন ছাপাবাড়ি খেলায় মেতে যায়। ইটের
টুকরো, বালি, নুড়ো নিয়ে আসে যতীন।
বন্ধু, ছাপা চড়ায়। যতীন বলে, তোমার নাম
কি বন্ধু?

—বন্ধু।

—সে তো সব বন্ধুরই নাম। তোমার
নাম কি?

পদ্মলোচনী ঠিক বুঝতে পারে না বন্ধু।
যতীন তখন পণ্ডিতকে বলে, ছেলের কি
নাম রেখেছ হে?

পণ্ডিত সলজ্জে বলেন, সাবিত্রী।

বন্ধু অবাক হয়ে শুনল কথা, সাবিত্রী
আবার নাম হয়?

হো-হো করে হেসে ওঠে যতীন। বলে,
নাম রাখা মেয়েকে নাম ধরে কোনদিন ডাকবি
নাকি পণ্ডিত।

পণ্ডিত অপরাধীর মতোই মাথাটা নেড়ে
বলেন, না!

—তুমি আস্তো নাম্বা পাঁড়ুই! ..

সত্যই এ নামে কোনদিন মেয়েকে তিনি
ডাকেন নি। আজই 'শুভদৃষ্টি এ নামটার
দীক্ষিত হিলেন। স্ত্রীর মুক্তকেশী পর্যন্ত,
এ নামের উৎপত্তিতে এবং ব্যুৎপত্তিতে স্বয়ংবরা
প্রধান হল এতদিনে।

যতীন নামকরণ নিয়ে হাসছে, ওরা
হাসছে ছাপা নিয়ে। ঝগড়া হয়।

পদ্মিনী বন্ধুকে উদ্দেশ্য করে বলে,
আপনি ওকে বন্ধু বলা। ভাল নতুন নাম
দিন বা হলে সারা জীবন ঐ বন্ধু হয়েই
থাকবে।

—না না, নামকরণটা তুমিই করবে

পদ্মিনী মুখ-চোখ লেখে বলেছিল, না
বাপ, আমার সাহস হয় না। অত বড়
পণ্ডিতের ছেলের নাম, ও আমি দেব কেন?

পণ্ডিত পদ্মিনীকে অনুরোধ করেছিলেন এ নাম-
করণের সহিত, পণ্ডিতের পরিচয়ের কোন
প্রশ্নই থাকবে নাই। তুমিই বল।

পদ্মিনী লজ্জায় বলেছিল, "আমার
ইচ্ছে; ওর নাম, হোক 'সাবিত্রী'।

পণ্ডিত বলেছিলেন, 'সাবিত্রী' কথাটা
পুরুষের। ওর অর্থ সূর্য, ঝলসিত।
'সাবিত্রী' শব্দটা ওর স্ত্রীলিঙ্গের রূপ।

পদ্মলোচনী ওকে শিখিয়েছিল পণ্ডিত।
এই ভয়েই সে এতক্ষণ কথা বলেনি। তবু
হাসা না করে বলে—না না, 'সাবিত্রী' নামের
ছেলেরা সুখী হয় না। আমি ধনের
সাবিত্রীকে চিনি—

—আহা! তুমি বুঝবে না। আমি
'সাবিত্রী' বলি নাই। সাবিত্রী হচ্ছেন ভক্ত-
পণ্ডিত কন্যা, সত্যবানের পত্নী;—সাবিত্রীর
অপর অর্থ সূর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, সাবিত্রী।

আমি বলি, 'সাবিত্রী'। সাবিত্র শব্দটার মৈল,
হয় সাবিত্রী।

পদ্মিনী বিস্মিত হয়ে বলেছিল, মত
ইংরিজি আমি বুঝি না, ওর নাম সাবিত্রী।

পণ্ডিত বিস্মিত হয়ে বলেছিলেন, কী
আশ্চর্য! বলেছিল না এটা পুলিশ পথ!..

পণ্ডিতের এ কথার আর জবাব দেয়নি।

বন্ধুর আর পোকাকী নামই রয়ে
গিয়েছে।

পণ্ডিত উঠানে আসন পেতে বসেন। যতীন
বলে, আমার মনের খুঁটি ছাড় নিজে পণ্ডিত:
বাড়িতে কি হয়েছে কে জানে। তার চেয়ে
বরঞ্চ বাড়িতেই খুঁটি পলাশ ছেয়ে যাই।

—আমার কিন্তু বাজনের কোন
আয়োজন নাই, ইবিষ্যান্নের ব্যবস্থা।

—তাহলে প্রসাদও তাই।

পণ্ডিত আসন ছাড়ে বুঝতে যান,
যতীন বন্ধুর পুতুলের আলমারী, খুলিয়ে
দেখে, বলে—এরে ভোমার পুতুল কই
বন্ধুমণি?

—আমার ঐসবও পুতুল নেই।

—এ কী ব্যাপার! পাষণ্ড একটা
পুতুলও কিনে দেয় নি তোমাকে? আচ্ছা,
কালই আমি তোমার জন্য একটা ভালদেখে
পুতুল নিয়ে আসব।

কথা বলতে বলতে আসে রাত। বন্ধু আর
যতীন, পাশাপাশি খেতে বসে। আজ সিদ্ধ,
মুগের ডাল সিদ্ধ, কাঁচকলা সিদ্ধ আর
ভাত। যতীন বলে,—পণ্ডিত তোমার কই?

পণ্ডিত বলেন, চরিত্রকালে আমি অন্ন
গ্রহণ করি না। আর ক্ষুধা তো একাদশী।

—আমার সঙ্গে তুমি যে একাদশী-
বৈরাগী এটা কেবল ছিল না আগে। একটা
কাঁচা লঙ্কা হবে? আমার সঙ্গে এসো।
কাঁচা লঙ্কা হবে তখন?

আচারান্তে, ঢেঁকুরে ঢেঁকুরে যতীন
বেরিয়ে যায়। খানিক পিছে আবার ফিরে
আসে, বলে : পণ্ডিত চীন দেশে একটা
প্রবাদ আছে, জানো, 'There are two
perfectly good men; one dead,
and the other unborn.' চীনে
যেতেও হবে না, আর এক দেশের
নিজেদের খাঁটি পাওয়া যাবে এই আশ্চর্য-
বর্ষে, নাই তিনিটির পাওয়া যেতে পারে,
যাদের কোন অবলম্বনই নেই, যারা অবেলায়
মনুষ্যত্বকে চাঁই মতো হারিয়ে যাবে, যারা
তোমার মত পাষণ্ড।

পণ্ডিত ওকে আশ্বাস দেয়, যাও-ভাই,
অনেক রাত হয়ে গেছে—

যতীন ঘুরে দাঁড়ায়, বলে—আবার,
কবে আসা আমাদের করছে? না বন্ধু! I'm
serious to the marrow of my bones!
তোমার মত পাষণ্ডের উপযুক্ত
স্থান এই কলকাতা শহরটা নয়। দেখছ না,
এর সর্বাঙ্গে ঘা হয়েছে। মাসে মাসে পচে ঘসে
পড়ছে। আমি ঐ রাস্তার ভিখারীর কথা
বলছি না, আমি বলছি মানুষের

মনের অলিগলির গুপ্তচরের কথা। তুমি ভেবেছ এ পরিচয়ের কথা কেউ জানে? না। কেউ নয়, আমি জানি।—মুখটা পণ্ডিতের কানের কাছে এনে বলে, পরিচয় রেজিস্ট্রার ডিসিজে হয়েছে। সংক্রামক মহামারী; সাবধান হো পাশাও। আমি পালাব। তুমিও কেটে পড়। তুমিও মরবে, তোমার খুকুও গো-ওয়েস্ট-ধন।

পণ্ডিত কাঁসের ঘরজাটা টেনে বন্ধ করে দেয় ওর মুখের উপর।

পরদিন সকালে পণ্ডিত সবারেই দেখে কাতুরিপিসির খোঁয়ারি। কিন্তু এই সাত সকালেই বাড়ি বাড়ি ছেড়ে বেরিয়েছে। উপবাস্ত বুড়িকে খাইয়ে হয়। দুই উপায়ন ক্ষয় পরের জন্য বদল করছে সে, ভোর সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত গতরে খেটে সুকিয়ে নেয় সেটা। তবু দুই পরিবারের মন পায় না। উঠোনটুকু সাফ করে পণ্ডিত কাতুরিপিসির সন্ধান পেলেন। একতাল গোবর নিয়ে পাঁচো পাঁচিলটার উপর মাটির সাথে ঘুঁটে দিচ্ছিল বুড়ি। পণ্ডিত সেখানে তার পদার্পণ করলেন। আজ ছেলেকে তার জিম্মায় রেখে যেতে চান।

বুড়ি, খিঁচিয়ে ওঠে—পারব নি, আমি পারব নি। কেন? যে-করতে যখন গিইছিলি তখন কাতুবুড়িকে শুধিয়ে গিইছিলি? তোর ওই মাগী যখন ভ্যাকোভিয়ে লগ্গে চলে গেল তখন কাতুবুড়িকে শুধিয়েছিলি?

নাছোড়বান্দা এ তর্কের সম্মুখে অসহায় বোধ করলেন।

সত্যই তো। বন্ধ্যা সমস্ত দিন হাড় ভাঙা খাটুনি খেটে, ছেলে ভাল রেখে না সংসারের ঐ পরিমাণ কাজ সামলে সে কোথা থেকে খুকুকে রাখবে?

বাবা ঘরে ফিরে আসেন ঘরে। খুকুকে বাইরে নিয়েও খেলে নেন। এটা বাসনগুলো মেজে, সব ঘরে পড়ছে খুকুকে বলেন, তোর মা ঘুম দিয়ে না তোকে?

—দিত তো বাবা।

—কোন মোয়ালা ঘুম দিয়ে যেত?

—তা তো জানি না বাবা।

পণ্ডিত চটে ওঠেন। খুকু কিছুই খবর রাখে না। তারপর খেয়াল হয় এমনা ঐ লিলুকে মোকরোপ করাটা অন্যায় হচ্ছে তাঁর। তিনি নিজেই তো জানেন না, কোন মোয়ালায় ঘুম দিয়ে যায়, কখন দিয়ে যায়।

খুকুকে ডেকে বলেন, তুমি আজ ঘরের মধ্যেই থাক মা-মণি। রাত্রি বাইরে থেকে তালাবন্ধ করে দিয়ে যাই। ভাবনাকাটি কর না, কেমন? লক্ষ্মী মেয়ে।

বাপছাড়া খোকাকি খুকু আপত্তি করতে পারে না। পুরনো একখানা বইয়ের ছবি দেখছিল সে। অন্যমনস্কের মত মাথা নেড়ে বললে—আচ্ছা।

আর ঘরে তালা বন্ধ করে স্কুলে চলে গেলেন পণ্ডিত। সমস্ত দিন কোথা দিয়ে কেটে গেল। শেষ পিরিয়ড শেষ হলে মনে পড়ল মেয়ের কথা। তাড়া খেয়েছি সমস্ত দিন ঐটুকু ঘরে বন্দী হয়ে আছে। ঘুমোচ্ছে হয়তো। হনহনিয়ে বাড়ি ফিরে আসেন। ঘরের কাছে এসে পশ্চিমের জানালা দিয়ে উঁকি মেরে ভিতরে তাকিয়েই একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পেলেন :

খুকু কাঁসের ঘরজাটার কাছে হাঁটু গেড়ে বসেছে। হাত দিয়ে ঘরজাটা ঠেলছে না। বাড়ির ঘোলাকের মত নিরাসক্ত ভঙ্গিতে সেই কাঁসের ঘরজার মাথা খুঁড়ছে, আর বলছে—মা, মা-মণি! আর কোন দুষ্টুমি আমি করব না, তুমি ফিরে এস। মা গো, মা, মা-মণি গো।

খুকুর মাথা খুঁড়ে ওঠে পণ্ডিতের : প্রায় দু-দিন খুকু মায়ের নাম উচ্চারণ করে নি। তার কচি বুদ্ধিতে সে কী বুঝেছে তা সেই জানে। প্রথম বিশ্বের পর আর সে নিয়ে কেউ মায়ের কথা বলে নি। পণ্ডিত ভেবেছিলেন, মায়ের কথা সে বুঝি ভুলেই গেছে। এই মুহূর্তে প্রত্যক্ষ করলেন, না, খুকুও ভোলে নি। সে ভেবেছে এ তার কোন অপরাধের শাস্তি। তাই এই নির্জন ঘরে পায়ের সবটুকু আকুতি উজাড় করে সে এখন মাকে ডাকছে আর বন্ধ ঘরজার মাথা খুঁড়ছে।

ঘরজা খুলে দিতেই খুকু ঝাঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

পণ্ডিত দু হাতে বাড়িয়ে ওকে বুকে টেনে ধরতে গেলেন। ছিটকে সরে গেল খুকু, দু হাতে মুখ ঢেকে কেওয়াড়ের দিকে ফিরে ভুকরে ভুকরে কাঁদতে থাকে। মুখা লম্বা-চওড়া মানুষটা আট বিশেষজ্ঞ।

না। খুকু কাতুপিসির কথাটুকু নিতান্ত ঠাট্টাচ্ছলে ভাবেন। উপায় ছিল না বেচারির। খুকু শিশু, ঘুমোও সোজাসুজি ভেতে অভ্যস্ত! ও ঘর নেয়ো না-কথায় আপাত বৈধিক পরিচয়টা বাধ হয়ে গেছে তার। ঘরের কোণটাতে আজও জল রাখতে ভুলে গেছেন পণ্ডিত। সমস্ত দিন বিশ্বের ঘামাচিতে ২৫° ডোবেছে! কতো ঘুনি অপরাধীকে ছেড়ে, সাচ্ছন্দ থাকে, যার তাও দেয় নি তাকে। বাবের কথা তাই ওর মনে পড়ে নি। কোন অপরাধে তার এ শাস্তি বিধান করা হল, ও সে জানে না; কিন্তু চিরদিন যিনি ওকে এ লজ্জা নিবারণে সাহায্য করেছেন তাঁকেই মনে পড়ে গিয়েছিল ওর। ঘুমন্তের পেটের মতো দুলছে উঠেছে,—বাঁচি করে ফেলেছে। তারপর কলসীতে এক ফোঁটা জল নেই দেখে সেই ভিজে জন্তু অন্ত্র দোষ ভিজেটুকু নেতে অন্ধকারে সে মাকে ডেকেছে। বাবে বাবে কাঁসের ঘরজায় মাথা খুঁড়ে বলেছে : আর কোন দুষ্টুমি কুমি করব না মাবে। তুমি ফিরে এস। মা-মা গো। মা-মণি আমার।

পণ্ডিতের মনে হল এ লজ্জা খুকুর নয়; এ লজ্জা তাঁর। তিনি অসহায়, তিনি অপরাধী। খুকুর এ শাস্তি তাঁরই অপরাধের কলাকে লজ্জা নিবারণের সুযোগ তিনি দিতে পারেন নি। বুকের মধ্যে হু হু করে উঠল তাঁর।

আকাশের দিকে দুই হাত উঁচু করে মাথা নত করে ওঠেন : এ কী ছলনা আমাকে বিভ্রান্ত করলেন।

দরজা খোলা পেয়েই খুকু ছুটে বেরিয়ে গেল।

একটু পরেই এলেন কাতুপিসি। খুকু নিরুদ্দেশ হয়ে তাঁরই দায়িত্ব হয়েছে। হয়তো দুঃখ কাতুবিধি মেয়ে মানুষ, নাতনির সহজেই লক্ষ্মায় তার মনে হয়েছে বাপের চেয়ে এ বিষয়ে কাতুপিসিই অগ্রগণ্য। এক বালতি জল আর কাঁটা হাতে কাতুপিসি আবির্ভূত একপাশে ঘরে দাঁড়ালেন পণ্ডিত। এ কাঁটাটাই পণ্ডিতের মুখের সম্মুখে নেড়ে খেঁকিয়ে উঠল কাতুবুড়ি— ঠিকই বলে গাই, তুই পাষণ্ড। তুই ঘোর পাষণ্ড। দয়া মায়া বলে কিছুই কি নাই গা এ পোড়া তলোয়াটায়? ঐটুকু মরের ছানাকে তুই কোন আক্কেলে এমন করে দেলি? এমনি করে দু-দুটোর মাকখানে হুখে কষ্টে না মেরে গলায় না দিয়ে প্রাণটাকে মেরে ফেলু না। সোজে বিষ দে এলে খাইয়ে দে। লাটা চুকে যায়। সে মরে এখান থেকে, মাবে কাঁটা লগবে।

প্রায় প্রায় পণ্ডিত কাতুপিসির পদাঘাতে সম্বোধনে কোন প্রতিবাদ করেন না। সমস্ত তিরস্কার মাথা পেতে নিলেন। হাঁ, অপরাধটা সম্পূর্ণ তাঁরই।

গোবর জল দিয়ে ঘরটা ধুতে ধুতে কাতুবুড়ি এক নাগাড়ে গজ গজ করতে থাকে। ভেদ্রা কত মারবে। তখন বাবার ছাতের ঠ্যাঙাতে বাওয়ার আগে এক হাঁড়ির নেয়েটারে নড়া ধরে আমার কাছে বসিয়ে দিয়ে যেও। তা কথা কানে তোল না; যায় দেখিয়ে ঘরে তালাবন্ধ করে যাওয়া হল। এখন দু-মুখ খুকুকে কয়ে কে?

খুকু পাশটা বদলে চৌকির উপর উবুড় হয়ে পড়েছে। দুরন্ত অভিমানে বালিশে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদছে।

কেমন করে ওর অভিমান ভাঙাবেন পণ্ডিত ভেবে পান না।

সন্ধ্যার পর মধ্যরাত্রি ঘতীন এসে হাজির। আরও মদ্যপান করে এসেছে। আর কিছু না খেলে এখনে আসতেই বা কেন? মহাপান জানতেই তো সে গ্রামে তালিতাকে তোলেনে। মদে চুর হয়ে পড়ার সঙ্গেই তার মনে পড়ে যায় পণ্ডিতের কথা। আর ঘতীন একটা সুন্দর পদ্মফুল নিয়ে এসেছে। জন্ত তার-পদ্মফুল পেয়ে খুকুর অভিমান ভুলে যাবার উপর হয়েছে তার, তাই আর ঘতীনকে আরও নিবিড় করে টানতে ধরে। ঘতীন আর খুকু ধরনে খেলা ঘরের সংসার পাতে। সেটা ঘতীন খুকুকে নামান পাত; তোলাই করা মন ওদের খুকুদের বড়দের তাদেরকে মিটিয়ে দেয়। দুটি শিশুর সে খেলা ঘরের সত্যকার স্বামীটা খুঁজে পায় না পণ্ডিত। খুকুতে পারেন, ওদের সে খেলাঘরে

হিনি অন্যকথা বলছেন। পণ্ডিত বাবার যোগাড়ে ছন দেন। ওরা ভ্রুক্ষেপও করে না। ওদের খেলা চলে ওঠে। হঠাৎ মাথাটা ঝুকুকে বলল, কাটস, যেন অনন্তের ঈশ্বরই শোনায়। ঝুকু একমনে শোনে। ঝুকুও ছড়া শোনায় : শিব ঠাকুরের আপন দেশে, আইনস্টাইন সবদেশে।

হঠাৎ বলে, এক্সাক্টলি! সেই শিব-ঠাকুরের আপন দেশটা কোথায় গেল ঝুকু-মণি?

—কোথাও থাকু।

—হিস্ দাদা-সিটি! এই কলকাতা শহর। এখানে কেউ যদি ধার শিধলে পড়ে, অমনি পাওনা এসে পাকড়ে ধরে। এখানে ব্রাহ্মণের কলার খোলা ফেলা, কেউ মানা করবে না, কিন্তু সেই কলার খোলায় পা দিয়ে পিছলে পড়, অমনি তোমাকে দেনাদার এসে চেপে ধরবে।

ঝুকু বলে, যাবো। তা কেন? কেউ পড়ে গেলে তাকে তো ধরে তুলতে হয়।

হঠাৎ মাথা নেড়ে বলে : উঁহু, হু। সে হবে না। সেটা পুরনো আইন। এখন ও আইন বাতিল। এখন হচ্ছে একদম অন্য আইন। এখন যদি পিছলে পড়ে গেলে ঐসো তার পিঠে সোটাসা সমেত উঠে বসবে, বলবে, ওঠ বলছি ওঠ।

তারপর তার পিঠে দমাদম লাথাবে আর বলবে, ওঠ বলছি ওঠ।

ঝুকু খিল খিল করে হেসে ওঠে হঠাৎের ভাবভঙ্গি দেখে।

—হাসি নয়। সত্যি বলছি। এখন দেখছে কার্জনপার্কের ধারে লোকা অন্ধকে মারছে লাথি ঘুষি লাথি পর্যন্ত পাইবে। কিন্তু মনেও কি করবে? আমরা দাদা সে ছোঁবে কেন বল? তার বদলে মানুষকে মারি বলো ছোঁবার ভয় একদম পেড়ে ফেলেছি; আমার কোন শান্তি নেই। এ যে একদম আইনের বেশ। তুমি পালা। নয়তো ঝুকুকে কি তোমাকে পাড়ারা এসে পাকড়ে ধরবে।

পণ্ডিত ভয়ের তাল পাল্টাতে পাল্টাতে আড়চোখে একবার তাকান। ঝুকুকে ওঁঠাতে পারেন না, এ কি হঠাৎের মাতলামী, না কি সে জানতে পেরেছে যে ঝুকুকে আগে তিনিই মহলার মধ্যে ফেলে ফেলেছিলেন, পণ্ডিত ঝুকুই পেয়েছে তিনি নন। অথবা হঠাৎ নিজের তীব্র দেখার সামে এই সমস্যাকে বাদ করছে।

হঠাৎ তখনও বলে চলেছে, মহলা না ঝুকুর ঔসাইস মার খাও। অমনি মস্ত মস্ত গাড়ি আসবে। তোমাদের নিয়ে যাবে বিরাট পুলিসে। হাজার কাঁচির বোলবাইরে তোমার সেই চিনে দেখবে। তারপর বলবে, এ অন্যায়ে ভারিত মতো নয়, এ বেশী বয়সে সেই মেরে ফেলেছে।

সেই ফেটে মরার আয়নাটা হঠাৎ ছিঁড়ে হয়ে ঝুকুর পায়ে পৌঁছে দেয়।

ঝুকু আবার খিল খিল করে হেসে ওঠে।

হাঁ ওস্তাদ হয়ে আসে। ঝুকুর মুখ পায়। সে শুয়েপড়ে। হঠাৎ আর খায় নি, বলে না মারা বোম বোম ও এলাকাটা বৈরাগীর হবিষ্যান্নে আমার পোষাবে না। হঠাৎকে পণ্ডিত স্যার পর্যন্ত এগিয়ে দেয়।

যাবার সময় হঠাৎ বলে, এখনও বলছি পণ্ডিত, কেটে পড় যাওয়া। ও সব ছেলে ঠোঁকরে কিলসুন হবে না। ও মাস্টার জান-সার হয়েছে ঝামেলার। ও শিবের অসাধ্য। বাঁচতে চাও তো কেটে পড়, আর ঝুকুটাকে যদি বাঁচাতে চাও—

পণ্ডিতের মনটা আর ভাল ছিল না। না হলে, মনসাকে, মনের দুঃখের কথা কাল খেলাতেন না। হঠাৎ বলে ওঠেন, ঝুকুকে নিয়েই হয়েছে আমার চিন্তা। কি যে করি?

—শুনবে? আমার পরামর্শ শুনবে? এখান থেকে সেটে কেটে পড়। সাওতাল পরগণার চলে যাও। সেখানে এখনও মানুষের সন্ধান পাবে। তারা নেটিভ পরে থাকে; কিন্তু তারা খাঁটি মানুষ। আমার মত নিলে এত, এতে আর এক নয়, হিপোক্রিট নয়। তুমি এখনে চলে যাও। সেখানে আমার একটা ফার্মহাউস আছে। তার ম্যানেজার করে দিচ্ছি তোমায়। সোজা চলে যাও সেখানে।

পণ্ডিত তদ্গতভাবে ওড়িয়ে যান। বলেন, আচ্ছা, ভেবে দেখি।

—তাই, তাই; আমার কথা ভাববে বই কি। এই নাও আমার ফার্মখানা রাখা। ভাবনার সুরাহা হলে আমায় মনে দেখা করা।

মানিব্যাগ খুলে সুদেষ্ণা একখানা কার্ড বার করে দেয় হঠাৎ মাতালকে।

পরদিন ভাতুখুড়ি এসে বললে, হাঁ পণ্ডিত তুই ঝুকু আনতে যাবুনে?

—ঝুকু আনতে যাব? কোথা থেকে।

—ও আমার সোড়া কপাল! দেখ, ঝুকুকে দেখ—ভার্মখানা কোথায় রেখে গেছে সে আবাগী। রোজ হিজলে যে হরিণখাটার তিপো থেকে ঝুকুর মা ঝুকু আনত।

পণ্ডিত বলেন, ও বেলা এসে অনেকক্ষণ করে দেখব দিদি। এখন আমার বিলম্ব হয়ে যাবে। মা-মণি থাকল, তুমি একটু দেখ।

কাউ দিদির জিম্মায় ঝুকুকে গচ্ছিত রেখে পণ্ডিত স্কুলে চলেন। ছেড়ে দেখলেন, এই ব্যবস্থাই সব চেয়ে ভাল। ঝুকুর বেলা মেয়েকে একা রেখেও যাওয়া যায় না, আবার ভালো কর করেও রেখে যাওয়া চলে না। একটা বিপদজনক, একটা অস্বাভাবিক। দাঁড়ায় কম একটা পাখীর ডানাটাও ঝুকুর যদি কম করে মেয়েটা পাখা ওঠপট করে তাহলে তাঁর বিদ্যাদানের ব্রতও ব্যর্থ হয়ে যায়। ছাত্রদের তিনি উপদেশ দেন, ব্রাহ্মণিক কথন থেকে আত্মাকে, অন্তরিপুর শিওরল থেকে স্নেহ-মমতে ঝুকুর প্রাণতে। ভাবেন, মাস্টারের কথাতে ঝুকু-বিকৃত হও ক্ষতি নেই, মনুষ্যত্ব হারিও না। আত্মাকে মুক্তি দেও। তাঁর সে বাণী সংস্কারের ব্রত পোলাবে না বলে তিনি ঐটুকু একটা মেয়েকে বন্দী করে রেখে যান। এ ভালই হল। কাউদিদির বাড়িতে মেওয়ার নিশ্চিন্ত হলেন তিনি।

কিন্তু ধুর্তামণি পণ্ডিতের এ ব্যবস্থাও খোপে টিকল না। সন্ধ্যায় তিনি ফিরে আসতেই কাউদিদির মেয়ের হাত ধরে পৌঁছে দিয়ে গেল। আঁচলে চোখটা মুছতে মুছতে বললে—নে বাবা, তোর ধন তুই ফেরত নে।

—কি হল হঠাৎ? অবাক হন পণ্ডিত।

—আমার সে আমলাও নেই, সে ধৈর্যবলও নেই।

ঝুকু মুখটা চুন করে দাঁড়িয়ে থাকে দরজার পাশে।

—তোমার চোখ অমন ফুলো কেন দিদি?

—তোর ছেলেকে নে তুলকালাম কাণ্ড বেধেছে সারাদিন। পরের ঘরে বসে বিড়ি তার খাবি, এ সব উঠতো আমেলা আমার বেটীর ধোরা সইবে না।

—ও। এই।

—শুধু এই নয়। তোর ছেলেকে খুঁচে আর ছোটন সারা দিন ঠোঁকরেছে, চিমটি কেটেছে আর চুল টেনেছে।

—কেন কেন? মা-মণি তো দুষ্টুমি করে না কিছু।

—দুষ্টুমি কেন করবে? তার পুতুলটা নিয়েই তো ঝগড়া। ছোটন সেটাকে টুকরো টুকরো করে ভেঙেছে। তাই নিয়ে কথা বলতে গেলুম, তাতে আমার কি হাল হয়েছে দেখ্।

তার হাতের কনুইটা তুলে দেখায়। ছেঁড়ে গেছে অনেকটা।

—এমন হল কি করে? বিস্ময়াহত পণ্ডিত সমস্যা না করে পারেন না।

—ছোটনের মা বাকুম বারলে, আমি উঠে পড়ে গেলুম।

পণ্ডিত কি বলবেন, কি করবেন ভেবে পেলেন না। নজরে পড়ে ছোটনের একগুচ্ছ ঝুকুমণি বাঁকিয়ে আছে তার পুতুলের ছিন্ন বিচ্ছিন্ন অঙ্গ-পতাকাগুলি আঁকড়ে। উসু উসু করে চোখ থেকে জল ঝরে পড়ছে তার।

—পরের সন্তানের একমুঠো ভাতের আশায় পড়ে আছি বাবা। আমাকে আর সেখান থেকে তাড়াস নে। নে, তোর বন্ধুকে নিয়ে যা ইচ্ছে করিস, আমার পিত্যেশী আর হস নে—

চোখে আঁচল চাপা দিয়ে ভে-ভাঁ করে কাঁদতে কাঁদতে কাউবুড়ি চলে যায়।

পণ্ডিত বলেন, সেঁধ পুতুলটা। ওটা মেরামত করা যায় কিনা।

খুকু পুতুলের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন এবং মূর্তি করতিয়ের ছেলে দেয় মাটিতে।

চলমাটা ঠিক করে নিয়ে পণ্ডিত সেগুলি পরীক্ষা করে দেখেন। না, খেলা-ঘরের পুতুলই ওটা না। শুধু ছিন্ন-বিচ্ছিন্নই নয়, রেন্ত দিয়ে সেগুলি ভালো ভাবে জোড়া হয়েছে। ও আর জোড়া লাগবে না।

স্কুল থেকে ফেরার পথেই পণ্ডিত কিছু মিষ্টি নিয়ে এসেছিলেন। বলেন, আর যা-খুশি আমরা কিছু খেয়ে নিই। বউদিদিকে বলব, যে ওর অপেক্ষা আরও ভাল একটা পুতুলই নিয়ে যাবে।

খুকু চোখ মুছে এগিয়ে আসে।

সন্ধ্যার পর হরতন যাতাল ঠিকই এসে হাজির হয়। আজও সে একটা পুতুল নিয়ে এসেছে। এবার কাঠের পুতুল। অন্যের পুতুলটার মর্মান্তিক অপঘাত মৃত্যুর কথা শুনে হরতন বললে, এ তো আমি জানতামই। তোমার পুতুলকে ওরা তো শান্ত থাকতে দেবে না। তুমি পুতুলটাকে তালবেসেছিলে কিনা, একটু আইনের ছেলে ভালবাসা বাসে। তাই ওরে তোমার পুতুলটাকে মেরে ফেলেছে, তারপর সেই ছিন্নে দেখেছে এটা অনাহার মৃত্যু কিনা। তাই আজ কয়টার পুতুল নিয়ে এসেছি। এর সেই কাটা হাত পড়বে না, হাঁ হাঁ বাবা! তোমার বেন্ত ছেড়ে যাবে এর সেই কাটতে গেলে!

খুকু বলে—কাকু তাহলে কি ওদের ভালবাসব না? ভালবাসলেই সে ওরা এটাকে মেরে ফেলবে!

হরতন বলে—তা কেন? ওরা তাদের খেলা খেলবে, ওরা ভাঙবে। আমরা ভাল বাসার খেলা খেলব, আমরা পুতুলকে ভালবাসব। তবে পুতুলকে শক্ত করে গড়ে তুলতে হবে। যাতে সে দু'দা নিতে পারে, দু'দা দিতেও পারে।

পণ্ডিত আরও আড়চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন। হরতনের সবটাই মাতলামো। কিন্তু পণ্ডিতের মনে হয়, সবটাই বুঝি মাতলামো নয়।

ছোট কথা পুতুল পেয়ে খুকু তার দুঃখ ভুলে যায়। হরতন মাতালকে সে রীতিমত পেয়ে বসেছে। ঐ তার একমাত্র বন্ধু। তাকে রান্না করে খাওয়ায়, তাকে ঘুম পাড়ায়। হরতন সমস্ত দিনমান কী করে সে সেই জানে; কিন্তু সন্ধ্যার পর সে সেই দুর্দিনরাত্রবাসীকে ভুলতে চায়। খুকুর ঐ ছোট মনোরাজ্যে যারা গড়িয়ে আসে তখন সে অকূলে হয়ে ওঠে। সারাটা দিন সে যে বিষ পান করে সন্ধ্যায় ফিরে-ফেরিনে এসে অন্তত পানে সে বিষক্রিয়াকে ভুলে যায়। তখন নিজের মত নিজের মনে সে নিজের সমস্তটুকু মেলে আনে। অনর্গল মোকেনয়াওয়ার, হেগেল, কীর্কেগর আওড়ে যায় খুকুর ওরে। হরতনের বিশ্বাস ওর কথা একমাত্র খুকুই বুঝবে।

পণ্ডিত খুকুরো সমস্ত পণ্ডিত রামবিহারীর ছেলের দিকে একটু ছেলেকে দেখে ঘণ্টার চলা পড়তে যান। বিরাট বড়লোকের বাড়ি। একদালে গ্রামিবাস ছিলেন, বর্তমানে গ্রামিবারী নেই—কিন্তু অর্থ আছে পুরুষে। অর্থের প্রতিমান পুরুষ। ছেলেটি হায়ার সেকেন্ডারি দেবে। তার বাবা রায় গোপালবাবুর অর্থের যখন অভাব নেই, তখন তিনি পুত্রের পাঠ্য বিষয়ে পরিবর্তনের জন্য পণ্ডিত পণ্ডিত শিক্ষক রাখবেন এ আর আশ্চর্য কি? সংস্কৃত ভাষাটা পড়তে ঘটনাই, কিন্তু রায় গোপাল বিবেচনা করে দেখেছেন ছাত্রটা ওটাতে সচরাচর ফেল করে না। এ বিষয়ে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও আছে। নিজে তিনি চার-চারবার ম্যাট্রিকে পরীক্ষা দিয়েছেন, অঙ্ক কোন বারই সংস্কৃতে ফেল করেন নি। হয় ঐ ইংরাজি, নয় অঙ্কে—নিজের ভাষায়। তাই ছেলের বেলা বিষয়-নির্বাচনের ব্যাপারে প্রবলভাবে সভার সমস্তটা ভার অন্য নিয়েছেন। পণ্ডিত পণ্ডিতের মনে হয় যাঁরা বরাবর পাঁতি পড়েছেন সকাল সাতটা থেকে সাড়ে সাতটা। চন্দ্রবাবুও ঐ ছেলেটিকে পড়ান; ইংরাজি। নিয়ে চার-বারে ম্যাট্রিকে দিয়ে রামদুলাল পরীক্ষার ঘাঁর সোর তালবইই খুলে ফেলেছেন। তাই চন্দ্রবাবুকে আসতে হয় সপ্তাহে তিন দিন। পণ্ডিত পণ্ডিতের সপ্তাহে দেড় ঘণ্টা হিসাবে মাসে ছয় ঘণ্টা পড়ান ছেলেটিকে। এ জন্য মাইনে মুলা সাত টাকা রামদুলাল।

গ্রামিবারী নেই, কিন্তু রায়দুলাল পড়েছেই কর্মচারীর। চেয়ারে বসে থাকেন নি। গ্রামিবারীর অভিপ্রায় ব্যবহ যে টাকাটা পেয়েছেন তার একটা বড় অংশ পেয়ে খুলে বসেছেন একটা লোহা-লক্কড়ের কারবার। লোহার পাত, চাদর, এ্যাংগেল, তারের জাল, কি আর কি মালিকের বিরাট স্টক তাঁর। হরতনের লোহাপট্টিতে তাঁর ছোট দোকান, কিন্তু ভিতরে বিরাট গুদাম। টেবিলের উপর দু-দুটো টেলিফোন। তিনি নিয়ে কারবার দেখাশোনা করেন, কর্মচারীদের পরিচালনা করার দায়িত্বটা কোন ম্যানেজারকে ছেড়ে দেন নি।

পণ্ডিত অট্টাচার্যের মতামত সংসার। চন্দ্রবাবু এই ছাত্রটির সন্ধান এনে দিয়েছিলেন। রায় গোপালের পুত্র, রায়দুলাল—কাকনাদ দুলাল। ওঁদেরই স্কুলে দুলাল পড়ে। স্কুলেরই কয়েন মাস্টারমশাই পাকা করে দুলালকে পড়ান। ফলে একবারও না আটকে সে উঠে গেছে শেষ ক্লাস পর্যন্ত। সে সুবোধ বালক কিনা তার জানার প্রয়োজন হোটে নি। এজন্য অবশ্য রায়গোপাল তাঁর স্বর্গত পিতৃদেবকে দায়ী করে থাকেন। রায়গোপালের জন্য তাঁর পিতৃদেবের অক্ষরজ্ঞানের অভাব ছিলনা। স্কুলে তিনি ভরপুর করতেন সেই স্কুল থেকে গৃহ-শিক্ষক সংসর্গ না করে তিনি কোয়াকের সঙ্গে কলেজের অধ্যাপকদের করে এনেছিলেন। ফলে রায়গোপাল পঞ্চমবার ম্যাট্রিকে দেবার সুযোগ পেয়েছিলেন বিশ বছর বয়সে। নাকাঁচিতত অভিজ্ঞতা থেকে সে জ্ঞান নিয়ে পুতের বেলা আর হতে যেন নিঃ দুলাল তাই ছোট বয়স বয়সেই শেষ পরীক্ষার 'আলাও' হয়েছে।

কিন্তু লোহার ব্যবসাটা দোহ-কঠিন তিনি জানতেন আসল সমস্যা দেখা দেবে হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষায় সময়ে। সে বড় সমস্যাটার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। নড়ও চাঁই। যাঁরা এ পরীক্ষায় বিভিন্ন স্কুলসমূহের পরিচালক তাঁদের সন্ধান জানা ছিল না তাঁর, না হলে একবার চেষ্টা করে দেখতেন তাঁদের আনা যায় কিনা। ছেলেদের এই মাস্টারমশাইকে তাড়িয়ে তাদের বাহাল করতেন সে ছেড়ে।

রায়গোপাল একটি বিচিত্র চরিত্র। সুখের দিনের আলোয় সরল মানুষ পণ্ডিত মনে মনে ভেবেছিলেন, লোকে রায়গোপালবাবুর এত বদনাম করে, কিন্তু আসলে লোক তো তিনি মন্দই দেখছেন। এ রকম নির্ভেজাল খাঁটি মানুষ তো তিনি জগতে কখনও দেখেন নি।

এ রকম একটা ধারণা পণ্ডিত পণ্ডিত কেন করেছিলেন জানতে হলে তার বিশ্লেষণের সময়ে পঞ্চম দিনের কিন্তু অধ্যায়ন এখানে লিপিবদ্ধ করতে হয়।

চন্দ্রকান্তবাবুর নির্দেশ মত পণ্ডিত পণ্ডিত এসে দেখা করেছিলেন রায়-গোপালের সঙ্গে তাঁর রায়বিহারীর উপর বানানো পুরোনো বাড়িটার বৈঠকখানায়। পারিবারিক কথাবার্তার পর রায়গোপাল বললেন, তাহলে এই কথাই পাকা রইল পণ্ডিতমশাই, আপনি দুলালকে পড়াবেন সকাল সাতটা থেকে সাড়ে আটটা পর্যন্ত পাঁচদিন যাবেন। সপ্তাহে একদিন। কিন্তু আমার একটি সর্ত আছে—

—বলুন।

—আপনাকে সপ্তাহে একদিন হিসাবে মাসে চার দিন পড়াতে হবে; এবং মাসান্তে আপনাকে আট টাকা দেওয়ার কথা, আমি এগারো করব, আপনি পড়াতে পনের দিন করে নিয়ে যান। সহজ হিসাব, চার-পনের আট। যদি কোন মাসে পাঁচটা শুক্রবার পড়ে, তার দায় আমি দাবী—সে মাসে আপনি পাবেন পাঁচ-চুনেরং পঁচাত্তর।

পণ্ডিত একটু অবাক হয়ে বলেন, এমন ব্যবস্থা করার হেতু?

রায়গোপাল হাত দুটি জোড় করে বলেন, সে আপনি বুঝবেন না পণ্ডিত-মশাই। আপনি পণ্ডিত মানুষ—ভগবান-ব্রাহ্মণ-

আপ্যায়ন-অভ্যর্থনা নিয়ে ব্যস্ত। আমি লোহার ব্যবসায়ী। ব্যবসায়ের হিসাবটা আমিই ভাল বুঝি। ওটা আমার উপর ছেড়ে দিন। দেখুন, আমার জীবনের ধর্মে এসেছে, আমি কারও ধার ধারি না, কারু আমি নিই না, ধার দিইও না। কারও কাছে ঋণী আমি এটা মনে হলেই রাত্রে আমার ঘুমানো হয়। মনের সুখের শুরুবার থেকেই আমি আপনার কাছে ঋণী থাকতে রাজি নই। ভিবেচনা করে দেখুন, ব্যবসাবাণী ধরে-ধার আমলে কি দাঁড়াচ্ছে? মাসান্তের সময় থেকে মাসের পরের শুক্রবার থেকে মাসের শেষ দিন পর্যন্ত আমি কর্মব্যস্ত থাকলে আপনার কষ্টে আনন্দ থাকবে না না, —ওহমশাই—আমি তাতে কিছুতেই রাজি নই।

দুলালের পাণ্ডিত্য বীতিমত প্রভাব হয়ে গিয়েছিলেন। এমন ঘাটি মানুষ আজও তাহলে অবশ্য পৃথিবীতে রয়েছে?

বলেছিলেন, উত্তম পাওনার, আমি কি ভদ্রা আপনার অভিপ্রায় জানতে পারি?

পরের শুক্রবারের ভাঁড়ার কাজ করে ঈশানিত হয়েছেন। বাড়ি দেখবার প্রয়োজন হত না, ঠিক সময়ে আটটায় একজন ভদ্রো এসে একটি মুখবন্ধ খাম রেখে যেতে পারবার চেষ্টা করে। বাড়ি এসে খুলে দেখতেন তাতে একশো নোটে পনেরটি টাকা।

পরে একদিন এ পক্ষের তুলেছিলেন চিত্তরঞ্জনকে। শুনে হো হো করে হেসে উঠেছিলেন অক্ষয়বাবু আর চন্দ্রবাবু। অক্ষয়বাবু বলেন— ওহো, পাণ্ডিতমশাই, আপনিও ঐ ফাঁদে পড়েছেন

—ফাঁদে? ফাঁদ কিসের? আমি তো ঠিক বুঝি না.

—ওরে ভদ্রা রামগোপাল একটি বাঘ, বুঝ! ও ঘরে কখনো পড়িয়েছেন শুকোচোরকে?

—দুই দিন মাত্র। বাকি দুই দিন সে অনুপস্থিত ছিল।

—তবু তো তিনটি টাকা জুটেছে বেহাতে। এরপর এমন অবস্থা হবে যে ছেলে হাত থেকে ও বাড়ির পেটে পাঠাতে দিতে যাবেন। হাসি নয়, আমি তাই বলি। ছাত্রের দুদিন সেই কাজলাতা ছোকরা গিয়ে ওদের বাড়ির সামনে চেয়ের মোতায়েন থাকে ফল বাড়ি। আমার হচ্ছে মোর-বুঝ: বিশ্বাস না হয় চন্দ্রবাবুকে জিজ্ঞাসা করুন। উনি আমার পরোয়ানের সঙ্গে ভদ্রতারীর ব্যবস্থা করেছেন। মঙ্গল-বৃহস্পতি আর শনিবার সকালে পরোয়ানা বিহুতেই ছোটবাবুকে বাড়ির বাইরে যেতে দেব না।

দুলালের পাণ্ডিত্য পাণ্ডিত্য হয়ে গিয়েছিলেন।

চন্দ্রবাবু বলেন, আঁত খুব ঐ রাম-গোপাল লোকটা। আমি তো আরও তিনবার এসেছি কাঁচা একটু ঝড়-বৃষ্টি হল, কি একটা বেরাদবি হল, কি কোন বেয়াড়া-পনেরো বোক মাথা নোয়েন, আমি তামাই করি। আমার ওদিকে ছাতেরই পরীর খারাপ হল, ডাক্তার দিতে আসল, কিন্তা ছাত দিলেনার টিকো কেটে ফেলেছে— কি বলা যায়, পড়ানো বন্ধ থাকে। মাসান্তে মাইনে ঠিকই পাই; কিন্তু দুলালের বেলা তা হবার উপায় নেই। আমি অনুপস্থিত কিনা ছাত্র অনুপস্থিত? তো সেই বাস-ওলার ভূতাটিও অনুপস্থিত! ফেল করি মাস হেল— মাসোমাস কালোবাজারের মত নগদ আদায়। ধার সে রাখবে না। ধার আদায় আর মাকি খুতে খুব হয় না!

পরদিন সেই চিত্তিয়ার শুক্রবার। এত-দিন কোন হালমা ছিল না। সকালে বাজারটা সেরে দিয়ে ছাতা মাথায় চলে গেলেন ছাত্রবাড়ি। থাকটা পকেটে নিয়ে গিয়ে আসলেন নটা নাগাদ। স্নান ক'রে খাওয়াদাওয়া সেরে থাকে। পরীক্ষার খাতা দেখবে খাকত। দুটো নাকে-মুখে গুঁজে চলে যেতেন স্কুলের দিকে।

এ শুক্রবারে তা হবার উপায় নেই। পাণ্ডিত সকালে উঠেই কুঁ-মুটো চিড়ে ভিজিয়ে দিলেন। দই কিনে আনলেন। থাকটাকা আর খাতাপত্র। ওতেই এ বেলাটা

বাস-রেটি ঝুলিয়ুটি চলবেন এ দিন। ঝুকুকে কোলে নিয়ে ঘরে ঢালা জাগিয়ে পাণ্ডিতমশাই রাসবিহারী-মুখো রওনা হলেন।

দুলাল বাড়িতে ছিল। উনি ঝুকুকে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে উপকরণিবাধানা টেনে নেন। দুলাল বলে, আপনার বেয়ে বুঝি পাণ্ডিতমশাই?

—হ্যাঁ বাবা; এর জন্যেই সম্পত্তি স্বর্গলাভ করেছেন শুনে গুহে তাই রেখে আসতে ভরসা হয় না।

—তাদেই করেছেন।

পড়ানো শুরু করবেন সেই বাস-পরোয়ানারী ভূতাটি আসতে এসে পাণ্ডিতকে বললে, ঝুকুকে ছোটমা উপরে নিয়ে যেতে বললেন।

চশমাটা কপালে তুলে দিয়ে পাণ্ডিত বলেন, ছোটমা কে?

দুলাল বলে, আমার মা। ওঁর তো কোন ছেলেপিলে নেই, বাচ্চা দেখলেই—

পাণ্ডিত অবাক বিস্ময়ে দুলালের দিকে তাকাতেই দুলাল বললে, উনি আমার আপন মা নয়। আমার নিজের মা মারা গেছেন।

—ও ঝুকুমণি। বেশ, নিয়ে যাও ওকে। না-মণি যাও ওর সঙ্গে

ভূতাটির হাত ধরে বাবা মেয়ের মত ঝুকু উপরে চলে গেল। উনিও অবাক হয়ে ভুবে গেলেন।

ঠিক সাড়ে আটটায় সময় খাম নিয়ে মেয়ে এল সেই চাকরটি, বললে, পাণ্ডিত-মশাই, ছোটমা বলে পাঠালেন, আপনার কষ্ট অসুবিধা না হয় তবে ঝুকু এখানেই খাক। ইস্কুল থেকেও ওকে নিয়ে যাবেন দুপুরে ও এখানেই খাবে।

অসুবিধা! হাতে স্বর্গ পেলেন পাণ্ডিত। এতদূর বিহ্বল হয়ে পড়েছেন, যে জবাব দিতে দেরী হয়ে যায় তাঁর।

দুলাল মাঝে চুলোকে বললে, সত্যার কোন মানছা। আমাদের বাড়িতে আসে না। মোর তাদের নয়। বাবা আবার বাচ্ছা সহ্য করতে পারেন না। অথচ ছোটমা ছেলেপুলে খুবই ভালবাসেন। ওঁর নিজের তো হল না। ওঁর সমস্ত ঘরবাড়ি খুলে, পড়লে, ছবির বই ছবি হলে আর খেলনা। যে যেখে সেই হাসে—

—তা তোমার বাবা—

—বাবা তো বিলকী মোহে, সর্দি, বিরবে। আর কাল কটো দিন থাকে, আমাদের বাড়িতে থাক না পাণ্ডিতমশাই; ছোটমা মানে—

পাণ্ডিত অবাক হয়ে যান। ঈশ্বরের কী বিচিত্র বিধান। এই একটি বন্ধা রমণী সন্তানের জন্য মাথা খুঁড়ে মরছে; সন্তান মানুষ করবার জন্য অর্থের তার অভাব নেই— দেবতার দয়া হচ্ছে না। অথচ অন্যদিকে সংসারে হতেতো তিনি নিজের বলা বইয়ে দিচ্ছেন।

ভূতাটি পুনরায় পশ্চিম করে, তাহলে খুকু এখানেই থাকবে তো?

পাণ্ডিত বলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, থাকবে বৈ। দুলালের ছোটমা যখন ইচ্ছা পকোল করেছেন; কিন্তু আমি ইতস্তত করছিলাম এই নিমিত্ত যে খুকুর তো নিজস্ব কোন জামকাপড় নাই—

ভূতাটি তাড়াতাড়ি বলে, আজ্ঞে না পাণ্ডিতমশাই; ছোটমা রামধনিকে এইমাত্র গাড়ি নিয়ে বাজারে যেতে বললেন। খুকুকে নিয়ে খুকু কিনতে যাবেন।

কুণ্ঠিত হয়ে পড়েন পাণ্ডিত। অভ্যর্থনার মনস্তত্ত্ব রাজার ঐশ্বর্য হাত দেখতে পারেন করেছিলেনন বলে কি এই বন্ধা মহিলার দেওয়া ফাঁকও—

দুলাল বলে ওঠে, আপনি কিন্তু বলবেন না পাণ্ডিতমশাই; বিকালে আপনি যদি না আসতে পারেন, আমি নিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসব। হয়তো খুকু বিকালেও যেতে চাইবে না। যার যরটা যেন পুতুলের একটা মিউজিয়াম।

—না বাবা, এরূপ তোমাকে কোন কষ্টস্বীকার করতে হবে না; আমি স্বয়ং এসে নিয়ে যাব।

রামধনিকে স্মরণ করতে করতে পাণ্ডিত ফিরে এলেন তাঁর ভালীবাটের বাসায়। হে ঈশ্বরাধার, তোমার লীলা বোঝা ভার। ঐ বন্ধা মহিলার মনোবেদনা উপশম

করানোর উদ্দেশ্যেই কি তুমি আর আমাকে এখানে এনেছিলে?

মই-চিত্রের কলার থেকে পান্ডিত হলে গেলেম শুকুলা।

স্কুল ছুটির পর বাড়ি না গিয়ে সোজা রাসবিহারী এ্যাভিনিউর দিকে হাঁটা দেন। দুলাল তখনও দেখেনি। মোড় ঘুরে স্কুল থেকে সোজাই খেলার মাঠের দিকে গিয়েছে। বাইরের ঘরে ঢুকতেই মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল রামমোহনালের সঙ্গে। গৃহ-কর্তা একটু বিরক্তি প্রকাশ করেই বলে ওঠেন, এসব উপদ্রব করলে তো আমি পারব না মাস্টারমশাই।

পান্ডিত আকাশ থেকে পড়েন। উপদ্রব? কী বলছেন আপনি?

—আমার ছেলেই নিশ্চয়ই সমস্যা। ওকে আর রাখা আমার এখানে চলবে না সমস্ত দিন আপনার ঘরে আমাদের অত্যাচার করেছে। দুপুরে কেউ যে একটু শান্তি পাবে তার উপায় নেই।

পান্ডিত কঠিনস্বরে বলে ওঠেন আপনি ভুল করছেন। আমি উপদ্রব হতে আপনার ভরসাতেই আমার কন্যাকে রেখে যাই নি। আপনার স্ত্রীই—

—কিন্তু আমার স্ত্রী যে বিকৃত-মস্তিষ্ক হয়েছে আপনি জানেন—

বিকৃত মস্তিষ্কতা! আজ্ঞে না, আমি তো কিছুই জানতাম না, দুলাল—

—দুলালের কি বলবে তার মা সামলে?

পান্ডিত অত্যন্ত সংকুচিত হয়ে বলেন, খুকুমণিকে ফিরিয়ে নেবেন—

—আমি চাকর দিয়ে আপনার বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছি। অত্যন্ত বেয়াদপ ছেলে! সমস্ত ঘরদোর লন্ডভন্ড করেছে; একটা চীনেমাটির ফুলদানি ভেঙেছে—

পান্ডিত বিশ্বাস করতে পারেন না। খুকু অত্যন্ত শান্ত স্বভাবের মেয়ে। অপরিচিত একজনের বাড়িতে এসে ফুলদানি সে নিশ্চয় ইচ্ছা করে ভাঙে নি। কিন্তু, চীনেমাটির ফুলদানিতে সে হাতই বা দেয় কেন? তাছাড়া ঘরদোর সে লন্ডভন্ড করবে কেন?

বিনা বাক্যব্যয়ে কুণ্ঠিতভাবে পান্ডিত চলে আসেন আলীপুরে। গলির মোড় ঘুরতেই দেখেন বন্ধ দরজার সামনে চুপ-চাপ হয়ে খুকু বসে আছে সিঁড়িটার উপর। মুখটা ভার। বাপকে দেখে ঠোঁট দুটো ফুলে ওঠে তার। পান্ডিতের খোলারও তর সয় না। হাতের বড়া ঘরে ওকে টেনে বাঁচ করিয়ে দেন। গর্জন করে ওঠেন—ওদের ফুলদানি ভেঙেছিস্?

বাপেরই ছেলে তো মিথ্যা কথা বলতে পারে না, ঘাড় নেড়ে বলে—হুঁ।

—কেন? কেন ভাঙলি?

খুকু ঠোঁট উলটিয়ে বলে, ওরা পাজি, যা খুশি, ওরা—

কথাটা শেষ হয় না তার। পরক্ষণে রাগে ওর গালে ঠাস্ করে এক চড় মেরে বসেন পান্ডিত। অসভ্য! ইতর। এই শিক্ষা হচ্ছে তোমার?

চড়টা বোধ হয় মাত্রাতিরিক্ত জোরে হয়ে গিয়েছিল। খুকু সামলাতে পারে না। ছিটকে পড়ে যায়।

ঠিক তখনই একটা সাইকেল এসে থামে তাঁর পাশে। দুলাল সাইকেল থেকে নেমে সেটাকে ঠেকিয়ে রাখে পাচিলে। পান্ডিত মহাশয়ের উদ্যত হাতটা ধরে ফেলে বলে, ওকে মারবেন না স্যার?

পরক্ষণে ফেরে ঘুরে দাঁড়ান বলেন—কেন তুমি বল নি যে তোমার ছোটমা বিকৃতমস্তিষ্কা?

দুলাল এতটুকু হয়ে যায়। চোখটা নেমে যায়। চোখে চোখে আর তাকাতে পারছে না।

—বল! উত্তর দাও!

মোষদীনিবদ্ধ বুদ্ধি, দুলাল ক্ষীণকণ্ঠে-স্বরে বলে, কথাটা সত্য নয় স্যার, তাই বলি নি।

অবাক হয়ে পান্ডিত বলেন, কিন্তু তোমার বাবা যে বললেন—

—বাবা সত্য কথা বলেন নি।

খুকুকে সে কোলে নেয়, বলে—ওঠো মণি, চলুন, বলছি।

জলচৌকিতের মত পান্ডিত তালা খুলে ঘরে ঢোকেন। খুকু তখন দুলালের কাঁধে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদছে। ওর ছোট্ট নরম গালে পান্ডিতের কড়া আঙুলের দাগ ফুটে উঠেছে।

মাদুর খুলে দুলাল বসে মেঝে, চৌকির একপাশে বসে খুকু, এ সব কথা আমার বলা শোভন নয়, কিন্তু সব কথা না বললে আপনাকে বোঝাতে পারব না যে খুকুর কোন দোষ নেই।

—কী বলতে চাইছ তুমি? তোমার মানেই—

বাধা দিয়ে দুলাল বলে, না স্যার, উনি, উনি আমার মা নন।

পান্ডিত বলেন, সে তো জানি, তোমার গর্ভধারিণী নন, কিন্তু—

—মা স্যার, উনি....মানে, ওঁকে আমার বাবা বিবাহ করেন নি।

পান্ডিত স্তম্ভিত হয়ে যান।

মাটির দিকেই তাকিয়ে থাকে দুলাল। তার কাঁধে মাথা রেখে খুকু তখনও ফুলে ফুলে কাঁদছে। দুলাল আর মাথাটা তুলতে পারে না। ঐভাবেই বলে—আমার মা মারা যাবার পর থেকেই উনি আমাদের বাড়িতে আছেন। আমার মনের মতই—

ওঃ!

—উনি কখনও মন স্যার! পাছে বাবার সম্পত্তিতে আমার পুরো অধিকার না আসে তাই ছোট্ট মনকে—

বাক্যটা শেষ করতে পারেন না পান্ডিত। মেয়ে যাওয়া বাক্যটাকে শেষ করতে বলেন, শুনেছি, তাই তোমার ছোটমাকে—?

—উনি অপারেশন করে মা হতে পারেন নি।

পান্ডিতের বিশ্বাস হয় না। একজন মানুষ একটি নারীকে এনে সংসারে স্ত্রীর মত রাখতে পারে, অথচ তাকে জোর করে মা হতে দেবে না এ কেমন করে সম্ভব? কিন্তু, দুলাল অযৌক্তিক নিশ্চয়ই নয়, নইলে এত বড় অভিযোগই বা আনবে কেন? পান্ডিতের বিশ্বাস তাঁর দিকে তাকিয়ে, চোখে চোখ রেখে তাঁর কোন কথা মিথ্যা বলতে পারবে না। সেই বিশ্বাসে জোরে বলেন, আমার দিকে মুখ তুলে তাকাও দুলাল—

দুলাল অনেকক্ষণ পরে কাল, মুখ তুলে পান্ডিত মহাশয়ের দিকে চোখে চোখ রেখে তাকালো। পান্ডিত দেখলেন তার দু চোখ বেয়ে জল ঝরছে। অনুচ্চারিত কণ্ঠে দুলাল বললে, আমি জানি এর পর থেকে আপনি আমাকে ঘৃণা করবেন। নিজের মায়ের নামে—

—দুলাল!

খুকুকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে দুলাল দেওয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়ায়। কোঁচার খুঁট দিয়ে চোখটা মোছে।

—কিন্তু, দুলালবাবুকে তাওস দেখেন করে।

সিঙ্গল দিয়ে ঐভাবে দাঁড়িয়েই দুলাল বললে, এই মাত্র সে কথা শুনলাম ছোট মার কাছে। বাবা হঠাৎ সিঙ্গল থেকে দুপুরে ফিরে এসেছে। বাবা ছোট ছেলেমানুষকে একা-একা দেখতে পারে না। তার জন্যই পাড়ার কোন বাড়ীতে ছোটমার কাছে যায় না। খুকুকে দেখেই ক্ষেপে উঠেছিল। খুকুকে ওর দেখাতে আমাদের কুকুরটাকে; খুকু আদর করতে ফুলদানিটা ভাঙে নি সার্থক বিশ্বাস করুন। ছোট মা নিজে তখন রোগা ছিলেন। কুকুরটার ভয়ে ছুটে পালাতে গিয়েই....

পান্ডিত কেমন যেন উদাস হয়ে যান।

দুলাল কুণ্ঠিত স্বরে বলে, অপরাধটা আমারই। ছোটমার জন্য আমার ভীষণ দুঃখ হয় স্যার। তাই খুকুকে দুপুরে পাঠাতে রেখেছিলাম। আমরা স্বপ্নেও ভাবিনি যে উনি হঠাৎ ফিরে আসবেন।

পান্ডিত উদাস কণ্ঠেই বলেন ঈশ্বর! তোমার সীমা—

—মা!

দুহাত ঘুরে দাঁড়ায় দুলাল। আবার তাকায় পান্ডিতের মুখের দিকে। চোখে আর তার চোখে জল নেই, বিস্ময়। বলবার কিছু নেই। যদি থাকেন তবে হয় তিনি ভণ্ড, নয় ধার্মিক।

পান্ডিত মৌখিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন না দুই হাতে নিজের কান বন্ধ করেন।

—না, ঐ আপনার মত ভিত্তি

অনাদের পাঠশালা লোনেন বন্ধ হাতে কান ছেড়ে। আমার এত ভয় সময় হচ্ছে যে মিয়েকে কথা বলি।

ঘর থেকে বাইরে সবে আসে পণ্ডিতের, বলেন—কী ব্যাপার দুলাল। আত্মহত্যা হয়েছিল।

—আত্মহত্যা নয় স্যার, খুন। নিজেকে খুন। ওহাদেই হোটমান পণ্ডিত যে অন্যায়টার কথা হচ্ছিল তার পণ্ডিত-মোশাই নিজে পাঠি? ঐ লম্পটি আমি কোনদিন ছোঁয়া করতে পারব ভেবেছেন?

—দুলাল!

দুলাল আর দাঁড়ায় না। হনহনিয়ে বেরিয়ে যায় ঘর ছেড়ে। পণ্ডিত বাধা দেয় না। পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকেন।

একটু পরে আবার ফিরে আসে দুলাল, বলে—একটা কথা ভুলে গিয়ে-ছিলাম স্যার, এটা ছোট মা খুকুর জন্য কিনেছিলেন—

সিল্কের একটা ফ্রক দুলাল বাড়িয়ে ধরে।

পণ্ডিত হাত বাড়িয়ে বলেন—দাও।

এবার বিস্মিত হবার পালা দুলালের, বলে, এটা আপনি নেবেন?

—কেন নেব না?

—আশ্চর্য! আমি ছোট মাকে বলে এসেছিলাম এটা আপনি কিছুতেই নেবেন না। সব কথা শোনার পর আপনি কিছুতেই।

পণ্ডিত বললেন, বাড়িয়েছে অতিমানে তোমার ছোট মার স্নেহের দানটা পত্যাখ্যান করলেই কি এ অন্যায়ের পরিমার্জন হত দুলাল? খুকুর পরি তার ভালবাসারও তো কোন দাবিদা স্পর্শ করেনি।

তোমাও কিন্তু সেই দুলাল হঠাৎ পণ্ডিত মশাইকে সম্বোধন করে।

পণ্ডিত হেঁট পান না। কেমন যেন উদাস হয়ে গেছেন তিনি। আত্মস্থ হয়ে গেছেন। দুলাল কখন যে চলে গেছে হেঁর পান নি। তাঁর ভাবছিলেন, ফলটা নিয়ে কি তিনি ঠিক করলেন? ঐ মহিলাকে রামগোপালবাবু বিবাহ করেন নি অথচ ঘরে স্থান দিয়েছেন। স্ত্রীর মত দেখেছেন। মহিলাটিকে তিনি দেখেন নি, জানেন না, হয়তো সম্ভবপরও তিনি নন—না হলে আনুষ্ঠানিক বিবাহে বাধা হবে কেন? হয়তো কোন পলাশনার ঘরে তাঁর চলে, হয়তো বহু পরিচর্যার পর তিনি এসে আশ্রয় পেয়েছেন ঐ বনকুসুম লোহ বাবসায়ীর গৃহে, খুকু যার মুখের হোরে। এমন একটি মহিলার দান কি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের গ্রহণযোগ্য? কিন্তু ঐ মুহূর্তে এ সব কথা মনে পড়ে নি পণ্ডিতের। মনে পড়েছিল, পাড়ার কেন ছেলে ছেলেবেলাকে ও বাড়িতে আসতে দেওয়া হয় না। হয়তো তাঁর ঐ পূর্ব কথা পরিবেশনীয় জন্যে, অথবা হয়তো রামগোপালের জন্যেই তারা শিশুদের ও বাড়ি যেতে দেয় না। মনে পড়েছিল, অন্তর্মহলার ঘর মাঝি খুকু সুরেশ ছাড়া দুলাল বলেছিল সেটা সুরেশের মিউনিসিপ্যাল—তিন চারার সাইকেল, বাকি হুর্ন আর কোনো। অতএব বাড়িওয়ার কাছেনার মহিলা সম্বন্ধে মনে আসেন। মনে পড়েছিল, বিদ্যাসাগর মশাইয়ের কথা : সংসার প্রবন্ধনের কুটিল স্বার্থে অসেতকায়ানা বার-নারীর হাতে টাকা গুঁজে দিয়ে ঘরে ফেরা। বিদ্যাসাগর মশাই নাকি বলেছিলেন, অনেক রাত হয়ে গেছে মা, এবার ঘরে যা।

না! অন্যায় তিনি করেন নি। জাতু-পিসির মনমরা হাতের আহার্য যদি তিনি রাত দেতে দিতে পেরে থাকেন, তবে ঐ অসহায়িতা ক্লান্ত রমণীর স্নেহের দানটা পত্যাখ্যান না করেই তিনি অন্যায় করেছেন।

হরদীন আর সে রাত্রে এল না। জাতু-পিসিও খেতে দিতে এল না। বোবকরি নিজের সন্তানেই মেতারি ছড়িয়ে পড়েছে। পরের অপমান যে; খুকুর পরি তার স্নেহের আতিশয্য তার পত্রবধূরা ভাল চোখে দেখছে না।

অন্নজলত্যাগ বিবেচনা না করে, সব কথা না ভেবে খুকুকে আঘাত করা অন্যায়ই হয়েছে তাঁর। এমন তো তিনি করেন না কখনও। আজ হঠাৎ এত রাগ হয়ে গেল কেন? বড়াক্ষরের তো এমন চঞ্চলতে রাগ হওয়া উচিত নয়। স্থির করলেন মনের উপর সংযম রাখবেন। পরিমার্জিত করতে হবে। খুকুও কিছুতেই কিছু খেতে রাজি হল না। এক-নাগাড়ে বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে রইল। মা থেকে তার অন্তর্ধান হয়েছে। বাপের কাছে কখনও সে যায় যায় নি। অমন একটা ভয়ঙ্কর খুকুরের সামনে থেকে ছুটে পালাতে গিয়েই না সে আছাড় খেয়ে পড়েছে? ফুলদানিটা কি সে ইচ্ছে করে ভেঙেছে? ঐ লোকটা কেন তাকে খুকুর দোলিয়ে দিল? খুকু তো ঠিকই বলেছে, ও লোকটা তো দুষ্টুই, পাজিই। বাবা কেন খুকুকে মারল? বাবার সঙ্গে ও আর কথাই বলবে না। বাবা ওকে একটুও ভালবাসে না। বাবার কাছে ও থাকবেই না। বাবার চেয়ে—

ঠোঁট দুটো আবার ফুলে ওঠে তার। জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে, সে গ্রহের সেই নক্ষত্রটা জ্বলে জ্বলে কয়েক আসও। অভিমানী খুকু তাকেই বলতে থাকে, আর কখনও দুষ্টুমি করব না। এস।..

শনিবার দিন স্কুলে যেন সোরগোল পড়ে গেল হাফ ছুটির। হাড পণ্ডিতমশাই স্কুলে এসেছেন, ফিরেছেন। উপর একটি খুকিকে নিয়ে।

মেয়েটির কাছেই ক্লাস ইলেভেনের একটি চালাকা ছেলে পণ্ডিতকে আড়ালে বলে, খুকিকে আমাদের ক্লাসে ভর্তি করে দিন, স্যার।

আর একজন বলল, ঘুমিয়ার সব স্কুলেই এখন কো-এডুকেশন চালু হয়ে গেছে স্যার, একমাত্র আমরাই পেছিয়ে আছি। আমরা সবাই মিলে হেড মাস্টার মশাইকে লিখে ধরব, খুকুকে আমাদের স্কুলে ভর্তি করাতে হবে।

—আপনি খুকুকে দিন স্যার, আমরা সবাই বর্ণপরিচয় করব। আমাদের স্কোয়াডে হবে খুকুকে ভর্তি করতে হবে, নইলে মারি ছাড়তে হবে।

পণ্ডিত হাসেন। চশমার ফাঁক-ফোকর দিয়ে ছলছল করে ওঠে। আড়ালে চোখ মোছেন। সবাই পালায়। আর পথ পায় না। চন্দ্রবাবু পণ্ডিতের দিকে ফিরে বলেন, শেষ পর্যন্ত মেয়েকে স্কুলে নিয়ে এলেন?

—কি করি বলুন?

—কোথায় রাখবেন ওকে?

—তাবছি দারোয়ানটা, মানে শিউ-চরণের সঙ্গে একটা ব্যবস্থা করে নেব।

কথা বলতে বলতে ওঁরা টিচার্স রুমে এসে পড়েন। অক্ষয়বাবু বলেন, সেবকবাবু হেড মাস্টার মশাই না আসার মানেটা কি?

মৌলভী সাহেব বলেন, রাগ করা সহজ অক্ষয়বাবু; কিন্তু পণ্ডিত মশাইকে তার আগে একটা পথ তো আপনাদের বাতলাতে হবে? উনি আর কি করতে পারেন?

ক্লাসের ঘণ্টা পড়ে গেল। শিউচরণের সাক্ষাৎ পেলেন না পণ্ডিত মশাই। ঘরে ঘরে তালা খুলে দিয়ে তার ডিউটি আসলত শেষ হয়েছে। সে কোথাও গেছে। অগত্যা খুকুকে টিচার্স রুমে বসিয়ে রেখে ক্লাস নিতে গেলেন। ঘরে ঢুকে ওরা টিচার্স রুমে এসে পড়েন। অক্ষয়বাবু বলেন, সেবকবাবু হেড মাস্টার মশাই না আসার মানেটা কি?

মৌলভী সাহেব বলেন, রাগ করা সহজ অক্ষয়বাবু; কিন্তু পণ্ডিত মশাইকে তার আগে একটা পথ তো আপনাদের বাতলাতে হবে? উনি আর কি করতে পারেন?

ক্লাসের ঘণ্টা পড়ে গেল। শিউচরণের সাক্ষাৎ পেলেন না পণ্ডিত মশাই। ঘরে ঘরে তালা খুলে দিয়ে তার ডিউটি আসলত শেষ হয়েছে। সে কোথাও গেছে। অগত্যা খুকুকে টিচার্স রুমে বসিয়ে রেখে ক্লাস নিতে গেলেন। ঘরে ঢুকে ওরা ভয়ে ভয়ে খুকিকে দেখে গেলেন, সে যেন কোন ভিলিনে হাত না দেয়। বললেন, তুমি কলকাতা হয়ে যাও মা-বাপি, আমি ক্লাসটা নিয়েই ফিরে আসব।

খুকু তার কাঠের পুতুলটাকে কোলে করে নিয়ে এসেছিল। টেবিলের উপর বসে থাকতে থাকতে পুতুলটাকে ঘুম পাড়াচ্ছিল। ঘাড় নেড়ে সে সায় দেয়।

পণ্ডিত ঘণ্টাটা নিঃশব্দে রেখে গেলেন। একেবারে নির্জনতে অবশ্য নয়। ঘরটা মাঝা স্কুলে রয়ে গিয়েছিল। বিভিন্ন ক্লাসের ছেলেরা দল বেঁধে ক্লাসান্ত টিচার্স রুমে এসে উঁকিঝুঁকি মারতে থাকে। যার পণ্ডিতের মেয়েকে দেখবার জন্য তাদের অধৈর্য কৌতূহল। পণ্ডিত বুঝে উঠতে পারেন না, খুকু এত বড় আকর্ষণীয় হয়ে পড়ল কেন হঠাৎ। ঘরে ঘরে বারান্দায় বেরিয়ে গিয়ে ওদের ছলে বুঝিয়ে ক্লাসে যেতে পাঠাতে হচ্ছে। হেড মাস্টার মশাই অবশ্য এখনও হস্তক্ষেপ করেন নি; কিন্তু ব্যাপারটা বোধ-হয় তিনি জানতে পেরেছেন। সেকেন্ড পিরিয়ডের ঘণ্টা পড়ে যেতে ছেলেরা হুড়োহুড়ি করে যে যার ক্লাসে চলে গেল। পণ্ডিত মশাই আবার খুকুকে নানা ভাবে ভালিয়

নিয়ে চশমা আর তাপ্তার নিয়ে ক্লাস এইটের দিকে যাচ্ছিলেন, চন্দ্রকান্তবাবুকে দেখতে পেয়ে বলেন, কী বিষয় বলুন তো। খুকুকে দর্শনের প্রভা ছাত্রেরা এত কৌতূহলী হয়ে উঠবে আগেভাগে জানলে তাকে আমি বিদ্যালয়ে আনতামই না।

চন্দ্রবাবু হেসে বলেন,- ওদের এত পরেও আপনি কেন মানেন?

—না, কেন বলুন তো?

—কতকগুলো চাচড়া রাউজে ঝিনুকের মতো পালিশের মেয়েই অপূর্ব সুন্দরী আর তার বয়স পনের বছর।

পণ্ডিত অবাক হয়ে বলেন এমন অদ্ভুত তাকলের উদ্দেশ্য?

—বলছি, আর কি?

—কিন্তু তাহলেই বা এক্সপেরিমেন্টের ভীত হবে কেন?

এবার অবাক হওয়ার পালা চন্দ্রবাবুর। একটা ঢোক গিলে তিনি বলেন, সকলকে সব কথা বুঝোবার ক্ষমতা তো ভগবান আমাদের দেন না; তাই ছাত্রদের 'এক্সপেরিমেন্ট' ভীতিগ্রস্ত কেন হয়েছে তাও আপনাকে আমি বুঝিয়ে নিতে পারব না।

পণ্ডিত বন্ধুতালুতে হাত বুলতে বুলতে বলেন, আপনি ঐ কথা বলে সর্ব সময়ে আসল সত্যটা গোপন করেন কেন বলুন তো, কী এমন কঠিন বেদান্তভাষ্য যে বুঝিয়ে দিলেও পরিষদান করতে পারব না?

এবার চন্দ্রবাবু হেসে বলেন, পণ্ডিত মশাই, এটা কঠিন বেদান্তভাষ্য নয় বলেই আপনি বুঝবেন না—আন ক্লাসে নিন গে।.

কিন্তু দ্বিতীয়ার ঘণ্টাটা আর নিরুপদ্রবে কাটল না, ঘণ্টার মাঝামাঝি একটা হৈ হৈ চীৎকার শুনে চমকে উঠেছিলেন তিনি। পর মুহূর্তেই একটি ছাত্র ছুটে এসে বলল —শিগগির আসুন স্যার। আপনার মেয়ে জলে ডুবে গেছে।

—জলে ডুবে গেছে। কোথায়?

হন্তদন্ত হয়ে পণ্ডিত ছুটে বেরিয়ে আসেন। সমস্ত স্কুল তখন ভেঙে পড়েছে বিদ্যালয় সংলগ্ন পুকুর ঘাটে। ভীড় ঠেলে এগিয়ে দেখেন, ব্যাপার তেমন গুরুতর নয়। তবে গুরুতর হতে পারত। খুকুর পড়ুয়ালের গল্প লেগেছিল, তা তো লাগতেই পারে। শীতের দিনে পড়ুয়ালের তো গল্প লাগে। তাই সে টিফিন বক্স ফেলে বেরিয়ে পড়ে। ঘুটি ঘুটি চলে আসে পুকুর পাড়ে। খুকুলকে স্নান করছে। ঘাটে শিউচরণ তখন স্নান সেরে ফিরছিল। খুকু জলের কাছে এগিয়ে আসে। শিউচরণ তখন লক্ষ্য করে নি। ঘাটের শেষ ধাপে যেন শ্যাওলা জমেছে। খুকু সেখানে পা দিতেই উল্টে জলে পড়ে যায়। সেই শব্দে শিউচরণ মুখ ঘুরিয়ে তাকে দেখতে পায়। খুকুর পরিচয় সে জানত না। ওখানে খুকুর ডুবে মরণও ছিল না; কিন্তু আর একটু গড়িয়ে গেলেই সে ডুবে জলে যেত। শিউচরণ তাকে টেনে তোলে।

শিউচরণ বলে, মাসলী বহুত্ অচ্ছেরেন পাণ্ডিত মাসা। হামি অচানক দেখতে পেলম, এক কাঁপ দিয়ে খোকিকে উঠিয়ে নিয়ে এলাম।

খুকুর ফক-পার্ট-ব্লাউজ সব জলে ভিজে একসা। চন্দ্রকান্তবাবু গর্জন করে ছেলেদের ক্লাসে ফেরত পাঠালেন : যাও যাও, যে যার ক্লাসে যাও। এ কি প্রশ্ন না দেখা, এ্যাঁ! যো—

হতচকিতে ছেলের দল সব ক্লাসে ফিরে গেল।

ছেড়ে আসার দরুণ পণ্ডিতের কাছে ফিরে এসে বলেন, আর কত্তা ক্লাস বাকি আছে আপনার?

—এই তৃতীয় ঘণ্টায় নাইন-বিতে ব্যাকরণের একটা পাঠ।

—ওটা আর আপনাকে আজ নিতে হবে না। আপনি বাড়ি যান। মেয়েটা একেবারে ভিজে গেছে। আর শুনুন, এর পর থেকে ওকে আর স্কুলে নিয়ে আসবেন না।

পণ্ডিত মাথা নেড়ে সায় দেন।

খুকুকে নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে তাকে শাসন করেন, তোমাকে সুনির্দিষ্ট অনুরোধ করলাম কোথাও যেও না, কেন শুনতে পাও নি?

খুকু সজলচক্ষে বলে এই ছেলেকে নিয়েই হয়েছে আমার জ্বালা। একেবারে কথা শোনে না। ভীষণ দামল! সেই স্নান করল তবে আমল ছেলের।

কী আর বলবেন পণ্ডিত। সন্তানকে নিয়েই তো পিতামাতার জ্বালা। পণ্ডিত তাঁর খুকুকে নিয়ে যতটা বিব্রত, মনে হল খুকু তার পড়ুয়াকে নিয়ে তার চেয়েও বেশী বিব্রত। হাজার হোক খুকুর কোন বায়না নেই, অথচ খুকুর পড়ুয়ালের কী বায়না। তাই ওকে আর বকলেন না; শুধু বললেন, 'স্নান' বল না মা-মণি। বলতে 'স্নান'।

(

রবিবার সকাল বেলা চন্দ্রকান্তবাবু এসে হাজির।

পণ্ডিত সসম্ভ্রমে ওঁকে ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। বলেন, আমার গৃহে তো চেয়ের অভাব নাই, যদি অনুমতি করেন সম্মুখের দোকান থেকে এক পেয়ালা নিয়ে আসি।

চন্দ্রবাবু বলেন, বসুন আপনি, ব্যস্ত হবেন না। চা আমি খেয়েই বেরিয়েছি। বারে বারে চা খেলে অম্বল হয়।

—কিঞ্চিত্ অসুখ আছে। উত্তম কথা বেশ!

—না মশাই। উত্তম অধমের মানের আমি এখানে আসি নি। আমার কিছু নিবেদন আছে, আপনি নিয়ে উত্তম না হয়ে উঠলেই বাঁচি।

পণ্ডিত হেসে বলেন, না না, যদি মত সহজে উত্তম হই না, বলুন!

—কী বিষয় বলুন
—কি বিষয়ে?
—বিষয় তো একটা [illegible] বিষয়।

পণ্ডিত বন্ধুতালুতে হাত বুলতে বুলতে বলেন, ঐ ছিল [illegible] চিন্তাও মনে হয়ে গেছে চন্দ্রকান্তবাবু কোন বিষয়েই উপনীত হতে পারবেন। আপনি তো পরামর্শ দেন?

—আপনার পিসি-বুড়ি মাসি মোট এমন কোন বিধবা বুড়ির কথা চিন্তা করতে পারেন, যাঁকে এখানে এনে রাখা যায়?

বৃদ্ধ মাথা নেড়ে বলেন, সেদিক হতে আমি সম্পূর্ণ দুর্ভাগা।

—আপনার স্ত্রীর কোন নিকট আত্মীয়া আছেন, যিনি ওকে দায়িত্ব করতে পারি হবেক?

—আমার স্ত্রীর পিতৃকুলের সকল সংবাদই তো আপনি অবগত আছেন চন্দ্রকান্তবাবু। থাকার মধ্যে আছেন খুকুমাস একজন মাসীমা; কিন্তু তিনি—

—জানি মশাই, সে মাসীর কথা আমি ভালরকমই জানি।

গলাস্ত পণ্ডিত প্রগাঢ় কণ্ঠিত স্বরে বলেন, চন্দ্রকান্তবাবু, আপনি শিক্ষক। আপনি ছাত্রদের আদর্শ। আপনি নিজেই যদি একপেরিমেন্ট শব্দটির ভাষায়—

চন্দ্রকান্তবাবু তাতে বাধিয়ে দিয়ে বলেন, যাচ্ছা থাক থাক। হয়েছে! আমার বক্তব্য : খুকুর মাসী মাত্রা ঠাকুরাণীকে আমি অস্থিতে অস্থিতে চিনি। তাঁর মত নিরঙ্কুশ প্রতিহিংসাপরী, আমারিক লোভ-মুখী, অমনুষ্যোচিতা কুলস্ত্রীলিতা আমি জীবনে দুটি দেখিনি। কী অমন করে তাকাচ্ছেন জেন? আমি তো আদর্শ শিক্ষকের মত ভাষার কথা বলছি। এটি শব্দটির সঠিক উচ্চারণ করিনি—

পণ্ডিত হেসে বলেন, অনুপস্থিতে মহিলার সম্মান আর নাই বা রক্ষিত করলেন। এ ক্ষেত্রে আপনি আমাকে কী পরামর্শ দেন?

—আমার পরামর্শ শুনবেন?

—শুনব বলেই তো শুনতে উপাসন করছি।

—আপনি আবার একটি বিয়ে করুন।

পণ্ডিত এক লাফে চৌকি থেকে নেমে পড়েন, বলেন, এই কি আপনার রসিকতা করবার উপযুক্ত সময়?

চন্দ্রবাবু গম্ভীর হয়ে বলেন, রসিকতা আমি করিনি পণ্ডিত মশাই; আমি সত্য কথাই বলছি। এ ছাড়া আমি তো গত্যন্তর দেখি না। চেষ্টায় তো আপনি ত্রুটি করেন নি। পারলেন কোন সমাধান করতে? আমার কথা শুনুন। সে কথা বলতেই এসেছি আমি।

—আপনি কী বলছেন? বিবাহ করার মত কি বয়স আছে আমার?

—কত বয়স হল আপনার? উনপঞ্চাশ তো?

মুখে ঘাড় নেড়ে সায় দেয়।

—ওতে আটকাবে না।

—না হলাই। ঐ ট্রান্সিটের মধ্যে আমি আর যাব না। যথেষ্ট শিক্ষা আমার হাঁড়-মজ্জাতেই হয়েছে। সুখেই আমার পরিত্রাণ করা উচিত ছিল, বলে যাচ্ছো বাহু।

—কিসের বাজু?

—বিবাহের।

—এ আবার কোন রাজের ছোকরা? বিবাহ কি বাজার পদার্থ?

—আজ্ঞে না, আমি ওর বাংলাতিগত অর্থটার কথা বলছিলাম। বিবাহ হচ্ছে, কি পূর্বক বহ্ ধাতু ঘঞ্। অর্থাৎ কিনা কিনবার ভাবে বহন করা। এ বয়সে আমার আর বহন করবার কোন ক্ষমতা নাই চন্দ্রকান্তবাবু।

হো হো করে হেসে ওঠেন চন্দ্রবাবু।

চন্দ্রবাবু, চলে যাবার পর পণ্ডিত সমস্ত বিষয়টা আবার একবার তলিয়ে দেখেন। কথাই তাঁর ভেবার কোন ত্রুটি হয়নি। যা-হোক একটি অনাথ শিশুকে এই দুর্দিনের বাজারে মানুষ করে তুলবার ভার তিনি যাবতীয় ব্যয়ভারসমেত যখন গ্রহণ করেছেন। কিন্তু কোন একটা ব্যবস্থা করে উঠতে পারলেন কই? তাঁর চিন্তাধারার সঙ্গে আর যারই মিল থেকে না কেন, সকলের ধারণা তিনি বুদ্ধিমান। তাঁর চরিত্রের স্থায়িত্বটাই সকলের সর্বাগ্রে নজরে পড়ে। তিনি ওদের চোখে পাকা-পণ্ডিত। হয়তো সেজন্য তাঁর আত্মচিন্তা গভীরতরভাবে চলে। ঐ যাদের পোড়া তালগাছের মত মস্তিষ্কটার অভ্যন্তরেও যে কোনরকম কোন ভাবের থাকতে পারে এটা দুনিয়া বিশ্বাস করল না। না করুন, তাই বলে—তিনি তো কারও কখনো যা মহানুভূতির পরোয়াই করেন না। কিন্তু তাঁর মা-মরিয়ে অন্তরিতে তো কাঠিন্যের কোন ছাপ নেই। অতটুকু মেয়েটাকে ফেলেও আসতে মন নরম হল না? যারা একটু আহা-উহু করবার উপলক্ষ খুঁজছিল, আর পাঁচজন তাদের গলা দিলে বলত। ভাড়াটেনী তার পরে ঘরের ভয়ে এ পথ মাড়ায় না, দালালের ঘা তার স্বামীর ওপর ওকে ফেলে করতে চলে যায়। যতীনই ঠিক বলেছিল, এ শহরটায় মানুষ নেই। এই কলকাতা শহরটার সর্বাঙ্গে বিষাক্তের পূর্ণ হয়ে গেছে। এখানে তিনি তাঁর মা-হারিয়ে মানুষ করে তুলতে পারবেন না। এখানে সবাই স্বার্থপরতা, সবাই পরশ্রীকাতরতা এবং নিষ্ঠুরতা। কিন্তু তা তো হবার কথা নয়। বুদ্ধে তো প্রাণীদের শেষ কথা হতে পারে না। আনন্দই যে প্রাণীদের মূল উৎস। আনন্দলোকের খনিজরাশি ভূতাত্ত্বিক গবেষণা। আনন্দ থেকেই এ সমস্ত পদার্থের উৎপত্তি। আনন্দের প্রমাণ প্রাণীদের। আনন্দকে মূলধন করে চলছে বেচে থাকা। এমন কি ঐ যে আপাতনিষ্ঠুর মনু, ঐ যে বিরোধ বাধলে আঘাত তাও এই আনন্দ-জগতের তালে তাল রেখে চলেছে। আনন্দ পঞ্চভূতাত্মিকাবিশ্বতাত্ত্বিক। এ মন্ত্র শুধু মুখে ইচ্চারণ করলেই চলবে না, পদার্থবিজ্ঞানীদের এ মন্ত্রকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করতে হবে। বিশ্বাস করতে হবে পরিত্রাণ ঐ পরমাণুর সেই ক্রমমুক্তির আনন্দঘন পরিকল্পনার একটা প্রাণী। হেতো হতাশের কথাই সত্য, মুক্তি পেয়েছে পরিত্রাণ। পণ্ডিতের এই সাধার ছেড়ে চলে যেতে পেরে সে কখন মুক্তির স্বাদ পেয়েছে। চিরদারিদ্র্য রাজের প্রাণ সে সকল দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনার অত্যাচার থেকে মুক্ত। শান্ত সমাহিত চিত্তে এ আশীর্বাদ গ্রহণ করতে হবে পণ্ডিতকে।

কিন্তু তিনি তো মুক্তি চান নি। প্রাণপ্রিয় বন্ধন আরও যে তাঁর জন্যে মায়ের সন্তানে। খুকিকে শুধু বাঁচিয়ে রাখা নয়, তাকে ঐ আনন্দঘন প্রাণিজগতে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এ শহরে তা সম্ভব নয়। চন্দ্রকান্তবাবুর পরামর্শ বিবেচনা করে দেখতে ওঠে না। তিনি বরং এই শহরটাকেই ত্যাগ করে যাবেন। যেখানে গাড়ি ঘোড়ার ভীড় নেই, যেখানে পরিবেশটা এত নিরুত্তাপ উদাসীন নয়, সেই সাতগাঁয় পরশপাথর গিয়েই একটি কুটির বাঁধবেন। ওতীনের পরামর্শমত বাল বোটির সেই নূতন আস্তানার কাছে থাকবে গরু, সেই নোটি আর তারি মানুষ—যারা সত্য প্রথমের কোমলকণ্ঠ প্রতিধ্বনি থেকে মুক্তকণ্ঠ।

সোমবার ছুটির পর যতীনের সেই বার্তাখানা সম্বল করে তিনি তালতোড়া-কেরোসিন-বাজারে একটি ট্রামের দিবতীয় শ্রেণীতে উঠে বসেন।

অফিস ছুটির চঞ্চলতায় তালতোড়ী স্টেশনারে তখন ঘরে ফেরার তাড়া। খুঁজতে খুঁজতে পণ্ডিত এসে পড়লেন নির্দেশিত ঠিকানায়, পরপর পরামর্শের সম্মুখে। অফিস বাড়ির পশ্চাদেই একটি কাঠের বেড়া ঘেরাও তার ওপাশে একজন মেম সাহেব বসে আছেন চেয়ারে। সামনে টেলিফোন। পণ্ডিত সসম্ভ্রমে কার্ডখানি বাড়িয়ে তাকে দেখালেন।

মেম সাহেব তাড়া তাড়া হিন্দিতে পণ্ডিতকে প্রশ্ন করেন, মিস্টার সাবুখাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান? এ কার্ড তোমার পেলেম।

—এটা আমাকে দিয়ে উনি দেখা করতে বলেছিলেন।

—আপনার নাম ঐ কার্ডের পিছনে লিখে দিন।

নির্দেশমত নিজ নাম পণ্ডিত ভিজিটিং কার্ডের উল্টোদিকে লিখে আবার দাখিল করলেন। মেম সাহেব অ্যানিকিওর-করা দুটি আঙুলে কার্ডখানাকে ধরে পরীক্ষা করলেন। তার পরেও আড় চোখে পণ্ডিতের দিকে তাকালেন; যেন কি একটা কথা বলি বলি করেও বললেন না। শেষে বলেন, আপনি ঐ সোফাটায় গিয়ে বসুন। মিস্টার সাবুখাঁ এখনো লিফটে কেউ একজন মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে। এখনই এসে পড়বেন।

পণ্ডিত সসঙ্কোচে সোফাটায় বসে পড়েন।

পালেই বাঁসাঁছিল আর একজন ছোকরা। দেহে খাইং-চাঁপদল, সুটেড-বুটেড। পণ্ডিতের দিকে একবার তাকিয়ে দেখল, তারপর সরে গিয়ে আর একটা সোফায় বসল। আবার কি মনে করে এগিয়ে এল কাছে, বললে : ওল্ড জেন্টেল্‌?

পণ্ডিত বিব্রতভাবে ঘাড় নাড়লেন।

ছোকরা অদ্ভুত ভাবে সন্তুষ্ট হয়ে আবার গিয়ে বসল তার আসনে, অযথেষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে।

একটু পরেই পাশের একটা কাচের গাড়ি ওলে ঘর্ঘরাণ পত্রবলভোরসের সম্মুখ। ওকমা-আঁটা একজন পরোয়ান সুটেড্‌ার সাহায্যে ঘর থেকে পদ্ম তুলে সসম্ভ্রমে নামালে এবং লিফটের দরজাটা খুলে ধরল। নেমে এলেন নিখুঁত সাহেবি পোষাকে এক-জন ভদ্রলোক। রৌদ্রালিনের নাসা-ঘেঁষা সাদা। কলারের টাইটা একটা সোনার টাইপিনে আটকানো। সুচালো কালো রঙের চকচকে জুতো ঘন্টাখানির তিনি উঠে এলেন। মুখের একপাশে একটা পাইপ। বাঁ হাতে চৌকো চামড়া একটা সুটকেস। অফিসের আশপাশের সবলে উঠে দাঁড়ায়। হাত তুলে নমস্কার করে। পণ্ডিত অবাক বিস্ময়ে দেখেন আগন্তুক আর কেউ নয়, স্বয়ং যতীন সাবুখাঁ।

যতীন গরীব ঘর এটুকু জানা ছিল। ট্যাকসি করেই যে কালিতারা ফেরিতে যায়, কিন্তু তার সাহস জোগাবে, ভাবাবার পণ্ডিতের কোনদিন মনে হয় নি যে তার দিনের বুলিটা এ রকম হতে পারে।

একটু পরেই মেম সাহেব পণ্ডিতকে ডেকে বলেন, আপনার ঠিকানা এবং কেন দেখা করতে এসেছেন এই কাগজে লিখে দিন।

ব্যাকুল পরিবর্তন করেন, যতীন জানতে চেয়েছে?

মেমসাহেব বিস্ময়মিশ্রিত দৃষ্টিতে পণ্ডিতকে আর একবার আপাদমস্তক দেখে নেন। তবাও যেন না। পণ্ডিতের দেওয়া কার্ড-খানাই আবার বাড়িয়ে ধরেন। পণ্ডিত দেখেন, তাল সোজিলে তার উপর লেখা আছে : ঠিকানা? পত্রয়োজন?

বিস্ময়ের মাত্রাটা উত্তরোত্তর দৃষ্টিসীমান্ত হচ্ছে। যতীন কি নাম শুনে তাকে চিনতে পারে নি? সে তো নিজে থেকেই পণ্ডিতকে বলেছিল অফিসে দেখা করতে—সেই সাত-তাল পরামর্শের কারণে, বোধহয় 'সলাপত্র ভট্টাচার্য' লেখাতে যতীন তাকে ঠিক চিনতে পারে নি। তাই হবে। এর বদলে উনি যদি লিখতেন 'পাকড়-পণ্ডিত' তবে বোধকরি যতীনের বুঝতে নিতে কোন অসুবিধা হত না। কিন্তু তা তো আর লেখা হলে না। পণ্ডিত এবার নামের নিচে নিজের ঠিকানাটা লিখে দিলেন। বৃদ্ধি করে তলায় আরও লিখে দিলেন 'কালীতারা ফেরিঘাটের

(৭৩ পৃষ্ঠায় দেখুন)

ভিয়েতনামের রূপকথা

তিন কন্যার বিয়ে

দক্ষিণারঞ্জন বসু

অনেক কাল আগের কথা।

ফি ইয়াং পর্বতের গায়ে বেশ দিন কাটছিল নিজেদের ছোট্ট বাড়িতে। 'মা' পরিবার সুখেই ছিল। হঠাৎ বাড়ীর গিন্নী মারা গেলেন। আনন্দের আবহাওয়াটা নষ্ট হয়ে গেল কিছুদিনের জন্যে।

তবে বাড়ির কর্তার মনের জোর খুব। নাম তাঁর মাখরুই। তিন তিনটে জোয়ান ছেলের বাপ তিনি। তিন ছেলেই সুপুরুষ। তিন ভাইয়ের মধ্যে ভারি ভাব। তাদের নাম মাখান, মাচো এবং মাজক।

মাকে হারিয়ে ছেলেরা একেবারে ভেঙে না পড়ে, একদম হয়ে না যায়, সেদিকে গোড়া থেকেই খুব লক্ষ্য রাখছিলেন মাখরুই। ছেলেদের মায়ের অভাব বুঝতে না হয়, সে বিষয়ে চেষ্টার তাঁর অন্ত ছিল না। যার যেদিকে ঝোঁক সে দিকেই সে যাতে সফল হয়ে উঠতে পারে, খুব নাম করতে পারে সে ব্যাপারে যথেষ্ট নজর রাখতেন তিনি।

ক্রমে ক্রমে ফল তার ভালোই দাঁড়ালো। তিন ভাই যে শুধু বয়েসেই বড়ো হলো তা' নয়, গুণেও তারা এক একজন হয়ে উঠলো এক এক বিষয়ে দিকপাল। তাদের নাম ডাক ধীরে ধীরে এতোই চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো যে গ্রামের সবাই এই তিনটি যুবককে মনে করতো তিনটি রত্ন বলে।

বড়ো ভাই খান তাদের অঞ্চলের সেরা বাঁশী বাজিয়ে। তার বাঁশীর গান শোনার জন্যে লোকে পাগল। গাঁয়ের ছেলেরা বলাবলি করে চাঁদের আলোয় খানের বাঁশীর সুর আকাশের চাঁদকেও বুঝি নামিয়ে আনে তার গান শোনার জন্যে।

আর মেজ ভাই চো?

সেও কম যায় না। তিন ভাইয়ের মধ্যে সে সব চেয়ে শক্তিমান ও খাটিয়ে। কৃষির কাজে আশপাশে তার জুড়ি নেই। ক্ষেত-খামারে হাতি, বাঘ বা অন্য কোনো জন্তু জানোয়ার এসে যখন সব তচনচ করতে শুরু করে তখন এই চো-এরই শরণ নিতে হয় গ্রামবাসী সকলকে। পশুপাখি তাড়িয়ে সেই যতো চাষবাস রক্ষা করে।

আর কাজ—জঙ্গল সাফ করে মাঠের পর মাঠ চাষের উপযুক্ত করে দেওয়া ছিল ছোটভাই জকের কাজ। চাষের কাজে তার অসীম আনন্দ।

ছেলেদের যখন এতো নাম ডাক এবং দেখতে দেখতে বয়েসও যখন হলো, বাপের মাথায় তখন ভাবনা, এক এক করে এবার ওদের বিয়ে দিয়ে দেওয়াই ভালো। শ্রীমানরাও তাতে খুশী হবে এবং তাঁরও দায় কমবে।

কাজ শুরু হয়ে গেল সেই মতো।

এদিক সেদিকে লোক পাঠাতে লাগলেন মাখরুই। কিন্তু তেমন পছন্দের মেয়ে একটিও খুঁজে পাওয়া গেল না। অথচ গাঁয়ের সব ক'টি তরুণীরই ঐ তিনটি গুণী ভাইয়ের দিকে দৃষ্টি, প্রত্যেকেরই আশা ওদের একজনের হাতে পড়লে নির্ভাবনায় জীবন কাটবে।

দিন যায়, মাস যায়, বছরও শেষ হয়ে এলো।

বৃদ্ধ মাখরুই অস্থির হয়ে উঠলেন। তবে কি তাঁর মনের সাধ মিটবে না? তিনি কি তাঁর তিন ছেলের বৌ দেখে যেতে পারবেন না? অন্তত একটি বৌ ঘরে এনে সংসারটা গুছিয়ে দিয়ে যেতে পারলেও তো হতো।

এমনি ভাবে কর্তা যখন ভাবছেন তখন একটা খবর পাওয়া গেল।

বেশ দূরে হলেও ফি-ইয়াং পর্বত স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায় মাখরুইদের বাড়ি থেকে। ঐ পর্বতের পুব দিকে ঢালু সবুজ বনের পাশে বাঁশের তৈরি একটি ঘরে নাকি এক বুড়ির সঙ্গে পরমা সুন্দরী একটি মেয়ে বাস করে।

খবরটা কিঞ্চিৎ আশার সঞ্চার করলেও খুব বেশি ভরসা পাননি মাখরুই। প্রথমত অতদূরে কাউকে যেতে রাজীই করানো হবে না। তারপর যদিও বা একজন অনেক টাকা পয়সা টাকে গুঁজে সুন্দরীর সন্ধানে বেরিয়ে গেল সে শুধু ঘুরেই এলো—ঐ বুড়ি আর তার মেয়ের কোনো হদিসই করতে পারলো না।

বেচারা মাখরুইর একেবারে পড়ার অবস্থা।

অথচ তাঁর তিন ছেলের দিন কিন্তু বেশ আনন্দেই কাটছে। বাবাকে বেজার বেজার দেখে তাঁকে আনন্দে রাখবার জন্যে করতো কি করে তারা।

ফি-ইয়াং পর্বতের পুব ধারে এক বাঁশের কুটিরে সত্যি সত্যি এক বুড়ি থাকেন তাঁর মেয়েকে নিয়ে। মাখরুইর লোক হদিস না পেলেও খবরটা মোটেই মিথ্যে নয়।

একেবারে ছোটবেলা থেকেই মেয়েটি

রোজ তার বুড়ি মায়ের সঙ্গে তাদের পাহাড়ী কুটির থেকে নীচে নেমে আসতো সঙ্গে নিয়ে আসতো নানা রকমের ফসল সমতল ভূমির বাজারে সে সবের বিনিময়ে অন্য সব জিনিষ-পত্তর সওদা করে নিয়ে যেতো বাড়িতে। ঘরে ফেরবার পথে বন থেকে রোজই কিছু কিছু কাঠও কুড়িয়ে নিয়ে যেতো।

মা-ই রান্নাবান্না করতেন প্রায় একলাই বসে মা-মেয়ের খাওয়া লাগতো হতো।

এমনি ভাবেই চলেছে অনেকদিন।

কিন্তু বয়েস বাড়তে বাড়তে বুড়ি প্রায় অচল। খুবই কষ্ট হয় তাঁর পাহাড়ী পথ ভাঙতে।

মেয়ে নিজে থেকেই একদিন তাই বললে, মা, আমি তো এখন বড়ো হয়েছি। তুমি সেই তোমার আমার জন্যে কিছু। আমি একাই দিয়ে হাট-বাজার করে নিয়ে আসবো, কাঠ কুড়িয়ে আনবো। তোমাকে একটুও ভাবতে হবে না।

বেশ তাই করো তা'হলে। আমি আর চলতে পারছিনা।

মায়ের অনুমতি পেয়ে হোলা সেই থেকে একাই সব বাইরের কাজ করতে থাকে।

পাহাড়ী মেয়েটির নাম হোলা।

সুন্দরী হোলা যখন পাহাড় থেকে নীচে নেমে আসে এবং সওদা করে ও কাঠ কুড়িয়ে ঘরে ফিরে যায় পথে তখন বনের পাখ-পাখালীরা আনন্দে দুলতে থাকে, পাখিগুলি গান শুরু করে দেয় এবং বনের পশুগুলিও খেলায় মেতে ওঠে।

দেখতে দেখতে ষোলো পেরিয়ে এসে সতেরোয় পা দেয় হোলা। অঙ্গে অঙ্গে সৌন্দর্য তখন তার উপচে পড়ছে। লাল গোলাপী রং-এর মুখখানিতে উজ্জ্বল কালো-চোখের সে কি আকর্ষণ।

কিন্তু তা'হলে কি হবে, মনটা মোটেই ভালো নয় হোলার। কাছে পিঠে কাঠ পাওয়া এক কঠিন সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে ক'দিন ধরে।

কি আর করা, ক্রমশই গভীর অরণ্যে ঢুকে পড়তে হচ্ছে হোলাকে। কিন্তু কাঠতো তাকে সংগ্রহ করতেই হবে। তা' না হলে তার মায়ের যে রান্নাই হবে না।

হাঁটতে হাঁটতে একদিন বনের অনেক ভিতরে চলে গিয়েছে হোলা। লোকজন সেখানে বোধহয় কোন কালে যায়নি। প্রকৃত মানুষের কোনো পায়ের ছাপ সে পথে তার চোখে পড়েনি।

পাশ দিয়ে অতি সরু একটি পাহাড়ী নদী তর তর করে বয়ে যাচ্ছিল। বেশ ভালো লাগছিল হোলার। সেই নদীর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সে এগিয়ে চলছিল।

অপরূপ সুন্দরীই শুধু নয়, ভারি নরম হোলা। অনেকটা পথ হেঁটে হেঁটে সে ক্লান্ত। নদীতে একবার স্নান করে নিতে ইচ্ছে হলো তার। মনে হলো তাতে ক্লান্তি দূর হবে।

ভাবতে ভাবতে নদীর তীর ধরে চলেছে হোলা, আর মরা গাছের খোঁজ করছে, হঠাৎ তার কানে বাঁশির সুরের এক অপূর্ব মূর্ছনা। সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো সেখানে।

অনেক দূর থেকে বাঁশির গানের সুর আসছে। অত্যন্ত ক্ষীণ সেই সুর। সেই সুরের জোয়ারে হোলার মন যেন কোন্ সুদূরের দিকে ভেসে চলেছে।

শুধু হোলার মনেই নয়, নদীর বুকেও গানের সুরের তালে তালে ঢেউ-এর নাচন শুরু হয়ে গিয়েছে। পাখিরাও একই তালে গান ধরেছে। দল বেঁধে তারা বেরিয়ে পড়েছে নিরুদ্দেশ যাত্রায়।

নীরব নিস্তব্ধ ভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে হোলা ভাবে, স্নানটা এবার সেরে নেওয়াই ভালো।

কিন্তু বাঁশির সুরটা ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠছে যেন!

না, না, আর দেরি করা ঠিক হবে না। তাড়াতাড়ি পোষাকটা খুলে রেখে নদীতে নেমে পড়ে হোলা।

আঃ, কি শান্তি! সারা দেহ তার শীতল হয়ে গেল একটি ডুবের সঙ্গে সঙ্গে। মুহূর্তের মধ্যে তার ক্লান্তি দূর হয়ে গেল।

কিন্তু ঢেউগুলি ভারি দুষ্টু। ঢেউগুলি তার বুকের ওপর কেবলি এসে আছড়ে পড়ছে। দু'হাতে ঠেকাতে গিয়েও সে ঠেকাতে পারছে না। ওরকম খেলায় ঢেউগুলি যেন একেবারে মাতিয়া হয়ে উঠেছে। হোলা তাই আর ওদের বাধা দিচ্ছে না, পুরো খুশিই ছেড়ে দিয়েছে।

তবে মোটেই আর দেরি করা চলবে না। বাঁশির সুরটা যে একেবারেই কাছে এসে গেল।

জল থেকে উঠে পোষাক পরতে যাবে, হঠাৎ বাঁশি থেমে গেল এবং নদীর ওপার থেকে কে একজন জিজ্ঞেস করলো—

এভা একা কে ওখানে? এই গভীর অরণ্যে কি করা হচ্ছে?

পুরুষের কণ্ঠ শুনে চমকে উঠলো হোলা। তাড়াতাড়ি পোষাকটা পরে ফেলে পিছন ফিরে তাকালো। লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো সে, কান দু'টো দিয়ে যেন আগুন বেরুচ্ছে এমনি তখন তার অবস্থা।

আঃ, প্রনিন্দ্য সুন্দর এক যুবক! কি বলিষ্ঠ চেহারা! কিন্তু নিরাবরণ দেহে যখন স্নান করছিল কিংবা সে যখন স্নান সেরে উঠে এসে পোষাক পরছিল লোকটি তাকে পুরোপুরি দেখে ফেলে নিতো! —লজ্জায় লুকিয়ে পড়তে ইচ্ছে হয় মেয়েটির।

কিন্তু তবু তখন যে সে আরেকবার পিছন দিকে তাকিয়ে ফেলে নিজেই তা খেয়াল রাখতে পারে না।

তা'হলে এই সেই বংশীবাদক!

মাথানতে নির্বাক বাঁশি হাতে সেখানে একখণ্ড পাথরের ওপর এক পা ভর করে আরেক পায়ে ঘাটিতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবাক হয়ে যায় হোলা। যুবকটির রকম-সকম দেখে তার কোনোই সন্দেহ থাকে না যে তাকেই সে অপলক দৃষ্টিতে খুটে খুটে দেখছে।

তাতে ভারি সরম লাগছে হোলার। অমন করে কোনো পুরুষ তাকিয়ে থাকলে যে কোনো মেয়েরই লজ্জা পাবার কথা।

হোলা তাই সেখানে আর দাঁড়িয়ে না থেকে এক ছুটে পালিয়ে যায়। খানিকটা দূরে গিয়ে কিছু কাঠ সংগ্রহ করে হাঁটতে হাঁটতে ঘরে ফিরে যায়।

কিন্তু ঘরে ফিরেই কি হাই শান্তি আছে। মাথার মধ্যে সারাক্ষণ সেই একটি লোকেরই মূর্তি কেবল ঘুর ঘুর করছে। মা দেরির কারণ জানতে চাইলে আগাগোড়া সব কথাই তাকে খুলে বলেছে হোলা। সব

শুনে মুচকি মুচকি হেসেছেন বুড়ি মা, আর মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে চুপ করে গেছেন।

অন্য দিকে মাখানও বাড়ি ফিরে তার দু' ভাইকে সমস্ত ঘটনা পুরোপুরি শুনিয়েছে। হোলার সৌন্দর্যের বর্ণনা শুনে তারা তো তখুনি বেরিয়ে পড়ে মেয়েটিকে দেখার জন্যে, এমনি অবস্থা।

শেষ পর্যন্ত ঠিক হলো, দিনের যে সময়টায় যেখানে ঐ সুন্দরীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল মাখানের, পরদিন সেখানে ঠিক সেই সময়েই তিন ভাই চুপি চুপি গিয়ে উপস্থিত হবে।

তাই হলো। পরদিন সকালে মাচো এবং মাজককে নিয়ে মাখান সেই নদীর দিকে যাত্রা শুরু করলো।

আশ্চর্যের ব্যাপার হোলাও কাঠ কুড়োতে বেরিয়ে পরদিনও কিসের আকর্ষণে আগের জায়গাতেই সেই নদীর পারে গিয়ে হাজির।

আগের দিনের চেয়েও বেশি ক্লান্তি বোধ হয়েছে মেয়েটির। আগের দিনের চেয়ে বেশি জোরে ছুটে এসেছে যে!

সেখানে এসেই নাইতে নেমে দু'লো হোলার। পোষাক ছেড়ে কালকের মতোই পাশের গাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখে ঝাঁপিয়ে পড়ে সে নদীর জলে।

আঃ, কি আনন্দ, কি আনন্দ! কিন্তু কালকের চেয়েও বেশি দুষ্টুমি করছে আজ ঢেউগুলি। বড্ড বেশি লুটোপুটি করছে। কেবলি আছড়ে আছড়ে পড়ছে তার বুকের ওপর মুখের ওপর। কি আর করবে সে, চুপচাপ সবই তাকে সহ্য করতে হয়েছে। নাওয়া শেষ হলে ওপরে এসে সে যখন পোষাক পরছিল হঠাৎ করে বাঁশি বেজে উঠলো ওপারের জঙ্গলের ভেতর থেকে।

ও, আজো তা'হলে এসেছে সেই বংশী-বাদক! একবার পিছন ফিরে তাকিয়েই হোলা দেখতে পেলো কালকের সেই বাঁশি-ওলাকে। দেখেই কাঠের বাণ্ডিল ঘাড়ে তুলে সুন্দরীর সে কি দৌড়! এদিন আসার পথেই সে বেশ কিছু কাঠ কুড়িয়ে নিয়েছিল। আগের রাতের ঝড়ে অনেক কাঠই ভেঙে পড়েছিল গাছ থেকে।

হোলার মনের ওপর দিয়েও কি কম ঝড় বয়ে গিয়েছে কাল সারা রাত ধরে। শুধু হোলাই বা কেন, মাখানেরও বুকের পাঁজরা ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে সে ঝড়ে।

মাখানের দু'ভাইয়ের কিন্তু একেবারে চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল হোলার রূপ দেখে। তারা আর নিঃশ্বাস ফেলতে পারছিল না। নিশ্চল পাথরের মূর্তির মতো হয়ে গিয়েছিল। যে ঝোপের মাঝখানে বসে তারা হোলাকে দেখছিল স্নান করতে, স্নান সেরে এসে পোষাক পরতে, সে ঝোপ-ঝাড়ের একটি পাতাও নড়ছিল না, এমন নীরব নিস্পন্দ হয়ে গিয়েছিল।

এ জন্যে হোলাও মাখানের ছোট দু ভাই মাচো এবং মাজককে দেখতে পায়নি। ভালোই হয়েছে। ওরা নজরে পড়লে হোলা আরো বেশি লজ্জা পেতো।

মাকে খাইয়ে দাইয়ে এবং নিজেও খেয়ে নিয়ে রাতের বেলা আগে আগেই শুয়ে পড়ে হোলা। কিছু দিন হলো তার মায়ের শরীরটা ভালো যাচ্ছিলো না তাই সন্ধ্যের মধ্যেই সব কাজকর্ম সেরে ফেলতে হতো তাকে।

সেদিনও তাই করেছে হোলা। খাওয়া-দাওয়া সেরে সন্ধ্যের একটু পরেই মায়ের পাশে গিয়ে শুয়ে পড়েছে সে। মা ঘুমিয়ে পড়লেও তার কিন্তু সহজে ঘুম আসছিল না।

ঠিক সেই জায়গাটিতে বাঁশিওলা আবার এলো কেন ঐ নদীর ঘাটের উল্টো দিকে একই সময়ে? সে কি চায় কিছু তার কাছে? শুয়ে শুয়ে এমনি সব কথাই ভাবছিলো হোলা।

হঠাৎ বাঁশি বেজে উঠলো। খুব শান্ত খুব সুন্দর করুণ একটি সুর। সে যে ঐ একই বাঁশির সুর তাতে সন্দেহ নেই হোলার। আর সেই বাঁশি বাজছে একেবারে তাদের কাঠের ঘরের বেড়া ঘেঁসে।

মা ঘুমুচ্ছেন। ঘুমোন।

হোলা চুপি চুপি নিঃশব্দে ঘরের দরজা খুলে বাইরে তাকায়। ঐ তো সে চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে বাঁশিওলার মুখখানা সেই একই লোক। বুঝতে আর তার বাকি রইলো না কেন ঐ অপরিচিত যুবক তাদের ঘরের কাছে এসে এ সময়ে অমন করে বাঁশি বাজাচ্ছে।

একটু অপেক্ষা করে হোলা ফিরে শুয়ে পড়লো। বাঁশি বেজেই চলছে। মধ্য আকাশে চাঁদ উঠে গেছে, তখনো বাঁশির সেই করুণ সুরের বিরাম নেই। হোলাকে যেন বাইরে বেরিয়ে আসতে ডাকছে সে সুর। কিন্তু তবে লজ্জায় সে আসেনি। চুপ করে বুড়ি মায়ের পাশে পড়ে রয়েছে। বাঁশির গান শুনতে শুনতে রাত কাটিয়ে দিয়েছে।

এমনি ভাবেই দিনের পর দিন কাটছে। একদিন হঠাৎ এক দুর্ঘটনায় পড়ে গেল হোলা। মাচোর চোখে না পড়লে তার আর সেদিন বাঁচার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না।

অতো বড়ো প্রকাণ্ড বন। বাঘ-ভালুক ও অন্যান্য হিংস্র জন্তু জানোয়ার সেখানে আছেই জানা কথা। তবু হোলা বা তার মাকে যে কখনো তেমন কোনো জন্তুর কবলে পড়তে হয়নি সে নেহাৎই ভাগ্যের কথা।

যথারীতি সেদিনও সকালবেলা কাঠ কুড়োতেই বেরিয়েছিল হোলা। হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড বাঘের মুখোমুখি হয়ে ভীষণ রকম সে ঘাবড়ে গেল। কিন্তু ঘাবড়ালে চলবে কেন, বাঁচতে হবে। যেমনিভাবা, অমনি দে-দৌড়।

প্রাণপণ ছুটছে হোলা। তবু বাঘটা তার একেবারে প্রায় গায়ের ওপর এসে পড়ার উপক্রম এমন কি বাঘটা তার থাবাও মাঝে মাঝে তুলে ধরছে। তা চোখে পড়তেই জীবনের আশা ছেড়ে দিতে হয় হোলাকে মায়ের কথা মনে পড়ে কে তার মাকে এখন বাঁচাবে! ভাবতে দিয়ে পা দুটো তার অবশ হয়ে আসে বাঘটা সেই সময়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছিল তার ওপর। কিন্তু সেই মুহূর্তেই বাঘটার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়লো এক দুঃসাহসী যুবক। হাতের শিকার হারিয়ে কিন্তু জন্তুটা তখন ঐ যুবকটিকেই আক্রমণে উদ্যত। তৎক্ষণাৎ ভয়ঙ্কর বর্শাবিদ্ধ হয়ে ভূতলশায়ী হতে হলো বাঘটাকে।

ব্যাঘ্র-বিজয়ী যুবক তখন ঝুঁকে ঝুঁকে বার করলো সেই পলাতকা তরুণীকে। সেই

অরণ্য-নদীর কাছাকাছি দিয়ে এক পাথর খণ্ডের ওপর হোলা অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে-ছিল। তার চোখেমুখে জল ছিটিয়ে দিয়ে মাচো তার জ্ঞান ফিরিয়ে আনলো এবং তাকে নিয়ে তাদের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এলো।

মাচোর সঙ্গে হোলার বেশ জানাশুনো হয়ে গেল সেই থেকে। জঙ্গলে কাঠ আনতে গিয়ে তারপর থেকে প্রায়ই হোলার দেখা হতে যায় মাচোর সঙ্গে। তার নদীতে নাইতে গেলেই সে দেখতে পায় মাখানকে। বেশ জানশোনাই তার দিন কাটতে থাকে।

এর মধ্যে আবার আরেক ঘটনা ঘটে বসলো।

হোলা সহসা একদিন অসুস্থ হয়ে পড়লো। এমন অসুখ যে সে আর বের হতে পারে না। একদিন যায়, দু দিন যায়, তিনদিন যায়—মা ও মেয়েকে না খেয়েই থাকতে হয়।

শেষ পর্যন্ত পেটের জ্বালায় বেরুস হয়ে পড়তে হলো দু' জনকেই। জীবন থাকতে জীবন নেই এমনি অবস্থা!

কিন্তু হঠাৎ চুলুনে যেন আগুন জ্বলছে! প্রায় অচেতন অবস্থায় আগুনের আলোর একটা রেশ যেন হোলা অনুভব করলো। তখন সন্ধ্যা রাত। আবার নিস্তেজ হয়ে ঝিমিয়ে পড়ার পর মুহূর্তেই তার মনে হলো মিষ্টি সরবৎ-এর মতো কিছু যেন তার গলা দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে। তার পরেই আস্তে আস্তে তার জ্ঞান ফিরে আসতে থাকলো। সে অনেকখানি সুস্থ হয়ে উঠলো কিছুক্ষণের মধ্যে।

চোখ মেলে তাকাতেই হোলার নজরে পড়লো আর একটি সুন্দর যুবককে। তাকে খাওয়ানো শেষ করে টুক করে সে বেরিয়ে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে হোলার মনে পড়ে গেল মাখান আর মাচোর কথা। ওদের দু'ভাইয়ের সঙ্গে এ যুবকটির অনেক মিল। তবে কি এও ওদের আরেক ভাই?

না, সে চিন্তা এখন নয়। হোলা তাড়াতাড়ি মায়ের দিকে পাশ ফেরে। মায়ের ঠোঁট নড়তে দেখে আশ্বস্ত হয় সে। ঘরে একটি আলো জ্বালিয়ে রেখে গেছে সেই অজ্ঞাত যুবকটি। সব অন্ধকার দূরে সরিয়ে রেখেছে সেই আলো। আশায় উজ্জীবিতা হয়ে ওঠে হোলা।

কিন্তু পরদিন উঠে সে কি রান্নাবান্না করতে পারবে?

প্রশ্ন মনে জাগলেও কোনো দুশ্চিন্তাই করতে হলো না হোলাকে। পর পর কয়েকদিন ধরেই সেই অজানা তরুণটি আসে, মাকে ও মেয়েকে খাইয়ে দাইয়ে চলে যায়।

কথা বলার মতো শক্তি তখনো ফিরে পায়নি হোলা, তাই যুবকটির নাম-পরিচয় জিজ্ঞেস করাও তার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

এদিকে চার দিনের দিন যুবকটি আর মা-মেয়েকে খাইয়ে দিয়ে যায় নি। খাবার-দাবার গুছিয়ে দু'জনের পাশে দু'টি বাটিতে রেখে গেছে। নিজেদেরই চেষ্টা করে খেতে হয়েছে দু'জনকে।

হোলাদের বাড়িতে তারপর অনেকদিন আর আসেনি ঐ ছেলেটি। কিন্তু এমন করে যে তার এবং তার মায়ের জীবন রক্ষা করেছে সেই তরুণকে বার বার হোলার মনে পড়েছে।

না, এ সেই বাঁশিওলাও নয় কিংবা তাকে যে বাঘের কবল থেকে রক্ষা করেছিল সে যুবকও নয়। চেহারায় তাদের সঙ্গে মিল থাকলেও সে নিশ্চয়ই অন্য কেউ। সেই তাদের বাড়িতে বেশ কয়েক দিনের রান্নার কাঠও জোগাড় করে রেখে গিয়েছে। এমন দয়ালু মানুষকে হোলা একবার ধন্যবাদ জানাবারও সুযোগ পাবে না?

সে সুযোগ পেতে অবশ্য খুব বেশী দেরি হয় নি।

ঘরের জমানো কাঠ কয়েকদিনেই শেষ হয়ে গেছে। বাধ্য হয়েই তাই কাঠ কুড়োতে বের হতে হয়েছে হোলাকে। খেয়ে দেয়ে সে তখন অনেকটা মজবুত।

বনের মধ্যে ধীরে ধীরে কাঠ কুড়িয়ে চলছে হোলা। খুব কাছেই কে যেন কুড়ুল দিয়ে গাছ কাটছে, শোনা গেল। লতাপাতার ফাঁক দিয়ে হোলা দেখতে পেল সেই বলিষ্ঠ মাচোকে যে তার জীবন বাঁচিয়েছিল বাঘের থাবা থেকে। মাচোকে দেখা মাত্র তার বুকের মধ্যে কেমন একটা কাঁপুনি শুরু হয়ে গেল, তার চোখ মুখ দিয়ে যেন আগুন বেরুতে লাগলো। হোলা অনেকক্ষণ মাচোর দিকে তাকিয়ে থাকলো সে যখন গাছ কাটতে কাটতে এগিয়ে চলছিল।

কিছু দূর গিয়েই মাচো বেশ জোরে জোরে কাকে ডাকলো, ছাগো ভক, ভক। কোথায় গেলে, চলো এবার বাড়ি ফেরা যাক।

মাজক ছুটে এলো। এসেই বললে, এতো শীগ্‌গিরই আজ বাড়ি ফিরবে মাখান দা?

হ্যাঁ চলো ভাই, কড় আসবে মনে হচ্ছে।

সমস্ত কথাই শুনলো হোলা। বুঝতে পারলো, ওরা দুই ভাই। ওদের নামও জানা হয়ে গেল তার।

এর পর থেকে রোজই রাতে তিন ভাই একই সঙ্গে হোলাদের বাড়ির কাছে চলে আসে। মাখান করুণ সুরে বাঁশি বাজায়। সে বাঁশির শব্দে ঘোর না ঘুলে পারে না হোলা। দূর থেকে তিন ভাইকেই সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে। প্রত্যেকটি ভাই-ই ওপী। কাকে সে বেছে নেবে তিন জনের মধ্যে? কাকে বরমালা দেবে?

সব ঘটনা মায়ের কাছে খুলে বলেছে হোলা। পরিষ্কার করে তার সমস্যার কথা বলেছে। কিন্তু বুড়ি মা শুধু হেসেছেন মেয়ের মুখে তিন ভাইয়ের গল্প শুনে, মেয়ের সমস্যা সমাধানের কোন আভাষই দিতে পারেন নি।

ভেবে ভেবে আবার গুরুতর রোগে পড়ে গেল হোলা। একদিন সকালে চরম অঘটন ঘটে গেল, হোলা অকস্মাৎ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো। পাহাড়ের গায়ে দাঁড়ানো হোলাদের সেই কাঠের কুটির কান্নায় ভেঙ্গে গেল।

বিষাদ নেমে এলো তিন ভাই-এর জীবনে। বিয়ের কথা আর তারা ভাবতেই পারে না সেই থেকে। প্রতি সন্ধ্যায় মাখান দিয়ে তার বাঁশি নিয়ে হাজির হয় পাথর কেটে হোলাকে যেখানে কবর দেওয়া হয়েছিল সেইখানে। কবরের পাশে

একাকে বসে সে কেবল বাঁশি বাজায় আর সেই সুর আকাশে মিলিয়ে দিয়ে এক অদ্ভুত পরিবেশ সৃষ্টি করে। আকাশের মেঘগুলি থেমে যায়, বাতাসে আর নদীর জলে বরফের শুষ্কতা নেমে আসে। সত্যি সত্যি বাঁশির কান্নার সুরে গোটা অরণ্য এমনি শোকার্ত হয়ে উঠতো যে কোন গাছের একটি পাতাকেও নড়তে দেখা যেতো না। প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা এভাবে কাটতো। মনটা যখন একটু পাতলা বোধ হতো তখন মাখান কবর ছেড়ে বাড়ি ফিরতো।

মাচোর শোকেরও অবধি ছিল না হোলার মৃত্যুতে।

অসুখে পড়ে হোলা কেবল মায়ের কথাই দিন রাত ভাবতো। তার যদি কিছু হয়ে যায় কে দেখবে তার বুড়ি মাকে? সেই চিন্তায় অনেকটা দায়িত্ব নিয়েছে মাচো। সে বড় শিকারি। বনের পশু শিকার করে বেড়ায়। রোজই একটা না একটা জন্তু মেরে তার মাংস রান্না করে হোলার মাকে খাইয়ে আসে এবং নিজেরা খায়, আর সেই জন্তুর চামড়াটা নিয়ে হোলার কবরের ওপর ঢাকা দিয়ে দেয়।

দেখতে দেখতে কবরের ওপর বিরাট স্তূপ হয়ে যায় রঙ-বেরঙের সব চামড়ার। ক্রমে ক্রমে চারদিকে সেগুলি ছড়িয়ে পড়ে অনেকটা জায়গা দখল করে নেয়। নানা-রঙের পাখিরা এসে সেই সব রঙীন চামড়ার ওপর বসে, শুরু হয়ে মাখানের বাঁশির গান শোনে। কখনো কখনো মাচোরও তা' চোখে পড়ে।

হোলার জন্যে মাজকেরই কি কম শোক।

প্রথম বারের অসুখে যে হোলাকে সে অনেক কষ্টে বাঁচিয়ে তুলেছে এবং তার মায়ের জীবনও রক্ষা করেছে, দ্বিতীয় বারে তাকে বাঁচাবার কোন সুযোগ পাওয়া গেল না। সেজন্যে দুঃখের শেষ নেই মাজকের। কিন্তু হোলা চলে যাবার পরে কি আর সে করতে পারে তার জন্যে? হোলার কবর স্থান যাতে কখনো অপবিত্র না হয়, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে এবং হোলাদের চাষের জমিটুকুতে যাতে ভালো-রকম চাষ আবাদ হয় সেই দায়িত্ব নেয় মাজক। ফল-ফসল তো কিছু চাই-ই, বুড়ি মা যতদিন বেঁচে আছেন ততদিন তাঁর নিজের মাঠের ফসলই তিনি ভোগ করবেন, সেটাই তাঁর সম্মানের কথা। কিন্তু মেয়ের জন্যে দিন রাত কাঁদতে কাঁদতে চোখ দুটি তাঁর অন্ধ হয়ে গেছে, আকাশ-মাটি কিছুই তিনি দেখতে পান না। কানেও কিছু শোনেন না। মাচো আর মাজকই তাঁকে দেখাশুনা করে।

মাজক যে হোলার কবরের চারদিক শুধু পরিষ্কার পরিচ্ছন্নই রাখে তাই নয়, এমন ভাবে সে ফুল বাগান করে দিয়েছে কবর ঘিরে সেখানকার ফুলেরা সর্বক্ষণ কেবল কান্নায় নুয়ে থাকে!

আসল কথা, মাখান, মাচো ও মাজক, তিন ভাই-ই হোলার শোকে যেমন মুহ্যমান তেমনি আবার কর্তব্যেও অটল।

যে মেয়েকে তারা তিনজনেই এতো ভালবেসেছে, কি করে তাকে ভুলবে তারা? মুহূর্তের জন্যেও হোলাকে ভোলা সম্ভব হয়নি তাদের পক্ষে।

'কো-কান' গাছে পর পর তিন বার বসন্তের ফুল ফুটে গেল। কিন্তু সেই তিন বছরের মধ্যে বিয়ের কথা ওদের এক ভাইয়েরও মনে আসে নি। ওদের বিয়ের ব্যাপারে শুধু ওদের বুড়ো বাপ মাখনই এরই আক্ষেপের অন্ত নেই। দিন রাত কত কি তিনি ভাবেন আর মাঝে মাঝে দুঃখ করে বলে ফেলেন, বৌ-এর মুখ দেখবো তেমন পুণ্য করে এলে তো আমি বেঁচে থাকতে থাকতে বৌ ঘরে আসবে! তেমন পুণ্য করিও নি, বৌ দেখেও তাই যাওয়া হবে না।

এমনি দুঃখ-বেদনায় আবহাওয়া যখন ভরপুর তারই মধ্যে সহসা এক মজার ঘটনা ঘটে বসলো।

সকাল বেলায় রৌদ্র-ছায়ার খেলা চলেছে পাহাড়ের বুকে। তিনটি তরুণী কোথা থেকে এসে উপস্থিত হলো হোলার মায়ের কাঠের কুটিরে। তাদের তিন জনের প্রত্যেকেই ঠিক যেন একেবারে বসানো হোলা। কিন্তু বুড়ি মাতো চোখে দেখতে পান না, তাই জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কে বাছারা? কি চাও?

একটি মেয়ে বললে, আমরা হোলার ছোট বেলার বন্ধু।

আর একজন বললে, ধান-চাল দিয়ে জিনিষপত্তর কেনার জন্যে আমরাও প্রায়ই সমতলে চলে যেতাম হোলার সঙ্গে।

ও, তাই বুঝি!—বুড়ি মাথা নেড়ে তাদের কথা মেনে নিলেন।

তখন শেষ মেয়েটি প্রস্তাব করলে, শুনতে পেলাম হোলা আর নেই। শুনেই আপনার কাছে ছুটে এলাম। আপনার যদি অমত না থাকে আপনার কাছেই আমরা থাকবো, আপনার সেবা করবো।

সঙ্গে সঙ্গেই তাদের ঠোঁটা অজ্ঞ পড়িয়ে পড়লো বুড়ির দু'গাল বেয়ে। ঠোঁট দু'খানি তাঁর কাঁপতে লাগলো। ঐ অবস্থা দেখে তিনটি মেয়েই চুপচাপ রইলো। অপেক্ষায় থাকলো উত্তরের জন্যে, অনুমতির জন্যে।

ক্রা, আবেগ একটু শান্ত হলে বুড়ি মা খুব ধীরে ধীরে বললেন, এ যে দেখছি তোমাদের গলার স্বর, কথা বার্তা সব কিছুই আমার হোলার মতন। চেহারাও কি তার মতোই নাকি?

সবাইতো তাই বলে।—সমস্বরে জবাব দেয় তিনটি মেয়ে।

তা'হলে তোমরাই আমার হোলার অভাব পূরণ করবে, ভালোই তো। আমার এখানেই থাকবে তোমরা।—বুড়ি মা'র অনুমতি পেয়ে মেয়ে তিনটি ভারি খুশি। এবার একের জায়গায় তিন হোলার মা হলেন বুড়ি মা। হোলা নামেই ডাকতে থাকেন তিনি তাঁর নতুন তিন মেয়েকে।

অন্য দিনের মতো সেদিনও এক জন্তু শিকার করেছে মাচো। তার ছাল ছাড়িয়ে ছালটা যে হোলার কবরের ওপর রেখে দিয়ে মাংসটা নিয়ে বুড়ির বাড়িতে এসেছে রান্না করে বুড়ি মাকে খাইয়ে যাবে বলে।

কিন্তু এ কি হোলার হোলার বাড়ি যে একেবারে সরগরম! তিন হোলার ছলায় বুড়ি মাও যেন তাঁর আসল হোলার শোক ভুলতে বসেছেন। মাচো একেবারে অবাক, এ কি করে সম্ভব হলো!

মাজকের অবস্থাও তাই। সেও মেজদার ঠিক পরে পরেই সেখানে এসে উপস্থিত

এবং অবিকল হোলার মতো দেখতে তিনটি মেয়ের হৈ-হল্লায় একদম বসতে পারে না।

এদের দু'ভাইকে দেখেও মেয়ে তিনটি কিন্তু একটুও দমছে না। বরং এমন ব্যবহার করছে যেন এরা এদের অনেক আগে থেকেই পরিচিত।

একটি মেয়েতো এগিয়ে এসে পরিষ্কার বললে, আপনারা মার জন্যে খাবার দাবার নিয়ে এসেছেন, তাই না? খুব ভালো কথা। খানিকক্ষণ বসুন। বিশ্রাম করুন। আমরা চটপট সব রান্না সেরে ফেলি। তারপর এক সঙ্গে বসে গল্প গুজব করতে করতে বেশ খাওয়া যাবে'খন।

দু' ভাই-ই রাজি।

অল্পক্ষণের মধ্যেই খাওয়ার ডাক এলে খাবার আসনে গিয়ে বসে দু'ভাই। তিনটি মেয়েও এসে বসে এক ধারে।

কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে কি করে সম্ভব হলো এতো রকমের রান্না করে ফেলার? মাকখানে ঘরে থরে সব সাজানো মাংসের, তরকারীর এবং দুধের রকমারি সব খাবার। যার যেমন ইচ্ছে নাও, খাও। এই ব্যবস্থা। আর প্রত্যেকটি রান্না কি সুস্বাদু!

মেয়ে তিনটির গুণের কথা ভাবতে ভাবতে আশ্চর্য হয়ে যায়, মাচো এবং মাজক। খেতে বসে গল্পে গল্পে অনেক সময় কেটে গেলেও খাওয়ার পর আর ওরা দু'ভাই বসে থাকে না। বড়দাকে সব গল্প বলার জন্যে দু'জনেই ওরা অধীর হয়ে উঠেছে। তাই খেয়ে উঠেই ওরা নিজেদের বাড়িতে রওনা হয়ে যায়।

বাড়িতে ফিরেই মাচো আর মাজক মাখান-এর কাছে গিয়ে হাজির। সব কাহিনী ওরা এমনভাবে বলে যে মাখানও তাতে অবাক না হয়ে পারে না।

সে আবার কি কথা, এক হোলা তিন হোলা হয়ে বুড়িমার বাড়িতে এসেছে?

সত্যি তাই। বিশ্বাস না হয় চলো, গিয়ে নিজের চোখেই সব দেখবে।—মাজক এক হুকুম দিবিা দিয়েই কথাটা বলে।

মাচোও তাকে পুরোপুরি সমর্থন করে।

মাখান আর কি করবে তখন, সন্ধ্যে বেলা দু'ভাইকে নিয়ে বুড়ি মা'র বাড়িতে যাবে ঠিক করে ফেলে।

সঙ্গে হাঁসিটা নিয়ে যেতে ভুল করে না মাখান।

ওরা যখন বুড়িমার বাড়ির কাছে গিয়ে পৌঁছয় রাত তখন প্রায় এক প্রহর। প্রথম রাতেই খেয়ে দেয়ে তিন মেয়েকে নিয়ে বুড়িমা শুয়ে পড়েছেন। অনেক বয়েস, শোবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুম। কিন্তু ঐ মেয়ে তিনটে কি এতো সহজে ঘুমোয়? কিস্ কিস্ করে ওরা গল্প চালিয়েছে অনেকক্ষণ ধরে। তারপর বেই বাঁশি বেজে উঠেছে অমনি ধড়মড় করে তিনজনেই ওরা উঠে বসেছে, ছুটে এসে দোর খুলে সামনে দাঁড়িয়েছে।

আরে, এ যে সত্যি সত্যি তিনজনেই একেবারে হোলার মতো দেখতে!

চাঁদের আলোয় ওদের তিনজনকে স্পষ্ট দেখতে পেয়ে অবাক হয়ে যায় মাখান। বাঁশির ওপর থেকে মুখ তুলে বিস্ময় প্রকাশ করতেই হো-হো করে ওরা হেসে ওঠে। বলে, বারে আমরাও তো সবাই হোলা, হোলার মতো ছাড়া কার মতো হবো দেখতো?

এরপর আর কোনো কথা বলে না মাখান। ভাইরাও চুপ করেই থাকে।

মাখান এবার বাঁশির সুরের মাধ্যমে আকুলভাবে ডাকতে থাকে তিন কন্যাকে। ওরাও বাইরে বেরিয়ে পড়ার জন্যে অধীর হয়ে ওঠে। সত্যি সত্যি একবার একই সঙ্গে তিনজনে বাইরে পা বাড়ায়। পরক্ষণেই আবার ভয়ে পিছিয়ে যায়, পাছে বুড়িমা টের পেয়ে যান, তখন কি হবে?

মাজক তখন এগিয়ে এসে বলে, ঠিক আছে তোমাদের এখন যাসতে হবে না, আমাদের বাবা এসে তোমাদের সকলকে আমাদের বাড়িতে আদর করে নিয়ে যাবেন।

ঠিক তাই হলো। ছেলেদের কাছে ঐ তিন কন্যার অদ্ভুত গল্প শুনে মাখরুই নিজেই পরদিন চলে এলেন ফি-ইয়াং পর্বতে ঐ বুড়ির বাড়িতে। তাঁর তিন মেয়ের সঙ্গে মাখরুই তাঁর তিন ছেলের বিয়ের প্রস্তাব করলেন।

বুড়িমা এক কথাতেই রাজী। সত্যি কথা, তিনি তো তাই চাইছিলেন। শুধু তাঁর একটা শর্ত, ঘুরে ফিরে এক মেয়ে-জামাই এসে তাঁর কাছে থাকবে।

এ আর কি এমন কঠিন শর্ত? মাখরুই সঙ্গে সঙ্গেই তা' মেনে নিলেন। বাড়িতে ফিরে এসে তিন ছেলেকে ঐ তিনটি মেয়েকেই বিয়ে করতে রাজী করালেন। দিন তারিখ সব ঠিক হয়ে গেল।

এদিকে তিন ভাই-ই হোলার কথা ভুলতে পারছে না। যাকে তারা এমন গভীরভাবে ভালোবেসেছিল সে নেই ঠিকই। কিন্তু তাই বলে তাকে ভুলে গিয়ে তারা কি করে অন্যকে নিয়ে এত সহজে ঘর বাঁধবে? অন্তত কবরের সামনে বসে হোলার কাছে একবার তাদের প্রাণ খুলে ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত।

তিন ভাইয়ের মনে একই সঙ্গে এ চিন্তা এসেছে। যেমনি চিন্তা, তেমনি কাজ। মাখান মাচো আর মাজক একত্র হয়ে চলেছে হোলার কবরের দিকে।

পথে সেই নদী পার হতে হবে তাদের যেখানে হোলা এসে স্নান করতো। সকালের দিকে যে সময়টায় হোলা সেখানে আসতো ঠিক সেই সময়েই তিন ভাই প্রায় তার কাছাকাছি এসে হাজির।

কিন্তু এতো আনন্দ-কোলাহল কেন? এতো কলকাকলি?—সত্যি সত্যি এমনটি কখনো শোনা যায়নি বলেই অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে যায় তিন ভাই। ঝাউ-পাতা সরিয়ে, ঝোপ-ঝাড় পেরিয়ে তারা নদীর পারে এসে দাঁড়িয়েই দেখতে পেল এক নয়, দুই নয়, একেবারে তিন হোলাকে।

আসল হোলার সঙ্গে এদের যে একেবারে হুবহু মিল! নিশ্চয় কোনো একটা রহস্য আছে এর মধ্যে।—এই বলে দু'ভাইকে নিয়ে এগিয়ে যেতে উদ্যোগ করে মাখান।

কিন্তু মেয়ে তিনটি বুঝতে পেরে জল থেকে উঠে 'পক্কি কি মরি' করে এক দৌড়ে বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত।

এদেরই কি আমরা বুড়িমার বাড়িতে দেখেছি?

হতেও পারে, নাও হতে পারে।—মাখানের প্রশ্নের উত্তর দেয় মাচো।

হোক না হোক, যেখাই যাক না ওরা কোথায় যায়। চলো ওদের পিছু পিছু।—মাজকের মুখ থেকে এ কথা বেরুতেই তিন কুমার জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে' ছোট্ট নদী পেরিয়ে আসে।

মেয়ে তিনটি তখন অনেক দূর এগিয়ে গেছে।

তাতে অসুবিধা নেই কিছু। তাদের ভিজে পোষাকের জলের চিহ্ন ধরে ছুটে চলে তিন ভাই। ছুটতে ছুটতে হোলার কবরের সামনে এসে ওরা থমকে দাঁড়ায়।

জয় প্রার্থনাটা সেরে নেয়া যাক।—এই বলে মাখান কবরের দিকে ঘুরে যায়। মাচো এবং মাজকও বড়দাকে অনুসরণ করে। তারপর কবরের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে, হোলার আত্মার তৃপ্তির জন্যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানায়। তারপর হোলার উদ্দেশ্যে বলে, তারা বিয়ে করতে চলেছে, তার শুভেচ্ছা থেকে তারা যেন বঞ্চিত না হয়। আরো বলে, তার স্মৃতিতে সম্বল করেই তারা তিন ভাই বছরের পর বছর কাটিয়ে দিচ্ছিল কিন্তু বাবা তাদের বুঝো হয়ে গেছেন। তিনি তাদের সংসার পেতে দিয়ে যাবার জন্যে বড্ড ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। আর হোলার মতোই দেখতে তিনটি সুন্দরী মেয়েও পাওয়া গেল—। বুড়িমা'রই তিন পালিতা কন্যা। কাজেই সহজেই সমস্যাদি সব স্থিরও হয়ে গেল হোলা যেন তাদের ক্ষমা করে।

প্রার্থনা শেষ হতেই কোথা থেকে কে যেন বললে, আমি তোমাদের সঙ্গেই আছি।

তিন ভাইয়েরই কানে গেল সেই কথা। মেয়েলী কণ্ঠ। একেবারে হোলার কণ্ঠস্বর! আরেকবার অত্যন্ত আশ্চর্য হতে হলো তিন ভাইকে। কিন্তু সে বিষয় নিয়ে আর কোনো কথা না বলে ছুটে চললো তারা সেই জল চিহ্ন ধরে।

এ কি, অল্প পথে হলেও এতো বুড়িমার বাড়ির কাছেই এসে পড়লাম আমরা!—খানিকটা বিস্ময়ের সঙ্গেই মাচো কথাটা পাড়লো।

হ্যাঁ, তাইতো। জল রেখাতো ওদিকেই চলে গেছে।

ঐতো বুড়িমার বাড়ি। আমরা এসে গেছি।—মাজকের কথার পিঠেই কথা বলে আরো জোর দৌড়তে শুরু করে মাখান। মেজ এবং ছোটও তার সঙ্গে সঙ্গে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তারা বুড়িমার বাড়িতে গিয়ে ওঠে। সে বাড়িতে তখন হৈ-চৈ। বহু লোকের চলা। বিয়ে বাড়ি না? দু'দিন বাদেই যে বিয়ে!

কি আশ্চর্য, বুড়ি মা তাঁর দৃষ্টি ফিরে পেয়েছেন! কি সুন্দর সুস্থ সবল হয়ে উঠেছেন! তিনি নিজে এসে তিন ভাইকে আদর অভ্যর্থনা জানালেন। নতুন বৈঠকখানায় ওদের নিয়ে গিয়ে বসতে দিলেন।

তিন মেয়ের বিয়ে হচ্ছে এক সঙ্গে। কত লোকজন আসবে। একটি মাত্র ঘরে কি করে চলবে? বুড়ি মা তাই আরো দু'খানা ঘর বাড়িয়ে নিয়েছেন। একখানা বড়ো বৈঠকখানা ঘর, আরেকখানা শোবার ঘর। এসব নতুন ব্যবস্থা দেখে মাখানরা ভারি খুশি। আর বৈঠকখানায় নিয়ে এসে বুড়ি মা সেই ওদের বললেন, তোমরা একটু বসো এখানে, হোলাদের আমি ডেকে নিয়ে আসছি, এমনি আনন্দে তিন ভাই চিৎকার করে উঠলো।

বড়ো ভাই বললে, মা, আপনি আমার সেই সুন্দরী হোলাকে বলবেন সে খুব ভালো গান গাইতে পারে।

মেজ ভাই বললে, মা, আমি চাই সেই সুন্দরী হোলাকে যে খুব ভালো কাপড় বুনতে পারে।

ছোট ভাই বললে, মা, দয়া করে আমার যদি সেই সুন্দরী হোলাকে দেন সে খুব ভালো চাষের কাজ জানে। তা'হলে আমি খুব খুশি হবো।

বুড়ি মা চুপচাপ ওদের কথা শুনে এবার, খিল খিল করে হেসে উঠলেন। সে হাসির অর্থ যার যেমনটি চাই তেমনটিই সে পাবে। আনন্দে বুড়ি মার চোখ দু'টি জল জল করছিল। মাখান সে চোখের চেহারা দেখে বুঝতে পারছিল, সে আনন্দ কত গভীর।

মুহূর্তের মধ্যে তাঁর তিন মেয়েকে নিয়ে বৈঠকখানায় হাজির করেন বুড়ি মা। তাঁর হুকুম, সেদিন আর তিন ভাবী জামাইকে বাড়ি ফিরতে হবে না। রাতটাও তাঁর কাছেই কাটিয়ে যেতে হবে। মেয়েদের তিনি বলে দিলেন ভালো করে রান্নাবান্না করতে। বললেন, খাওয়ার জিনিষপত্তর অনেক উপহার এসেছে—তিন রকমের মাংস হবে, উড়ন্ত জীবের, বন্য-পশুর এবং জলজীবের। সার যেটা বেশি পছন্দ সে খাবে। তার ওপর সুগন্ধ দম্ভ চালের ভাত আর নানা রকমের ফল ফলাদিতো আছেই।

এতো সব শুনে লোভ হবারই কথা। কিন্তু একেবারে বাড়ি না ফিরলে বুড়ো বাবা চিন্তায় পড়বেন সে কথাটা মনে হয় মাখানের। বুড়ি মা মেয়েদের নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে কথাটা বলেই ফেলে মাখান।

মাচো তার উত্তরে বলে, অতো চিন্তায় পড়তে যাবেন কেন বাবা? তিনি তো জানেনই আমরা শিকারে বেরিয়ে কখনো কখনো বাড়িতে ফিরতে পারি না। পরদিন তো ঠিক ঠিক তাঁর কাছে গিয়ে হাজির হই-ই। কাজেই অকারণ তিনি ভাবতে যাবেন কেন? কাল সকালেও হয়ি বাড়ি না যাই তখন ভাবনা চিন্তে পারে।

মেজ ভাইয়ের কথায় নিশ্চিন্ত হয় মাখান। মাজকও। খাওয়া-দাওয়া হৈ-হল্লায় দিন কেটে যায়। রাতেরও প্রায় অর্ধেক। বাকি রাতটুকু মাখানের বাঁশি সবাইকে জাগিয়ে রাখে। সারা জগতের পতি যেন শুব্ধ হয়ে রয়েছে তার বাঁশিতে।

এরই মধ্যে মাচো তার তীর-ধনুক নিয়ে জঙ্গলে গিয়ে দু'টো বিরাট বিরাট শূয়োর মেরে নিয়ে এসেছে। মাজকও একেবারে চুপ করে বসে থাকেনি। বাইরে বেরিয়ে সে মাঠ থেকে রাতারাতি এতো ধান এনে সংগ্রহ করেছে যে তাতে উঠোন ছুড়ে ধানের স্তূপ জমে গেছে।

ওদিকে গান চলছে তো চলছেই। চারদিক থেকেই লক্ষ্মীর হাসি করছে যেন!

হাতে বিয়ের আর একদিন মাত্র বাকি। পরদিন ভোর হতেই মাখানরা ভাই বাপের কাছে চলে যায়। মেয়েরাই প্রস্তুতির কিছুই বাকি রাখেননি। কাজেই নির্বিঘ্নে ও সহজেই বিয়ের পর্ব শেষ হয়ে যায়।

গ্রামবাসীরা মাখানই-এর বাড়িতে বৌ দেখতে এসে সবাই খুশি। সবারই মুখে এক কথা, তিনটি বৌতেই ভারি সুন্দর মানিয়েছে তিন ছেলের সঙ্গে। মাখানইকে সবাই ভাগ্যবান বলে অভিনন্দন জানায়।

সূর্য ওঠে, সূর্য অস্ত যায়। চাঁদ ওঠে

আকাশে, চাঁদও বিদায় নেয়। এমনি ভাবেই দিনের পর দিন কাটে, বছর শেষ হতে যায়। বনে প্রান্তরে, পাহাড়ে অজস্র কোথাও থাকে আবেকবার বসন্তের সমারোহ দেখা গেল, লাল ফুলের। পলাশ জাতীয়) সমারোহ।

এর মধ্যে তিনটি শিশুর মা হয়েছে বাড়ির তিন বৌ। এক এক কোলে এক একটি শিশু। কান্নায় ভরে উঠেছে মাখনই-এর বাড়ি। বুড়িমা'র আনন্দের সীমা নেই—মেয়ে-জামাই আর নাতিদের নিয়ে পরম সুখে তিনি দিন কাটিয়ে চলেছেন।

কিসুর মধ্যে কিছু নেই, হঠাৎ একদিন সকাল বেলা তিন ছোলা ভগ্নী একত্র হয়ে তিন ভাইকে এসে বললে তাদের বন্ধু ছোলার কবরখানায় একবার যেতে। চার বছর আগে যে দিন যে মুহূর্তে ছোলা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিল সেই মুহূর্তটি আসন্ন তাই।

ঠিকই তো, ঠিক ঠিক মুহূর্তেই কবরখানায় গিয়ে উপস্থিত হওয়া দরকার। সঙ্গে সঙ্গেই মাখান মাচো এবং মাজক বেরিয়ে পড়লো। তাদের পিছে পিছে তিন বৌও গিয়ে হাজির সেখানে।

অন্ধকার নেমে এলো চারদিকে। প্রবল ধারায় শুরু হলো বৃষ্টি।

সেই বৃষ্টির জলে ভিজে ভিজে কবরের ওপরের চামড়াগুলি ফুলে উঠেছিল। আর তার ভেতর থেকে পর পর কেবলি বিদ্যুতের মতো আলো চমকাচ্ছিল।

তিন ভাই অবাক নিষ্পন্ন। তারই মধ্যে মাখানের স্ত্রী বললে স্বামীর সামনে এসে, ওগো প্রিয়তম, এবার আমার ঘরে' ফেরার পালা। আমাদের খোকনকে তুমি মানুষ করে তোলো। দেখবে, বড়ো হলে খোকন আমার মতোই ভালো গাইবে হবে, আর তোমার মতো বাঁশি বাজিয়ে।

বলেই সে কবরের সঙ্গে মিশে গেল!

মাচো এই দেখে ভয়ে তার স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরলে। কিন্তু তার স্ত্রীও বললে প্রায় একই রকমের কথা। বললে, ওগো বন্ধু,

যাবার সময় হয়েছে, এবার আমায় ছেড়ে দাও। আমাদের খোকামনির দিকে নজর রেখো; দেখবে, বড়ো হয়ে সে আমার মতোই ভালো বয়লাশিল্পী হবে, আর তোমার মতো শিকারী।

এ কথা কয়টি বলেই সেও কবরের সঙ্গে মিলিয়ে গেল।

মাজক অস্থির হয়ে তার জীবন সঙ্গিনীর হাত ধরে রাখে শক্ত করে। কিন্তু ছোটবৌ পরিষ্কার ভাবে বলে, প্রিয় জক, প্রিয় বন্ধু —দেখো, আমরা ছোলারই আত্মার তিনটি অংশ। ছোলা তোমাদের ভালো-বেসেছিল, তোমরাও তাকে নানাভাবে খুশি করেছিলে। ছোলার মৃত্যুর পর তার হয়ে কৃতজ্ঞতা জানাতে, তোমাদের সুখী করতে আমরা এসেছিলাম তোমাদের কাছে। সে কাজ হয়ে গেছে। ঈশ্বর আমাদের তিনটি সন্তান দিয়েছেন। তারা বড়ো হবে, মানুষ হবে—সেখানেই তো সুখের শেষ। প্রিয় জক, আমাদের খোকার যেন যত্নের কোনো ত্রুটি না হয়। দেখবে, বড়ো হয়ে সে তোমার আমার মতোই চাষের কাজে অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দেবে।

সুখের কথা শেষ করেই ছোট বৌও কোথায় অন্তর্ধান হয়ে গেল তার দুই বোনের মতো!

বৃষ্টি তখনো অঝোরে ঝরছে। আর অঝোরে কাঁদছে তিন ভাই ছোলার কবরের ওপর হাত ছড়িয়ে দিয়ে। বৃষ্টির জল আর তাদের চোখের জল একই সঙ্গে মিশে তাক নিম' নদীতে পড়তে থাকলো।

বর্ষণ থামলে মাখান মাচো এবং মাজক বাড়িতে ফিরে গেল। ওদের মুখে সব কথা শুনে সকলেই হতভম্ব।

তিন ভাই-এর মধ্যে কেউই এর পর আর বিয়ে করে নি। কখনো কোনো বিয়ের প্রস্তাব এলে সঙ্গে সঙ্গেই সে প্রস্তাব উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সেটাই স্বাভাবিক। বাড়িতে যে তিনটি শিশুর আবির্ভাব ঘটেছে সবদিক থেকে তাদের যোগ্য করে তোলা, বড়ো করে তোলাই যে তিন ভাইয়ের বাকি জীবনের একমাত্র লক্ষ্য!

যেন এক পলকের বিদ্যুৎ ঝলকানো ঘয়েরী মেঘের ওপর। ছোটন আর কোড়ো তারপর দুজনেই সেই জায়গাটা দেখছিল। বিকেলটা এত ঝকঝকে রোদে উজ্জ্বল যে ঘাসের নিচে সূঁচ পড়লেও দেখতে পাওয়া সহজ।...

ইচ্ছে করেই ছোটনের পিছনে হাঁটছিল কোড়ো। ওকে দেখতে দেখতে যাচ্ছিল। ছোটনের পোষাক যেমন, ছোটন নিজেও এত সুন্দর হয়ে উঠেছে আজকাল। তা ছাড়া অবাক লাগে, এ পাড়াগাঁয়ে ঘাসের মাঠে ধনেবাদাড়ে এসেও কেমন মানিয়ে যায় ছোটনকে। অবিকল যেন নেচে নেচে ওড়া প্রজাপতি—ছিটকি ফুটকি রঙীন ঝলমলে জামা, আঁটো প্যান্টের রঙ ঘাস ফড়িঙের ডলপেটের মত মেটে-হলুদ, তিতিরের মত ছুটো ছুঁচলো জুতো। কী শোভা খেলে রূপসারির বাঁওড়ে! তবে হঠাৎ থেমে ছোটন যখন কিছু দেখে, কোড়োর গা শিউরোয়। ওর চেহারায় একটা তখন ভাব ফুটে ওঠে। যেন বেলাশেষের মাঠে শিকারেরও শুত্ত কোন শেয়াল—চঞ্চল ছুটো কটা চোখ। অভিভূত কোড়োর চমক লাগে। কী চায় ছোটন? কেন আসে প্রতি শনিবার বিকেলে দূরের শহর থেকে? কোড়ো কিন্তু এমনি করে ভাইয়ের সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়ে তার ছেলেবেলাকে কুড়োতে চায়। এও তো সেই পোড়া ঘরার শেষ দিনগুলো। এখন বিলেজঙ্গলে পোকামাকড় সাপ-পিরপিটিনের জোড় বাঁধবার শুত্ত। পাখিরা ডিম পাড়বার জন্যে ঠোঁটে খড়কুটো আনে। এমন দিনে একসময় তারা জোড়বাঁধা ও ডিমপাড়া নিয়ে গভীর উৎসাহে মাথা ঘামিয়েছে। ঘনিষ্ঠ লালপোকা ছুটোকে শুকনো কাঠি দিয়ে উল্টেপাল্টে রহস্যভেদে প্রয়াসী হয়েছে। ঢ্যাবনা-পোখরোর অসংখ্য জড়াজড়িতে ছুঁড়েছে অপঘাতী ঢিল। আফশোসে ফুঁসেছে রূপসারির মাস্তবর মণ্ডলের ছুটি বউর ছুটি ছেলে। কেন তারা দেখতে পায় না বনবেড়াল শেয়াল খটাস বেজি কি তিতিরের জোড়বাঁধা? তারা জঙ্গল ছুঁড়েছে দিনমান। ওদিকে বাঁধের ওপর ঘোড়ার পিঠে মাস্তবর হেঁকে বেড়িয়েছে—হুই কোড়কু ...ছোটকু...উ...উ...অঃ! আওয়াজের শেষটা হঠাৎ উ থেকে অঃ হয়ে গেলে ছুটি সমবয়সী ছেলেই ভয় পেতে গিয়ে হেসে উঠেছে। মাঠের রাজা মাস্তবর।

জায়গাটা কয়েকশো একর অনাবাদী মাঠ। নদীর অববাহিকা—প্রতি বর্ষায় বানের জলে ডুবে যায়। এখানে ওখানে ব্যানা-কাশের ওপর জন্মে ফুল শেয়াকুল নাটা-কোপ। কোপের ওপর লতাপাতার ঘন বুনোট। মাকড়সার জাল। সাপের খোলস উড়ছে। কোথাও বাবলা কি শিউলির গাছ। বাবলায় হলুদ ফুল ধরেছে। শিউলির গাছে গুচ্ছগুচ্ছ ঘয়েরী ফুল। তারপর পেটল ঝোপের ঘন বন—তারপরও সে এক ঘোর অরণ্য যেন। হিজল বট শিমুল ডাঙুলে জাম—গাছ আর গাছে মেশামেশি একাকার। জায়গায়-জায়গায় খানাখন্দ—মাটি ওলটপালট। বড় বড় চাঙড় পড়ে আছে। শাঁওতালদের ক্ষুধার্ত হাতে মাটির বুক এফোঁড়-ওফোঁড়। কত কঙ্কাল আছে এ মাটির নিচে! মোটা-মোটা লতা ওপড়ানো—শুকিয়ে যাচ্ছে পাতা। সেইরকম একটা গর্ত ডিঙিয়ে যাবার সময় ছোটনের পায়ের কাছে কী উঠে এল, নেমে গেল, যেন একপলকের বিদ্যুৎ ঝলকানো ঘয়েরী মেঘের ওপর।

ছোটন আবছা কী শব্দ শুনেছে মাত্র। ডিঙিয়ে গিয়ে পিছন ফিরেছে। সাপই বটে। কিন্তু কী সুন্দর! সে দেখতে লাগল। সাপটা ফাটল না পেয়ে শুকনো লতার ভিতর আস্তে আস্তে হাঁটছে। সন্তর্পনে।

এদিকে কোড়া কাঠ হয়ে দাঁড়িয়েছে

কয়েক মুহূর্ত। তার ঠোঁট কাঁপছে। নিষ্পলক চোখে সটটার দিকে তাকিয়ে সে সাপটাকেই খুঁজল প্রথমে। দেখতে পেল না। এক লাফে এবার সে ছোটনের কাছে এগিয়ে এল। ওকে টানতে টানতে একটু দূরে নিয়ে গেল। তারপর তার কান্না আর থামে না! ছোটন স্তম্ভিত। এখনও এত ছেলেমানুষ হয়ে আছে কোড়োদাটা!

হু হু ফোঁস ফোঁস দুঃখবিকারে কোড়ো অনর্গল কিছুক্ষণ কাঁদে। পুরু ঠোঁটদুটো উল্টেপাল্টে, লাল মাড়ি হলুদ দাঁত চিতাবাঘের মত ধরকুটে, ঘাবড়া নাক কাঁপিয়ে—কী বিচ্ছিরি রকমের কান্না তার। ছোটনের ভারি খারাপ লাগল। আরও খারাপ লাগল, যখন কোড়ো তার দুতোর তলায় আঙুল দিয়ে সাপের দাঁতের ফুটো খুঁজতে থাকল। চামড়া মোটা আঙুল দেখে হাসি পায়। ছোটন মুখ ফিরিয়ে রাখে—পাছে তার হাসি দেখে ফেলে কোড়ো। কোড়ো বলে, উঁ হু হু, কী হত রে ছোটকু! তোকে ছটফটিয়ে মরতে দেখলে আমি কী করতাম …হায়, হায়!

নাঃ। ছোটন তাচ্ছিল্য করে জবাব দেয়। পায়ে-দুতোর ঢাকা আছি না! বরং কোড়োদা, তাজ্জিল, তুই আগে ছিলিনে। কী হত বল্ তো? তুই যে প্রায় নেকেড হয়ে আছিস রে।

সে কথায় কান করে না কোড়ো।… বাবা বাজে না তো রে ছোটকু? যন্ত্রণা হয়? নিমপাতা চিবোবি?

হাসলে কোড়োদার অসম্মান হয়। সে অভিমানী ছেলে। ছোটকু ঠাট্টা করছে জানলে হয়ত এ ব্যানার বনে স্থির দাঁতাবে আজীবন নির্বাক যেন ছড়কাটা বাবলাগাছ। সে এক দমক্কা। সুতরাং ব্যস্ত হয়ে সে বলে, না, না, কিস্যু হয়নি। টেরও পাইনি। তাছাড়া পয়েজনাস স্নেক নয়—দেখলাম তো। ঠোঁকা ফিংবা চ্যামনা।

কোড়ো গামছার খুঁটে এবার চোখ মোছে। ভাঙা গলায় বলে, আমিই তোর কাল নাকি রে! তোকে নিশির ডাক দিই! আর তুই এদিকে আসিস না ছোটকু। আমি হাজার বললেও আসিস না। আমি…আমি তোর মরণ।

ছোটন তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে একটু সময়। তারপর মিষ্টি মিষ্টি হেসে বলে, তুই আমার দাদা।

এই কথায় কী আছে, একমাত্র কোড়োই জানে—সে আস্তে আস্তে বসে পড়ে, নদীর ঘাটে যেমন করে নৌকা ভেড়ে। তারপর বলে, ঠোঁকা না চ্যামনা বলছিলি। আমি স্পষ্ট দেখেছি, ফণা ছিল সাপটার। সোঁ করে ছোবলাতে গেল তোকে। ছোটন, তোর চোখ থাকে আকাশপানে, আমি মাঠচরা মানুষ, আমার চোখ মাটিতেই থাকে।

নাও, ওঠ। ছোটন ওর হাত ধরে টানে।…ছিঃ, কী বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে তোমায়। কাপড়চোপড় ঠিকঠাক করে পরো।

টানাটানিতে কোড়ো উঠেছে। উঠে সে বলে, দিবি কর্ তো ছোটকু, বাড়ি ফিরে একথা বলবিনে কাকেও।

বেশ তো, বলব না। ছোটন ঘাড়িতে জবাব দেয়। পা দুঁতে থাকে কোড়োর।

কোড়ো বড়বড় চোখে তাকিয়ে বলে, তোর মা শুনলে ভাববে আমি বিষয়সম্পত্তির লোভে তোকে…

বাধা দিয়ে ছোটন বলে, সাপটাতো তোমার পোষা নয়।

কে জানে! বলে হঠাৎ কোড়ো সামনে তাকিয়ে কয়েক মুহূর্ত কের নিষ্পলক—তারপর বুকের পাশে এগোচ্ছে। সামনের ঝোপে একটা বুলবুলি ছিল। সে উড়ে গেল। কয়েকটা শালিখ ছিল। ট্যা…অ্যা…অ্যা…অ

আজ হঠাৎ এমন হয়ে গেল কেন সে ? কেমন বিভ্রান্ত, অপোগণ্ড-আর প্রাংটোও !

• • •

অবশ্য বনেবাদাড়ে এলেই কোড়োকে কেমন যেন ন্যাংটো দেখায়, ছোটন তা আগেও লক্ষ্য করেছে। সেটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। যে-বয়সের হোক না কেন, নিরিবিলি গাঢ় লতাপাতার ভিতর কেউ ন্যাংটো হলেও কারুর কিছু বলার নেই। দেখলে তো বলবে! তাছাড়া কোড়োর চেহারায় যা-ঘটছে-ঘটতে-যাওয়ার একটা স্বাধীনতা আছে। বড় বড় চুলে মাথাটা তার কাকড় মাকড়, খেজী বেশ কয়েক জায়গায় টুটা কাটা, ধুতি ময়লা তো বটেই—প্রথমদিকে দখের বশে আজানুলম্বিত থাকলেও কখন উরুর উপর জড়িয়ে যায়—পায়ে মোটরের টায়ারে তৈরী চল্লিশ পয়সা দামের স্যাণ্ডেল; অথচ তার বাবাই গাঁয়ের মণ্ডল—যার সবচেয়ে বেশি চাষের ক্ষেত আছে। দুকোড়া বলদ আছে। আর আছে দুটো বউ। একটার পেটে কোড়ো, অন্যটার ছোটন। তার ওপর বিলপারের এই সামান্য গাঁয়ে চাষাভুষো মানুষদের একমাত্র ছেলে ছোটন, যে ইদানীং দুবছর ধরে শহরের কলেজে পড়ছে। সুতরাং কোড়োকে কেমন খাপছাড়া দেখায় এটা ঠিক। ঘাসের জঙ্গলে চলতে চলতে সে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেলে কঞ্চিকাটা বাবলা গাছ দেখায়। আক্ষেপে কোড়োর মানী বাবা মানুষকে মণ্ডল বলে, ওটা কি মানুষ ? ওটা গাছপালা।

এক রাজা—তার দুই রাণী। সুয়োরাণী আর দুয়োরাণী। মানুষকে তেমনি রাজা হবে।

এইরকম একটা সংসারের দুই যুবক ছেলে কোড়ো আর ছোটন। দুই ভাই—সৎ কিন্তু সমবয়সী প্রায়, দুদিনের আগপিছু জন্ম, তাই বন্ধু। অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু। যারপরনাই দুজনের অন্তরঙ্গতা। পরস্পর দুজনের ঘর সামনাসামনি হাট করে খোলা। তাই এক ঘরের ভিতর দিয়ে বাতাস এসে সামনের ঘরের ভিতরও কিছুক্ষণ ছটফটিয়ে যায়। প্রতি শনিবার ছোটন শহরের হোস্টেল থেকে ছোট লাইনের ছোট গাড়ী চেপে ছোট্ট স্টেশনে নেমে হাঁটে দুমাইল বিলঝাঁদর ভেঙে বাড়ি আসে। মাঠেই দেখা হয় পরস্পর। হয়ত তখন সবে কোড়ো ক্ষেতে মই দেওয়া সেরেছে, সেরে বীজের ঝুড়ি কাঁখে ধরে বাবার চোখেই ঘুমের নরম শান্ত ঠাণ্ডা আর ফুলন্ত সেই ক্ষেত—যা কুমারী চাষামেয়ের প্রসূত শরীরের মত দেখায়, কোড়ো তাকে দেখছে। হঠাৎ ছোটনের হালকা খুসির ডাক এল সেই দমস্ত পুরের হাওয়াছ ভাঙচুর : কোড়োদা, কোড়োদা রে ! বাস, বড় বড় হলুদ দাঁত খুলে কোড়োর নক্ষত্রহীন অবাধ হাসি। আনন্দ। আমন্ত্রণ। আয় রে আয়, ছোটকু আয়···এই বলে সে লম্বা কয়েকপা এগিয়ে আলের ওপর দাঁড়ায়। তখন ছোটনের কী মনে হয় ? তার মনে হয়, এই যে শরীরে মনে লেগেছে মুক্ত হাওয়ার বেগ, এই যে বিহ্বলতা—পাখি এমনি করেই গাছের দিকে উড়ে যায়।

কোড়োকে লেখাপড়া শেখানো যায় নি। রেললাইনের ওপারের গাঁয়ে বড় সমৃদ্ধি। স্কুল আছে, ডাকঘর আছে। বাদুন কাহেতে আছে। সেখানে দুটি ভাই লেখাপড়া শিখতে যেত। প্রথম প্রথম পায়ে হেঁটে—পরে ঘোড়ায় চেপে। কোড়োর অল্প বয়সেই ঘোড়ার নেশা, ছোটনের সাইকেলে। মনু মাষ্টারের মার খেয়ে কোড়ো স্কুল ছাড়ল। ঘোড়াটাও চুরি করে নিয়ে গেল পাহাড়দেশের জাঁতা-ওয়ালারা। তারও হঠাৎ কোড়োর মনে পড়ে যায় তার কথা। হায়, এখনও দুষ্ট নিষ্ঠুর সেই জাঁতাওলাদের প্রকাণ্ড সব জাঁতা বইতে-বইতে ঘোড়াটার বুড়ো হতে হতে রুপমারির এক দুধের বাছুরের পালকসমান ওজনটুকু কি মনে পড়ে ? বড়মোল্লানের ধারণা, ঘোড়া চুরি না গেলে তার ছেলে স্কুল ছাড়ত না। আর ওদিকে ছোটন দুয়োরাণীর ছেলে—বয়রমপুর থেকে এসে শেল তরুণ সাইকেল, কুড়িমন ধানও লাগেনি। কোড়ো কিন্তু বাঁজা ভাওয়ার ভাইকে সাইকেল চালা শিখতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। ভাইয়ের জন্যে তার গর্বের অন্ত ছিল না। আজও নেই। প্রতি শনিবার স্টেশনমাস্টার সরু ডহর পথের আশেপাশে কোন ক্ষেত সে বেছে নেয়। ছিনটের ভাইন দুপুরের খরেরী জঙ্গলের শীর্ষে অতিকায় চামনা সাপের মত গড়বড়িয়ে এসে অপ্রমনস্ক কোড়ো দেখে তার বুকটা কখন ফুলল, আদরের তোলপাড়, তার ভালবাসায় টলটল, কখন কানে শুনবে ভাঙচুর ডাক : কড়োদা রে !···তখন কী হয় কোড়ো ? তখন কোড়ো হয় বিশাল স্থির আর প্রসূত গাছ। যে আসে পাখী, তার জন্যে।

তারপর অনেক কথা হয় দুটিতে। সবরকম কথা। বাছবিচার হীন। সংকোচ-বিহীন। এই জৈষ্ঠে একলা বাবলার হলুদ-হলুদ ফুল ধরেছে। কদিন আগের বিকেলে কিছু বড়জল হয়েছিল এদিকে। তাই জমানো শুঁড়ো দুধের মত কুরো কুরো সাদা মাটির রঙ প্রায় দূসর। নরম ঠাণ্ডা শান্ত সেই মাটিতে কচি ঘাস দলে ওরা বসেছিল কিছু ক্ষণ। ছোটনের অবশ্য পাছার নিচে রুমাল। তার পাশেই পিঁপড়ে বা ঘাস ফড়িং বসলে সযত্নে কাঠি দিয়ে কোড়া সাফ করে। ছুঁচলো জুতোর ডগা থেকে আনমনা আঙুলে ঘষে ফেলে মাটির টুকরো, এবং ব্যস্ত হয়ে ছোটন পা সরালে কোড়ো বলে, মরলা লেগেছিল। সে মনে মনে আরও বলে, এই আমার ভাই ভাইয়ের হাতটা হাতে নিয়ে সে পরখ করে তার দ্রব্যগুণ যেন—যেন তার মনে হয়, ছোটনের শরীরটা দিনে দিনে এত দামী হয়ে উঠছে, যা অতঃপর এই রুপমারির এতবড় মাঠের মূল্যেও কেনা যাবে না। তখন ভয়ে তার পা ছম ছম করে। এই তার ভাই—তাকে আটকে রাখবার আকুল সাধে কোড়ো মনে মনে ছটফট করে। গাছের মতো ছায়ার সুখে নিবিড় নরম স্পর্শের সোহাগে ধরে রাখতে চায় তার আদরের পাখিটিকে।

অথচ এই গাছের কোটরেই ছিল সাপের বাস।

• • •

তখন জঙ্গলের দিক ছেড়ে সাপটা কেন ছুটেছে আবাদী জমির ওপর, এই এক রহস্য। দরকারমত বৃষ্টি হয়নি বলে আউস-পাটের চারাগুলোর ঝাড় নেই।

কদিন আগের রক্তটুকু না পেলে শুকিয়ে মরে যেত এতদিনে সেই সামান্য রসে অল্প কিছু সবুজ রঙ পেয়েছে মাত্র। তাহলেও নীচের মাটি চাওয়ার আলো আপাতত নেই। আর সাপটার রঙ কালো। রোদে পিঠ চকচক করছে। তার দুরোবার চেষ্টা বড় বৃথা। সময়ও পাচ্ছে না তো! সরু আলের বুকে ইঁদুরের গর্ত যা ছিল, জ্ঞানী চাষারা চাষবাসের সুরুতে দিয়েছে বুজিয়ে। নতুন করে জাল বেঁধেছে সাপটা ক্রমশ ভীত হয়ে পড়ছিল। পিছনের পায়ের শব্দ ক্রমাগত এগিয়ে আসছিল।

হুচারবার ছিল বা বড় চাঙড় তার খুব কাছে বা পিঠের ওপর পড়ছে বটে—এ মাটি এত নরম যে সঙ্গে সঙ্গে তা গুলো হয়ে যেত। হাওয়াতে সে গুলো উড়ছে যেন বন্দুকের গুলি ফট্টাস্। এখানে ওখানে একলা দোকলা গাছ আছে—ক্ষেতে ছায়া দেয় বলে তার ডাল কেটে জড়ো করা থাকে। আশপাশ খুঁজে তেমন কোথাও দেখছিল না জোড়ো। তখন মামাসি ভুলে গাল ঠিচ্ছিল কাঠকুড়োনী মেয়েগুলোকে। এ মাঠে একটু-আধটু কাঠকুঠো আর মিলবে না—ওদের হাতের এমন লোভ!

বাবা মানুষের নাকি সাপ মারতে পটু। তার হাতে সবসময় একটা ছোটা ছড়িমতন থাকে—কিংকর হুতোর যোক্তম হবার আগের দিন একটা ভাল ছুলে মাথায় মধুরের মাথা বানিয়ে মণ্ডলকে উপহার দিয়ে দিয়েছিল। মণ্ডল তাই দিয়ে কত সাপ নাকি মারল সংখ্যা নেই। অতি সহজে কি কৌশলে মাথায় ঠুক করে ঘা মারতেই গতর দ্যাপটে সাপযোগ অজ্ঞা! পড়ার কোন ঘরে সাপ ধরতে বেদের বদলে মণ্ডলকেই ডাক পড়ে। তার ছেলে এই জোড়ো সে হন্যে হয়ে সারা মাঠ দৌড়চ্ছে একটা সাপের পিছনে। ধিক্ জোড়ো, তোকে ধিক্!···নিজেকে এভাবে ধিক্কার দিয়ে সে ছুটছিল। মাঝে মাঝে ঢিল লেগে সাপটা কোঁস করে ফণা তোলে। ঘাড় কাৎ করে তাইনে বা বাঁয়ে ছোবল মারে। ফসলের পাতায় বুঝি গরল

ঢালতে ঢালতে যায়। সারা ফসলের মাঠ বিষিয়ে দিল যে! সব পুড়ে যাবে বিষে। উঃ হু হু আওয়াজ জোড়োর গলায়, ত্রাসের শিহরণ, চুল খাড়া! ক্রমশ সে ক্ষেপে অস্থির,) চকমার চাপচাপ ফেনা, চোখদুটো লাল,—যেন তাকে সাপে কেটেছে। ছটফট করে সে। বিড়বিড় করে—তুই, তুই ওকে সংসারে চেয়েছিলি!

এবার সাপের গতি ডাইনে অর্ধ-বৃত্তাকার। কোথায় যেতে চায় সে? ওদিকে নদীর ধরা সোতা—যার নাম বাঁওর। এক জায়গায় বহুকাল আগে পাড়ের কিছুটা বসে ডোবার মত হয়ে আছে। মাঠচরানী মেয়েরা বাঁওরের জল থেকে খাদটা পৃথক করে রেখেছে। উঁচু কাদার বাঁধ দিয়েছে। সন্ সন্ করে সাপটা গিয়ে নামল সে পাঁকগোলা গাঢ় হলুদ জলে। সদ্য মাছধরার চিহ্ন পাড়ে। সাপটা বেশ কিছুটা সাঁতার কেটে গিয়ে ডুবল। জোড়ো ঢিল হাতে তৈরী। মাথা তুলতেই ঢিল ছুঁটল সে। ডুবে গেল ফের। তারপর আর অনেকটা সময় কোন পাত্তা নেই তার। তখন জোড়ো পাড়ে বসে পড়ল হাতের কাছে প্রচুর কাদা। টেক্কেমাত্র ছোঁড়া যাবে! হুঁশও এলোমেলো। মন মন ঢেউ উঠল। বৃত্তাকারে মিলিয়ে গেল চার পাশে।

বুক শুধা লাগে। বড় তেষ্টা খু খু ফেলার মত আঠালো। সারা গায়ে ঘাম জোড়োর। আস্তে আস্তে সে ক্লান্তি টের পেতে থাকে। রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে আসে। ঘুম পায়। ঘোলাটে চোখে আধবুজা মানুষের মত বসে থাকে জোড়ো। কত কী মনে পড়ে যায় তার। আবছা সব দৃশ্য। ছেলেবেলা আর ছোটন—তার আদরের ভাই। পাখপাখালি আর পোকামাকড়ের জোড়-বেঁধে থাকা। নীল হলুদ ধূসর নানা রঙের ডিম। বাঁওরের ধারে বা গাঙ পালার ভিতর এইরকম কতদিন ধরে একটা সাপের মত সে কাকে তাড়া করে ছুটে চলেছে। জোড়োর ভয় করে। সে মাথা চেপে ধরে বারবার বলতে থাকে চাপাস্বরে: না, না। আমি কাকেও হিংসে করি না, কারুর ওপর আমার হিংসে নাই।·····

* * *

পিছন থেকে একটা লম্বা ঘুমের ছায়া কখন এল—জোড়োকে ঢেকে বাঁওরের জল পেরিয়ে চলে গেল ওপারে, জোড়ো জানে না। পিছনে ডুবন্ত সূর্য—প্রতিদিন লাল। তাকে ঢেকে ছোটন দাঁড়িয়ে আছে। ডেকেছে, জোড়ো দা। তুই বসে আছিস এখানে? কেন রে?

জোড়ো পিছন ফিরে এতক্ষণে ওকে দেখে নেয়। তারপর গলা ঝেড়ে বলে, ছোটকু এলি?

ব্যাপার কী তোর? ছোটন পাশে বসে পড়ে।···সাপটা মারতে পেরেছিস?

জোড়ো মাথা নাড়ে। আস্তেসোস্তে বলে, না রে ছোটন, না। ও আমাকে পাগল করেছে! ও আমাকে হার মানাল রে।

তবে বসে আছিস কেন?

ভাবছি।

কী ভাবছিস?

তোর কথা।···এই বলে খুকখুক করে কাসির মত একটু হাসে জোড়ো।

ছোটন ওর গলা বেড় দিয়ে বলে, আমার কথা ভাবছিস! সে কী রে জোড়ো দা?

ছোটকু, ফুলির কথা তোর মনে পড়ে?

ফুলি? কে সে?

ফুলরা।

ও, হ্যাঁ। ফুলরা।

আমরা দু ভাই মিলে তার সঙ্গে জোড় বাঁধা খেলতে চেয়েছিলাম, না রে ছোটকু?

ছিঃ জোড়ো দা। লজ্জা দিও না। এখন আমরা বড় হয়েছি।

জোড়ো কান না করে বলে, তুই আমার আদরের ভাই। তোকে দিলাম আগে জোড় বাঁধতে। তারপর আমার পালা। কিন্তু যাবার মুখে হঠাৎ তুই বলে উঠেছিলি, ওই রে, বাবা খুঁজতে বেরিয়েছে!···আমি ভয় পেয়ে পালালাম। আমার জোড় বাঁধার সাধ যেন মনে। ফুলরাকেও আর কোনদিন পেলাম না। তুই কি তাকে বারণ করেছিলি ছোটকু? নাকি ও তোকেই পছন্দ করেছিল? আমাকে বুঝি ঘেন্না হত তার।

ছিঃ, কোড়ো দা। এতদিন পরে ও কথা তুলো না। আমার লজ্জা করে।

আমার করে না। বলে অকারণ দাঁত বের করে একবার হাসে কোড়ো।...সত্যি ছোটন, আমার জানবার ইচ্ছে করে। ভাবি প্রতি শনিবার তুই আসিস—বলব কথাটা। বলা হয় না। বয়স আমার মুখ চাপে। আজ সেই বয়সটাকে পাল্টা চেপে তোকে বলতে পারছি ছোটকু। সত্যি বারণ করেছিলি? নাকি ওর বেলা হত? আঃ, আমার সাধ মেটেনিরে ভাই।

ছোটন তার গলা ছেড়ে দিয়ে আলগোছে একটা ঘাস ছিঁড়ে দাঁতে কাটতে থাকে। বলে, সে-সাধ তোর কারুর কাছে কি মেটেনি একবারও?

নাঃ। ফুলরা ছাড়া আমার সাধ কই ছিল? দেখি না, জানি না। আমি এত কুণ্ঠিত, এক সাধ দুই করতে ভয় পাই।

পাগল! তুমি এত ভালো কোড়ো দা, এত সুন্দর! আমার চোখে তো বটেই! তুমি চুপ করো। অন্য কথা বলো। আরো কত কথা থাকে—সেইসব কথা বলো।

বলি।...একটু চুপ করে থেকে কোড়ো বলে, আচ্ছা ছোটকু, বাঁওরের বাঁধের দরখাস্ত তুই লিখেছিস?

হ্যাঁ। কেন?

বাঁধ দিয়ে কী হবে রে?

বাঃ। তোর—তোদের সবারই মঙ্গল হবে। ফসল ফলবে। জঙ্গল সাফ করে জমি পাবি তোরা। তুই তো চাষবাস করতেই ভালবাসিস, কোড়ো দা। বাসিস না?

বাসতাম। এখন আর বাসি না।

কেন রে?

আমি জানি.....হঠাৎ থেমে যায় কোড়ো।

কী জানিস?

শুনবি?

বা রে। শুনব না কেন?

তোর মাও জানে সব। আমার মা বোকা মেয়ে, টের পায়নি। এখনও পায় না। আমি কিন্তু জানি সব। জেনে...

ছোটন ওর কাঁধ ধরে শক্ত আঙুলে। বলে, কী, কী রে কোড়ো দা? থামলি কেন? বল্।

তোর মা আমার মা বটে। তবে আমার মা সেজী—আমি যার ছেলে!...হাসতে হাসতে কোড়ো বলে, তোর মা রূপসী মেয়ে। তুই তার ছেলে। তুই দেবতাদের মত সুন্দর, আমি অসুরেরও অধম।...ছোটকু, তোর রূপসী মায়ের নামেই মণ্ডলের সব সম্পত্তি দাসখতে বাঁধা! এ সেই জোড় বাঁধবার খেলা রে ভাই।

স্তব্ধ হয়ে থাকে ছোটন। তার পরে বলে, তুই সত্যি বলছিস?

সত্যি ছাড়া মিথ্যে না। তোকে কোনদিন মিথ্যে বলিনি ছোটকু। একদিন তুই হবি এ মাঠের রাজা।

ছোটকু লাফিয়ে ওঠে। চিৎকার করে বলে, না, না, না! ওসব মাঠ-ঘাট আমি ভালবাসিনা! আমি যাই!

কোথায় যাবি?

বাবার কাছে যাব। আশ্চর্য কোড়ো দা, তোর চেয়ে বোগা মানুষ আর কে আছে রে, যে মাঠের মালিক হতে পারে?

বোস্। হাত ধরে টানে কোড়ো।...বাবার জীবরতি—বাহাত্তুরে ধরা। তুই-আমি যুবাপুরুষ বটে। বোস্। আরও কথা আছে। এতদিনের কত না বলা কথা আছে, ছোটন। সে বড় বিষম কথা ভাই।

পাশাপাশি দুটো ছায়া তখন অন্য এক বিশাল ঘুসর ছায়ায় মিশে গেছে। আকাশে ফুটছে নক্ষত্র। দুই ভাই পরস্পরকে ছুঁয়ে নির্বাক বসে থাকতে-থাকতে চোখ ভাসিয়ে জল উপচে আসছে। মুখোমুখি দুটো দরজা খোলা ঘর। যান এলে দুটোই ভাসে।

• • •

এক ঘর পেরিয়ে যান গেল সামনের ঘরে—দরজাটা হাট করে খোলা তারও। তখন কোড়ো বলে উঠল, আয় ছোটন, অনেকদিন পরে তোকে আদর করতে সাধ যায়। এবং যানের মত আদর এসে সাপের মত লম্বা আর কুটিল হতে হতে ঠাণ্ডা হতে হতে, ক্রমশঃ শীতকায় হতে হতে, ছোটন হাঁফায় আর বলে, উঃ, ছাড়, ছাড় কোড়োদা মরে গেলাম যে! আদর বাড়ে। বাড়তে থাকে। বিশাল হয়। আঁটো হয়। প্রবল চাপে ফুসফুস ফাটিয়ে ফেলে। ছোটনের নাক দলিয়ে অন্ধকারে যেন মদির মত রক্তের স্রোত ধারায় হাত ভিজে যেতে থাকে কোড়োর। প্রকাণ্ড থাবড়া হাত। লাঙলের মুঠোধরা কোদালের বাঁট ধরা কঠিন বলবান হাত। পাখির মত হটফটায় মাকড়ের মণ্ডলের দ্বিতীয় পক্ষের রূপবান ছেলে। আর তার শহরে ফেরার আশা করা যায় না। কলেজে পড়েই বা কী হবে? রূপমারির মাঠে-বাঁওরে প্রতি শনিবার বিকেলে তার ছেলেবেলার সঙ্গে লুকোচুরি খেলবার সময়, সারাক্ষণ তাকে অনুসরণ করেছে যে সাপ তার প্রথম ছোবল লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেও, দ্বিতীয়টা ফস্কাল না। সামান্য দু চার ইঞ্চির এদিক-ওদিক মাত্র। এতক্ষণে লক্ষ্যটা ঠিক হল।...

তারপর অনেক রাতে টলতে টলতে ফিরেছে কোড়ো। লণ্ঠনের আলোয় বড় মোক্ষম ছেলের মুখ দেখে অবাক। যেন কড়ছলে ক্ষেতে বীজধান ছড়িয়ে ফিরল এতক্ষণে। এত ক্লান্ত আর হতশ্বাস! তবু বলে, খিদে নেই। ঘুমুবো:—বড় ঘুম আসে মা!

ঘুমিয়ে কোড়ো ছাড়া দেখে ছোটনকে। রূপমারির বাঁওরের পাড়ে নিরিবিলি মাঠে সে স্টেশনের পথ ভুলে গিয়ে শুধু কোড়োদাকেই ডাকছে। কোড়ো সাড়া দিতে যায়—পারে না। তাই গোঙায়। গোঙানি শুনে মা তাকে জাগিয়ে নিলে কোড়ো ঠাণ্ডা শরীরে নিঃসাড় পড়ে থাকে। তেষ্টা পেলেও জল চাইতে ভয় পায়। কারণ, কোড়োর সাড়া পেলে ইকে বলে উঠবে, তুই আমার সখা! কে সখা তার? যে সখা সে চিরজীবি রূপমারির বাঁওড়ে। খোলসে ওড়ে তার পতাকা।

এর পর সবটাই জেলার কাগজে আইন আদালতের পাতায়। সেখানে সাপটার কোন উল্লেখই থাকছে না।

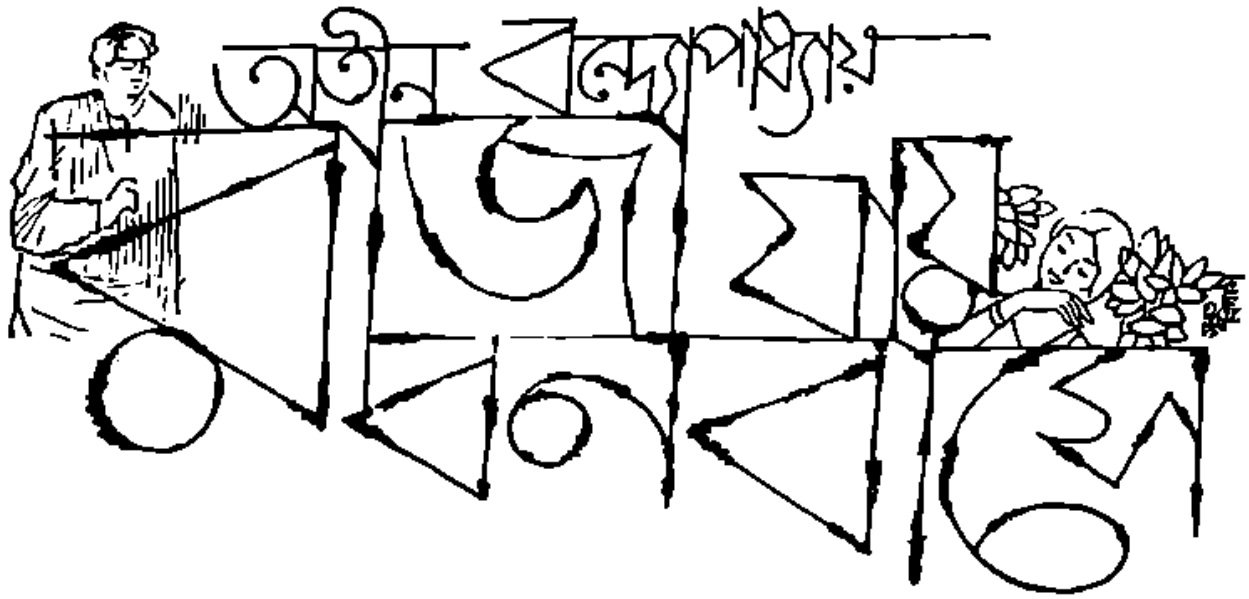

রাতে খুব বৃষ্টি হয়েছে। সুভাষ ট্রেনে জানালা বন্ধ করে বসেছিল। নিয়োগ পত্র এবং সঙ্গে একটা চিঠি। কোন স্টেশনে নামতে হবে, তখন কটা বাজবে, কোন গাছটার নিচে ওর জন্যে একটা বয়েলের গাড়ি থাকবে, সব ঠিকঠাক লেখা। সুতরাং বার দুই হাতে সে তার সিটে বসেই যেন সেই রাস্তার গাছপালা এবং যে পথ ধরে ওকে যেতে হবে সব খুবই দেখতে পাচ্ছিল। তারপর কখন ঘুম এসে গেছিল সে টের পায়নি। যখন জাগল ভিতরে একটা ভয়। বুঝি ট্রেন ওকে নির্দিষ্ট স্টেশন ফেলে দূরে নিয়ে এসেছে। সে তাড়াতাড়ি উঠে বসল। জানালা খুলে দিল। এখনও রাত এই বর্ষার মাঠে চুপচাপ জেগে আছে। আছে। সে বুঝল ট্রেন এখনও ওর গন্তব্য স্থলে পৌঁছায়নি। ট্রেন লেট না থাকলে, স্টেশনে পৌঁছানো মাত্রই সূর্য উঠে যাবে এমনি বুঝি লেখা ছিল চিঠিটাতে।

বেশ সময় মত এই ট্রেন ওকে একটা স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে গেল। রেল লাইনের এ পাশে গ্রাম। ও-পাশে বন। বিল। কতদূর চলে গেছে কে জানে। বিলের নাম কি, এত বড় বিলের পাশে তাকে আজীবন কাটাতে হবে ভাবতেই প্রথম কেমন একটু বিহ্বল হয়ে পড়ল। দু একজন যাত্রি নেমেছে। খুব ছোট্ট স্টেশন। ও পাশে একটা বট গাছ, দুটো আম গাছ, এবং একটা শাতকুয়ো। সড়ক চলে গেছে মাটির উপর দিয়ে। একপাশে রেলবাবুদের বাড়ি, এবং কুপথ্য মতো সর্বত্র গাছের জঙ্গল অনেক দিন পর সুভাষ এমন একটা নিরিবিলি স্টেশনে নেমে যেন সে বনবাসে চলে এসেছে, এই বনবাস বুঝি ওর জীবনে নির্ধারিত ছিল, সে বিলের জল দেখতে দেখতে এমন সব ভাবল। বিলের জলে সামান্য ঢেউ আছে। কিছু জেলে নৌকা চলে যাচ্ছে। ওরা এই গাড়িতে কিছু মাছ সহরের জন্য তুলে দিয়ে গেল। আর কিছু পাখি উড়ছিল বিলের জলে। রোদ ছিল। বৃষ্টির পরে রোদ। রোদে এই মাঠ, গাছপালা এবং বিলের জল আশ্চর্য রকমের স্নিগ্ধ। গাছপালা সবুজ, এত সবুজ যে একটা গন্ধ উঠে আসছে। সবুজ গন্ধ।

রেলবাবু বললেন, স্যার আপনি সুর্যপুর যাবেন। আপনার গাড়ি রেডি। বলে বাবুটি হাত তুলে দেখিয়ে দিল।

সুভাষ ভাবল, এই মানুষ তাকে কলকাতার মানুষ ভেবে ফেলেছে। খুব গাঁয়ের স্কুলে সে যাচ্ছে। আপাতত সে স্কুলের প্রধান হিসাবে থাকবে। অস্থায়ী। টেনিং প্রাপ্ত হলে সেই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং আজকাল এই ডাকে করে যেতে হবে। ট্রেন থেকে নামা মাত্র এই মানুষ তাকে চিনে ফেলেছে। এমন অজ পাড়াগাঁয়ে কলকাতার মানুষ আসে এই বুঝি মানুষটার বিস্ময়। সে সুভাষকে টিকিট নেবার ফাঁকে ফাঁকে দেখছিল।

সুভাষকে এই স্টেশনের প্রতিটি মানুষ লক্ষ্য করছিল। রেলবাবুর গায়ে কালো কোট। একজন পানি পাতে, হাতে খালি টিন, সে নীলরঙের একটা জামা গায়ে বাবুর দিকে তাকিয়ে প্রায় যেন গিলে ফেলবে ভাব, এ-কোন দেশ থেকে এল, এমন দেশে কার বাড়ি সে যাবে, তারপর বেট গুনল সূর্য-গাঁয়ের মাষ্টার তখন ফিক করে হেসে দিল, অ বাবু আপনার লাগি একটা গাড়ি লেইগে আছে যান। বলে সেও গাছটার নিচে যে গাড়িটা ছিল, যে ঘোড় দুটো রাত থেকে অপেক্ষা করে আছে, সেদিকে হাত তুলে দিল। সঙ্গে একজন মানুষ যেন, সেই মানুষ এতক্ষণে নেমে এসে বলল, আসুন স্যার। আমি বলাই বাবু, শ্রীবলাই চন্দ্র দাস। ইস্কুলের ক্লার্ক। হেড-পণ্ডিত। মাঝে মধ্যে চিঠিটাও স্যার চালিয়ে দেই। যখন শিক্ষক থাকে না স্যার তখন বলাই দাস সব কাজ করে বেড়ায়। বলেই বলাইচন্দ্র

একটা ঢোক গিলে বলল, কোন অসুবিধা হচ্ছিল স্যার। রাস্তা ঘাট আজকাল ঠিক হয়েছে।

—না। সুভাষ বলাই বাবুকে অনুসরণ করল। গাড়িটার সামনে একটা হ্যারিকেন। বোধ হয় রাতে, সারা রাত আলো জ্বালিয়ে রাখা হয়েছিল, কেউ খেয়াল করেনি আলোটা নেভাতে হবে, তেল নেই, আলোটা ভিতরে ভিতরে জ্বলছে, সুভাষ ওটার দিকে তাকিয়ে বলল, বলাইবাবু হ্যারিকেনটা এই আলোতে জ্বালিয়ে রেখে কি লাভ।

বলাইবাবু জিভে কামড় দিল। এই যাদুন স্যার। বলেই সে এক বয়স্ক পাড়োয়ানকে। অলিমদ্দি বসে বসে তামাক খাচ্ছিল। সে বলল, যাই বাবু।

—আরে ব্যাটা যাই না। রোদের ভিতর বসে আলো জ্বাললে যে মূর্খ লক্ষ্মী পায়।

তা বটেক বাবু। কি বুঝল, কি বুঝল না বোঝা গেল না।- অলিমদ্দি ঘাড় নাড়ল।

বলাই দাস বলল, স্যার অনেকটা পথ। কিছু খেয়ে নিলে হত।

—এখন এই সকালে।

—এই চা টা।

—আমরা কখন পৌঁছাব।

—তা বারোটা হয়ে যাবে। জলে ভাঙ্গার পথ। বর্ষার দিন। বাকিটা আর বলল না বলাই দাস। সুভাষ না বললেও যেন টের পায় এই পথ পাঁচ ক্রোশ চলে গেছে। দুপাশে বন। মাঠ আছে বড় দুটো। তারপর হিজলে ডাঙ্গায় সে চলে যাবে। বড় বড় ঝোড় পড়বে। প্রায় যেন এক দেশ, বহু যোজন দূরে, আলো নেই চাওয়া নেই, কেমন এক দ্বীপের ভিতর সে চলে এসেছে। সুভাষের সেই আবেগ কাজ করছিল, প্রাচীন কলকাতার পথ ঘাট, সর্বত্র অনুর ছবি, সে এমন এক দেশে চলে যাবে, যেখানে রাতে কেবল কিঁ কিঁ পোকা থাকে, তাহুকের শব্দ শোনা যায় এবং খুব গভীর রাত্রিতে নদীতে কোন মাঝির গান শুনতে পাবে—নদীরে তোর উজানী স্রোতে আমারে ভাসাও। এখানে অন্তত সেই ছবি, অনু এবং অসীমের যুগলে ছবি, সে দেখতে পাবে না। সে কি যেন দেখতে পাচ্ছে, তার ভিতরে ভিতরে এত দূরে এসেও সেই কষ্ট কেন, অনুর জন্যগান সে এই সকালের রোদে কোথাও দেখতে পায়ে ভেবে মনের ভিতর আলো জ্বেলে দিল। খুব খুসি খুসি গলায় বলল, বেশ জায়গাটা! আমার খুব ভাল লাগছে বলাইবাবু। বস্তুত এতদূরে এসেও অনুর ছবি তাকে ভাড়া করছে ভাবতে গিয়ে ভিতরে সে কেমন বিষণ্ণ হয়ে গেল।

কিছু খেয়ে নিন স্যার।

—চলুন!

একটা ঘুপচি মত ঘর। কিছু পাকা কলা। একটা কড়াইয়ে বাসি রসগোল্লা কত দিনের। কিছু জিলাপি, তাও বাসি। গরম কিছু ভেলেভাজা। খাস্ত বলতে এই। সুভাষ বলল, আমি শুধু একটু চা খাব বলাইবাবু।

—রসগোল্লা খান।

—আমি খাব না।

—আপনি না খেলে স্যার…

অর্থাৎ যেন বলার ইচ্ছা বলাইবাবুর, আপনি না খেলে স্যার আমি খাই কি করে। সুভাষ মনে মনে বুঝতে পেরে বলল, আপনি খান। আপনি রসগোল্লা নিন।

—আপনি স্যার ভাববেন না। খুব ভালো। খাটিক নাম। ওর বাবা জটিলার হাতে রসগোল্লা কারিগরের বাবুরা, অনু বাবু রস বাবু—সে একেবারে অজ্ঞান। পূজা পার্বণে জটিলা, উৎসবে ব্যসনে জটিলা বাকিটা যেন সুভাষের বলার ইচ্ছা, কারণ কেন জানি বলাইবাবুকে দেখলেই একটু রসিকতার ঝোঁক হয়। এমনটা কিন্তু ওর কোনদিন হতো না। দমদমাতে রাজবাড়ে …সে এইসব বলে রসিকতা করার স্পৃহা কিন্তু কোনরকমে মন সংবরণ করে বলল, আপনি খান।

—আপনি খাবেন না স্যার। পরে যেন ওর সহসা মনে পড়ে গেল, এই মানুষ এসেছে কলকাতা থেকে। আবেদনপত্রে ওর ভিগ্রি এবং ভালো ফল লাভের কথা সকলে জানে, আর এমন হীরের টুকরো ছেলে যে গ্রামে এমন একটা সামান্য কাজ নিয়ে আসছে—সে এ-অঞ্চলের মহাপুণ্যের ফল। কিন্তু বলাই বাবু একমাত্র মানুষ, যিনি রহস্য খুঁজে পান। খুঁজে খুঁজে কোথায় সেই রহস্যের মূল, কেন এমন মানুষ সহর ফেলে দূরে চলে এসেছে—তার একটা যেন অনুসন্ধান চাই। সুতরাং বলাইবাবু আর কিছু না বলে, কিছু রসগোল্লা গব গব করে খেয়ে ফেললেন।

সুভাষ টাকা বের করে দিল। ওর চায়ের দাম এবং বলাই বাবুর রসগোল্লার দাম।

বলাই বাবু হা হা করে উঠলেন, স্যার এটা আপনি কি করছেন!

—খেলে দাম দিতে হবেনা।

—সব জায়গায় দাম দিতে নেই স্যার। বলে প্রায় জোর করে তুলে নিয়ে এল সুভাষকে।

—গরীব মানুষ…

—তুলে ওর এলাউন্স আছে।

—পাঁচ ক্রোশ দূরে মানুষটা থাকে।

—হাঁ স্যার।

—রোজ আসে যায়।

—না। মাঝে মাঝে আসে, মাঝে মাঝে যায়।

বয়েলের গাড়িতে সুভাষ এই প্রথম উঠতে গিয়ে ছেলেমানুষের মতো ঘিরে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে গেল। বলাইবাবু সামনে বসলেন গাড়িটা লাইনের ধারে ধারে চলতে থাকল। মাঠে নানা রকমের শস্য বলতে কিছু নেই। শুধু চারিদিকে ধানের জমি। কতদূরে এইসব ধানের জমি চলে গেছে। কত কাল পর সে একটা নতুন পৃথিবীতে চলে এসেছে। উপরে—আকাশ নীল। লাইনের ও-পাশে বিলের জল, জলে কিছু জলপিপি উড়ছে। কিছু পানকৌড়ি ডুবছিল ভাসছিল কোথা থেকে সব পাখিরা উড়ে এসে বিলের ও-পারে যাচ্ছে। রেলের এ-পারে সব জল ক্ষেতে চাষিরা আপন মনে কাজ করছে। কোন ত্বরা নাই কিছুতে। কিছু হিজলের গাছ। গাছে এখন ফুল নেই। ফল ধরেছে। জলে রাস্তায় এবং সর্বত্র সেইসব ফল হরতকির মতো ছড়িয়ে আছে দেখতে পেল।

বলাইবাবু বললেন, স্যার কেমন দেখছেন?

—খুব ভালো। খুব ভালো লাগছে।

—আরও পাঁচ ক্রোশ পথ ভাঙব।

ঐ যে দেখছেন, ওটা হচ্ছে আদুর গাঁ। এখানে ছোট্ট মেয়ের গল্প বলেন বলাই বাবু মেয়ের নাম আদুর কেন—কোন এক মেয়ে আদুর গায়ে সব এই হিজলের বনে চলে আসত। হিজলের মোটা কোটর ভরে নিতে মেয়ে খেলা করে অথবা ওর এক জগত ছিল, যেখানে এসব ফলের লাল অনেক, মেয়েটা আসত, মাঠ পার হয়ে আসত, কি বর্ষার শীতে, কি বসন্তে এই মেয়ে লাইনের ধারে ধারে কচু বন থেকে কচু, বিলের জল থেকে শাপলা, রাঙা থেকে শোবর এবং সবই মহামূল্যের মতো এই মেয়ে তার দুঃখী মায়ের জন্য সংগ্রহ করে নিয়ে যেত। সেই মেয়ে কারু গায়ে ঢিল দিত না। কেবল আদুর গায়ে এই মাটিতে, গাছ পালা পাখির ভিতর ছুটে বেড়াতে ভালবাসত। তারপর একদিন যেন এক নিয়তি এই মেয়েকে জলের নিচে নিয়ে গেল, নতুন আর এক দেশ, সবুজ দেশ, শ্যাওলা জমি, সূর্যের আলো সেখানে সবুজ কেবল, সবুজের পাতাদের জলের ভিতর মেয়েটা শাপলা তুলতে গিয়ে মাছ হয়ে গেল। বলাইবাবু এমনই যেন সেই মেয়ের নামে বলতে চাইলেন। কত লোক এল, খোঁজার পালা, কে হারিয়েছে, সেই মেয়ে হারিয়েছে, আদুর গায়ে যে মেয়েটি মাঠে ঘুরত সেই মেয়ে হারিয়েছে। তারপর মেয়েটাকে আর কেউ দেখতে পেল না। শীতের রাতে অথবা বর্ষার এক রুপালি মাছ জলে উঠতে দেখেছে সেই বিলে। মাঝটা পাকে এসে যেন ডাকত, আমি দুঃখি মায়ের জন্য এখানে বসে আছি। অনেকে ছাট ফেরত অথবা গঞ্জ থেকে ফিরে আসার সময় এমন শুনেছে। আদুর গায়ে মেয়ে যেন শীতে কাঁপছে। সে অবেকার কথা, বলাই বাবু বললেন, মেয়েটাকে আমরা দেখিনি, আমাদের পিতামহের আমলের গল্প। সেই মেয়ের নামে নাম শুনেছি যারা খুঁজতে এসেছিল, কেউ কেউ আর ফিরে গেলনা। চচু জমিতে ওরা ঘর বাধল। ওর দুঃখি মা বললে, আদুর গাঁয়ে এলে একটু মাছের নিচে জল দিতে হয়। বিলের জল। আসুন আমরা গাছটার নিচে একটু জল দিই বড় প্রকাণ্ড হিজল গাছ, সাদা পাথর কালো রঙের পথ ধরে হাবার সময় জল, পদ্মা যা তোমার আছে, তুমি দাও। সুভাষ নেমে জল দিল।

সুভাষ বলল, মাঝটাকে আপনারা দেখেছেন বলাইবাবু? দেখিনি তার। তবে অনেকে দেখেছে। খুব জ্যান্ত দেবতা।

সুভাষ চুপ করে থাকল। এমন একটা নির্জন জায়গায় এসে, যখন চারিদিকে শুধু প্রান্তর আর বিলের জল, কচিৎ দু এক জন চাষি মানুষের মুখ, গাছে গাছে কি সব নানা রঙের পাখি ডাকছে, আর মনে হয় কোথাও এই নির্জন সকালের রোদে শালিখ অথবা চড়ুই শস্য খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে, তখন গাছের নীচে যে দেবতা বসবাস করবে বিচিত্র কি। সুভাষ তার শৈশবের কথা যেন স্মরণ করতে পারে—সেই শৈশবে মনে হয় যেন সে এক নিরিবিলি আশ্রমে মায়ের পাশে রাতে ঘুম যেত, পরীদের গল্প বলতেন মা। সুন্দরী বালিকা এবং শিশু দেখলে পরীরা সব হরণ করে নিয়ে চলে যেত ওর মনে হত তখন তাকেও একদিন কেউ হরণ করে নিয়ে যাবে। তারপর পরীদের সেই যে বলে না, নিয়ে গিয়ে এক বরফের পাহাড়ে, অথবা পাহাড় পার হয়ে ওর কোন এক যক্ষ রাজার দেশে, কি সব সোনার ফুল, রুপোর পাতা মুক্তোর ফল, ফুলে ফলে ভরা দেশে নিয়ে ছেড়ে দিত। তারপর পরীদের কাজ শেষ হলে, ঘরের চালে, গম ক্ষেতের ভিতর, অথবা নদীর চরে ফেলে দিয়ে চলে যেত। পরীতে পেলে মেয়েদের চোখ নীল হয়ে যায়। যেদিকে তাকাবে সব মরুভূমি হয়ে যাবে। সুতরাং আগুন জ্বেলে ওকে খুন করা—এখন সব গল্প ছেলেবেলাতে সে শুনে শুনে কবে এক কলকাতা নগরীতে এসে কেমন বুদ্ধিমান হয়ে গেল। অনু নামক এক যুবতীকে ভালবেসে বিবাহ। ভালবাসা কথাটার সে ছুটো অর্থ খুঁজতে চাইল। ভালবাসা পরীর মতো, কি এই যে মেয়ে আদুর গায়ে মাঠে অথবা বিলের জলে ভেসে বেড়াত, ভালবাসত সব কিছু নীল আকাশ অথবা মাঠের সস্যক্ষেত্র' চাষিদের বাড়ি ফেরা গরু নিয়ে, সন্ধ্যায় গ্রামে আলো জ্বলে উঠলে শাঁখ অথবা কাঁসির শব্দ, (যেন ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান, সন্ধ্যায় সূর্য আমাদের বনবাসে রেখে চলে গেছেন, এখন আমরা আমরা ঘন্টা বাজিয়ে ঈশ্বরকে আমাদের পাহারাদার নিযুক্ত করছি) এবং সেই মাঠ পার হয়ে আদুর গায়ে ছোট্ট এক বালিকা নিরন্তর ছুটছে, ওর ভালবাসার সাম্রাজ্য এই সব মাঠ, সস্যক্ষেত্র। আদুর গায়ে সেই মেয়ের মতো ভালবাসা না হয়ে পরীর মতো ভালবাসা অনুর। আপন স্বার্থে অনু তাকে ভালবেসে কেমন এক নিদারুণ ভোগের নিমিত্ত এখন ওর কাছে পরী হয়ে গেল। বস্তুত সুভাষ কেন জানি অনুর জন্য কোন দুঃখ অথবা বেদনা বহন করতে পারছে না। এই যেন তার ভাল হল, সে এক আদুর গাঁয়ে চাষির। এখানে কেউ ওকে বলবে না, আপনার স্ত্রী সিনেমাতে অভিনয় করছে! বড় মারাত্মক অভিনয়। অথবা অনুর বিচিত্র লীলা, সে কোথায় কি করে বেড়াচ্ছে কিছুই এই এমন এক স্থানে পৌঁছে গেলে আর জানা যাবে না। সে নিজেকে বস্তুত, এই সব নির্জন পৃথিবীতে নিক্ষেপ করে নূতন ভাবে বাঁচতে চাইল।

বলাইবাবু বললেন, আপনি কলকাতার মানুষ। দুদিনে হাঁপিয়ে উঠবেন।

—হাঁপিয়ে উঠব কেন?

—এখানে আর কি আছে বলুন।

—কি নেই বলুন।

—ও আর প্রথম প্রথম সবাই এমন বলে-কি গ্রাম্য। তারপর এসে কেমন বিষন্ন হয়ে যায়।

সুভাষ এবারও উত্তর করল না। ওর ঘুম পাচ্ছিল। কারণ যেন দুলছে গাড়িটা। রোদ এসে পায়ের কাছে পড়েছে। দু একজন চাষি মানুষ কে যায় এই গাড়িতে উঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করল। বলাইবাবু সুভাষের পরিচয়, এবং কখন স্টেশনে এসে বসে আছে সব বিস্তারিত বলছে।

সুভাষ বলল, এ-গাঁয়ের কি নাম।

বলাই বাবু বলল, দূর্গা হাট। বলেই আর একটা গল্প বলতে গেলে সুভাষ বলল, আমাদেরও কিছু পথ নৌকায় যেতে হবে।

—সামনের বড় বট গাছটা দেখছেন, পাশে মসজিদ এবং তারপর এক ঘাট পাবেন। ঘাটে নৌকা বাঁধা আছে।

—আমার মনে হয় দুপুরের ভিতর পৌঁছতে পারব না।

—তা পারা যাবে।

একটা কাক ছইয়ের উপর এসে বসেছে। কাকটা দুবার কা কা করে ডাকল। এখন প্রীতি কি করছে? প্রীতিকে সে দুবার দুটো ফুল দেবে ভেবেছিল। প্রীতি যদি ওর ফুলের অপেক্ষাতে বসে থাকে বরং অনুর চেয়ে ওর প্রীতিকে বেশি মনে পড়ছে। এখন ভিন দেশে সে যথার্থই নিঃসঙ্গ। প্রীতিকে যদি সে এখানে নিয়ে আসে। প্রীতি, ডাক্তার মানুষ। এখন অজ পাড়াগাঁয়ে প্রীতিকে সকলে দেবীর মতো দেখবে। সে দেখ সমস্তটুকু—যখন প্রীতি ট্রেনে তুলে দিতে এসেছিল, বলেছিল সুভাষ, সুভাষের এখন মনে পড়ছে, আপনি কিছু হেসে আমাকে বিদায় দেবেন। চোখে মুখে কোন বিষণ্ণতা থাকে আমি চাই না। প্রীতি কথা ঠিক রেখেছে। সে এতটুকু বিষণ্ণ হয় নি। সে যেন রুমাল উড়িয়ে, যেন সে তার বন্ধুকে বিদায় জানাতে এসেছে, দুদিন পরই আবার কোনো সমুদ্র তীরে বুঝি দেখা হবে এমন চোখ মুখ ছিল প্রীতির। কিন্তু সুভাষ জানত, প্রীতির সঙ্গে দেখা হবার আর সম্ভাবনা নেই। সে বড় একগুঁয়ে মানুষ। ভেতরে ভেতরে যা একবার ঠিক করে ফেলে সেখান থেকে কেউ তাকে নড়াতে পারে না। সে নিজেই একটা ব্যূহ তৈরি করছে। যার সে শুধু প্রবেশ পথটা জানে, বের হবার পথ যেন তার জানা থাকে না। সে অসহায়! ট্রেন ছেড়ে দেবার সময় প্রীতির দিকে চোখ তুলে নিজেই আর তাকাতে পারেনি। সে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে বসেছিল। সে সুরুচ মানুষ। দুর্বলতা ধরা পড়লে সে খুব ছোট হয়ে যাবে।

বলাই বাবু বলল, স্যার ঈশ্বরের কি অপার মহিমা!

সুভাষ ভাবল, এত ঈশ্বর ঈশ্বর করছে কেন লোকটা।

—কি মহিমা বলাই বাবু?

—এই যে স্যার না, একটু বর্ষা পেলেই ধান পাটালি গুলো কেমন সজীব হয়ে যায়। যেন ওরা ঈশ্বরের কাছে এই সামান্য বর্ষনের জন্য প্রার্থনা জানায় কেবল। সবুজ মাঠের দিকে তাকালে এখন মনে হয় না আপনার।

আমি অনেকদিন পর সহর ছেড়ে এসেছি, গ্রামের কথা প্রায় ভুলেই গেছিলাম অথচ দেখুন কি আশ্চর্য জন্ম আমার গ্রামে আমাদের পুকুর পাড়ে বড় বড় শিমুল গাছ ছিল, নিচে ঝোপাট, সেই ঝোপাটে অজস্র মালার ধান, পলাশ ধান, বলতে সেই যে লাল রঙ, লাল ফুলে ফুলে ছেয়ে গেছে মাঠ ঘাট, আমি এক ছোট বালক—এমন আগুনের ভিতর লাল আগুন দেখে আশ্চর্য হয়ে যেতাম—আমারও তখন ঈশ্বরের মহিমার কথা মনে হত। কিন্তু পরে ভেবেছি, বড় হওয়ার সঙ্গে, বিশেষ করে যখন বড় সহরে চলে এলাম, অনু এল জীবনে, মিথ্যা অহমিকা নিয়ে অভিমান করে থাকলাম, অনুর জীবনে ফুল ফুটুক এমন আর বলতে পারলাম না তখন ঈশ্বরকে আমার সব সময় কেন জানি একটা কুকুরে তাড়া করা একটা বাঁদরের মতো মনে হত। এসব বলার ইচ্ছা হল সুভাষের। কিন্তু না বলে অন্য কথায় এল। কারণ লোকটা জানে না, সে এখানে কেন পালিয়ে এসেছে। জানলে সেও ওকে করুণা করবে। সে বলল, গ্রামে মাঠে ঈশ্বরকে যতটা ধরা যায়, সহরে তেমন আমরা তাকে তেমন ধরতে পারি না। সহর ঈশ্বরকে খুব মেকি মনে হয়। বলাই বাবু আপনার এত বড় মাঠ দেখে আমার ঈশ্বর নতুন ভাবে যদি কথা বলে বলুক না। তাকে দেখি কের আমি ভালবাসতে পারি না।

বলাই বাবু যেন সুভাষের অসারতার কথা থেকে কিছু ধরতে পারল না। শুধু বলল, তবে কি জানেন স্যার আপনাকে আমি একটা ধন দেখাব। গ্রামের গ্রাম পার হলে একটা নদী পড়বে। নদী পার হয়ে সেই বনে ঢুকে যেতে হয়। একবার যদি সেই বনে প্রবেশ করেন, তবে দেখবেন কি যে সব লতাপাতা, নানা রকমের গাছ, কত বিচিত্র বর্ণের পাখি, কত রকমের ফুল ফল। একবার ঢুকে গেলে আর বের হতে ইচ্ছা হয় না। যেন শেষ নেই অন্বেষণ। মনের রহস্য ধরে ফেলতে পারলে আর এই দেশ ছেড়ে যেতে পারবেন না।

সুভাষ যেন মনে মনে বলল, আমি তেমন একটা জায়গার সন্ধানেই চলে এসেছি বলাই বাবু। তেমন সন্ধান পেলে আর কোথাও যাব না। আপনি আমাকে সেখানে ঠিক নিয়ে যাবেনত!

বলাই বাবু বলল কেন নিয়ে যাব না বলুন।

সুভাষের যেন বলার ইচ্ছা হল, আমি এক রহস্যের ভিতর এতদিন ডুবে ছিলাম, সে শরীরের রহস্য। এখানে এসে, এই শস্যময় মাঠ, ঘাট দেখে ফুল ফল দেখে সে রহস্যময় কথা ভুলে যাচ্ছি। যদি অন্য রহস্যের সন্ধান দিতে পারেন আমি নিশ্চয়ই আর কোথাও যাব না মনে মনে আমিও অন্য এক শরীরের রহস্য বুঁকে বেড়াচ্ছি। এক রহস্য দীর্ঘদিন ধরে বেড়াতে ভালো লাগে না।

—এই ঘাট, নামুন স্যার।

সুভাষ বিলের জলে নৌকায় উঠে ভেসে গেল। স্ত্রী অনু, প্রীতি, অথবা সেই হোটেলের স্ত্রীর অভিনয়ের ছবি চোখে ভেসে উঠল না। সে বিলের জল দেখতে দেখতে কেমন তন্ময় হয়ে গেল। সূর্য মাথার উপরে ছিল, মনে হল মাথার উপর কিছু পাখি, হবুল তাদের বক। পাখিরা বিলের জলে অদৃশ্য হয়ে গেল। সুভাষ এবার যেন মনে মনে বলল, আমরা ইচ্ছা করলেই বনে ঢুকে যেতে পারি না, আপনি আমাকে সেখানে নিয়ে চলুন।

তখনই যেন বিলের জলে ঢেউ উঠল। পালে বাতাস লাগল। নৌকা জলের উপর ওর ওর করে ভেসে চলছে। যেন অনন্ত যাত্রা। এই বিল শেষ হবে না।

নিজের জলে ছায়া প.ড় না ...খোলা জল। রেল লাইন ক্রমে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। সুভাষ, সেই জল, হাওয়া এবং রোদের ভিতর ভেউয়ের শব্দ শুনতে পেল। যেন সেই ঢেউ চুপি চুপি সুভাষকে বলছে, রাজা যায় বনবাসে, রাজার প্রাণে ভয়। সব ছেড়ে পালায় রাজা, কোথায় সে পালাচ্ছে। সে তো পালায় নি। সে এবার মনে মনে বলল, আমি কার কাছ থেকে পালাব? আমি তো চেষ্টা করলেই জোরজার করে অনুকে ঘরে আনতে পারি, প্রীতিকে বেঁধে রাখতে পারি, আমি পালাব কেন?

মনের ভিতর থেকে কে যেন জবাব দিল, বাপু তুমি নিজের কাছ থেকে পালাচ্ছ। হয়তো তোমার প্রিয় ছিল। বস্তুত তুমি তোমার পাগলা গারদ তৈরি করে রেখেছ। তুমি যতই দূরে চলে যাও, যতই ভাব বনবাসী হলে তোমার ভালবাসার অনু কি করে বেড়াচ্ছে, তুমি জানবে না, মনে শান্তি আসবে, এটা ঠিক না সুভ, এ ভাবে পালালে সংসার তোমাকে কাপুরুষ বলবে। এবং এ-সময় কেন জানি সুভাষের বার বার প্রীতির চোখ ভেসে উঠল। ওর বারান্দায় যে অস্থির ছিল, সারা জীবন ধরে যেখানে সে এত জল ঢেলেও ফুল ফোটাতে পারল না, আশ্চর্য সেখানে একটা ফুল ফুটে থাকল। ফুলটা সে প্রীতিকে উপহার দিয়ে এসেছে। একমাত্র প্রীতিই জানে সে নিরুদ্দেশে চলে এসেছে। সুস্থির হয়ে অনু কলকাতায় ফিরে এসে দেখবে, যদি সুভাষের খোঁজে আর একবার আসে —তা ছাড়া দোসর রামচন্দ্র আছে, সেই তার মা-মণিকে জানিয়ে দেবে, মা-মণি বাবু নিরুদ্দেশে চলে গেছে—অনু হয়ত সামান্য সময়ের জন্য লোক দেখানো কান্না-কাটি করবে। এই লোক দেখানো সব কিছু, মনের ভিতর আবার একটা মন আছে, সেই মনটা তাকে এখন সব বলতে চাইবে।

বলাইবাবু বলল, স্যার এত চুপচাপ কি ভাবছেন।

—কিছু না।

—নামুন। আমরা এসে গেছি।

সুভাষের যেন ঘুম ভেঙে গেল। সত্যি, এই যেন একটা আলাদা দেশ। কি সবুজ এবং গাছপালা বৃক্ষে একেবারে জড়াজড়ি করে আছে। একটা বড় পথ চট সুতকির। পাশে রেল-লাইন। রেল-লাইন বেঁকে এই গ্রামের পাশ দিয়ে চলে গেছে। পাশে নদী। নদীর পারে সেই বন দেখতে পেল। ফুল বাড়ি ইটের। সামনে সবুজ ঘাসের লন। প্রায় আশ্রমের মতো দেখতে। প্রধান শিক্ষকের নিবাস তার দিকে। ওর সংসার এই বলাই বাবু বিদেশীদের জমি নিয়ে বসবাস করেন। একটা বড় আমলকি গাছের নিচে বলাই বাবু মাঠ-কোঠা বাড়ি বানিয়ে নিয়েছেন।

সে নামতেই গ্রামের মাতব্বর মানুষেরা সুভাষকে অভ্যর্থনা করল। ওরা নিবাসে নিয়ে এল ওকে। সুভাষ দেখল, নানা রকমের ফুল ফুটে আছে। পাঁচিলের ধারে ধারে নারকেল গাছ। বর্ষাকাল বলে কিছু জিনিয়া ফুল নীল হলুদ রঙের, সে বারান্দায় একটা বেত চেয়ারে চুপচাপ বসল। সত্য পৃথিবী থেকে সে যেন কত দূরে চলে এসেছে। নির্জন নিরিবিলি এই জগৎ। সে কলকাতায় থাকলে এখন কোন স্রোতে অথবা প্রীতিকে নিয়ে ঘোরা, এবং সন্ধ্যা হলেই জিরো জিরো লেভেলে চুপচাপ একা একা বসে মদ্যপান, যেন জীবন থেকে সব হারিয়ে গেলে যে নিঃসঙ্গতা জন্মায়, সুভাষের ভিতর তেমনি এক নিঃসঙ্গ ভাব। ওর কান্না পায় তখন। এই নির্জন পৃথিবীতে বসে ওর কেমন সেই সহর কলকাতার জন্য আবেগ বোধ করল।

কিছু রাত হতেই চারিদিকে অন্ধকার ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকল। কি কি পোকা ডাকছে। মন্তরী ঘরের ভিতর আলো জেলে দিয়ে গেছে। নিশুতি রাত মনে হয় দূরের সব গাছ পালা বৃক্ষ এক অন্ধকার-মগ্ন জগত সৃষ্টি করে রেখেছে। সে চোখ তুলে তাকাতে পর্যন্ত সাহস পচ্ছে না। বিদ্যালয় ছুটি বলে দু এক জন গ্রামের মাতব্বর মানুষ ছাড়া ওর সঙ্গে কেউ দেখা করতে আসেনি। কাল হয়ত অনেকে আসবে। ওর মনে হয়েছে কেউ কেউ দূর থেকে দেখেই চলে গেছে। রাতে বলাই বাবু ওর বাড়িতে খেতে বলেছেন একমাত্র এই বাড়িটাই ওর আবাসের কাছাকাছি এমন কি চুপচাপ বসে থাকলে বলাই বাবুর কথা শুনতে পাওয়া যায় কাঁচা তারের বেড়া পার হলেই বড় আমলকি গাছটা, গাছটার নিচে কে যেন লণ্ঠন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে দেখল, বলাই বাবু অন্ধকারে টর্চ মেরে এদিকে আসছে। ওর বারান্দায় উঠে এল।—আপনি স্যার একা একা বসে আছেন। তবে যেন ভাল লাগে অন্ধকারে বসে থাকলে নিজেকে চেনা যায়। আমি মাঝে মাঝে স্যার, সবাই যখন ঘুমিয়ে থাকে, তখন চুপচাপ অন্ধকারে বসে থাকি। সেই কবে যেন এই পৃথিবীতে এসেছি মনে করতে পারি না। আমার মাকে মনে করতে পারি না। বাবাকে তবু মাঝে মাঝে মনে হয়, কি করে যেন কি সব নিয়ে বড় হয়েছিলাম। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার সে সব ছেড়ে ছুড়ে দিতে হচ্ছে ঠিক পেঁয়াজের খোসার মতো যত খোলা যাবে তত নিঃস্বের হয়ে আসবে।

সুভাষের জানার ইচ্ছা হল, এই মানুষের সংসারে আর কে আছে। সে বুঝতে পারল, প্রতিবেশি বলতে এই মানুষ তারপরে মাঠ এবং শস্যক্ষেত। তারপর গ্রাম। সুতরাং বিদ্যালয়, ফুল ফল পাখি আর পাশের বড় আমলকি গাছটার নিচে সুভাষকে বাকি জীবন কোনরকমে শরীরের খোসা ছাড়িয়ে বাঁচতে হবে। তারপর শূন্য অন্তহীন এক সমুদ্র। সেখানে কে কার! অনু কে তার! প্রীতির সঙ্গে কি সম্পর্ক তার। সকলেই তখন বুড়োবুড়ি সেজে যেন চরে গরু হারিয়ে গেছে এমন মুখ নিয়ে বসে থাকবে। এ-সব ভাবলেই সুভাষের ভিতর এক দুষ্টু প্রকৃতির মানুষ হেসে উঠে। হেডি-এর বিজ্ঞাপনে অনু এবং অসীমের ছবি তখন কলো কুৎসিত বেড়ালের মুখ মনে হয়।

খেতে বসে সুভাষের বিস্ময়ের আর সীমা থাকল না। সে মুখ তুলে একবার মাত্র তাকিয়েছিল। আর পারেনি।

বলাইবাবু বলল, আমার মেয়ে। বড় মেয়ে।

সুভাষ কিছু বলল না। একটা বড় অরণ্যের ছবি, হাতি ঘোড়ার ছবি এবং বাঘের ছবি কেবল চোখে ভেসে বেড়াতে থাকল।

ভাত ডাল মাছ মেখে খেতে বলল, আপনার প্রাইমারী সেকশানে কাজ করে। হেড টিচার হয়ে আছে। দুজনের আয়ে কোনরকমে চলে যায়।

দরজার ও-পাশে প্রায় সাত আট জনের মুখ। ওরা খুব ফিস ফিস করে কথা বলছে। বলাইবাবু নিশ্চয়ই আরও খবর দেবেন। সে চুপচাপ খেতে থাকল।

বলাইবাবু বললেন, এখানে এসেছিলাম স্যার দুজন। সে তো ফাঁকি দিয়ে চলে গেল। দিয়ে গেল এইসব অপোগণ্ড। মেয়েটা আছে বলে রক্ষে।

এমন পাড়াগাঁয়ে এক নদী জলের মতো মেয়ের লাবণ্য সামান্য লণ্ঠনের আলোতে যার মুখ কলসে উঠছিল, তার দিকে সুভাষের মতো শক্ত সামর্থ মানুষ পর্যন্ত তাকাতে পারে নি, বলাইবাবু খুব নিশ্চিন্তে বড় বড় গ্রাসে এখন খাচ্ছেন, বাপের চোখে ত ঘুম থাকার কথা নয়, ঘুটে পুটে নিয়ে যাবে—তারপর বিলের জলে সাঁতার কাটা অথচ এই মানুষ কি নির্বিঘ্নে বলছে, স্যার স্যার কি মানুষ নিয়ে এলাম, কত বড় পণ্ডিত মানুষ তোরা জানিস না! এবার ভুল দেখবি কি হয়।' কেন এমন এক মানুষ বলই বাবু ধরে এনেছে—যার কাছে মহাভারতের কথা অমৃত সমান। কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান—সতীকে বলাইবাবু কাশিরামের মতো মহাভারতের পাঠ শোনাতে থাকলেন।

লণ্ঠনের আলো নিয়ে সতী এসেছিল। সঙ্গে ছোট একটি ভাই। ওর ঘরে জল, বিছানা এবং অন্য সব বড় সামগ্রী ঠিক করে দিয়ে যাবে। সতী চুপচাপ কাজ করছিল। জানালা দিয়ে দেখা যায়। এই নির্জন পৃথিবী কেন জানি আবার সুভাষের কাছে বড় সহজ হয়ে যাচ্ছে। এই মেয়ের কোমল মুখ ওকে বড় বেশি বিষণ্ণ করে দিচ্ছিল, কি আলোক উজ্জ্বল এক বাতি ঘরের স্বপ্ন দেখাচ্ছিল সে বুঝতে পারছে না। কেবল মনে হচ্ছে ক্রমান্বয়ে এগিয়ে যাওয়া—এক সমুদ্রের অন্ধকারে সে সামান্যনাবিক, জাহাজের সব আলো নিভে গেছে। সে এখন দূরবর্তী বাতি ঘরের প্রতীক্ষাতে বসে আছে। সতী এই প্রথম কথা বলল, স্যার আপনার বিছানা করে দিয়েছি। আপনি আর জেগে থাকবেন না। এতটা পথ এসেছেন। এখন শুয়ে পড়ুন। আপনাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

সুভাষ দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে গেলে বলল, ডানদিকের টিপরটাতে জল আছে। আলোটা নিয়ে যাবেন। একেবারে অন্ধকার করে দিলে ভয়ে আপনার ঘুম নাও আসতে পারে।

তারপর সতী চলে গেল। সে আলোটা নিয়ে নিয়ে করে বসে থাকল বিছানাতে এমন আকর্ষণ কেন! মাত্র একটা পথ সে কেবল মনু এবং প্রীতির কথা ভেবেছে। তার আর কিছু মনে হয়নি। অথচ এখন এই বনবাসে পঞ্চবটির মতো এক আশ্রমে এসে সে আরেক মেয়ের চরিত্র আবিষ্কার করে কিছুক্ষণের জন্য কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেল। তার অন্ধকারের কথা মনে থাকল না, এই নির্জন পৃথিবীর কথা মনে থাকল না, কেবল থেকে থেকে দূরে এক ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পেল। এই ঘণ্টাধ্বনি তাকে আকাশে ছুটিতে মাবছে।

এই তব
শুভ আশীর্বাদ !

প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে গান্ধিজী কথাপ্রসঙ্গে প্রিয় শিষ্য শ্রীসতীশ দাশগুপ্তকে বলেছিলেন, তাঁর বড় ইচ্ছে যে একটি সত্যিকারের ভালো স্বদেশী কালি তৈরী হয়। দেশের মুক্তি আন্দোলনে আত্মনিবেদিত দুই তরুণ "মৈত্র" ভ্রাতা তখন সবে স্কুল থেকে বেরিয়েছেন। সতীশ বাবু তাঁদের দুজনকে ডেকে এই মহৎ কাজের ভার দেন। সহায় সম্পদ বলতে তেমন কিছুই নেই, তবু শুধু নিষ্ঠা এবং দেশপ্রেম সম্বল করেই তাঁরা দুজন এই দুঃসাধ্য ব্রতের ভার মাথায় তুলে নেন। আজকের বিশ্ববিখ্যাত মুলেখা ফাউন্টেন পেন কালির এই হল গোড়ার কথা।

মুলেখার আজ যে এই সুনাম ও সমাদর, এটা গ'ড়ে উঠতে যথেষ্ট সময় লেগেছে। বহু বাধা-বিপত্তি অতিক্রম ক'রে নিরলস গবেষণা, কর্মীদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা এবং জন-সাধারণের শুভেচ্ছা ও সমর্থনে এই বিপুল সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছে।

যাঁর প্রেরণা ও আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু, সেই জাতির জনকের পুণ্য জন্মশতবর্ষে, তাঁর উদ্দেশ্যে বিনত নমস্কারে নিবেদন করি আমাদের অন্তরের গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি।

মুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেড, মুলেখা পার্ক, কলিকাতা-৩১

কি-না-সামান্য একটা কথার সকাল বেলাটা কড়া হয়ে গেল। দুত্তুরি ছাই, সংসারের নিকুচি করি, বলে মোহন বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। মনটা বিষিয়ে গেছে ওর ললিতার কথার ঝাঁজে। উঃ কি মেয়ে। বাজার থেকে ফিরে এক সেকেণ্ড দাঁড়াতে না দাঁড়াতে একটা ফুলুল কড় তুলে দিল।

ফুটপাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে ভাবে মোহন, না ললিতার কথা আর ভাবব না—তবুই সকালের ওই কথাটুকু ওর ক'রে ব্যঙ্গের চিন্তা এসে মোহনকে বিমূঢ় ক'রে তোলে।

কি-ই বা এমন ব্যাপার—এই আজকের ঘটনাটা ; বিচলিত মনে বিশ্লেষণ করতে চায় মোহন—কিন্তু না। কাল থেকেই ললিতা বলছিল, এক গজ শাদা খুব ভাল কাপড় এনে দিও।' মোহন বলেছিল, 'কেন ?'

'দরকার আছে।' সাফ জবাব ওর।

'কিসের দরকার ?'

'রুমাল বানাব।' ললিতা তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল।

'রুমাল, রুমাল কি হবে ?' আশ্চর্য মোহন।

'অত কৈফিয়ৎ বাপু দিতে পারব না' বিরক্ত হয়েই বললে ললিতা, 'হাঁ ক'রে তাকিয়ে না থেকে দেবে কি-না বলো।'

চুপ মোহন। স্ত্রীর কথার ভঙ্গীতে হয়েছিল একটু। তবু খানিক চুপ থাকবার পর বলেছিল, 'আর কটা দিন সবুর করো, মাইনেটা পাই।'

বাস, ওই নিয়েই কাল হয়ে গেল আর এক পশলা।

'মাইনে মাইনে।' উত্তেজনায় ললিতার মুখে খই ফুটছিল। 'দেবে না স্পষ্ট বললেই তো পার, তার অত অজুহাত কিসের ? আমি যেন কিছু বুঝি না ?'

মোহন অতর্কিতে চমকে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি স্ত্রীকে শান্ত করতে গিয়ে বলেছিল, 'বিশ্বাস করো, হাতে টাকা নেই। মাসকাবারে হাত পাওলেও পাবনা।' এ-টুকু বলে একটু থেমে আবার কী ভেবে বললে সে, 'তা ছাড়া রুমাল তো রয়েছে। কি হবে শুধু শুধু'—

তির্যক দৃষ্টিতে ললিতা তাকাল মোহনের দিকে। কথাটা শুনেই ওর চোখে আগুন জ্বলে উঠল। একটা বিদ্রূপের ভঙ্গীতে মুখটা বেঁকিয়ে অদ্ভুত ভাবে বললে, 'শুধু শুধু মানে ? তুমি কি মনে করো আর কারো জন্যে আমি রুমাল বানাতে পারি না ? আমার কি আর কেউ নেই ?'

এ-কথার পর মোহনও আর স্থির থাকতে পারেনি। সেও তখন উত্তেজনার মুখে যা এল তাই বলে গেল। বলল, 'তা না থাকলে আর তুমি এ-ভাবে কোমর বেঁধে ঝগড়া কর !'

ওই দু' এক কথার পর স্বামী-স্ত্রীর ভেতর সে এক বিশ্রী কাণ্ড। ললিতার কান্নাকাটি, ধুন্ধুমার। 'আমাকে সন্দেহ করো, হীন নীচ। 'বেশ তো না পোষায় বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দাও। যেচে এমন লোকের সঙ্গে কে থাকতে চায় !'

শেষ পর্যন্ত মোহনকেই হার মানতে হল। বউকে সামলে সুমলে অনেক ক'রে বুঝিয়ে ঠাণ্ডা ক'রে বলতে হল 'দেখি পারি তো এনে দেব।' মোহন অফিসে বেরিয়ে গেল। অফিসে গিয়ে আর বাড়ির কথা মনে থাকল না। ফিরল রাত ক'রে। তারপর আজ আবার। সকালবেলাটা। কাল কাজে কর্মে বেমালুম ভুলে গিয়ে মোহন ভেবেছে ললিতাও কথাটা ভুলে যাবে। কেনা যখন হয় নি তখন আর কিনতে হবে না। কিন্তু সকালে উঠেই বাজারে যাওয়ার সময় বলল ললিতা, 'থুব এনে দিলে !'

'কাল মোটেই সময় ক'রে উঠতে পারি নি।' মোহন হাসবার চেষ্টা ক'রে বললে, 'বলেছি যখন ঠিক সময়মতো পাবে।,

গম্ভীর ললিতা। কাপড়ের চেয়ে এখন যেন ওর জেদটাই বড়। তাই বললে, 'অত কথা শুনে আমার লাভ নেই। আজই চাই। উঁহু।' ধমক দিল ললিতা ; তুমি ঠিক ভুলে যাবে, 'গরজ তো তোমার দেখা আছে, বাজারের পথেই নিয়ে আসবে, এমন কিছু হাঙ্গামা নয়।'

'আচ্ছা আচ্ছা।'

ললিতা চা তৈরী করছিল। চায়ের কাপটা নিতে নিতেই মোহন ওকে ভরসা দিল।

তবু যেন ললিতার কথাটা বিশ্বাস হচ্ছিল

না। মোহনকে ওর বিশ্বাস নেই। তাই আবার বললে, 'আজ ভুললে কিন্তু ভাল হবে না বলে রাখছি।'

চা খেতে খেতে জিনিসটায় অত গুরুত্ব আরোপ করল না মোহন। নিজের মনেই ভাবল, 'তারি এক গজ তো কাপড়—কী আর হবে ওই নিয়ে।'

তখন কী ও ভাবতে পেরেছিল কি লাজুকতিক এই মেয়ে। কী বিশ্রী কথাবাটে মেয়ে ললিতা। যে কি না সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে রাত-সকালে এ-ভাবে কলহ শুরু করলে। যার ফলে আজ সমস্ত দিন খেতে মোহন বেরিয়ে পড়েছে রাস্তায়। সংসারের কথা মনে ক'রে তাই মোহন ধিক্কার দিল নিজেকে।

যথারীতি বাজার ক'রে ফিরল মোহন। কাপড়ের কথাটা ভুলে যায় নি সে। তবু কেন যেন পা করল না।

আর ভাবে কোথা! কথার পর কথা। ললিতা যেন মারমুখী হয়ে বসেছিল সুযোগ পেলেই শুরু করবে। ঘৃণা মেশান একটা বিদ্বেষ মিশিয়ে বিকৃত গলায় বলল, 'ছিঃ ছিঃ, এক কৌটা কাপড় কিনে দেওয়ার মুরোদ নেই, তার আবার অত গলা: মেয়ে-কণ্ঠ ললিতার, 'তোমার লজ্জা করে না বলতে?

মোহন ভাবতে পারে না এখন। কী ক'রে কী ভাবে সে তখন স্ত্রীর ওই বিশ্রী বাকাবাণ গ্রহণ করেছে। নিজেও হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে কেমন ক'রে একটা হিংস্র পশুর মতো তার গলাকেও সপ্তমে তুলে ললিতার কথার উত্তর দিয়েছে: 'তা নয় তো কি! তুমি তো বলবেই, আমি শালা খেটে-খুটে পয়সা রোজগার করি আর সেই পয়সায় মনের সুখে উপহার বিলিয়ে তুমি সোহাগ করো! লজ্জা আমার করবে, না তোমার! বেশ, বলো খুলে, কাকে রুমাল দেওয়ার এতো জরুরী দরকার, না বললে সাফ জবাব, আমি কাপড় কিনে দিতে পারব না।'

ললিতারও জেদ, 'আমি বলব না। যাকে খুশি দেব আমার ইচ্ছে মতো।'

বলবে না?' মোহনের অসহিষ্ণুতা।

'না, না, না।' রাগে চীৎকার ক'রে উঠল ললিতা। 'তোমার যা খুশি করতে পার।'

'বটে?' দাঁতে দাঁত চেপে বললে মোহন, 'আমার সংসারে থেকে আমার ওপর তুমি! বেরিয়ে যাও এ-ঘর থেকে, যাক তোমার দরদের লোক নিয়ে, আমি চললাম।' দুমদুম ক'রে ঘর ছেড়ে চলে গেল মোহন।

ললিতা শুধু হয়ে তাকিয়ে থাকল শুধু।

তারপর একটা ঝড়ের মতোই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল মোহন। ললিতা হঠাৎ ওকে চলে যেতে দেখে কী যেন ভেবে গলার সুর নামিয়ে বলল, 'এখন আবার কোথায় চললে, অফিস করবে আমি নাকি?'

'তা দিয়ে তোমার কি দরকার?' মোহন একবার পেছন ফিরে বউর দিকে তাকিয়ে বললে, 'দরকার হলে আমিই করব—দয়া ক'রে তুমি আর মাথা ঘামিও না।

ললিতা কী একটা উত্তর দিতে গেল। ওর মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরোনোর আগেই মোহন সদর পেরিয়ে রাস্তায় নামল। হেঁটে চলল অনির্দেশ্য ভাবে।

হাঁটতে হাঁটতে এলোমেলো সব কথা-গুলোকে চিন্তা ক'রে এখন মোহন কিছুতেই ভাবতে পারে না, কোথা থেকে কী ভাবে নিজের স্ত্রী সম্বন্ধে এমন একটা হীন ধারণা তার মাথায় ভর করল। অনেক ভেবেও কোনো কূল খুঁজে পায় না মোহন। ললিতাকে সন্দেহ করার কারণ কি—ওই বা তার ওপর কখনো বিশ্বাস করতে চায় না কেন! এ-ভাবে পোঁজামিল দিয়ে কাটানোর কথা তো কখনো কল্পনা করে নি ওরা।

ওদের বিয়ে হয়েছে দু'বছর। অথচ ললিতা কোনো দিনই এ-রকম ছিল না। হাসিখুশি ফুর্তিতে সে ঊর্ধ্বে বেড়াত সব সময়। থাকত আমোদ-আহ্লাদ নিয়েই। কিন্তু গত তিন মাস ধরে মোহন লক্ষ্য করেছে ললিতার কী যেন হয়েছে। কী-এক গোলমাল হঠাৎ এসে ওর সদাচঞ্চল রূপটাকে গম্ভীর ক'রে তুলেছে। অকারণে থমথমে। এই তিনমাসই ওদের মধ্যে এটা সে-টা নিয়ে খিটিমিটি। তর্ক-বিতর্ক। সব সময় একটা বিশৃঙ্খলার মেজাজ নিয়ে ললিতা ঘুরে বেড়ায়। কোনো কিছুই এখন আর ওর ভালো লাগে না। আগে যে শুধু সারাক্ষণ পাখরার মতো বকবক-বকবক করত সে একে-বারেই চুপ। কথা হাসি ঠাট্টা কিছুতেই ওর মন ওঠে না।

মোহন প্রথমটায় খুবই অবাক হয়ে বেসামাল হয়েছিল। অপ্রস্তুতও। তবু সে ললিতার এই পরিবর্তনে রাগ করেনি। নিজের বুদ্ধিবৃত্তিকে আলগা ক'রে উত্তেজনার মাহুত চড়ায় নি। শুধু ওই বিস্ময়ভরা মনটুকু নিয়ে ওকে বোঝবার চেষ্টা করেছে। সত্যিই কি হয়েছে ললিতার? কিসের অশান্তি, অসুবিধে? কিন্তু স্ত্রীর মনকে বুঝতে গিয়ে যখনই সে এই কথা জানতে চেয়েছে তখনই জল হয়েছে মারাত্মক। একটা অশ্রদ্ধার দৃষ্টি নিয়ে মোহনের দিকে তাকিয়েছে ললিতা। বলেছে—কত তাড়াতাড়ি করতে পার, অসুবিধের কি?

বাধ্য হয়ে মোহন আর কিছু জানতে চায়নি। চুপ ক'রে গেছে। চুপ করেছে প্রতিবারই। এ-ভাবে দু'চার দিন কাটিয়ে মোহন কী ক'রে যেন ব্যাপারটাকে ঠিক সহজ চোখে দেখতে চায় নি। কেমন একটা খটকা তার মনে, এর মধ্যে কোথায় বুঝি গোপন একটা রহস্য আছে—যাতে ললিতা বদলে গেছে, হঠাৎ রূপান্তরিত হয়েছে ভিন্ন এক নারীতে। যে-নারী এখন আর মোহন বলে কোনো পুরুষকে সহ্য করতে পারে না। মোহন যেন এখন ওর দু'চোখের বিষ!

অনেক ভেবেও কোনো নির্দিষ্ট কারণে পৌঁছানো সম্ভব হয় নি মোহনের। একটা 'কিছু না' ভেবে নিয়ে সে মুখ বুজে কাটিয়ে দিচ্ছিল দিন—আর চোখে রাখছিল ললিতাকে। ও কী করে, কি চায়? এক ঘরে খুব কাছাকাছি দু'টো মানুষের দিন এ-ভাবে নীরবে কাটছিল, চুপচাপ দু'টিতেই। শুধু সামান্য দু'চারটে সাংসারিক প্রয়োজনীয় কথাবার্তা হত মাঝে মধ্যে। এ-টা নেই, ও-টা এনো, আচ্ছা, হবে, দেখব এই রকম।

অনির্দেশ্য ভাবে ঝির্জাপুর ষ্ট্রীট ধরে হাঁটতে হাঁটতে অনেক কথা ভাবল মোহন ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করতে পারল সকালের সমস্ত ঘটনা। কেন যেন মনে হল মোহনের এ-বিস্ফোরণ হবারই ছিল। আজ ঘটে গেল তাই।

আনমনে রাস্তা ধরে এগোতে লাগল মোহন আজ আর কোনো কাজের

তাড়া নেই তার অফিস যাওয়া হবে না। আবার কালকের কথা মনে পড়ল। কাল রুমালের কথা উঠতেই কী ক'রে হঠাৎ একটা নীচ সন্দেহ জেগেছিল মোহনের তবুও সে-ভাব কাটিয়ে তখন সে ললিতাকে চাঙা করেছিল কিন্তু আজকের ব্যাপারে কের ওর মনে হচ্ছে মিথ্যে নয়, কিছু একটা আছেই নয় তো সাত-সকালে— কী আর বলতে বাকি রেখেছে ললিতা—দুরন্ত ঘাঁটি। ফুটপাতে উঠতে উঠতে কথাগুলো মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে চাইল মোহন না আর ভাবব না। কি হবে মিথ্যে ভেবে ভেবে। তবু ভাবতে হল তাকে অনেক কথা। ললিতার কথাই নিজের কথা অফিস কামাই। সকাল থেকে এখন পর্যন্ত দিনটার বিশ্রী সময়গুলো এ—ভাবে এলোমেলো কথার মালা সাজিয়ে নিজের অজান্তে মোহন কখন যেন সার্কুলার রোডের মোড়ে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। বড় রাস্তার ট্রামের ঘর্ঘর শব্দে ওর ঘুম ভাঙল। মুখ তুলে, তাকাল মোহন।

রোদের তেজ অনেক বেড়েছে। ট্রাম বাস। ফুটপাত দিয়ে বহু লোক। যে সব কাজে ব্যস্ত একটা কাক শুধু সামনের দিকের চালে বসে মোহনকে দেখছে কী যেন ভাবল মোহন তাকাল এ—দিক ও—দিক তারপর কী মনে ক'রে হঠাৎ হাত দিল জামাটার বুক পকেটে। অফিসের জামাটাই গায়ে। পকেটে হাত দিতে শুরু একটা কাগজ হাতে লাগল মনে পড়ল না। কী খেয়াল হল কাগজটা টেনে বার করল ও। একটা খাম।

এই যা! মোহনের মনে পড়ল। ললিতা একটা চিঠি পোস্ট করতে দিয়েছিল কাল। অফিস যাবার পথে। কালকে এমনিতেই সেই রুমালের কথা নিয়ে সকালটা কেটেছে। তারপর তাড়াহুড়ো কথা কাটাকাটি নিয়ে মেজাজ ভাল না থাকায় অফিস ফিরে খামটার কথা আর মোহনের মনে ছিল না। পোস্ট করা হয় নি তাই। কাল থেকেই থেকে গেছে পকেটে।

এখন হঠাৎ এ-ভাবে খামটা বেরিয়ে পড়তে তাড়াতাড়ি ক'রে একসঙ্গে অনেকগুলো কথা মোহনের মাথায় এসে ভর করল। যে-কথাগুলোর জন্যে মোটেই ও প্রস্তুত ছিল না। ললিতা চিঠি লিখল, কি লিখল। প্রশ্নটা মনে হতেই কেমন একটা শির শিরানি জাগল মোহনের। হাত নিশপিশ ক'রে উঠল। দেখব না কি চিঠিটা। কথাটুকু ভাবতে ভাবতেই হাতের খামটা চোখের সামনে উঁচু ক'রে ধরল মোহন। চকচকে কৌতূহল চোখেই দেখতে পেল সে, খামটার গায় সুন্দর ক'রে ললিতার হাতে লেখা ঠিকানা। গোটা গোটা অক্ষর!

শ্রীসুকমল রায়
পোঃ বহরমপুর
মুর্শিদাবাদ

কে থাকে বহরমপুর? অনেক চেষ্টা করেও আত্মীয়-স্বজন, চেনা জানা কারো কথা মনে করতে পারে না মোহন। তবে? কে এই লোকটা? ললিতার চেনা কেউ? হবে তো। কি রকম চেনা? একটা কথার পর আর একটা কথার ঢেউ। যাকে চিঠি লেখা যায়। কতদিন ধরে এই লোকটাকে ললিতা চিঠি লিখছে, কতদিন? অনেক দিন কি? মনে করতে পারে না মোহন। অদরকারি একটা কথা কিছুতেই মনে আসে না। ললিতার অনেক চিঠিই সে দেখেছে। দেখতে ভাল লাগে নি। ওরোরা সামান্য কথা মাকে বা বাবাকে। কিন্তু এ-চিঠি, এতে কি আছে?

রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে একের পর এক কথাগুলো ভাবতে ভাবতে ক্রমশঃ মোহনের মাথা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। আবার মনে পড়ে যায় সকালের সেই কথা। ললিতার বিশ্রী মুখ। কাঠ কাঠ গলা। আচ্ছা কি আশ্চর্য। তিনটে মাস ওর কি হয়েছে? কালকের সামান্য রুমালের ব্যাপার নিয়ে কী কাণ্ডই ক'রে বসল। রুমাল। খামটার দিকে চোখ পড়ল। খামটাও কী রুমালের মতো কিছু···কাকে দেবে ও রুমালটা···এই লোকটাকে না-কি। মোহন আবার হাতের খামটার ঠিকানা পড়তে লাগল। চিঠিতে কী লেখা তাতে ঘুলে যদি পড়ি এখন। ললিতা দেখবে না। দেখতে পারবে না, অথচ সে তো এই মুহূর্তেই এখানে দাঁড়িয়ে ললিতার মনের ভেতরের গোপন বিষটুকুর কারণ জেনে ফেলতে পারে। পারেই তো। আর মোহন এখনই তা জানবে।

খামটা তুলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে পড়তে হল। হাত পড়ল না। আর সেই সঙ্গে কেন যেন মোহনের আর এক দিনের কথা মনে পড়ে গেল। এই চিঠির সূত্র ধরেই কথাটা ছবির মতো মোহনের মনে ভেসে ওঠে।

মোহন অফিস থেকে ফিরেছে। মাসের প্রথম দিক। কী মনে ক'রে হঠাৎ ললিতাকে বলল, 'চল একটা নতুন বই হচ্ছে দেখে আসি।' ললিতার কোন ভাব পরিবর্তন হল না। মুখে শুধু একটু জবাব, 'না।'

'না, কেন? চল।'

'কেন আবার কী।' ললিতা এবার মুখ তুলল। ওর চোখে তীক্ষ্ণ এক দৃষ্টি। এতক্ষণ মুখ নিচু ক'রে ও কী একটা চিঠি পড়ছিল। বিকেলের ডাকে এসেছে। মোহনও লক্ষ্য করেছিল ঘরে ঢুকেই। কিন্তু জিজ্ঞেস করেনি কিছু। ললিতা নিজের কথার জের টেনে বলল, "একদিন আপিস-খাতা দেখিয়ে মাসের শেষে আমার হাত জ্বালিয়ে যাবে। দরকার নেই। তার চেয়ে আমাকে সোহাগ না দেখিয়ে ওই পয়সায় দেনা শোধ করো।'

মোহন অবশ্য সামান্য টাকাই মাইনে পেত। তবিও সে-টাকায় ওদের চলে যাওয়া উচিত। দু'টো লোক। স্বামী-স্ত্রী। তবু কিছুতেই কুলোতো না। মাসের শেষে কিছু ধার মোহনকে করতে হত। তা বলে বাজে খরচ কিছু না। ললিতার দু'একটা শাড়ি। দু'টো দিন একটু ভাল বাজার। তা ছাড়া টুকিটাকি সামান্য প্রসাধন সামগ্রী। এতেই মোহন অস্থির হয়ে পড়ত। অথচ ললিতাকে বারণ করতেও মন চাইত না। হাজার হলেও ছেলেমানুষ একটু সখ করবেই তো। প্রথম প্রথম ক'দিন। তারপর ছেলেপুলে হলে সখ আর থাকবে না। অমন সুন্দর বিকেলটা সেদিন মাটি হয়ে গেল। চিঠির মধ্যে ডুবে থাকা ললিতার মুখে ও-ভাবে জবাব পেয়ে মোহন বড়

ছোট হয়ে গেছিল। রোজ তো নয় একদিনই। বউকে নিয়ে একটু ঘুরে আসা। চুপ ক'রে মোহন কী যেন ভাবল। ওর চোখে তখনো ললিতার মুখ ঢাকা কাগজ-টুকুতে। মনে হল ওই চিঠির লেখাটুকুই যত সর্বনাশের মূল। যার জোরে এখন এই ললিতা আর আগের ললিতা নেই। এবার একটু গম্ভীর হয়েই অথচ অবাক লাগা সুরে মোহন বলল, ওটা কার চিঠি! 'আমার এক বন্ধুর।' ললিতার স্পষ্ট উত্তর।

'বন্ধু! বন্ধু কে?

'তা দিয়ে তোমার কি দরকার?' আবার সেই শাণিত চিরে-চাওয়া দৃষ্টি। 'বন্ধু বন্ধু।' মুখ ঘুরিয়ে বললে ললিতা: 'তার সমস্ত বাড়ি-নক্সা তোমাকে বলতে হবে না-কি।'

মোহন বুঝি ধাঁধায় পড়ে গিয়েছিল হঠাৎ। কী বলতে কী হয়ে গেল। কত আশা ক'রে সে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরল। আর ললিতা তাকে কিছু বুঝবার অবসর দেওয়ার আগেই কার একটা চিঠি পড়ে এ-ভাবে বললে গেল। অথচ এর আগে ওর কত চিঠি সে দেখেছে। ললিতাই নিজে থেকে দেখিয়েছে—কই আপত্তি হয় নি; আর আজ—বিশ্রী ভাবে মাথায় আগুন জ্বলে উঠল মোহনের। বললে, 'না হয় বলতেই, তোমার বন্ধুকে তো আর গিলে খেতাম না।'

'তা জানি।' ললিতাও গলায় ঝাঁজ মিশিয়ে ওর কথার উত্তর দিল, 'কিন্তু এই প্রনুসঙ্কিংসোটা আমার বিশ্রী লাগে। অসভ্যতা।' তুমি আজকাল আমায় সভ্যতাও শেখাবে না-কি।' মোহনের তীক্ষ্ণ বাক্যের খোঁচা।

'একটু না হয় শিখলে, ক্ষতি কি।' বাঁকা হাসি হেসে কথাটা বলে ললিতা ঘর ছেড়ে চলে গেল। মোহন চুপ। শুধু একটা ব্যর্থ ক্রোধে ওখানে দাঁড়িয়েই থরথর ক'রে কাঁপতে লাগল।

ঘটনাটা এখন মনে পড়ায় মোহন কেমন বিচলিত হয়ে পড়ল কেন, কেন সেদিন ললিতা এই দুর্ব্যবহার করেছিল। কেন সামান্য ব্যাপারে বিচলিত করে ও। মোহনের প্রতি বিদ্বেষ ছড়াল —কারণ কি রাস্তার মোড়ে রোধে দাঁড়িয়ে ওরমে ভেতে রাখে কাঁপতে লাগল মোহন। মুখটা দেখতে দেখতে কঠিন হয়ে উঠল লোহার মতো। মনে হল এখন যাদটা খুললেই মুহূর্তের মধ্যে ললিতার মনের স্পর্ধার সব খবর এখুনি সে জানতে পারবে। জেনে ফেলবে সব কিছু। কৌতূহল আর ঘাম! মোহনের চোখের সামনে দু'টোই যেন এক রহস্যের সূত্র। মোহন যাদটা খুলতে যাচ্ছিল। আবার কী ভেবে একটা ঘৃণায় কুঁচকে উঠল আর জ্ব। যাক। পরের চিঠি খুলে এ-চৌর্যবৃত্তি কেন? ললিতা যদি তাকে না-ই চায়, না ভালবাসে, তবে···একবার ভাবল ছিঁড়ে ফেলি চোখের সামনে এ-নাকাবি সহ্য করা ছিঁড়ব কি ছিঁড়ব না চিন্তা করতেই একটু সময় নিল। এমন সময়ই হঠাৎই কেমন করে যেন মোহনের চোখে পড়ল নিজের বেশভূষার দিকে। রাস্তার পাশেই বড় হোটেলটার কাঁচে নিজেকে দেখে চমকে উঠল সে। এ-কি! কী নিজেকে প্রশ্ন করল মোহন। উসখুস-খুসখুস চুল। পরিষ্কার ধবধবে একটা জামা গায় তার সঙ্গে বাজার করতে যাওয়ার একটা ময়লা ধেলচিটে ধুতি। পায়ে ফেড়া সেট বাচার চটিটা। বেরো-নোর সময় সব ভুলে গেছি রাগে। রাস্তায় কয়েকজন লোকের দিকে তাকাল মোহন। মনে হল লোকগুলো অবাক হয়ে তার এই অদ্ভুত চেহারা চেয়ে চেয়ে দেখছে। কী ভাবছে ওরা নিশ্চয়ই ভাবছে আমি একটা পাগল। না বি বি ক'রে উঠল। বিশ্রী লজ্জার মনটা সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল। লজ্জায়, ক্রোধে মোহন ভুলে গেল একটু আগের কথা। সন্দেহ। ঘাম। এখন শুধু ভাবল কী ক'রে রাস্তার ওই কৌতূহলী চোখগুলোর সামনে থেকে গা ঢাকা দেওয়া যায়। এখুনি সরে পড়তে হবে এখান থেকে। কোথায় যাব—কোন দিকে? আবার মন তোল-পাড় ক'রে ক'টা কথা ফিরিয়ে দিয়ে গেল বাড়ির কথা। সেই কখন বেরিয়েছি, এখন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছি। অফিস কামাই হল। কাল আবার মিথ্যে কতকগুলো কৈফিয়ৎ! চোকগে।

ভিন্ন ললিতা—কেন যেন চকিতে বউয়ের কথাটা ভাবল মোহন। ললিতা এখন কি করছে, নিশ্চয়ই খায়-দায় নি। নাঃ-ই তো। আমি না গেলে ললিতা খাবে কি ক'রে। এ-ক'বছরে ললিতার এক দিনও তা-ভুল হয় নি। রাঁ রাঁ দুপুর রোধে ললিতার মুখটা কল্পনা ক'রে বড় ভাল লাগল। বিশেষ ক'রে শুকনো মুখ। ললিতা তাকে ভালবাসে, তার কথা ভেবেই ওর দিন গড়ায়। কিমোনো মনে এ-কথা ক'টা ভাবতে ভাবতে একটু আগের মোহনও যেন বদলে গেল। একটা ভুল ভাঙার অনুশোচনা। বুকের মধ্যে ব্যথা ললিতার জন্য। যে মেয়ে এখনো তাকে ভালবাসে—যে মেয়ের ওপরই ঘৃণা ক'রে প্রতিশোধ নিয়ে সে চলে এসেছে। আত্মধিক্কারে ভরে গেল মোহনের মন। আগের চিন্তা-গুলোর কথা ভেবে শিউরে উঠল ও। ও ক'দিন কী একটা বিশ্রী সন্দেহ করেছে ওকে। ললিতা কখনই বলেনি তিনটে মাসের বিচ্ছিন্ন কথা গুলোর যেন একটা মুহূর্তের উপরে ভর ক'রে মোহনের চোখের সামনে ভেসে উঠল। একের পর এক মনে পড়তে লাগল নিজের যত দুর্ব্যবহারের কথা। বিশেষ ক'রে মন থেকে হারিয়ে যাওয়া একটা দিনের কথা মনে করতেই ও যেন হঠাৎ বুঝে ফেলল। মুঁটিয়ে নিজেকে যাচাই করল মোহন। সুবিমল রায়—নামটাও মনে পড়ছে, এ-ক'দিনে ভুলে গিয়েছিল সে। এখন যেন কি-ক'রে একটা বিস্মরণের পরদা আপনা থেকেই সরে গেল। ওই লোকটাকে ঘিরেই যত রহস্যের সমাধান লুকিয়ে ছিল। ঠিক তিন মাস আগের কথা ললিতার পাড়ার সম্পর্কে কী-রকম দাদা। ক্ষীণ চেহারা। ফরসা লাজুক মুখ। চোখ দু'টো ভাসা-ভাসা। খদ্দর পরনে। চুল গুলো এলোমেলো, মার্জিত রুচি, মিষ্টি হাসি, পরিচ্ছন্ন কথাবার্তা।

একদিন অফিস-ফেরৎ বাড়ি ফিরে এই অচেনা ভদ্রলোককে দেখে মোহন আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। একটা চেয়ারে বসে ভদ্রলোক। ললিতা বসে চেয়ারের হাতলে। হাসছিল দু'জনেই। এমন সময়

একটু ইতস্তত ক'রে মোহন ঘরে ঢুকল দরজা খোলাই ছিল। ওরা এতক্ষণ মোহনকে দেখতে পায়নি। পেছনে পায়ের শব্দ পেয়ে চোখ ফেরাতেই ললিতা হেসে এগিয়ে এল, 'ওমা, কখন এলে তুমি?'

মোহন গম্ভীর। স্থির ওর চোখ দুটো। কোনো কথা বললে না। শুধু চোখে একটা সন্দেহের ছায়া এনে ললিতার দিকে তাকাবার আগেই ওর ললিতা খুশিভরা কণ্ঠে বলল, 'এস, এঁর সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই। সুবিমলের মামে ভদ্রলোকটির দিকে চোখ ফেরাল ললিতা: 'আমাদের সুবিমলদা.. স্বাসলে সুবিমল রায়—এক পাড়াতেই থাকতেন, বিয়ের সময় ছিলেন না; আজ হঠাৎ কী ভেবে দেখা করতে এলেন। ...র সুবিমলদা চিনিই তো আমার—'

'সে-টুকু বুঝে নিয়েছি ললিতা, ওঁর কথার মাঝে বাধা দিয়ে ভদ্রলোক চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'মোহনবাবু নমস্কার!' 'নমস্কার!' একটা ওকনো প্রতি নমস্কার ক'রেই কী মনে ক'রে মোহন পাশের ঘরে চলে গিয়েছিল।

হ্যাঁ মনে পড়েছে—এমনি মুহূর্তের মতোই সে-দিনের মুহূর্ত, একা ওই ছোট বাড়িতে একটা চাপা আর তীব্র সন্দেহে সে ওদের চিহ্নিত ক'রে নিল। নির্জন দুপুরে আলাপ-রত দুটো মনোরী ওর চোখকে নিভিয়ে দিয়েছিল। সে-দিনে পরে অবশ্য নিজের মনকে মোহন জিজ্ঞেস ক'রে এই ধারণার কোনো উত্তর পায়নি।

সুবিমল তারপর কিছুক্ষণ বাদেই চলে গিয়েছিল। সে চলে যেতেই চোখে-মুখে এক অভিমান জানিয়ে ললিতা এসে বেশ রুদ্ধ গলায় বললে, 'এর মানে কি?'

'কিসের?'

'এ-রকম বিশ্রী ব্যবহার কেন?'

'ভাল লাগল না।' তির্যক জবাব মোহনের।

'কেন কেন! সে কথাই জিজ্ঞাসা করছি। তুমি এ-ভাবে আমাকে অপমান করলে কেন?'

'অপমান!'

'না তো কি?'

অফিস ফেরৎ মোহন এমনিতেই বিরক্ত হয়েছিল। তারপর স্ত্রীর এই কৈফিয়তের তাগাদা শুনে রাগে জ্বলে উঠল। কেমন যেন কঠিন একটা মন নিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে ওর কথার জবাব দিল, 'তা হলে তাই। অপমানই করেছি। আমার কাছে এর বেশি আশা করা তোমার উচিৎ ছিল না। কে-না-কে তোমার পাড়াতো দাদা তার সঙ্গে এত ঘন হয়ে বসে কথা বলা।... মোহন আর কথাটা শেষ করতে পারল না। ললিতাও এরপর আর একটা কথাও বলে নি। চুপ ক'রে চলে গেল। সে-দিন সন্ধ্যে থেকে সেই যে গুম হয়ে গেল ললিতা, এর পর আর কোনো দিনই সহজ হয়ে সে মুখ খোলে নি।

কিছুদিন বাদেই অবশ্য মোহন ভুলে গেছে এ-ঘটনা সম্পূর্ণ। হেসেছে, কথা বলেছে। কিন্তু বেশই লক্ষ্য করেছে ললিতা কেন যেন হঠাৎ-ই গম্ভীর। আগের মতো নেই। এ-ভাব পরিবর্তনের কোনো অর্থ খোঁজে নি মোহন। আবিষ্কার করতে পারে নি কোন রহস্য। তাই মিথ্যে ললিতার ওপর রাগ করেছে। ঝগড়া করেছে। সন্দেহ।

তারপর সেই চিঠি পড়ার দিন। সে-দিনও মোহন ভুলে করেছিল, ভেবেছিল ললিতা বুঝি কিছু গোপন রাখতে চায়। পুরনো কথা একের পর এক ভাবতে ভাবতে সময় কাটে। অনেকক্ষণ বাদে মোহনের আবার হুঁস হয়, তাই তো আজি দাঁড়িয়েই আছি এখনো। পাশেই সে একজন কাকে যেন জিজ্ঞেস করল, 'মশাই কটা বাজে?' 'দেড়টা।'

দেড়টা চমকে ওঠে মোহন। ললিতা এই তো এতক্ষণ আমার আপিস থেকে ভাত ঢেকে ঘুমিয়ে পড়েছে। নয়তো রান্নাঘরে বসে বসে ঝিমুচ্ছে করছে, লোকটা কোথায় গেল।

ললিতার ওপরের সেই রুদ্ধ বসে থাকার ভঙ্গীর কথা ভিন্ন ক'রে বড় ভাল লাগল মোহনের। একটা হাতের পর চিবুক। অগোছাল চুলগুলো দাঁতনে চুঁকে পড়েছে। পায়ের নখের দিকে তাকিয়ে চোখ দুটোয় অকারণ জল। জল নয় জ্বালাও। একটা ভুল বোঝার আর মোহনের নির্দয়তা যেন অসহ্য জ্বালা। এ-বার ললিতাকে এই ঘর থেকে বুকতে পেরে, ওদের মনের দ্বন্দ্বের কারণ জেনে মোহন যেন স্বস্তি পেল। না, না, এখনি বাড়ি ফিরতে হবে।

ফিরতে গিয়ে আবার হাতে চোখ পড়ল। তখনো শক্ত ক'রে ধরা সেই খামটা—ললিতার চিঠি। এখনো যা ওকে দেওয়া হয় নি। ছিঃ ছিঃ, কেমন একটা নিজের প্রতি লজ্জার ভাব এসে ঢেকে দিল রোধে পোড়া মোহনের মুখটা। ঠিকানাটাও চোখে পড়ল: শ্রীসুবিমল রায়। পোঃ বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

নিরীহ, নির্দোষ লোকটাকে কল্পনা ক'রে সাদাশ্ত হাসি পেল মোহনের। মনে পড়ল ভদ্রলোককে দেখার দিনের কথা। ওকে জড়িয়ে কত বিশ্রী সন্দেহ করেছিলাম। ধার জের চলল তিনমাস ধরে। না, না, মনে মনে হাসল মোহন। হাসতে হাসতেই ততক্ষণে হাতের চিঠিটা সে ফেলে মোড়ের ডাক-বাক্সে। এ-বার বুক ভরে একটা বড় ক'রে শ্বাস টানতে পারল ও। হালকা হল মাথাটাও। আবার মুখ তুলে রাস্তায় তাকালো মোহন। সেই লোকের চোখ। বিশ্রী তার বেশ ভূষা। আর এক মুহূর্তও না দাঁড়িয়ে সে বাড়ির দিকে রওনা দিল।

হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফিরতে এখন আর কোন গ্লানি, কোনো অনুশোচনা তার নেই। ললিতাকে বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করতে আর কোনো অসুবিধে হবে না। তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগল সে। সহজ সুস্থ মোহন।

সমস্যা পণ্ডিত

(৬৮ পৃষ্ঠার পর)

সাংবাদিকদের। পরেরদিনের ঘরে লিখলেন রাষ্ট্রপতিরা।

তবুও দাঁড়ানো একজন চাপরাশী উঠিয়ে নিয়ে চলে গেল।

পণ্ডিত মনে মনে হাসলেন। তিনি জীবনের তর্কজালের গ্রন্থ, 'সুবর্ণম তর্ক-পঞ্চাননের লেখা, নিজেও তিনি নামের উপাধি পেয়েছেন—কিন্তু সে সব পরিচয়ে এখানে কেউ তাঁকে চিনবে না। পঞ্চানন কুমার যদি এই অফিসের বড়-সাহেবের কাছে আসেন, তবে তা সাহেবের জন্য এক দুঃখের ঘটনা। তিনি কালীতারা মন্দির পাশ্ববর্তী পণ্ডিতেরণী জনে।

একটু পরেই চাপরাশীটা এসে তাঁকে ডেকে নিয়ে গেল। লোহার একটা কপাট দরজার সম্মুখে দাঁড় করালো। লাল-পাতা বৈদ্যুতিক আলোক বিন্দুর কী সব সঙ্কেত লক্ষ করে একটা বোতাম টিপে দিল। মুহূর্ত পরে সেই লোহার দরজাটা খুলে গেল। একটা খাড়াই উঠে দাঁড়ালেন পণ্ডিত। লিফটটা উপরের কোন এক তলায় গিয়ে থামল। আলোকমণ্ডলে একটা সরু গলিপথ অতিক্রম করে আবার একটি কপাট দরজার সম্মুখে তাঁকে অপেক্ষা করতে বলে চাপরাশীটা দ্বার ঠেলে ভিতরে ঢুকে গেল। পণ্ডিত লক্ষ্য করে দেখেন, দরজার উপর একটি কাচের ফলকে লেখা আছে—'মনোনীত ডাইরেক্টার'। তার নিচে আর একটি ফলকে লেখা : ডঃ হে, সাধুখাঁ; এবং তারপর অনেকগুলি ইংরাজি অক্ষর। ঘরে ঘরেই-কখনো যেমন লেখা 'লণ্ডন', 'সিকদার'। ডক্টর যে লেখাপড়া জানা লোক এটাও জানা ছিল পণ্ডিতের, কিন্তু সে যে এতখানি কিবান তাও জানা ছিল না।

একটু পরেই ডাক পড়ল ভিতরে। পণ্ডিত দরজার পাল্লাটা খুলে ঘরে প্রবেশ করলেন। দরজাটা নিঃশব্দে আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে গেল। ঘরের ভিতরেও শীতলতা ঠান্ডা। ফ্যান ঘুরছে না কিন্তু।

ডক্টর একটা বেতিও-মত জন্তুর সামনে মুখ রেখে কার সঙ্গে কথা বলছিল। টেলিফোন নয় কিন্তু। বাঁ হাতে তার পাইপটা ধরা আছে, ডান হাতে একটা লাল নীল পেনসিল। বৈদ্যুতিক কপাটকে ডেস্কের ভিতর ঢুকিয়ে দিয়ে এবার ডক্টর মুখ তুলে তাকিয়ে দেখেন, বলেন, ইয়েস, কী চাই?

পণ্ডিতকে ডক্টর বসতে বলেন নি; নিজে থেকেও পণ্ডিত বসেন নি সম্মুখস্থ চেয়ারে। কেবল যেন বিদ্যুৎ খেলে যায়। ডক্টর তাঁকে কি এখনও চিনতে পারছে না? আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে বলেন, আমি কলকাতায় থাকব না স্থির করেছি—

—বুঝে ছিলাম ভিলেজ ইউনিভার্সিটির এই কথা জানাতেই কি এখানে এসেছেন? আপনি বোধহয় থাকতেন হার মনে আমার কী সম্পর্ক?

—আজ্ঞে না, আপনি বলেছিলেন, সাউথ্যাল পরগণার কোন আপনার কি একটা কারবার আছে, সেখানে আপনার একজন লোকের দরকার—

—আই সী। চাকরি চাই?

—আজ্ঞে হাঁ।

—বসুন বসুন। অফিসের বাইরেই তো নোটিশ টাঙানো আছে : নো ভেকেন্সি; এমনিতেই এখন মার্কেট খুব 'ডাল'; বোধহয় মোক ছাঁটাই করব আমরা—

হঠাৎ খস্ খস্ করে পেনসিলটা থেমে উঠল।

মাথাদের কথা ঘামিয়ে কথাটা তুলে নিলেন ডক্টর : ইয়েস?

অপ্রস্তুতাবিনীর কথা মন দিয়ে শুনে নিয়ে বলেন, লুক হিয়ার মাস্টার। এ ভদ্রলোক আমার কি চান তাদ্ধ ওঁর চেয়ে নিয়ে তাঁদের আমার কাছে পাঠাও। কম্পানির চাকরির উমেদার পাঠাও না। আমাকেও কিন্তু কাজকর্ম করতে দাও। প্রাঃ? কি বললে? না, 'পাইছো' লিখলে সেটা 'এক্সপেন্স' করবে না। অফিসে আমি পাইছো কার করতে জানি না। তুমি যদি আমার লাঞ্চের সময়ের ঠিকমত 'ডিক্টেশন' করতে না পার, তাহলে বাধ্য হয়ে তোমাকে 'আউট-ডোরে' পাঠাতে হবে।

কথার ঘরে টেলিফোনটা রেখে মুখ তুলে পণ্ডিতকে দেখতে পান, বলেন, আপনি এখনও দাঁড়িয়ে আছেন?

পণ্ডিত চলে যান না। ডক্টর পাইপটা তুলে নিলেন, আগুনটা বোধহয় নিবে গিয়েছিল; লাইটার ছেলে তাতাকরতে আগুন ধরাতে ধরাতে বিকৃত উচ্চারণে বলেন, আর কিছু বলার আছে আপনার?

পণ্ডিতের মুখ চোখ লাল হয়ে উঠেছে তখনও। ঠোঁট দুটো কাঁপতে থাকে। বাক স্ফূর্তি হয় না।

—আর কিছু বক্তব্য না থাকলে আপনি যেতে পারেন, আমি বড় ব্যস্ত।

—যাচ্ছি। একটা শুধু প্রশ্ন ছিল। পণ্ডিত ওভারের পকেটের ভিতর হাত চালিয়ে কী একটা খুঁজতে থাকেন।

ডক্টর যে ওঁকে চিনতে পেরেছেন, এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না। তাই ডক্টর আর ওঁর চোখে চোখে তাকাতে পারছেন না, তাই একটা জীবুলের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই বলেন, তুমি শুনে করে সেটা তাড়াতাড়ি বলে ফেললে সুখী হতাম।

—আপনি আমার ছেলেকে একটা কলের পুতুল দিয়ে গিয়েছিলেন মেটার মনে আছে?

হেলে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে ওঠেন ডক্টর সাধুখাঁ, পুরনো পত্রাপাদিবত জানে-হি: ডাইরেক্টার। পাইপটা ঘরার দিকে নিক্ষেপ করে গর্জন করে ওঠেন—বো। বো! বো আউট।

পণ্ডিত থর থর করে কাঁপছেন তখন।

কাঁপা হাতেই ওভারের পকেট থেকে বার করে আনেন ঘুঁটিমার্কা একটা এক-টাকার নোট। হাতের মুঠোয় সেটাকে দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে মারেন ডক্টরের মুখে।

তারপর কাঁপতে কাঁপতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যান।

পরের দিন সিদ্ধান্ত হবে পালা চন্দ্র-যাদুর।

স্কুল ছুটির পর পণ্ডিতমশাই তাঁকে একান্তিকে ডেকে বললেন, চন্দ্রকান্তবাবু, একটা কথা ছিল।

—বলুন বলুন।

আশপাশে একবার দেখে নিয়ে পণ্ডিত বলেন, অনেক বিবেচনা করে সিদ্ধান্তে এসেছি—আপনার নির্দেশিত পথে গমন করা ভিন্ন আমার গত্যন্তর নাই।

চন্দ্রবাবু খুশি হয়ে বলেন, আমি জানতাম। ইচ্ছা করেই তাড়াহুড়া করি নি, আমার বিশ্বাস ছিল আপনি নিজে থেকেই পত্রোত্তরটা তুলবেন। ছেলেটিকে আর কোথায় রেখে এলেন?

—আমার এক পরিচিতের নিকট। বাঁকুড়ায়।

—ঐ কালিতারা কেমিক্যালের মালিক?

—আজ্ঞে হাঁ।

—ওটা তো একটা মস্ত বোকামী।

পণ্ডিতের মুখটা করুণ হয়ে ওঠে; বলেন, বিবাহযোগ্য নয়; এ ভিন্ন আর কি করতে পারতাম বলুন?

—না না, এ ঠিক হচ্ছে না। ঐ সব পরিবেশে গিয়ে কতকগুলো অসভ্য গালা-গাল শিখবে শুধু। শিশু মনে পরিবেশের বিষয়ের প্রতিক্রিয়া ভাবতে হয় আপনি তো জানেনই সব।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পণ্ডিত বলেন, উপায় কি বলুন?

—উপায় তো অনেকই বলেছি; এতদিনে আপনি রাজিও হলেন। পাত্রী আমি স্থির করেই রেখেছি; আপনি দিন চারেকের ছুটি নিয়ে আমার সঙ্গে চলুন।

—কোথায় যেতে হবে?

—বর্ধমানে। দেবকীপুর স্টেশনে নেমে মাইল তিনেক আমাদের যেতে হবে। চন্ডী-গড় বলে একটা গ্রামে;

—আপনি কি ইতিপূর্বেই সমস্ত স্থির করে রেখেছেন? পাত্রী কবেই বা দেখা তো? আমার বক্তব্য পাত্রীর অভিভাবককে আগাম বিবৃত করেছেন তো?

—আজ্ঞে হাঁ। পাত্রী আপনাকে দেখেছে, তার অভিভাবকও আপনাকে ভালভাবে চেনেন। চন্ডীগড়ের কুলসহায় বাসটি। আপনার মনে আছে?

—অন্যে না। কে তিনি?

—পত্নীমা, মানে আপনার স্ত্রীর সম্পর্কে কাকা হন। তাঁর বাড়িতে তাঁরা চারটিকে পায় করেছেন। এটি পঞ্চম। আপনার

বিবাহের সময় ঐশ্বর্যময়ী, তখন তার বয়স বারো। এরপরে উনিশ-কুড়ি হয়েছে। পড়িমার মত একেবারে অশিক্ষিত নয়। পর বছর হয়তো মেট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়েছিল, পাশ করতে পারেনি—তারপরে পরীক্ষা দেবার চেষ্টা করছে।

পণ্ডিত তৃপ্তিতে স্বরে বলেন, অতটুকু মেয়েকে—

—অতটুকু কি মশাই? বুদ্ধি শুদ্ধি বয়সে কম হল? লাহিড়ি আপনাকে দেখেছে, আপত্তি নেই। তার বাবা এবং মাও আপনাকে বিবাহের সময় দেখেছিলেন। তাঁদেরও আপত্তি নেই, আগ্রহ আছে। বস্তুতঃ পড়িমার মৃত্যু সংবাদ পেয়েই তাঁরা আমাকে পাঠিয়েছেন, এ বিবাহ হতে পারে কিনা জানতে চেয়েছেন।

পণ্ডিত কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারেন না। মনুষ্যের উপর বিশ্বাস হারানো নাকি পাপ, কৃষ্ণসহায়বাবু, তাঁর স্ত্রী প্রবধা তাঁকে জানাতে তিনি সময় চেয়ে নিলেন। তাঁদের তিনি জানেন না চেনেন না কিন্তু তাঁরা পড়িমার আত্মীয়। কৃষ্ণসহায়বাবু, ভাতৃষ্পুত্রীর মৃত্যু সংবাদ পাওয়া মাত্র পত্র লিখেছেন। পাত্রে পাত্রীটি হাতছাড়া হয়ে যায়। তাঁরা কি জানতেন যে পাত্রস্থ পণ্ডিত পূর্ণেন্দু স্ত্রীর চিতার আগুন থেকেই খেপলাই-কাঠির খরচ বাঁচাতে দ্বিতীয়া স্ত্রীর হোমের শিখায় অগ্নি সংযোগ করবেন? কিন্তু অন্যায়ই বা কি করেছেন তাঁরা? পক্ষবালও অতিক্রান্ত হয়নি, এই তো তিনি আজ নিজেই চন্দ্রকান্তবাবুর স্বাস্থ্যন্ন হয়েছেন—

নির্বাচনের গ্লানিতে ক্ষুব্ধ মোক্ষ মনটা ঘোলাল, আচ্ছা ছেড়ে দাও—

—না না, মশাই ভাবনা-চিন্তার সময় আর নেই। এতদিন ভবদেবতার তলা থেকে ফিরে এসেছে, এতদিন পুকুরের জলে ডুবতে ডুবতে বেঁচে গেছে। মেয়েটাকে মেরে ফেলার আগেই লাপনার চিন্তা-ভাবনা শেষ হওয়া ভাল নয় কি?

পণ্ডিত নিষ্পলক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন।

খুকি সভয়ে করে, ঠাকুরদাদা, আর স্নানে যাবে কেন বাবা?

—কি জানিরে।

—যা তবে জানবে যাবে।

—সীমন্তে ঐশ্বর্যকে তিনি মা-মণি। তুমি লক্ষ্মী হয়ে থেকো তাহলেই মাতৃ-বিলম্বে তিনি আসবেন।

—'মাতৃবিলম্ব' কি বাবা?

—বুঝে পাঁচ।

—জান বাবা, বন্ধুরা আমাকে বিস্কুট খেতে দিয়েছিল, আমি খাই নি।

—উত্তম করেছ মা-মণি। লোভকে সর্বদা জয় করতে হবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণসখা গীতায় বলেছেন, লোভ ; করা পাপ। গীতা জানেন, তবে যে অসাধিত্রাণ তবে পরিত্রাণ শুভ্রতা, অর্থাৎ কিনা—

বাবা দিয়ে খুকু, বলে, না বাবা গীতা কি কিনতে দিলেই যায়।

পণ্ডিত হাসেন, সে গীতার কথা আমি বলছি না মা-মণি। এ অন্য গীতা।

বয়সের সঙ্গে খুকুর মনের কথা জানা বড় হয়ে যা বাবার কথা গুলোই যেন ঠেস-বোঝা যায় না। খুকুর তাই দুশ্চিন্তা—বাবার সঙ্গে কথা বলে আরাম পায় না, বন্ধু আর ছোটনকে সর্বদা এড়িয়ে চলতে হয়; তারা সুযোগ পেলেই চিমটি কাটে, জ্বালা করে দেয়। কেন তা কিছুতেই খুকু উঠতে পারে না খুকু। ঠাকুরদাকুর কথাও সব সময় বোঝা যায় না, তা হোক সে তবু খেলার ছোঁয়া দেয়। তা আর কিছু তো ঠাকুরদাকুও আসছে না। গীতাটিকেও খুকু। সহ্য হয় না। পাঁতাটি বলে, নাকো। বন্ধুরা তখন কিনতে দিল, তুই নিলি না কেন?

খুকু সপ্রতিভ স্বরে, কেউ কিনে২ খুকু দিতে হয়? লোকে হারালো বলবে না?

—উঁহু। হারানো এমনি বললেই হল? মুখে নুড়ো জেলে দেব না? তুই না হয় কিনে নাই খেতি, আমাকে কিনে কিনেই পারতি?

খুকু সমস্যাটা বুঝিয়ে দিতে পারে না গীতাকে। বাবার ইচ্ছেটা যে তার ছোটো জানাই আছে। বিশেষ থাকে তার। কিন্তু কোনদিন তারও কষ্ট কিনু হাত পেতে নেয় নি, সে যে মনে করত। তাই হাত পাতার অভ্যাসটা তার হয়নি, এখন সে বদভ্যাস ছাড়বে কেমন করে। লজ্জায় মাথা থেকে হাতখানাই যদি সে কোনক্রমে পাততে পারে, তবে সেটা খাওয়ার মনা গীতার সাহায্যে তার প্রয়োজন নেই। বলে মা যে বকে—

খিল খিল করে হেসে ওঠে গীতা। বলে, তোর কি বারণা এখনও তোর মা মাগী বকতে আসবে? সে তো মরে ভূত।

খুকু অবাক হয়ে শোনে। বাপারটা বুঝে উঠতে পারে না।

পণ্ডিত বলেন, মা-মণি তোমার মায়ের পরিবর্তে আমি যদি অন্য একজন মা নিয়ে আসি, তাহলে কেমন হয়?

—অন্য মা কেন বাবা? মা কি আসবে না?

—আসবেন মা-মণি, কিন্তু তাঁর বিলম্ব হবে। স্বর্গের দেবতারা তাঁকে অবিতিবিলম্বে পাঠাতে পারছেন না। এ ছেলে মানুষ অন্য একজন জননীকে নিয়ে আসি তুমি কি সন্তুষ্ট হবে?

খুকু একটু ভেবে নিয়ে বলে, অন্য মা মারবে না?

—মারবে না' বলা অনুচিত মা-মণি, বলতে হয় 'মারবেন, না'। না, মারবেন কেন? ভয় আদর করবেন। তোমাকে গল্প বলবেন, ছড়া বলবেন, কাছে নিয়ে শয়ন করবেন।

খুকি সে কথার জবাব না দিয়ে ঘরের অন্য দরজার দিকে চলে যায়; বলে—আচ্ছা বাবা, 'মাগী' মানে কি?

—কী। কে তোমাকে ঐরূপ অভদ্রোচিত ভাষা শিখিয়েছে?

—কোথায় এ কথা?

ভয়ে খুকু, একেবারে কাঁদতে যায়!

—না মানের সাধনে চলবে না সত্য কথা বল।

খুকু গীতার নামটা করবে কিনা খুকে উঠতে পারে না।

ধুরন্ধর ছেলের পণ্ডিত হাসিটা তোলেন। তারপর নিজেই সেটা টেনে নেবার না, অপরাধ খুকুর নয়। সে শিশু, সে যা শোনে তাই বলে। অর্থ না বুঝেই বলে। সে তো জানে না কোনটা শ্লীল আর কোনটা অশ্লীল। আর জানে না বলেই তো সে শব্দটার অর্থ জানতে চেয়েছে। ও জিজ্ঞাসু, ও অজ্ঞ, ও ছাত্রী—জ্ঞানদণ্ড প্রয়োগ করতে চায়। পণ্ডিত আত্মসংবরণ করে বলেন, ঐ শব্দটা অত্যন্ত অশ্লীল মা-মণি—ওর অর্থ হল স্ত্রীলোক। কিন্তু 'স্ত্রীলোক' শব্দটার অনেক প্রতিশব্দ আছে:—রমণী, মহিলা, যোষিত, নারী। ঐ পরিত্যক্ত শব্দটার প্রয়োগ না করেও আমরা স্ত্রী জাতীয়াকে বিজ্ঞাপিত করতে পারি। এবং তাই আমাদের করা উচিত। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন,—'ভাল বলিবে, মন্দ বলিবে কিন্তু অশ্লীল কখনও বলিবে না'

খুকু মাথা ঝাঁকিয়ে প্রতিবাদ করে। না বাবা, বন্ধুরাই সেদিন কাত্যায়নিকে 'মাগী' বলছিল।

—আবার ঐ শব্দ উচ্চারণ করছ? না আমি ঐ কালিদাসের বঙ্কিমচন্দ্রের কথাটা বলি নাই। ইনি অন্য বঙ্কিমচন্দ্র।

একটিমাত্র বস্ত্রধারী নিয়ে পণ্ডিত পূর্ণেন্দু ভট্টাচার্য একদিন মধ্যাহ্নে হাওড়া ষ্টেশনে এসে অবতীর্ণ লোকালে উঠে বসলেন। চন্দ্রকান্তবাবুর হাতে পাতলা কাগজে মোড়ানো একটি সোনার চেনের, অপর হাতে মোষের শিঙের বাঁধানো একটি সৌখীন ছড়ি। ওরই মধ্যে একটু সাজসজ্জা করেছেন তিনি। পাট ভাঙা সিল্কের পাঞ্জাবি। পায়ের পাম্প-সুটোয় আর সদা কালি পরেছে। হাতে ঘড়ি, কাঁধে শাল। বাকেতার উপযুক্ত প্রায় বলা চলে। সে তুলনায় বস্ত্র বড় নিষ্প্রভ। তাঁর পাঞ্জাবিটা লা কুর্তার এক সেটা পাইজামা নয়। পায়ে বিদ্যাসাগরী চটি। বৃত্তিটাও মাসে ছোট; এক সপ্তাহের বড় কথা পণ্ডিত আজ সকালে ক্ষৌরকর্ম করেন নি। চেলাগুরা বাবার বসিয়ে নেবার জন্য চন্দ্রকান্তবাবু পণ্ডিতকে অনুরোধ করেন নি। কন্যাকর্তার ছেলের বলকে চিনতে তো আর তাঁর বাকি নেই। সেই পণ্ডিতের কাছা ধরে টানাটানি করবে যে সেবাইতরা পর্যন্ত সেদিনটাতেই হয়তো অসন্তুষ্ট হয়ে পড়বে। ষ্টেশনের দু-চারজন লোক চন্দ্রকান্তবাবুর কিংবা ভাতৃষ্পুত্রকে উঁকি ঝুঁকি দিয়ে যাচ্ছেন না; যেন খুকুর বিয়েতেন, তারা তাদের ষ্টেশনের ও পুরোহিতকে নিয়ে তিনি কলকাতা থেকে দেশের অন্যস্থলে যাচ্ছেন।

স্কুলে কেউ কিন্তু জানে না অন্যদের

সঙ্গে গুরুনাথনেরও কয়দিনের ছুটি পাওনা ছিল। পরিবারের সঙ্গে থাকতে হওয়ায় বেশ লম্বা তিন দিনের ছুটি পাওয়া গেল। এক এক মুহূর্ত সুযোগ। কাজকর্মীতে ঢৈর পাবে না এ আশ্বাস চন্দ্রবাবু পণ্ডিতকে বার বার দিয়েছেন। তিনি নিশ্চই রক্ষেও। বিবাহ আর কুলপঞ্জিকা চন্ডীগড়েই হবে। স্বিতীয় দিন ফিরে আসবেন। কুলপঞ্জিকার কোন আয়োজন পণ্ডিত জানতে করবেন না। পুরুতপনা একটা সাম্প্রদায়িক অনুষ্ঠান। না করে উপায় নেই। সে দিন পণ্ডিত একটিবার মন্ত্রপাঠে নিমন্ত্রণ করবেন। চন্দ্রকান্তবাবুকে। নবদম্পতি পরস্পর পরস্পরকে মালা দুই বন্ধুর পাশাপাশি বসে থাকার করবেন। নবদম্পতির সাম্প্রদায়িক স্বীকৃতি হবে।

পণ্ডিতের মনে বস্তুত তিনটি সংকট ছিল। আশ্চর্য যোগাযোগ। তাঁর সংকটের কারণগুলি অপনা থেকেই দূরীভূত হতে গেল। সম্ভবতঃ মা-মণি পরিষ্কার করে ভেবেছিলেন। কিন্তু তা সে করল না। খুশি মনেই সে মেনে নিল এই পরস্তাব। তার মনের পরিবর্তে আপাতত অন্য একজন মা। যেখানে ঐ নির্জন গৃহে সন্তান অভাবে তার নিঃস্ব মন হাঁপিয়ে উঠেছিল। কিংবা সে বলতে পারে, সে হয়তো তার নিরবচ্ছিন্ন বিবেচনাহীন বাপের অসহায় অবস্থা আশঙ্কা বুঝে নিয়েছিল। অথবা হয়তো এ ব্যবস্থার গুরুত্ব সে আদৌ বুঝতে পারেনি। আপন মনে পুতুল খেলতে খেলতে সে 'হ্যাঁ' বলে সায় দিয়েছে বাবার কথায়। মোট কথা তার কোন আপত্তি নেই। দিন দুয়েকের মনা চন্দ্রবাবুর স্ত্রী ঝুকির দায়িত্ব নিয়েছেন। চন্দ্রবাবুর ছেলেমেয়েদের কাছে সে ভালই থাকবে আশা করা যায়। ওরে ভালো দিকে নিশ্চিন্ত মনে বেরিয়ে পড়তে পেরেছেন। কাজকর্মের সঙ্গে তাকে দেখা হয় নি। তাকে কিছু বলে আসা হয় নি।

স্বিতীয়তঃ সংকট ছেলেমেয়ের পাত্রীটির সম্বন্ধে। পরলোক পণ্ডিত আর পোড়ে মন, তিনি বস্তুতঃ বুঝ। পাঁচ বছর আগে তাঁর মেয়েদের বিবাহের পরিস্থিতি তবু কিছুটা ছিল। এখন তিনি একেবারে ভেঙে পড়েছেন। কামনা বাসনার তত স্বপ্নই তো থাকে। নাম-পরলোক আর উপনিষদে আকণ্ঠ নিমজ্জিত পরলোক পণ্ডিতকে কারও কিছু কিছু পড়তে হয়েছে বৈকি। আহা! মেয়েটার কি তিনি সর্বনাশ করতে যাচ্ছেন? এ মনও ইতস্তত করেছিলেন তিনি। কিন্তু সেদিক থেকেও চন্দ্রকান্তবাবু তাঁকে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত করেছেন। কন্যা, তাঁ যেন তার নাম, সে পণ্ডিতকে দেখেছে। তাঁর সঙ্গেই বিবাহ রাজি। তখন সে প্রয়োজনবতী। বালিকামাত্র। তা ছোক, বর্তমানে সে নাবালিকা, বয়ঃসন্ধিতে সে নিজের অনায়াসেই বুঝে নিয়েছে যে এই বয়সে সে কেমন বৈশোর থেকে ধীরে ধীরে যৌবনের সিংহদুয়ারে এসে উপনীত হয়েছে, তেমনি পণ্ডিতও পৌঢ়ত্বের সীমান্ত থেকে বার্ধক্যের কেন্দ্রে চলে পড়েছেন। আর যাই হোক পুরুষত্বের তিনি ঘোষণাকে ছিলেন না। এখন তিনি একটি কন্যার জনক। চন্দ্রবাবু ওঁকে বার বার আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, সে মেয়েটি এ সব কথাই জানে। তার কাছে পরলোক পণ্ডিতের কন্যাটি সন্তানের চেয়ে কম নয়, বোনটি। মা-হারা ঐ মেয়েটিকে বুকে তুলে নিতেই সে আসতে চায় পণ্ডিতের সংসারে। কুলসহায়বাবু কন্যাকে কোন রকম পাত্রাপাত্রি করেন নি, মেয়েটি নাকি নিজেই বলেছে পুরুষের পৌরুষ তার বয়সে নয়, তার জ্ঞান গরিমায়, তার পাণ্ডিত্যে। পণ্ডিত পরলোক ওঁচোর্য ন্যায়তর্কতীর্থের গৃহিণী হওয়াকে সে সৌভাগ্যসূচক মনে করে।

পণ্ডিত অবাক হয়ে গিয়েছিলেন।

তৃতীয়তঃ সংশয় ছিল নিজের স্থিত থেকে। আত্মা অবিনশ্বর, এ বিশ্বাস তাঁর আছে। পত্নিমা তাঁর পত্নীটি পদক্ষেপ উপর থেকে দেখতে পাচ্ছে। পত্নিমার মনের কথা তিনি কোনদিনই বুঝতে পারেন নি। মরণীন বলেছিল, পণ্ডিতের মরণ থেকে মুক্তি নাকি তাকে মুক্তির এনে দিয়েছিল। পণ্ডিত মানেন না, এ কথাটা সত্য কিনা। সত্য বলে মনে করতে মন সরে না, অসত্য বলে উড়িয়ে দেবারই বা মনের জোর কই? আশ্চর্য চাপা মেয়ে ছিল পত্নিমা। মুখফুটে কড়া কথা তো দূরের কথা, পণ্ডিতের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনদিন সে পত্নিমাস পর্যন্ত করেনি। নিরলস সেবার দ্বারাই সে পেতে চেয়েছিল স্বামীকে। একনিষ্ঠা বৈষ্ণবীর মত। পণ্ডিত তাই ভাবছিলেন, সে কি ক্ষমা করবে, যদি তিনি এই শেষ, স্বিতীয়বার বিবাহ করতে যান? পণ্ডিতের সে সংশয়ও বড় অকস্মাৎভাবে মিটিয়ে দিয়ে গেল পত্নিমা। স্বপ্নের মধ্যে সে এসেছিল তাঁর কাছে। পণ্ডিতের শিয়রের কাছে এসে বলেছিল নতমুখী মেয়েটি। খুকুর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলেছিল, আপনি আর অমত করবেন না। খুকুকে তার মায়ের হাতেই তুলে দিন।

ঘুম ভেঙে পণ্ডিত চুপ করে বসে ছিলেন অনেকক্ষণ ঐ একনাগাড়ে ঝাড়া গাঢ় রাত্রিটার দিকে তাকিয়ে। মনে মনে বার বার বলেছিলেন, তোমাকে আমি চিনতে পারিনি পত্নিমা, তোমার অভাবেই আজ তোমাকে চিনতে পারছি। তুমি মহীয়সী।

স্বেতীপুর স্টেশনে মেয়ে পড়লেন দুজনে। তখন 'দুপুর বেলা। সূর্য এখন মধ্যগগনের রাশিচক্রে। মেঘের ভেতর দিয়ে এসেছে। স্টেশনে গেটে টিকিটটি দাখিল করে বাইরে বেরিয়ে আসতেই একজন পোড়ে ব্রাহ্মণকে এগিয়ে এসে বললেন, কিছু মনে করবেন না, আপনারা কি চন্দ্রকান্তবাবুর বাড়ির?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আপনিই চন্দ্রকান্তবাবু?

—হ্যাঁ। আপনি?

—আমি কুলসহায়বাবুর জ্ঞাতি ভ্রাতা। আমার নাম সুবলচন্দ্র আপনি। আপনাদের আমন্ত্রণ করে নিয়ে যেতে এসেছি। আসুন, আসুন পণ্ডিতমশাই।

স্টেশনের বাইরে খোলা বাথানে। সড়কটার উপর একটি গো যান। টাপর টোলা আছে। পোড়ে ব্রাহ্মণ পরলোক, হলধর, চ' বাবা, আর দেরি করিস না। একটু তাড়াতাড়ি চ'।

মকবুল হাত বাড়িয়ে সৌপটো নিতে যায়। চন্দ্রবাবু বলেন, থাক এটা এখন কিছু ভারি নয়।

পরলোক পণ্ডিত আর চন্দ্রবাবু এগিয়ে যান গো-যানের দিকে। চন্দ্রবাবু বলেন, আসুন সুবলবাবু, আপনিও আসুন।

—না না। আপনারা বরং হাত পা মেলে আরাম করে বসুন। আমার সাইকেল আছে।

বলদজোড়া পাশিকার, হাত পাঁচেক ধার করা। ছাড়া পেয়ে এতক্ষণ তারা বেলের বয়ানগুলিতে মেহে পড়েছিল সযত্নে ছানের লোভে। মকবুল তাদের তাড়িয়ে এনে গাড়িতে জোড়ে। চন্দ্রবাবু সুবলচন্দ্রকে ডেকে বলেন, ইয়ে, লোকের বেশি হবে না তো?

সুবলচন্দ্র একেবারে ঝিব যান কথা ফেলেন। কী যে বলেন। আপনারা নিশ্চিন্তে আমরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি। আমার পরিবারের কজন, আমি, আমার স্ত্রী, পুরোহিত আর নাপিত। ব্যস। কুলের প্রথা পালন করা যাবে। আর আপনারা কুটুম। আমার তিন মেয়ে, বৌদি আর আমার দেওরের বা এই হল গিয়ে পাঁচ ঘরো—মুখে মুখে ছিয়ানব্বই। এ ছাড়া কাজকর্মীতে ঢৈর পাবে না।

চন্দ্রবাবু একটা কাশি নিগারেট ধরিয়ে বলেন, না, মানে ইয়ে—আমরা কিন্তু খুব-চচ্চড়ি করতে যাচ্ছি না; শাস্ত্রমতে বিবাহ দিতেই যাচ্ছি। তবে ব্যাপারটা তো বুঝতেই পারেন। এঁর বয়স হয়েছে তো। তাই সবদিক বজায়—

—সে আর বলতে হবে না দাদা। উনি যে পাত্রিকে পায়ে ঠাঁই দিতে রাজি হয়েছেন এতেই আমরা কৃতার্থ। তবে ওঁর যদি নাম্য মত্য মনাই, নিজের ভাইকে বলেই বলছি নয়, এমন একটি মেয়ে সচরাচর দেখা যায় না। যেমন স্বাস্থ্য, তেমনি রূপ এবং স্বভাবে সে যে কোন ব্রাহ্মণ সন্তানের ঠাঁই পেতে পারত।

পণ্ডিত ফস করে বলে বসেন—তাহলে সেই চেষ্টাই করুন না! আমার মত একটি বৃদ্ধের—

একেবারে হাঁ হা করে ওঠেন সুবলচন্দ্র। তদ্রলোক কিছুতেই বুঝে উঠতে পারেন নি, যে পণ্ডিতের কথায় কোন শ্লেষ ছিল না, কোনও অভিমান ছিল না—নিছক খোলা মনের পরিচয়টাই পেশ করেছিলেন তিনি। যতই শুনছেন মেয়েটির কথা, ততই যেন পিছু হটতে ইচ্ছে করছে তাঁর।

চন্দ্রবাবু হাসলেন আস্তে করে বললেন, যাক, এবার তবে ওঠা যাক।

সুরেনবাবু একটু ইতস্তত করে বলেন, —ইয়ে, একটা কথা বলছিলাম, কিছু মনে করবেন না, স্টেশন মাস্টার মশাই একবার বলছিলেন। তাঁকে নাকি একটা কথা বলে রেখেছি। আমি বলছিলাম, উনি যদি মাস্টার মশায়ের সঙ্গে গিয়ে কলাপে দু-একটা চন্দনের ফোঁটা দিয়ে নিতেন—মানে, বুঝতেই তো পারেন। হাজার হোক উনি বর।

চন্দ্রবাবু একটু বিব্রত হয়ে বলেন, আবার স্টেশন মাস্টার মশাইকে এ সব কথা বলতে গেলেন কেন?

—না না, তাতে কিছু নেই। উনি অতি সজ্জন ব্যক্তি।

এতক্ষণ মন্ত্রের পড়ে ফাস্তার বাবে পরোণ্টা করা এতক্ষণে হোলওয়ে-কোয়ার্টার থেকে কয়েকজন মহিলা উঁকি-ঝুঁকি মারছিলেন।

চন্দ্রবাবু কিছু বলার আগেই বেঞ্চের কোণ থেকে একজন স্কুলমাস্টার ভদ্রলোক হোলটল ঘোড়ার আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে বললেন, নমিতা, মানে আমার ছোটবোন শান্তির সঙ্গে একসঙ্গে পড়ত। ওকাবে তো আপনাকে চেনে দেখা না, পণ্ডিত মশাই। সুরেনবাবুর কাছে সব কথা শুনে নমিতা চন্দন কেটে রেখেছে, ফুলের মালা তৈরি করেছে। আমার বাড়িতে আপনাদের একটু জলযোগ দিতেই হবে।

চন্দ্রবাবু কোনরূপ আপত্তি করলেন না। সাহেবি ভদ্রতা ছাড়িয়ে ঘরোয়া আন্তরিকতার ছোঁয়া পেয়ে তিনি মনে মনে খুশি হয়ে উঠলেন। সামনে চায়ের দোকানে, বাজারের দোকানে এবং স্টেশনে কোথাও বড় ভিড় নেই। মনে মনে তিনি সুরেনবাবুর অদূরদর্শিতার নিন্দা করেছিলেন বটে, কিন্তু মুখে বললেন, সে আর বেশি কথা কি? চলুন—

ওদিকের সব নাগরেরা গুটি গুটি এগিয়ে যান ঐ বাড়িটার দিকে।

উঠানে পা দিয়েছেন কি নেই কি পরনবিধবারী এক সম্বর্ধনিতে চমকে উঠলেন বরকনে।

একজন পা-ধোওয়ার জল আনল, বাটি আর গামছা এনে দিল।

চন্দ্রবাবু বলেন, ব্যস্ত হবেন না মাস্টার মশাই।

স্কুলমাস্টার স্টেশন মাস্টারটি হাসিমুখে বললেন, ছেলে বলেন, সে উপায় রেখেছেন নাকি? তাহলে ফল্গুকে অন্তত আর ভোগান্তিটা করে আসতে বলা উচিত ছিল। আর অনভিজ্ঞতায় দোষই ছিল তো আমরা শুনব না। বিবাহের সম্বন্ধে ওঁর কিছু বক্তব্যও তো আছে।

চন্দ্রবাবু চোখ দিলে চুল করে বাকা শেষ পর্যন্ত ভোগান্তিটাও করতে হল। মাস্টারমশায়ের মেয়েটি রোগাসে নতুন ব্যেত চিড়িয়ে একটিবারের না-জানানো গালটাকে ভেজে-ঘষে লাল করতে হল; সবের-ঘোল খেয়ে একটি চঞ্চলা মেয়ে এগিয়ে এল শেখা-পাউডার আর চন্দনের বাটি হাতে। হাসতে হাসতেই আসছিল, হঠাৎ পণ্ডিতকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। কেমন যেন অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে থাকে পণ্ডিতের দিকে। পর মুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে ও'র সামনে এসে দাঁড়ায়।

ও'র ঐ ক্ষণিক বিহ্বল দৃষ্টিপাতেই বেশ ভয় পেলেন পণ্ডিত। কি জানি হয়তো শুভদৃষ্টির সময়ে ঐ মেয়েটিও, কি যেন ভয় তার, সেও অমনভাবে তাকিয়ে দেখবে তাঁর দিকে। এ কী ফ্যাসাদে পড়লেন তিনি!

মেয়েটি পত্রোদ্বাহনের উপক্রম করতেই তিনি আর্তনাদ করে ওঠেন—না না! আমাকে ছাড় কর মা! শুধু একটি চন্দনের ফোঁটা।

পাশ থেকে খিল-খিল করে হেসে ওঠে আর একটি মেয়ে। বছর বাইশ-চব্বিশ বয়স। সম্ভবত নমিতার দিদি। হাসতে হাসতেই বলে—তা কেন পণ্ডিতমশাই? ও তো আপনার শালী! মন্ত্রের সম্বন্ধ হতে চলেছে যে ওর সঙ্গে।

সমর্থন পেয়ে নমিতা এক ধাবড়া দেয়া তুলে নেয়। পণ্ডিতমশাই ফুলোছিলেন পণ্ডিত। মেয়েটি যেন দেখা পেয়েছে, বললে—মেজদি, বর তো ও'র হাত দুটো ফেল। আঁচল দিয়ে ঘেঁষে ফেল!

স্টেশন মাস্টারের মেয়ে পণ্ডিত মশায়ের কপালে চন্দনের ফোঁটা দিচ্ছে।

পণ্ডিত বুঝতে পারেন পরিস্থিতি নিষ্ফল। পত্রোদ্বাহনের দুটি ওড়নাটার মধ্যে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করলেন। তেমনি ভয়ে ভয়ে একটি পার্বত্য ছাগলের মতোন বিনিময়ে উদাসীনতার অপেক্ষা করে উদাস দৃষ্টি ধানিস্তম্ভিত পর্বত, তেমনিভাবে চুপ করে বসে থাকেন। কিশোরী-তরুণী মেয়ে দুটি যেন পাথরের নিরীহমুখে চন্দন চর্চা করছে। পণ্ডিতের মনটা লতাই হু-হু করে ওঠে। যাকে বিবাহ করতে চলেছেন সেই মেয়েটি এই কিশোরী নমিতারই সহ-পাঠিনী, একই সখী—হয়তো এরই মত সুশীলতা, এরই মত কৌতুকময়ী। ঘরকন্নার যত কলহই এর চোখে মুখে এত কথা, এত কৌতুক! কিন্তু পণ্ডিত কিছুতেই ভুলতে পারেন না—পদ্মের দৃষ্টিতে সে কেমন অন্তুতভাবে তাকিয়েছিল। ঐ স্টেশন-মাস্টারমশাই যদি পণ্ডিতের মত এক বস্তা বোঝেতের ভার নিতে এসে দাঁড় ওকে যেন ছাড়োয়ালার তখনও কি ও সমনি ভয়ে খিল খিল করে হাসতে পারবে পত্রোদ্বাহ পণ্ডিতের পত্রোদ্বাহতা বাহত ওরে যেন—ইহুরে এত ফুলের মালাই! ছিঁড়ে যেন এই নাগপাশ থেকে ছুটে বেরোতে চেয়ে রেল লাইন ধরে দিগন্তে ঐ পশ্চিম-মুখো ছুটতে—ঐ যেখানে অস্তায়মান দিনান্তের সূর্য লক্ষ্যের রাঙা হয়ে উঠেছে।

কিন্তু কার্যতঃ সেসব কিছুই করলেন না। ক্লান্ত অবসন্ন চিত্তে ফুলের মালা, মাথায়, চৌদর মাথায়, চন্দনের ফোঁটা নিয়ে বসলেন গো-যানে। মনে মনে বললেন, হে হৃষিকেশ! তুমি আমার অন্তরে বসে আমাকে যেভাবে চালনা করবে, সেই পথেই চলব আমি। আমাকে শক্তি দাও। আমি যেন মুখে অনুশিলন আর মুখে বিষয়-স্পৃহ থাকতে পারি।

চন্দ্রকান্তবাবু বোধ হয় পণ্ডিতের অনুধাবন করেছেন। কী একটা সান্ত্বনার কথা তিনি বলতে গেলেন; এবং সে কথাটা চাপা দিয়েই পণ্ডিত পত্রোদ্বাহকের চেয়ে গেলেন, বললেন —চন্দ্রকান্তবাবু, আপনি ধূমপান করে থাকেন? ইতিপূর্বে তো কখনও দেখি নাই?

—করে থাকি নয়, মশাই। আজ সখ করে ধরেছি। হাজার হোক আজ আমি বর কর্তা।

পরমুহূর্তে কিন্তু পণ্ডিত ফিরে এলেন আসরের পত্রোদ্বাহে। কন্যাপক্ষের তরফে ভ্রাতৃস্থানীয়কে একটু সান্ত্বনা যাক পত্রোদ্বাহ করছিলেন বোধহয়, তাকে ওঠেন—এ কী বিড়ম্বনা দেখুন তো। এই বয়সে কি এইসব পুষ্পমালা, চন্দন, সোভা শোভন?

চন্দ্রবাবু দ্বিতীয় আর একটি সিগা-রেট ধরিয়ে বলেন, দেখুন ম্যানেজমেন্টমশাই, একটা কথা আজ আপনাকে বলব। কিছু মনে করবেন না, আপনার চেয়ে আমার সাংসারিক জ্ঞান বেশী। আমার এখন মনে হচ্ছে কন্যা হিসাবে আপনাকে এ কথাটা বলার প্রয়োজন রয়েছে।

পান্তত ওরে ভয়ে হলেন, বললেন, বলুন।

—আপনি বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে দ্বিতীয়বার বিয়ে করছেন। দাম্পত্য-জীবনের পরিণতি সম্বন্ধে আপনার কোন মোহ নেই, আকর্ষণ নেই— তা আপনিও বুঝতে পারছেন, আমিও বুঝছি। আপনার সংসারের এখন গৃহিণীসচিবী নয়—আপনার মা-বোন ছেলেটির একটি অভিভাবিকা। কিন্তু সেটাই তো শেষ কথা নয়। এ সাইডে আপনি ছাড়া আরও একটি পরিবার চাপের প্রান্তে, যার কথা আপনি ভাবছেন। ভুলতে পারেন না। সে হচ্ছে শান্তি। আপনার বিবাহিত পক্ষের স্ত্রী। সে আপনার সংসার করতে আসছে; হয়তো বিভ্রান্ত মনে পড়েই সে আপনাকে ক্ষমাঘেন্না থেকে উপায় করতে এ বিবাহে সম্মতি দিয়েছে। না, না, পান্তভমশাই—আপনি আমাকে বাধা দেবেন না, আমার বক্তব্যটা বলতে দিন। আমি জানি, আপনি কি বলতে চাইবেন। হ্যাঁ, এ কথা আমি ইতিপূর্বেই বলেছি যে, তার উপর কোন পীড়াপীড়ি করা হয় নি। সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সম্মতি দিয়েছে; কিন্তু সংসারজগতের মেয়েদের সম্বন্ধে একটা বাঁধা পরিচয় আছে, আপনি নিশ্চয় পড়ে থাকবেন—'উদয়ের পথে শুনি কার বাণী ভয় নাই ওরে ভয় নাই;' নমিতা সর্বান্তঃকরণে এ বিবাহে সম্মতি দিয়েছে; কিন্তু পান্তভমশাই নিজের সম্পূর্ণ অন্তঃকরণটাকে কি আমরা জানি? চিনি? বুঝতে পারি?

পান্তত কি জবাব দেবেন ভেবে পান না। পশ্চিম দিগন্তের দিকে উদাস দৃষ্টি মেলে অন্যমনস্ক হয়ে ছিলেন তিনি। সূর্যটা পালিয়ে যেতে। তার পলায়নের চিহ্ন কিছু কিছু লেগে আছে মেঘের চূড়ায় চূড়ায়—রক্তিম স্বাক্ষরে। গো-যান চলেছে ধীর মন্থর গতিতে—যেন আর যাইতে পারিবে না যাত্রিদের। তৈল-তৃষ্ণিত তার চাকার চাকার ঘর্ষণজনী আর্তনাদে সারা আকাশকে বিদীর্ণ করেছে। যেন সে কেঁদে-কেঁদে মিনতি করে বলছে, আর পারছি না গো, এবার মুক্তি দাও আমাকে।

চন্দ্রবাবু পুনরায় বলেন, আমি জানি নমিতার সমস্ত দাবী মিটিয়ে দেবার ক্ষমতা আজ আর আপনার অবশিষ্ট নেই। না থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু তাই বলে তার পরিণতি তো আপনি অতীতের পুতুলের মত ব্যবহার করতে পারেন না। আজ এই ভুলের মালার কাঁটা বিঁধছে আপনার বুকে—চন্দনের ফোঁটার কমল চন্দন করছি;—কিন্তু এই তো সবে শুরু হল ন্যায়রত্নমশাই। এরপর যে অনেক স্নেহের অত্যাচার সহ্য করতে হবে আপনাকে। যে অমৃতে অরুচি জন্মেছে আপনার, নমিতা যে এখনও তার স্বাদই পায় নি। আপনি বিচক্ষণ, আপনাকে বেশি বলা আমার ভাল না লাগলেও ভাল-লাগার অতিনয় আপনাকে করতে হবে।

ন্যায়রত্নের পান্তত শুধু বললেন—তারপর?

—স্ত্রী অভিনয়। সাধারণ স্ত্রীর হিসেবে অভিনয় কি করেন না? রান্না-খোপালের অন্তরে টেনে চুপ মারবার ইচ্ছে যখন মনে জন্মে তখন সোফাসেট অভিনয় করে হেঁ-হেঁ হাসি হাসেন না?

পান্তত গম্ভীর হয়ে বলেন, ধুলোমাটির সংসর্গে-নিষ্কাম আমি তাদের করেছি।

—সে কি! টিউশনি ছেড়ে দিয়েছেন?

—হ্যাঁ।

—কাজটা ভাল করেন নি। নতুন বিয়ে করেছেন, অনেক খরচ বাড়বে আপনার—

পান্তত বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেন, যেন? তিনটি প্রাণীর গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা ছিল—তাই থাকবে। আর বর্ধিত হবে কেন?

চন্দ্রবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন শুধু।

বেশ কোন পক্ষ অতিক্রম করে গোধূলিটা। যখন নির্মিতি বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল, তখন চন্দ্রবাবু নিজেই একটু প্রবাক হলেন। গোপনেই আয়োজন করতে বলেছিলেন তিনি; কিন্তু তাই বলে একটা গ্রামাঞ্চল-বাড়িও মনে হবে না, দুয়ারের পাশে একরোড়া কলাগাছও দেখতে পাবেন না, এতটা উনিও আশা করেন নি। গোপনেই এসে দাঁড়াবার আগেই সাইকেল চেপে সুবলচন্দ্র অকুস্থলে এসে পৌঁছেছিলেন। তবু মোটর গাড়ি এসে পৌঁছতে কোন হুলুধ্বনি শোনা যেল না অন্দর মহল থেকে, বরণডালা হাতে উঁকি দেয় না। কৃষ্ণসহায়-বাবু ছেলেকে কাঁধে নামিয়ে রেখে দাওয়া থেকে নেমে আসেন। পান্তিতের হাতটা টেনে নিয়ে বলেন, আসুন, আসুন, আসতে আজ্ঞা হোক!

এবং পরমুহূর্তেই পান্তভকে সুবল-চন্দ্রের-ই জিম্মায় সমর্পণ করে চন্দ্রবাবুকে একটু চলান্তিকে টেনে নিয়ে গেলেন।

—কি ব্যাপার কৃষ্ণসহায়বাবু? তাপ-মানকে কিঞ্চিৎ মিটমিটে মনে হচ্ছে।

—মানের হ্যাঁ। একটু মিটমিটই বলে পড়েছি। একটু আগে কয়েকজন ছোকরা মার্কেটের ছেলে এসেছিল। আমি তাদের চাউকে চিনি না। ও পাড়ার ছেলে নয়। সুবলবাবু তাদের পান্তিতের স্কুলে পড়ে। তাদের দিগ্বিজয়, পান্তিত চন্দ্রবাবুর স্কুলে পড়তে যায়—

বাধা দিয়ে চন্দ্রবাবু বলেন, তাদের স্কুলে কি ছোট-এডুকেশন?

—না ঠিক তো-এডুকেশন নয়। সকালে মেয়েদের ক্লাস হয়, দুপুরে ছেলেদের। তা যে যাই হোক, ওরা বল বেঁধে সাইকেল-চেপে এসেছিল, উঠোন খবর পেয়ে। আমাকে বললে, আপনি নাকি পান্তিতের সঙ্গে একটা বিয়ে-পাগলা মোকদ্দমার বুড়োর কিয়ে স্থির করেছেন? আমি তো সম্পূর্ণ অস্বীকার করে দিয়েছি। ওরা আমার কথায় বিশ্বাস করে নি, বললে আমরা পান্তিতের সঙ্গে দেখা করে সঠিক কথাটা জানতে চাই। তাতে আমি পরের আপত্তি করেছিলাম। পান্তিত কেন ওদের সঙ্গে কথা বলবে

—তারপর?

—ওরা হৈচৈ করেই এসেছিল। একটা মেয়েকেও নিয়ে এসেছিল, সে নাকি পান্তিতের সঙ্গে পড়ে। বললে, আমরা কেউ যাব না—এই মেয়েটি পান্তিতের সঙ্গে কথা বলে আসবে। কিন্তু সেখানে আপনারা কেউ থাকতে পারবেন না।

চন্দ্রবাবু চোখ মিলে সুবলচন্দ্রকে প্রশ্ন করেন, তারপর?

—তারি ছুতে হল আমাকে। মুই জবুথুবু বয়সা বন্ধ করে অনেকক্ষণ কি কথাবার্তা হল। তারপর সেই মেয়েটি বেরিয়ে এসে ছেলেদের বললে, না, ওটা মিথ্যা। তখন ওরা চলে গেল?

—পান্তিতকে পরে জিজ্ঞাসা করেছিলেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। সে তো বলেছে, মেয়েটাকে কিছু বলে নি।

চন্দ্রবাবু একটু ভেবে নিয়ে বাইরে থেকে ওরা এসে বিশেষ কিছু সুবিধা করতে পারবে না। গাঁয়ের ছেলেরা কি বলে? তাদের কোন ক্যারেক্টার নেই তো কোকটে তো মেয়ের বিয়ে দেবেন, ঐ ক্লাসের ছেলেদের কেউ একটা ফেলেদেন-ফেলেদেন আকার করুন না?

কৃষ্ণসহায়বাবু আমতা আমতা করে বলেন, ক্যারেক্টার তো আছে—'খুবসুরত' কিন্তু আপনিই তো ডাক্তারবাবুকে ঢুকাতে যাবার অনুরোধ করেছিলেন। এই মেয়ে ডাক্তারবাবুকে পাঠালে হিতে বিপরীত হবে না তো? বেটারা এখন আমাদের বলে মোটা টাকা চেয়ে বসবে।

—তবে থাক। তার চেয়ে তোরাতাড়ি দু হাত এক করে দিন। ছিঁদুর বিয়ে হয়ে গেলে আর কে কি করতে পারে?

— স্ত্রী-আচার-ফচার তাহলে বাদ দিই, কেমন?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি আবার বলতে। ওসব, কি বলে ভাল, ঐ অনুষ্ঠানাদির সময় করবেন বরং। সোজা পান্তিতমশাইকে সম্প্রদানের ওখানে নিয়ে যান। মেয়েকে আনুন। পুরুত আছে তো?

—তা আছে। অত্যন্ত বিশ্বস্ত লোক।

—বাস বাস, তবে আর কি। শুভস্য শীঘ্রম্।

কিন্তু শুভকার্য নির্বিঘ্নে হওয়া কি এতই সহজ? ন্যায়রত্ন ঘরের ছাঁচতলার দিকে সরে দাঁড়িয়েছেন; চন্দ্রবাবু, সুবল-

চলে, আর কৃষ্ণনগরের চীৎকার করে ওঠো, বরফটা হল করে যাও।

কিন্তু তার আগেই হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ল একখানা ছোকরা ছেলে—রংপুরের হিতৈষীর সঙ্গে স্থানীয় সংবাদদাতা। অনাহারে মৃত্যুসংবাদ জানাতে এসেছে তারা। সাময়িক অন্যায় হতে তাদের ব্যতিক্রম। পঞ্চম বার্ষিকী শুভ্র ধূপ পুরোহিতের শিরোপর উপরং ঝরোনো' বলে তিনি সেই এক ঘরেই ধরাশায়ী হলেন। আর উঠলেন না। কৃষ্ণনগরে একখানা ছোটর ছোড় পড়ে সাপসঙ্কলনে বলেছিলেন; উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, একী? এসব কি হচ্ছে কি?

কথাটা তাঁর শেষ হয় না। একজন এগিয়ে এসে চুলের মুঠি ধরে বলে, ও শালাই না মেরের বাবা?

কৃষ্ণনগর আন্তর্জাতিক ঘেরার আর সুযোগ পায় নি। তা আগেই কে একজন পশ্চাৎ থাকতের তাঁকে মাটিতে ফেলে ফেলেন। সংঘর্ষের মাটির ঘটা বিশাল হয়ে গেল তাঁর ঘেরতলে।

চন্দ্রবাবু বিদ্যুৎবেগে চারিদিকে একবার তাকিয়ে দেখে নিলেন। তারপর মাটি সন্তর্পণে দা-পকেটে ঢোকান কোঁচাটাকে আলগোছা করে নিলেন এবং হাঁটু বিদ্যুৎগতিতে ছুটে বেরিয়ে গেলেন খিড়কির দরজা দিয়ে। খিড়কির পরেই একটা ছড়-ঢোপ, তারপর খোয়ালা একটা ঢোকরের ধারার তাঁর একটা পা আ-হাঁটু ডুবে গেল। চন্দ্রবাবু ভ্রুক্ষেপ করলেন না। একপাটি পাদুকা সেখানে গচ্ছিত রেখে, দামলা কাঁটা এবং পড়ুকোস আগাছা করে উঁকার দাঁড়িয়ে তিনি ছুটে বেরিয়ে গেলেন ঢোকার-চরের মধ্যে।

দিগন্তে একটা লাল হঠাৎ নিরবলম্ব হয়ে যাওয়ায় হতচকিত তিন জামাইবাবু সারদাতে সারদাতে সাদাবরফ নরবধূ তাঁর-সাম্য হারালো। হাত বাড়িয়ে সে সবল-চুম্বনে ব্রাহ্মিকে বাচ্ছিল যাচ্ছিল— ঠিক সেই সময়েই আর একটি হৃদ্যবিদারক নারকো সংবেদনশীলে আত্মপ্রকাশ করেছিল। তিনিও পড়-লেন, সবশেষে উঁচুতে হয়ে পড়ল সুলাও পাঁচতের পায়ের উপর।

শুধু পাঁচত পাঁচত ছিটকের মত দাঁড়িয়ে আছেন আগলনা ছেওয়া। পিঠির উপর। যেন কী হচ্ছে তা তিনি বুঝতেই পারছেন না। যেন তিনি এ নাটকের অভাবে চরিত্র নন, তিনি দর্শকমণ্ডলি। চোখের উপর ঘটনাচক্রের একটি মূল অভিনীত হচ্ছে।

নগেনবাবু, গৌরবোবাবু, চন্দ্রনের ঢোকার সম্মিত হয়ে, কৃষ্ণের মালী মালায় আকৃষ্ট দীপশিখার মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি। একজন বলিষ্ঠকর্মী ঘুষের এতক্ষণে এগিয়ে এসে ছেলে ধরল আর সারবেরী সৈন্যটাকে।

ঘুষেরা বললেন, এসব অন্যায়-কি। অন্যায় যদি করাও হয়ে থাকে, তবে হয়েছে আমাদের, বন্ধুতা আমার।

—তা তো বটেই। তা তোমরাই যে মেয়াই দেব তা তাবছিস কেন রে?

ঠাস করে একটা পড়ল তরুণ ঘাড়ে সে ন্যায়রত্নের চন্দনচর্চিত ঘাবদাংশে।

এবারের ঘৈলে উঠেই আবার সোজা হয়ে দাঁড়ালেন পাঁচত। একটি হাতও উঠালেন না আত্মরক্ষার্থে, বললেন, তোমার পক্ষতলে নরবধূ লিখে হচ্ছেন।

ছেলেটি নিজের পায়ের দিকে তাকায়। উত্তেজনার ঝিমের উপর দাঁড়িয়ে আছে তা এবে খেয়াল ছিল না। বহু নিম্নচর অন্যায় হয়ে গেছে, না হলে তার পিঠের উপর থেকে ঘড়াসাহেব সে নিম্নচর আর-করে উঠত।

পাশের থেকে আর একজন বললে— শালা ঝিয়ে-পাগলা বুড়োর জ্ঞান উঠনেন। শালার বয়স এখনও 'নরবধূর' ঝিকে। শালা।

পড়ন্ত একটা ঘুসি মারলে সে পাঁচতের চিবুকে। ন্যায়রত্নের মুখটা উঁচু হয়ে গেল—আকাশের দিকে উঠে গেল। নিচের একটা দাঁত নড়ছিলই কাঁচন থেকে। এ আঘাতে ছেড়ে বেরিয়ে এল সেটা। রক্তের ধারে হতে পড়তে শুরু করল। শ্বেত-কুরধার দালানটা লালে লাল হয়ে গেল। তবু আত্মরক্ষার কোন চেষ্টা করলেন না তিনি। উর্ধ্ব আকাশের দিক থেকে মুখটা নামিয়ে এনে আবার সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। পর মুহূর্তেই পঞ্চম ঘোকরা ও'র তলপেটে একটা পড়ন্ত লাথি মারল। আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না। মাথার মধ্যে টাল উঠল। জ্ঞান হারিয়ে নরবধূর উপরেই উবুড় হয়ে পড়লেন ন্যায়রত্ন।

জ্ঞান যখন ফিরে এল তখন তত এত হয়েছে বুঝতে পারলেন না। নিজেকে আবি-ষ্কার করলেন কালভাসুন্দির একটা ঢোকে। সর্বাঙ্গে অসহ্য এক যন্ত্রণা। চোয়ালে, পেটে এবং মাথায়। রক্তে ভেজে গেছে মুখটা। ধীরে ধীরে উঠে বসলেন। একটা দেয়াল ধরে ধেতে ও'কে লক্ষ্য করছিল; ও'কে উঠে বসতে দেখে জলের মতো ছুটে পালালো। শুক্লা স্বাধনী তিথি। ঢোকরার ঘরোপাশ আলোর বন্যায় ভেসে যাচ্ছে। উঠে দাঁড়ালেন। ঘরোপালতে এত বন্যা কেন? মাথায় হাত দিয়ে তিনি আঘাত পান নি। হাতটা মাথার উঠে গেল। এবার অনুভব করলেন ঘারক্তা। ও'র নিশাটি ভগ্নতরাতে হয়েছে। না ছাড়ি দিয়ে কেটে নেওয়া হয় নি, উপড়ে নেওয়া হয়েছে। তাই মাথার এত বন্যা। কে জানে কোথায় ঐ নিশার মুটি ছেলে পড়েই ছেলে সেই নিশার মালা পেয়ে উঠে বলবে ঘোকা হিংছে' আমা হয়েছিল' আমার অব-স্থায় তিনি ভাবতে পারেন নি।

অন্যত্রে কীরকম বলতে? ভেবেন। বাস্তবের। তাঁরই সত্য।

পারলেন না। নিজেকে বিশ্লেষণে কেন্দ্রে গেছে।

পায়ের চটিজোড়া কোথায় পড়ে গেছে। তা যাক, মন্দমন্দে চলাকেরায় তিনি একান্ত। পথটা তিনি চিনতে পেরেছেন। স্টেশনে যাবার রাস্তাটা। এই পথেই কয়েক ঘণ্টা আগে চন্দনচর্চিত পাঁচত যোগদান করে এসেছিলেন না? আর সেই সময় তরুণের ঘোমটা ছিঁড়ে ফেলে ছুটে পালাবার একটা ইচ্ছা জেগেছিল না তাঁর।

না ছুটে পালাবার আর প্রয়োজন নেই। সে 'অবস্থাও নেই। নরমুণ্ডে অসহ্য বেদনা। ঘাঁড়িয়ে তিনি স্টেশনের দিকেই চলতে থাকেন।

স্টেশনে এসে দেখা হল চন্দ্রবাবুর সঙ্গে। তাঁর খুব কিছু ক্ষতি হয় নি। পাঞ্জাবিটা ছিঁড়েছে, আর জুতো জোড়া গেছে, ন্যায়রত্নকে দেখে বলেন—ঈশ্। এ কি চেহারা হয়েছে আপনার? একেবারে চেনাই যায় না যে?

পাঁচত প্রত্যুত্তরে কি একটা কথা বলতে গেলেন। পারলেন না। মুখটা এমন ফুলেছে আর ছিঁড়ে এমন বিশ্রীভাবে কেটে গেছে যে একটা 'গোঁ' 'গোঁ' শব্দ ছাড়া আর হল তাঁর রক্তাক্ত মুখ দিয়ে।

—আসুন, স্টেশনমাস্টার মশায়ের কাছে গিয়ে চিকার আইওডিন পাওয়া যাবে।

পাঁচত হাত দুটি জোড় করলেন শুধু।

—না না, এ কি চক্ষুলজ্জা করার সময়? সেপটিক হয়ে যেতে পারে।

কিন্তু ন্যায়রত্ন তাঁর সিদ্ধান্তে অটল। কিছুতেই তিনি স্টেশনমাস্টার মশায়ের বাসায় যেতে রাজি হলেন না। সেই দুটি মাতৃনির বয়সী ভৌতিকমরী তরুণীর সম্মুখে এই অবস্থায় তিনি কিছুতেই যাবেন না। অগত্যা স্টেশনের কলে নিয়ে গিয়ে চন্দ্রবাবু পাঁচতের রক্তধারা ধুইয়ে দিলেন।

মুখ হাত ধুয়ে পাঁচত চন্দ্রবাবুর মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ালেন। বীভৎসভাবে ফুলে উঠেছে মুখটা। বাঁ চোখটা একেবারে ঢেকে গেছে। একটা দাঁত পড়ে যাওয়ায় মুখটা ভোকলা হয়ে গেছে। ঐ অবস্থাতেই অদ্ভুতভাবে হাসলেন পাঁচত। চন্দ্রবাবুর মনে হল, ন্যায়রত্ন কোন সংস্কৃত নাটকে বিদূষকের পার্ট করছেন। কোনক্রমে হাসি চেপে বললেন, কিন্তু অন্যায়ে?

পাঁচত মাথা নেড়ে মানা দিলেন, 'ওঁ'ও এঁ'ও' করে' কি যেন বলবার চেষ্টাও করলেন। মুখের হাসিটা তাঁর তখনও মিলিয়ে যায় নি, অথচ চোখ দুটি করুণ-মিনতি মাখা হয়ে উঠেছে।

চন্দ্রবাবু বলেন, এ অবস্থায় আর পথে বলার চেষ্টা করবেন না।

কিন্তু পরের বড় বালাই। এক গরুর গাড়ীওয়ালার ভিড়ও জমন্তব। কিন্তু একটা তিনি বলতে চান, এবং সেটা না বলতে পারা পর্যন্ত তাঁর পক্ষটা হাল্কা হবে না। অগত্যা চন্দ্রবাবু, তাঁর কর্ণমূলে ঐ-বিকৃত মুখ-খানা রেখে যাড়িয়ে রইলেন। অনেক কষ্টে

পাণ্ডিত শুধু বলতে পারেন—এরকম যেন কেউ ভাবতে না পারে।

—অরে এসব কী বলছেন আপনি। পাগল; এরকম কি পাঁচকান করবার? বাংপক্ষীতে টের পাবে না। আমারই ভুল হয়েছে। বিবাহের, অনুষ্ঠান কলকাতায় করা উচিত ছিল। আমার বাসা থেকে হলে এতক্ষণে আপনারা বাসর ঘরে গিয়ে বসে-থাকতেন। ...যেমতাম কোন্ পাগল আইছিল।

পাণ্ডিত আবার 'আঁও-আঁও' করে কি যেন বললেন।

এবার কিন্তু বোঝা যায় না চন্দ্রবাবুর না পারাই স্বাভাবিক। তিনি কেমন করে আন্দাজ করবেন পাণ্ডিত ঐ অবস্থাতেও না বলতে চাইছেন তা চন্দ্রবাবুর ঐ 'পাগল' শব্দটির পরোক্ষের বিরুদ্ধে প্রতি-বাদ।

—এখন ভালয় ভালয় আপনাকে বাড়ি নিয়ে যেতে পারলে বাঁচি। দিন আমার শালটা দিয়ে কান-মাথা ভালো করে বেঁধে ফেলুন। না হলে রাতদুপুরে কাছে বেরিয়ে ঠিকে ঠিকে পড়েপড়তে হবে। আমি এখানে এসেছি অনেকক্ষণ। আপনার জন্য অপেক্ষা করায়। ফেলে রেখে তো আর যেতে পারি না।

চন্দ্রবাবু অবশ্য বাহুল্য বোধে আর বলেলেন না যে ইতিমধ্যে কলকাতাগামী কোন ট্রেনও আর আসে নি।

বেদনার তাড়নে দুটি দিন তো বটেই তার পরের তিনটি দিনও পাণ্ডিত বিছানা ছেড়ে উঠতে পারলেন না। পঞ্চের ঘরে এসেছিল তাঁরা। চন্দ্রবাবু দুটি ঘরে খুকুকে আটকে রেখেছিলেন তাঁর বাসায়। বাসের ঐ বাঁকানে মুখ দেখলে বেচারি ভয়ে আঁতকে উঠত। অযোক্তিক কতকগুলো বৈধিকতের সম্মুখীন হতে হত পাণ্ডিতকে। এ কদিন সন্ধ্যার পর চন্দ্রবাবু একবার ঘরে ঢোকে নিয়ে যেতেন। শুনো ঘরে ঢোকিতে শুয়ে আওয়াজে আওয়াজে তাঁর এই নতুন জীবনের নিঃসঙ্গতাকে পাণ্ডিত যেন নিবিড় করে অনুভব করতেন। স্মৃতিরা তাঁর মোটামুটি ভাবেই— তবু মাঝেন মাঝে মনে হত, পত্নীবিয়োগটাকে যেন একে-বারে আড়াল করে রাখত। সারা রাত জেগে বসে হাওয়া করত, অথবা মাথায় হাত বুলোতো। অবশ্য এ রকম পরোক্ষভাবে অনুভব তিনি কখনও করেন নি তাঁর সাক্ষিপ্ত সাত বছরের বিবাহিত জীবনে। এবার তিনি পাশ্বপরিবর্তন করে উঠে বাইরে যান নি রাত থাকতেই বাসরঘর থেকে শৌচাগারের কাছে, সেও আসতেন। খুকু কেন নেই, পাণ্ডিত কেন শুয়ে আছেন সে প্রসঙ্গে অবশ্য কেউ জিজ্ঞাসা করতে এল না। এমন কি কাছাকাছি পর্যন্ত নয়। শুধু-বধূর পায়ের শব্দে সে খুকুর সম্বন্ধে যেন একটু নিশ্চিন্ত হয়েছে, ভেবেছে। এবার অবশ্য শুধু সেই আশ্বাসে সে এমন নিশ্চিন্ত হয়ে পড়ে নি। পায়ের শব্দের মধ্যে একটা চেনা ভাব এসেছিল পাণ্ডিতের। কাতরোক্তি পায়ের শব্দে ভাতবাবু : আর বিছানায় শুয়ে থাকতে হলেই এতবড় কথাটা তাঁর বলতে বৌমা। বেশ তাই বেশ হবে। এ প্রসঙ্গে যেন আমার না-সরে। যেই জ্ঞানান, তাদিবধূকে এখনও মন দিই নি ঠাকুর, এখন তুমি যদি কর আমার চেয়ে মাও তোমার বোলে। ঝৌবউয়ের এ অনুরোধটা পিতা যেন আমাকে আর না দিতে হয়।

পাণ্ডিত মুখে নিজেকেন পক্ষের কথা কাতরোক্তিও সমাধায়ী। না হলে সে অন্তত একবার ওলে দাঁড়াত, বলত— হাঁরে খুকুটা কই গেল! অথবা পাণ্ডিতের চেহারাখানা দেখে প্রাণকে উঠে বলত— ওমা, এমন দশা তোর করল কোন্ পাপুরে?

চার পাঁচ দিন পরে চেহারার পর সেদিন সকালে পাণ্ডিত উঠে বসেছেন। পাতিবার একখানা ছোট কাঠের হাত-আয়না ছিল। ঐটে সামনে নিয়ে পাণ্ডিত সন্তাহে দু-তিন দিন দাড়ি কামাতেন। সেই ছোট আয়নাটায় একবার নিজের মুখখানা দেখে-নেন। না, মুখের ফোলাফুলো ভাবটা কমে গেছে। একমুখ দাড়ি গজিয়েছে এ কদিনে। তা হোক ওটা থাক। আজ স্কুলে যেতে হবে। তিন দিন কামাই হয়ে গেল। দাড়ি কামালেই মুখের বিকৃতিটা আরও বেশী করে নজরে পড়বে। হয়তো কেউ পরসন্ন করে বসতে পারে এ নিয়ে।

কদিন পত্রের অনাহারেই কেটে গেছে। চন্দ্রবাবুকে দিয়ে একরাশ পাঁচা কলা কিনে এনেছিলেন, তাতেই এ কদিন ক্ষুন্নিবৃত্তি করেছেন। আর উমানে আলুন ছিলেন। যা হোক দুটি ফুটিয়ে মুখে দিতে হবে। আগুন জ্বল এখনও কিছুটা ঘরে আছে। কেতের উনুকোটায় গোটা চারেক আলুও পড়ে আছে। সিদ্ধ করে নিলেই হবে। স্কুলক্ষেত্রে আর খুকুকেও নিয়ে আসবেন, এক তারপর ভাল করে বাজার করবেন। বাল বরং দু-একদিন তরকারী রাঁধবেন। দুবেলা এ কদিন খেওয়া হয় নি। বিকেলে ফিরোদাতে গিয়ে দুধও নিয়ে আসতে হবে।

কদিন সন্ধ্যাহ্নিকও হয় নি। শুয়ে শুয়েই বসবার করে গায়ত্রী জপ করেছেন। উপায় কি! আজকে নিয়ম নাস্তি। আজ ভাল করে আহ্নিক করবেন। বসলেন ছিলই করে। আহারাদি সেরে, উঠেছিলেন খেলে, বাসন ধুয়ে তাতিটি বাজার দিয়ে বেশ তখন পর আজ বাজে পাণ্ডিত-মশাই স্কুলের দিকে রওনা ছিলেন।

পথের ... ইতিমধ্যেই একবার সেরেন্টার সংস্কৃত অধ্যাপক ভায় শুয়ে একবার হেডমাস্টার মশায়ের সঙ্গে একবার দেখা করা দরকার। চন্দ্রবাবুই নিজের তাঁকে বলে রেখেছেন যে, পাণ্ডিত অসুস্থ। তবু পথেই হেডমাস্টারমশায়ের সঙ্গে একবার দেখা করা দরকার।

স্কুল বসতে তখনও মিনিট দশেক বাকি আছে। হেডমাস্টারমশাই জগদানন্দবাবুর সঙ্গে একখানা বাংলা সংবাদপত্র পড়ছিলেন। পায়েই জগদানন্দবাবু পাণ্ডিত ঘরে ঢুকে হাত তুলে নমস্কার করতে বলেন, কি হয়েছিল মাস্টারমশাই? ইনফ্লুয়েঞ্জা?

পাণ্ডিত হাঁ-না কিছু বলেন না। শিরে কলেন, তাঁদের মুখে চোখে উঠলাম।

—নতুন টেন্সা পড়ছে তো, সাবধানে থাকবেন।

সাবধান পাণ্ডিত যথেষ্টই আছেন, তাই কথা না বাড়িয়ে চলে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ জগদানন্দবাবু বলে ওঠেন, আচ্ছা পাণ্ডিতমশাই, বাহুলাদের মতো কি 'অ্যাপশ' সংস্কৃত শব্দটি আছে? আমি তো জানতাম যদই বলে সব ভাষাই।

হঠাৎ এ প্রসঙ্গ কেন উঠল বুঝে উঠতে পারলেন না পাণ্ডিত। তাঁর সেই প্রথম কৃষ্ণির পত্রোত্তরে বোন কবি জগদানন্দবাবু হাতের ধরনের ভাগলপুরী ওঁর দিকে বাড়িয়ে ধরে বলেন, পড়ে দেখুন।

চিঠিটা অবশ্য পড়তে গিয়ে পাণ্ডিতের হাত-পা অবশ হয়ে এল।

বর্ধমানের নিজস্ব সংবাদদাতা জানা-চ্ছেন, সম্প্রতি বেবীপুর অঞ্চলে একটি কৌতূহলের ঘটনা ঘটেছে। চন্দ্রকীর্তি গ্রামে একজন সতর বছরের বিধবা-পালনা-বধূকে স্থানীয় একটি প্রতীকলনীকে বিয়ে করতে ছেড়েছিলেন। বিয়ে-পাগলা-বুড়োটি এখনও এবং পঞ্চের জন্যাপদের লোভ দেখিয়ে কনের পিতাকে এই অন্যায় কাজে সম্মত করেন। সংবাদদাতা আরও জানিয়েছেন, বুড়োর সন্তানাদি আছে, এবং তার শেষ পক্ষটির মৃত্যু হয়েছে মাত্র পক্ষকাল পূর্বে। গ্রামের কুলকাঠি এই গোপন সংবাদ সংগ্রহ করে কন্যাটিকে উদ্ধার করে। বিয়ে-পাগলা বুড়োর লালসার আর অবধি থাকে না পেরে নিয়ে সে কোন কাজে পালিয়ে যাচ্ছে।

নাতবরনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘামতে থাকেন সেই অবস্থাতেই সকলে। জগদানন্দ-বাবু কি সব কথা বলতে পেরেছেন কিন্তু কীভাবে তা সম্ভব? চন্দ্রকোলবাবু কিছুতেই এটা পরোক্ষ হতে দেবেন না তিনি পত্রিকাসম্পাদিকেও। তাহলে?

খবরটা পড়তে যতক্ষণ লাগা উচিত তার পরেও পাণ্ডিত মুখ তুলে না তাকিয়ে হেডমাস্টারমশাই বলেন, আমার ধারণা ছিল ব্রাহ্মণদের, মধ্যে কন্যাপণই প্রচলিত নেই বরং বরপণই দিতে হয়। তাই নয়?

পাণ্ডিত কোনক্রমে বলে, আজ্ঞে হাঁ।

—তাহলে এখানে কন্যাপণের কথা লিখেছে কেন?

পাণ্ডিত নিরুত্তর।

জগদানন্দবাবু বলেন, এই বিশে শতাব্দীতেও যে এমন কাণ্ড ঘটতে পারে এটা আমার বিশ্বাস হয় না। খুকুকে ট্রাস্টিশিপ দিতে দেওয়া উচিত হয় নি ওদের। সে হয়তো এতক্ষণে অন্য কোথায় বিয়ে করতে বসেছে!

অক্ষয়বাবু বলেন, একটা কথার কিন্তু উত্তর নেই। মেয়েটির কি হল। উনাহই

[illegible] মধ্যে কেউ যদি অন্যের হয়ে এ [illegible] মেয়েটিকে বিয়ে করত তাহলেই নাটকটাকে সর্বাঙ্গসুন্দর বলা চলত।

ও ও করে ভদ্রা পড়ে আওয়াজ পাল্টাবার একটা সুযোগ পেলেন। ঈশ্বরে রক্ষা করেছেন। সাধারণী তাঁরা জানেন না। সাধারণীরা তাঁর কাছেই ছেলে ধরাটা, ঐ রাতে বলে কাকতালীয়-ঘটনা, তাই।

বেয়ারাটার চক আর তাশ্চার নিয়ে পণ্ডিতমশাই একাদশ শ্রেণীর দিকে রওনা দিলেন।

'বস বস ছোকরা, আসন গ্রহণ করো।

বলতে বলতে তিনি গিয়ে বসলেন নিজ আসনে। ব্রেজিস্টার খাতা খুলে নাম ডাকতে যাবেন, তার আগেই একটি ছেলে বলে ওঠে—আপনার অসুখ করেছিল স্যার?

—হ্যাঁ বাবা।

—কি অসুখ স্যার?

—ওসব কথা থাক সুশীল। কুশলা- দিন পরশুর ক্লাসের পরে হবে।

এরপর তিনি রোল-কলে মনোনিবেশ করেন। কিন্তু মাঝে মাঝেই মনে হচ্ছে ছেলেদের মধ্যে একটা চাপা হাসির ফোয়ারা বয়ে যাচ্ছে। অবশ্যই উনি খাতায় দৃষ্টি নামিয়ে আনছেন, ততবারই ওরা চঞ্চল হয়ে উঠছে—এক মুখ তুললেই ভাল ছেলের মত চুপচাপ বসে থাকছে।

রোল-কল শেষ হল। পণ্ডিত বললেন, এস, একের আমরা পদার্থবিদ্যা করি। আমরা আজকের এবং কালের উপনয়ন হয়েছে তাঁরা 'ও' বলবে, অপরাপর সকলে 'নমঃ' বলবে, নাও বল—

হাত দুটি জোড় করে পণ্ডিত উঠে দাঁড়ালেন, নির্দিষ্টের নেতে বললেন,

'ওঁ সহ নাববতু, সহ নৌ ভুনক্তু, সহ বীর্যং করবাবহৈ—অর্থাৎ, ঈশ্বর আমাদের গুরুশিষ্য উভয়কে সমভাবে রক্ষা করুন, উভয়কে তুল্যভাবে বিদ্যাফল দান করুন— আমরা যেন উভয়ে সমানভাবে সাধনা আরম্ভ করিতে সক্ষম হই। বল, 'তৈত্তিরিয় শ্রুতীতত্ত্ব, মা বিদ্বিষাবহৈ।' অর্থ বুঝলে? সো অমরীতত্ত্ব, ভদ্র দিয়ে , মাহরীতত্ত্ব। অর্থাৎ কিনা, আমাদের উভয়ের অধীত বিদ্যা , তেজস্বী হউক, এবং যেন পরস্পরকে বিদ্বেষ না করি, আমরা যেন অন্যান্যকে ভালবাসিতে পারি। বল, 'ওঁ শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ।'

কোথাও কিছু নেই অকস্মাৎ ছেলে হো হো করে অট্টহাসে ফেটে পড়ে।

পণ্ডিত স্তম্ভিত হয়ে যান। এ ছাত্রে কি? মর্মান্তিক কোথে গর্জন করে ওঠেন? হাসা কিসের? কে হাসছে?

পিছনের বেঞ্চি থেকে মুখ লুকিয়ে একটি ছেলে বলে ওঠে—শান্তি আর নাম পণ্ডিত মশাই!

শান্তি কার নাম? এ পরিহাসের অর্থ? পণ্ডিত মশাই মনে করতে পারেন না। গত বছর শান্তি পড়াশ ঘোষ বলে একজন বি, টি, টিচার ক্লাস এই স্কুলে পড়িয়েছিলেন, এ ছাড়া শান্তি নামে আর কোন ছাত্রছাত্রীকে তো মনে পড়ছে না।

পণ্ডিতের মুখকে হাসিটা মেঘেছে। কিন্তু চক ডাস্টার হাতে নিয়ে সেই তিনি ব্লেকবোর্ডের দিকে ফিরে দাঁড়িয়েছেন আবার উচ্চহাসির শব্দে ছেলেরা আবার সেই মেতে পড়ল। ব্লেকবোর্ডের দিকে তাকিয়ে পণ্ডিত বুঝতে পারেন, ওদের এই পৈশাচিক হাসির উৎস কোথায়।

কালো ব্লেকবোর্ডের সমস্তটা জুড়ে একটি সাদা চিত্র আঁকা। তালগাছের মত দীর্ঘ লম্বা একটি ধড় এবং ভয়ঙ্কর একটি মুণ্ড। মুণ্ডের মাথায় ঝুঁটি, কিন্তু চৌখরটা ধরের হাতে ধরা আছে—না হলে চিত্রকরের অসুবিধা হত কথন ঝুলে থাকা চুলের উপর খাড়া হয়ে থাকা অর্ধচন্দ্রাকৃতি আকৃতে। ধরের পায়ে বিদ্যাসাগরী চটি, ধড়ির হাঁটু পর্যন্ত। দোষারোপের বস্তুতত্ত্বা বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না, তবু চিত্রকর ধরের নিচে লিখেছে 'শান্তিত পণ্ডিত' এবং তলের নিচে লিখেছে 'ও শান্তিঃ।'

পণ্ডিতের মুখটা ছেলেরা দেখতে পাচ্ছে না। তিনি আর ক্লাসের দিকে মুখ ফেরান নি। তাঁর শিরের উপর তাঁক্ষ্য তাঁর হাসির লহরাঘাত হয়ে চলেছে। তবু তিনি মুখ ফেরাচ্ছেন না, আপত্তি জানাচ্ছেন না। ছেলেরা সাহস পেয়ে চিৎকার চেঁচামেচি করে ওঠে : আপনার ঠিক কোথায় ব্যথা স্যার?

পাশের ঘরে ক্লাস নিচ্ছিলেন চন্দ্রকান্তবাবু। বিরক্ত হয়ে তিনি উঠে এলেন এ ঘরে : কি হয়েছে? অত হাসির কোন কারণ আছে? ক্লাসে টীচার নেই?

বলেই তাঁর দৃষ্টি পড়ে কালো ব্লেকবোর্ডের উপরে। নিজেও হেসে ফেলেন তিনি। তারপর বন্ধু অতি হাস্য সম্বরণ করে ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখতে পেলেন পণ্ডিতকে। দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি। এবারে এদিকে ফিরলেন। চন্দ্রকান্তবাবু লক্ষ্য করলেন। পণ্ডিতের দু চোখে মেঘের ঘনায়মান ঘোর।

চন্দ্রকান্তবাবু পালিয়ে এসেছিলেন, তিনি জানতে পারেন নি—কিন্তু চন্দ্রকান্তবাবু এসেছিলেন, চেতনাকে ধীরবাতাসের নির্বাতভাবে ধৈর্যের নির্বাতন সহ্য করেছেন পণ্ডিত মাথা নত করে, চৌখ দিয়ে এক ফোঁটা জল করে নি। সেই খানসামা তখন ধরে ফেলে ফেলেছেন। পড়েছে ধরেছে। কয়েক এ ঘরানার ভাঁর এতদিনের ধৈর্যবাঁধই যে চুর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল। এইবারই তা তিনি বলেছেন : বিদ্বিষাবহৈ!

পাঞ্জাবির হাতায় চোখ মুছে নিয়ে পণ্ডিত মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ব্লেকবোর্ডের দিকে তাকালেন। চন্দ্রকান্তবাবু আগেই পণ্ডিতের হাসা সম্বরণ করতে পারেন না। পণ্ডিতের চৌখ দুটি জ্বলে উঠল, কিন্তু ব্লেকবোর্ডে চোখানো যেন ঐঁকা বাঁকা হয়নি, এবারও তেমনি কোন কথা বলতে পারলেন না। মনোযোগ দিলেন।

ঘোরাটোপ, আড়াআড়ি তুলে নিয়ে নিখিলেশ শেষ না হতেই পণ্ডিত ক্লাস ছেড়ে চলে গেলেন। কিন্তু চৌকাঠের বাইরে পা দিয়েই আবার ফিরে এলেন। ঐদিকে গেলেন ব্লেকবোর্ডের দিকে। না, তাশ্চার নিয়ে যাবার মধ্যে দিতে তিনি যান নি। শুধু 'শান্তিঃ' শব্দটার 'শ'-টাকে মেঝে লিখে দিলেন 'ব'। তারপর মাথা নিচু করেই বেরিয়ে গেলেন ঘর ছেড়ে।

অফিস ঘরের সামনেই মধুসূদনবাবু দেখা হয়ে গেল ছেড় মাস্টার মশাইয়ের সঙ্গে। ধরকে দাঁড়িয়ে পড়লেন ভ্রমণবাবু। মর্মান্তিক একটা দৃষ্টি নায়কত্বের দিকে নিক্ষেপ করে বললেন : আপনিই দিন।

সোজা গিয়ে উঠলেন চন্দ্রকান্তবাবুর বাড়ি। খুকুকে নিয়ে কালিঘাটের সেই বস্তীর ধরখানাতে ফিরে এলেন। চন্দ্রকান্তবাবুই ছিলেন এই কলকাতা শহরে তাঁর একমাত্র বন্ধু। মর্মান্তিক অপমানের মধ্যে দিয়ে আজ তাঁকেও হারালেন। এ শহরের সঙ্গে আর কোন আন্তরিক বন্ধন রইল না। এদিক থেকে বস্তীর মাতাল বরং ভাল। সে যা পদ্ধতি-পদ্ধতি দিয়েছিল তা মনের ক্রোধে। অজ্ঞানে নয়। দিনের বস্তীর আর রাতের বস্তীর দৃষ্টি পৃথক সত্তা। কালিতারা কৌবনে সে ছুটে আসত শুধুমাত্র ধনের আকর্ষণে নয়, ঐশ্বর্য বিকর্ষণে। আর তাই সে কালিতারা কৌবনে ঠোকর খেয়ে শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছায় বুকুর খেলা ঘরে। পণ্ডিতের হেঁসেলে রাঁধুনী ছিল তারা। ঘুরোপ বস্তের ঘরণা ঘরের ছেলেমেয়ের একদিন মধুমাসের আড়ালে আত্মহত্যার অধিকার ঘরে আনিতালে যোগ দিত—আপামর জনসাধারণের আনন্দ বেদনার ভাগীদার হতে চাইত, বস্তীরও তেঁতুলি মনের আড়ালে নিজেকে ডুবিয়ে দেবার জন্যই এ পাড়ায় আসত।

কিন্তু চন্দ্রকান্তবাবু তো সে ঘরের মানুষ নন। তিনি পণ্ডিতকে যে পদ্ধতি-পদ্ধতি দিয়েছিলেন তা মনের ক্রোধে দেয়;—তিনি জানতেন এ কথা পুকাশ পাওয়ায় তাঁর বন্ধুর স্ত্রী মর্মান্তিক পরিণতি হবে। শুধুমাত্র একটি কৌতুকের ছোয়ায়, একটু মজার ছলে হাসিয়ে হাসিয়ে বলতে পারার ছোয়ে তিনি মুখরতার উচ্চ মাধ্যমী পাঠের মধ্যে ঢেলে দিয়েছিলেন। আবার ধার গড়ার সময়টা পরিপূর্ণ হল একটা পরোও নিয়েছিলেন। পলাশপুর পণ্ডিত প্রতিষ্ঠিত হলেন সত্যই পাবক-পণ্ডিতরূপে।

ঘরে ঘুকুকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে মৃদু বললেন, মা-মণি, তোর বাবামশাই ঠিকই বলত রে। এই কলকাতা শহরটা সর্বাঙ্গরূপে বিষাক্ত মা। এখানে থাকলে আমাদের স্নেহেও যে বিষক্রিয়া সংক্রামিত হবে। চল মা, আমরা এখান থেকে চলে যাই—

বড় বড় দুটি চোখ মেলে খুকু বলে। কোথায় যাব বাবা? মায়ের কাছে?

মায়ের কাছে? এ কথাটা তো এতক্ষণ মনে হয় নি। তাহলে সব ঝামেলা চুকিয়ে দিয়ে যেতে পারেন। তাহলে যে স্বীকার করে নিতে হয় এই ধরণীর ধূলিমাটির মালিকও একজন পাকড়। স্বীকার করে নিতে হয় তাঁর এই সৃষ্টি ব্যর্থ। তাই কি কখনও হয়? এই কলকাতা সহরটাকে দিয়েই তিনি কেন বিচার করছেন এমন সর্বশক্তিমান বিশ্বনিয়ন্তার এই ঘৃণ্যতম সৃষ্টি? কলোহাহা: নিরবধি বিপুলা ও পৃথিবী:। কাল অনন্ত, পৃথিবীও বিপুলা। এই দেশে, এই স্কুলে তিনি উপহাসাস্পদ হয়েছেন—তাঁর স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে গেছে, কিন্তু এই কখনও শেষ কথা হতে পারে না। এখানে না হয় নাই হল—পৃথিবীর প্রান্তে নিশ্চয়ই কোথাও আছে। সেখানকার মানুষ এমন ভুল বিচার করবে না। তাঁর মূল সমস্যাটা সহানুভূতির, সাথে বাচাই করবে, তাঁকে পথের সন্ধান দেবে। হাত ধরে তাঁকে সাহায্য করতে যদি এগিয়ে আসতে নাও পারে তবু উপহাস করবে না। এত সহজেই কেন পরাজয় মেনে নেবেন পণ্ডিত? তিনি তো যুদ্ধবাজী নন—তিনি যে প্রেমের পাঁচনারী। তিনি ভাকে ভয় করবেন? দৈহিক পীড়নকে? অসম্মানকে? অপমানকে? না। আনন্দ: যজ্ঞেশো বিপদান ন বিভেতি কদাচন না বিভেতি কুতশ্চন। তিনি যে সেই প্রেমের স্বরূপকে জীবনসাধনে স্বীকার করে নিয়েছেন। তার শুরে তিনি আত্মবিশ্বাসের পথে যাবেন?

—বল না বাবা, মায়ের কাছে?

—না মা-মণি, আমরা স্বগ্রামে ফিরে যাব।

—সেটা কি বাবা?

—আমাদের দেশে। এই যে মা গঙ্গা আছেন না, ঐ মা গঙ্গা বঙ্কিমাতিমধুর পরিবাহিত হয়ে অন্তিমে সমুদ্রে মিশে গিয়েছেন। সেদিকেই যাব আমরা। আমাদের গ্রামের নাম সোনাখ গাঁ। সত্যিই সেটা সোনার চেয়ে দামী মা-মণি। এই রকম পুতিগন্ধময় সহর নয়। সেখানে দিগন্ত অনুসারী উদার প্রান্তর, অনাবর্ণ আলো ফেরে, সেখানে কত রকম পাখী, কত ফুল, ফুলে কত মধু। সেখানকার মানুষও উদার, সহজের—

সব কথা খুকু বুঝতে পারে না, আর বয়সের সব কথা কবেই বা বুঝেছে খুকু? তবু ওটুকু বুঝতে পারে সেটা এই বস্তীর চেয়ে অ-মে-ক ভাল একটা জায়গা। সাগ্রহে বলে, কবে যাব বাবা?

—ভাল পড়তেই যাব রে। এ ঘর তালাবন্ধ করে রেখে যাব। ভবিষ্যতে কোন একদিন এসে যাবতীয় বিলি-ব্যবস্থা করে যাব।

হাঁ, কাল মঙ্গলেই এই বিল্ডি পটা শহরটা ত্যাগ করে চলেছেন। এখানে আর নয়, আর একদিনও নয়। চন্দ্রবাবু অথবা অন্যান্য-বাবুরা খোঁজ খবর নিতে আসার আগেই যাবেন। সোনার গাঁয়ে পৌঁছে এবাবকার স্কুলে একটি পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিতে হবে। এ মাসের মাইনেটা পেলেই আছে। ধরচার যা কর্জ পাঠিয়ে দেবেন। আর সুযোগ সুবিধা হলে এ মাসের মধ্যেই আর একদিন এসে সব বিলি-ব্যবস্থা করে যাবেন। যাবার আগে তো আছে খানকয় পুরীর আর গন্ধে। তা তো নিচ্ছেই যাবেন; আর আছে কিছু চৈতন্য—তাও নিয়ে যেতে হবে। চৌকিটা দিয়ে যাবেন কাতুবুড়িকে। আহা বেচারি, ঐ বয়সে পঙ্গু দেহটা নিয়ে মাটিতেই শোয়।

খুকু বলে, সেই বেশ ভাল হবে বাবা। এ চাকরটাও পচা!

—হাঁ, আমাকেও এখানে ভাল লাগে না। এই বেশ ভাল হল। কলা পাতেই আমরা স্বগ্রামে ফিরে যাব। এখন লক্ষ্মী মেয়ের মত ঘুমিয়ে পড়।

বাবার বুকে মুখ গুঁজে খুকু চুপ করে শোয়।

পণ্ডিতের মাথায় তখন নানান চিন্তা।

অনেকক্ষণ পরে আবার মুখ তুলে খুকু বলে, নতুন মা কেন এলেন না বাবা?

কী জবাব দেবেন ভেবে পান না। তার পর মৃদু হেসে বললেন,—নতুন মা আমাকে পছন্দ করলেন না মা-মণি?

—কেন বাবা? তুমি খুকুকে বলে?

—হাঁ মা-মণি। আমি খুব। তাই জান।

—বুড়ো হওয়া বুঝি দোষের?

—না মা। প্রবা-বার্ধক্য মানুষের প্রাকৃতিক পরিণাম। অপরাধ নয়।

—তাহলে তোমাকে ওরা অমন করে মারল কেন?

চমকে ওঠেন বৃদ্ধ : মারল? কে মারল? কাকে মারল!

খুকু হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলে। বাবার পাঞ্জাবী-সর্বস্ব বুকে মুখ গুঁজে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলে, আমি জানি। সব জানি।

পণ্ডিত কেমন যেন অসাড় হয়ে গেলেন। অনেকক্ষণ পরে খুকুর কান্নার বেগ একটু কমে এলে বললেন, কে বলেছে তোমাকে?

—নেড়া দা।

নেড়া চক্রবাবুর ছেলে। কেমন যেন ঝুঁকড়ে গেলেন পণ্ডিত। এবার কি তাঁকে মা-মণির কাছে উপহাসাস্পদ হতে হবে? ভয়ে ভয়ে বলেন, নেড়া কি বলেছে? আমাকে কেউ মেরেছে?

অশ্রুসিক্ত মুখটা নেড়ে খুকু বলে —হুঁ।

—কে মেরেছে?

—নতুন মাস্টার আছুয়া বাবা 'ঘোলাই' কাকে বলে?

পণ্ডিত বলতে যাচ্ছিলেন 'কাপড়-কাচা'-কে, কিন্তু পরক্ষণেই বুঝতে পারেন, সে অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হতে শোনে নি খুকু।

তাকে নিরুত্তর দেখে খুকু এক সময়ে চলে যায়, বলে—বুড়ো হওয়া যদি দোষের নয়, তবে ওরা তোমার দাঁত কেন ভেঙে দিল? তোমার ঠিক কেন নিল?

উদ্যত অশ্রুকে দমন করে পণ্ডিত চুপ করে পড়ে থাকেন। কী জবাব দেবেন ঐ অবোধ মাতৃহারাকে। কেমন করে তাকে বোঝাবেন, কোন অপরাধে তাঁকে এভাবে বিদ্রূপীত হতে হয়েছে! কেমন করে স্বীকার করবেন সে লজ্জার কথা!

খুকু কুণ্ঠিত স্বরে বললে, তুমি বুঝি দুষ্টুমি করেছিলে বাবা?

হঠাৎ হা-হা করে কেঁদে ফেলেন বৃদ্ধ। সবলে খুকুকে বুকে চাপিয়ে ধরে বলেন, না-রে মা। জানতঃ বস্তুতঃ কোন দুষ্টুমি আমি করি নাই। আর তুই অনেক বড় হয়ে বুঝবি মা মা-মণি, বড় হয়ে যখন এ সব কথা মনে পড়বে, তখন এটুকু বিশ্বাস করিস, তোর পিতা জানতঃ কোন অন্যায় করে নাই, পাপাচার করে নাই। তবে হাঁ, তোর কাছে স্বীকার করছি, মা রে, ভুল আমি করেছিলাম, হাঁ। ভুল।—মর্মান্তিক ভ্রান্তি হয়েছিল আমার।

খুকু, বোধকরি ঐ 'মা রে' সম্বোধনটার সত্যই মা হয়ে যায়। বাবার পাঁজর সর্বস্ব আলিঙ্গন থেকে ধীরে ধীরে নিজেকে মুক্ত করে নেয়। তার ছোট্ট করকের একটি পদ্মকুঁড়ি দিয়ে মুখ বাবার কোটরগত চোখ দুটি মুছিয়ে দিয়ে বলে, বুঝেছি। আর তাহলে কখনও ভুলও কর না বাবা, কেমন?

খুব নৈর্ব্যক্তিক ঐ ছোট্ট মানবশিশুর কাছে পণ্ডিতমূর্খবন্ধু হলেন, মুখেকণ্ঠে বললেন, ঠিক বলেছিস মা। না রে, আর ও ভুল করব না কখনও।

সান্ধ্য আকাশ তারা। জানালা দিয়ে উঁকি মারছে ঐ উজ্জ্বল একটা তারা।

৯ এরপর দীর্ঘ পাঁচ বছর কেটে গেছে। কালিঝাটি বস্তীর সেই একচালা ঘরে এখন জন্মা ভাড়াটিয়ার বাস। কালীতলা-কেবিনের চা-খেলা আধো-অন্ধকারে ইটের উপর বসে মাটির ভাঁড়ে গরম-গরম চা-আস্বাদন করতে হতীন বাবুরা আজও আসে কিনা জানা নেই। গোপাল-নেপাল এখনও আছে তাদের ঘর দু-খানায়—তবে কাতুবুড়ি অনেক দিন হল গঙ্গাযাত্রা করেছে। গোপাল-নেপালদের ঘরে খুঁজলে পাকড়-পণ্ডিতের সেই চৌকিখানা আজও দেখতে পাওয়া যাবে—সেটার এখন নেপাল সস্ত্রীক শোয়। মুক্তাকাশ কাত্যায়নীর, শীতকের শেষ কটা দিনও তাকে বাড়িতে শুতে হয়েছে। চৌকিখানা ওদের অনাদরে এসে পড়ার পরেও বুড়ি কাত্যায়নী চৌকিতে শোয়ে, আর তার রোজগারের সোনার চাঁদ ছেলেরা মাটিতে পড়ে থাকবে এত বড় অসৌরব সহ্য হয় নি বলে। চলে। চৌকিটা ওদের সংসারে কেমন করে এসেছিল সে কথা আজ আর কারও মনে নেই। ও পাড়ার পাকড় পণ্ডিতের নামও কেউ উচ্চারণ করে না। বালিঝাটির সেই ঘোলার বস্তীটুকু আজ পাকড় পণ্ডিতের চিহ্ন নিঃশেষে মুছে গেছে।

স্কুলে গেছে তেতলা স্কুলের ছাদরাও। তা তো যাবেই। এখন বাবা উঁচু ক্লাসে

উঠেছে তারা নেহাৎ নাবালক ছিল তখন। তখন যারা পড়ত তারা কেউ কলেজে পড়ছে, কেউ চাকরি-বাকরি করে। তবে যখনও সময়ও ঠিকমত হলে পণ্ডিতের নামটা উঠে পড়ে। মৌলভী সাহেব প্রশ্নের নিয়েছেন; তা নিন—অক্ষয়বাবু, চন্দ্রকান্তবাবু, ভূষিং মাস্টার মশাই এবং প্রমদানন্দবাবু, এখনও আছেন। অক্ষয়বাবু হুবহু বলে বলেন : যাই বলুন, ছোলেরা কিন্তু ভট্টাচার্য হলদের নামটা মনের নিয়েছিল। লোকটা ছিল সত্যই একটা পাষণ্ড!

প্রমদানন্দবাবু বলেন, চন্দ্রকান্ত-বাবুকেও সম্পূর্ণ নির্দোষ বলা যায় না। তিনিই তো বুড়োকে লোভ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন।

চন্দ্রবাবু বলেন, কী করব মশায়? পণ্ডিত বেচারার আমার হাতে পায়ে ধরে পড়েছিল, অস্বীকার করতে পারি নি।

যেন চন্দ্রবাবুর নয়, দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে পণ্ডিতের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে এ সভার বার বার উঠেছে। অত্যুৎসাহ সমর্থন করতে কোন সুদূর অতীতে ঐ মিথ্যা কৈফিয়ৎ-টুকুকে আঁকড়ে করেছিলেন তা আজ তাঁর মনেই নেই। হয়তো পুরুষবাবু এমন চন্দ্রকান্ত মিথ্যা কথাটা বলতে সঙ্কোচ বোধ করেছিল—তার পর বার বার একই মিথ্যা কৈফিয়ৎ দাখিল করতে করতে সেই সঙ্কোচের বাষ্পটা মোলায়েম হয়ে এসেছে। এখন উনি নিজেই বিশ্বাস করেন এই কৈফিয়তে। তাঁর বক্তব্যের মধ্যে যে মিথ্যাটা আছে একথাটা মিলিয়ে-ছিলেন সেটা বেমালুম নিজেই ভুলে গেছেন: এমনিই হয়, বিবেককে তো আমরা এভাবেই তালিম দিই; অত্যুৎসাহ সমর্থনে সওয়াল যখন করি তখন সজ্ঞানে মিথ্যা বলি না, নিজের পড়া মিথ্যাকে নিজেই বিশ্বাস করি।

প্রমদানন্দবাবু বলেন, যাক পণ্ডিতও ওকালোক বড় কম পান নি। মাস্টারও তো অবশ্যই হয়েছিল—চাকরিটাও গেল। কেউ তাঁর খবর রাখেন? সুমাত্রিলার প্রসন্নগাছের ওদিকে তোষায় যেন তাঁর দেশ। বেঁচে আছেন ভদ্রলোক?

অক্ষয়বাবু বলেন, না ইদানিং আর কোন খবর পাই নি। মৌলভী সাহেবকে লেখা তাঁর সেই চিঠিখানার কথা তো মনে নেই।

—হ্যাঁ, সে তো পাঁচ বছর আগেকার কথা।

—তারপর আর কোন খবর নেই।

চন্দ্রবাবু বলেন, যাই বলুন, লোকটা খাঁটি ছিল; ছিল না। আমরা না হয় তুচ্ছ মানুষ; অন্তত হেডমাস্টার মশাইকেও চিঠি খালা লিখতে পারত সে। মৌলভী সাহেব হয়তো ছোক বিধর্মী।

অক্ষয়বাবু বলেন, শুধু আমাদের অপমান করেই পুরুষোত্তমবাবু মৌলভী সাহেবকে চিঠি লিখেছিলেন।

কিন্তু না। ঈশ্বর জানেন, পাষণ্ড পণ্ডিত ছাড়াও অপমানিত করার মনো মৌলভী সাহেবকে পত্র লেখেন নি। তারও পূর্বে তিনি অন্যত্র দিয়ে, বিদেশে গিয়ে তিনি স্কুলে জ্বান করে যান নি। এই স্কুলে বাড়িতে দীর্ঘ সাতের বছর ধরে বহু ছাত্রের পাঠ্যপুস্তক উচ্চারণ করেছিলেন পণ্ডিত; কিন্তু তাঁর শেষ মন্ত্র ছিল ? তা বিস্মৃতিতে!

সে মন্ত্র তিনি অন্তর থেকে পড়েন করেছিলেন,—তাতেও পূর্বে কোন বিদ্বেষ তিনি প্রাণে নি মনের কোনে। ঐ বিধর্মী সহকর্মীর কাছে কেন তিনি চিঠি লিখে-ছিলেন তাই যদি এঁরা বুঝতে পারবেন, তাহলে আর পণ্ডিতকে সব ছেড়ে চলে যেতে হবে কেন?

দীর্ঘ পাঁচ বছর আগে একজন পত্র-বাহকের হাতে পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য একটি পত্র পাঠিয়েছিলেন চেতলা স্কুলের মৌলভী সাহেবকে। খামের ভিতর একটি চাবিও ছিল। পুরুষোত্তমবাবু লিখেছিলেন :

'মহিমার্ণবেষু,

মৌলভী সাহেব, কলুটোলার বাসাটি করেকটি ছাত্রের পাঠ্যত; আপনার উপর অর্পণ করিতেছি। কলিকাতার লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিতর কেন আপনাকেই এ কার্যের জন্য নির্বাচিত করিলাম, এ প্রশ্ন আপনার অন্তরে জাগিতে পারে। আপনাদের ঐ সহরে মৌলবীবিদ্যালয়ী ধর্ম-পরায়ণ খুব বেশী মনুষ্যের সংস্পর্শে আসিবার সৌভাগ্য আমার ঘটে নাই। আমি লক্ষ করিয়াছি আপনার অন্তঃস্তরণ আমাদের পুরুষদের মতই শুদ্ধ। সেজন্যই এই পত্রের সহিত একটি গৃহচাবি পত্র পাঠাইতেছি। এটি স্কুল-কর্তৃপক্ষের হস্তে সমর্পণ করিবেন। আমার সামান্য কিছু বেতন হইতে পাওনা আছে, সেটি দুঃস্থ ছাত্র-দের জন্য আমরা যে সাহায্য ভাণ্ডার খুলিয়াছিলাম সেই খাতে জমা দিবার ব্যবস্থা করিবেন। নিতান্তই যে কুণ্ঠিকা পাঠাইলাম তাহা মদীয় বালিঘাট-বাটির, দ্বার উদ্ঘাটন করিলে আমার গৃহে একটি চৌকি এবং একটি কম্বল দেখিতে পাইবেন। আমার পরিত্যক্ত পরিবেশী শ্রীমান গোপাল ও নেপালের জননী শ্রীযুক্তা ভাত্যায়নী দেবীকে ঐ সুটি আমার দান করিয়া দিবেন। গৃহে দু-একটি কলাইয়ের থালা, গ্লাস, কৌটা ইত্যাদি থাকিতে পারে। তাহা ঐ বস্তীর দীন-দুঃখীকে বিলাইয়া দিবেন। দ্বারের পার্শ্বে বালগোপালের একটি দেয়াল-ঝোলানো চিত্র দেখিতে পাইবেন। সেটি নেপাল অথবা গোপালকে খুলিয়া লইতে বলিবেন। তাহাও ভাত্যায়নী দেবীকে দিবেন। আপনি নিজে কিছুটি স্পর্শ করিবেন না। অতীতের ঐ গৃহের অধি-কার বস্তুর মালিক শ্রীবৈকুণ্ঠ ঘোষ্টুইকে বুঝাইয়া দিবেন। ওরা সম্পূর্ণ দেওয়া আছে। ওরের ভালোই মক্কেল। আমার স্বর্গগত পত্নী সেটি সব করিয়া ওরে দিয়াছিলেন। আপনি ঐটি গ্রহণ করিলে এবং আমাকে করিলে সুখী হইব। খোদাতালা আপনার মঙ্গল করুন। নমস্কারান্তে ইতি—

শুভার্থী

শ্রীপুরুষোত্তম দেবশর্মা।

মৌলভী সাহেব কখনও পত্রখানি আদ্যোপান্ত রোধ করে কখনও পাঠন করেছিলেন।

পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য সোজার গাঁয়েরই আছেন। আরও বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন বাহ্যিক ধরনের বদল হলে তাঁর। তা হক, এখন তিনি সুখী। হিন্দু মেয়েরা ছিলে ছিল এক সমস্যা। সম্মুখের উত্তরসূরী মনস্তাপী তো আবার ছিল আঠারো। সেটা ভেঙে পড়েছিল পণ্ডিত ফিরে আসার পূর্বেই। পুরুষোত্তমী ঘরখানা তো তার অনেকই গেছে। অবশিষ্ট ছিল একমাত্র বাঁচবার চালাঘরটা। গ্রাম-বাসীদের সহযোগিতায় সেটাই আবার খাড়া করে তুলেছেন। চালটায় আর কিছু ছিল না; আবার নতুন করে ছাউনি করতে হল। বেড়াগুলগুলি অবশ্য রক্ষাই ছিল। প্রসন্নগাছ বৃ-একটি গাছগাও তৈরি করতে হল গ্রামা ভদ্রলোকের সাহায্যে। আগাছা-র জঙ্গল সব সাফ করালেন। বেল আর নিমগাছ দুটো কাটেন নি। বেল বড় হয়ে উঠেছে ইতিমধ্যে। বেড়ার ধার দিয়ে তুলা দেখেন আর নারি-কেলের গাছ লাগিয়েছেন। নারিকেল এ অঞ্চলে ভালই হয়। এ অবধিই গাছের ফল ধরেছে গাছে। কিন্তে সালেপ্রাহিও বড় কম নয়। কিন্তু বেড়েকা এক হাতে ঘুরাণ চালিয়ে এতখানি জমিকে রক্ষা করা যায় না; অথচ লাঙল চালানোতেও অসুবিধা। ঐ বেড় কিন্তের মধ্যেই আছে মরাই, তুলসী-মঞ্চ, কলাগের গাছ,—ফলে লাঙল ঘোরাতে অসুবিধা হয়। তাই মাঝে মাঝে প্রসন্নগাছে লাগান। মাটি কোপাতে, নিড়েন দিতে,—খরার সময় জল দিতেও। ফসল ভাল হয় না। গত বছরে তো তাঁর তুলকপি স্থানীয় সবজিমণ্ডীতে পুরস্কৃত পর্যন্ত হয়েছে। বি ডি ও অফিস থেকে সার নিয়ে আসেন, বীজ নিয়ে আসেন, পোকামাকড় মারার ঔষধও নিয়ে আসেন। সালেপ্রের জন্য কেউকে পয়সা দেন তা ছেড়ে বাকিটা ঐ মুদিখানা কিনে হাটে পাঠান। গাইকার এসে নিয়ে যায়। চালান যায় কলকাতায়।

এছাড়া পুরুষোত্তমী ঘরের বারান্দা-টাকে একটু বাড়িয়ে নিয়ে একটা পড়াশুনার আয়োজন করেছেন। রোদ-বৃষ্টি না থাকলে পড়াশুনাটা চলে নিমগাছের ছায়ায়। ছাত্র নয় এখন, শুধু ছাত্রী। অবশ্য ছাত্রীসংখ্যা খুব বেশী নয়। বল-বাহুল্যটি ছাড়ো সংখ্যা খুব বেশী না হওয়ায় সুবিধাও আছে। পল্লীমায়ারী-স্কুলে খোলা হয়েছে মোনার পরীক্ষা সরকারী ব্যবস্থাপনায়। কর্তৃপক্ষ মাস্টারমশাকে শিক্ষকতা করতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। পণ্ডিতই স্বীকৃত হন নি। না, পরের চাকরি তিনি আর করবেন না। অধ্যাপনা তাঁর কৌলিক বৃত্তি। পুরুষোত্তম-দেব বৃত্তিকে তিনি ত্যাগ করবেন না;

কিন্তু চাকরি আর নয়। পয়াইমারি স্কুলের গণ্ডি পার হয়ে প্রায় সবাই মেয়েই আর পড়াশুনো করতে পারে না। আগেকার কালে অল্প বয়সে তাদের বিয়ে হয়ে যেত। ছেলেদের পা দিলেই তারা মা সরস্বতীর কাছে বিদায় নিয়ে সংসারের খাতাকলে পড়ে যেত। এখন মেয়েদের বিবাহের বয়স পড়াশুনোয় বেড়ে গেছে। অথচ ঐ পয়াইমারী স্কুল ছাড়া গ্রামের মেয়েদের শিক্ষার আর কোন ব্যবস্থা নেই। নিকটতম হাইস্কুল গ্রাম থেকে সাত মাইল দূরে। ছেলেরা প্রায়ই সাইকেলে চেপে পড়তে যায়। মেয়েদের পক্ষে অতটা দূরে গিয়ে মা-সরস্বতীর আরাধনা করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। তারা পাঁচকড়ির স্কুলে পড়তে আসে।

স্কুল ঠিক ওকে বলা চলে না। এখানে একটি মাত্র শ্রেণী এবং একজন মাত্র শিক্ষক। অথচ ছাত্রীরা বিভিন্ন বয়সের, বিভিন্ন পর্যায়ের। তাই বলে পাঠশালাও একে বলা চলে না—কারণ পাঠশালা আর পয়াইমারি স্কুলের গণ্ডি পার হয়েই এখানে মেয়েরা পড়তে আসে। পনের ষোল বছরের মেয়েরাও আসে। খুকুও এসে বসে। এমন কি মিহিদের একটি বিধবা বউও এসে বসে। পণ্ডিতের অধ্যাপন-পদ্ধতিটাও বিচিত্র। ছাত্রীর অভিভাবককে তিনি সঙ্গেসঙ্গেই স্পষ্ট ভাষায় বলে দেন, কন্যাকে যদি স্কুল-ফাইনাল অথবা ছাত্রীর সেকেণ্ডারি পাস করাবার ইচ্ছা থাকে, ভবিষ্যতে তাকে দিয়ে যদি উপার্জন করানোর বাসনা থাকে তবে আমার এই নবা-চতুষ্পাঠীতে নামেন করবেন না— স্কুলে ভর্তি করুন। আমি নিজ বুদ্ধি-বিবেচনামত এখানে পাঠক্রম রচনা করি। ইংরাজি, অঙ্ক, বাংলা এবং সংস্কৃত শিখাই; এছাড়া আছে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান, শিল্প মঙ্গল, সংস্কৃতি পরিচর্যা। অল্প ইতিহাস, সামান্য ভূগোল এবং দর্শনের মূল সূত্রগুলি। সমাজ বিজ্ঞান এবং ধর্ম-বিজ্ঞানের সামান্য কিছু পরিচয়ও যৌথিক জানাই।

ছাত্রীর অভিভাবক হয়তো শুধোন, তা মাইনেপত্র কি রকম?

—কপর্দক মাত্র নয়। ছাত্রীকে কিন্তু কমপক্ষে সেনসিল কিনে দেবেন। কোন পাঠ্য-পুস্তক ক্রয় করার প্রয়োজন নাই। সে দায়িত্ব আমার। তবে ইচ্ছানুসারে প্রণামী এই নবা-চতুষ্পাঠীতে কিন্তু গুরুদেব গ্রহণ করতে পারেন, ভবিষ্যত ছাত্রীদের জন্য।

ছাত্রীর অভিভাবক হয়তো ভেবে না, আর্থিক-বাণিজ্যিক অর্থেও অসঙ্গতি, তবু ন্যায়রত্নকে কি ভেবে কেন এইকে তাঁর নবাপর্যায়ের চতুষ্পাঠী বলেই মনে করেন। ছাত্রীর অভিভাবকের মনে কিন্তু দ্বন্দ্ব চান না কিন্তু ছাত্রীকে অত সহজে ছেড়েই দেন না তিনি, ছাত্রীকে একটি প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর দিতে হয়। এমন কিছু ভীষণের প্রতিজ্ঞা নয়। মেয়ে পড়া যাক, পথের প্রতিজ্ঞা 'নিজ সন্তান ভিন্ন অন্ততঃ তিনটি নিরক্ষরকে বিনা পারিশ্রমিকে আমার শ্রীবৃদ্ধিসাধন করাইয়া দিব।' কিংবা 'বিবাহে যে কোন অবস্থায় অন্ততঃ একবার ঘোম্ব উচ্চারণ করিয়া আত্মশুদ্ধি করিবার প্রয়াস পাইব' অথবা 'সজ্ঞানে মিথ্যার আশ্রয় লইব না।'

অথবা এ প্রতিজ্ঞা ছাড়া বাকি জীবনে মেয়ে চলবে কিনা তা পাঁচকড়ি দেখতে যাবেন না। সেটা ছাত্রীর বাবার উপর নির্ভর করবে। এই প্রস্তুত ব্যবস্থায় সকলেই অবাক হয়। গ্রামের মাতব্বর গোছের কেউ কেউ এসে পাঁচকড়িকে সুপরামর্শ দিতে ছাড়েন নি ন্যায়রত্নমশাই, এও স্কুলমার চলবে কি করে? আপনি দক্ষিণও কিছু নিন না।

ন্যায়রত্নও বলেন, কী প্রয়োজন, আমার সংসারযাত্রা তো নির্বাহ হয়ে যাচ্ছে।

মাতব্বর বলেন, এ একটা কথা হল? আপনাকে পারিশ্রমিক কিছু নিতে হবে।

এবার পণ্ডিত হাত দুটি জোড় করে বলেন, ও অনুরোধ করবেন না। এতদিন বিদ্যা বিক্রয় করেছি, তাই আমার সাধনা নিষ্ফল হয়ে গেছে। এবার আমাকে একবার শেষ চেষ্টা করতে দিন। বিক্রয় নয় বিদ্যা দান করব এবার। দেখি তাতে কিছু ফলোদয় হয় কিনা।

—কিন্তু, শুধু ছাত্রী কেন? ছাত্রও নিন তাহলে।

—না। পুরুষ মানুষকে বাবহারিক জীবনে উপার্জনক্ষম হতে হবে। সরকার অনুমোদিত পাঠক্রমে অবিদ্যার উপাসনা না করলে অর্থোপার্জন সম্ভবপর নয়। আমার উদ্দেশ্য অর্থ লাভ নয়, অমৃত লাভ—বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে। তাই আমার পাঠচেষ্টা শুধু মাত্র ছাত্রীদের ভিতর সীমিত রাখতে ইচ্ছুক। এমন কি যে সকল ছাত্রী উপার্জনক্ষম হতে চায়, তাদেরও আমি গ্রহণ করি না। আমি শুধুমাত্র সেই সব ছাত্রীকেই আমার নবাচতুষ্পাঠীতে স্থান দিতে চাই, যারা শুধু মা হবে, সংসার করবে, ভবিষ্যত জাতিকে গঠন করবে। বাঙ্গালীর জনসংখ্যার অর্ধেকের উপর স্ত্রীলোক, এবং তার শতকরা নব্বুই তাদের জীবন সংসারের অন্তঃ পাঠটীরে সীমাবদ্ধ। আমাদের জীবন তা শেষ হয়ে গেল। আগামী যুগের বঙ্গ-বালার জীবন নিয়ন্ত্রণ করবে ঐ আগামী দিনের জননীরাই। আমার সাধনা শুধুমাত্র তাদের নিয়ে।

কেউ কেউ হয়তো তা সত্ত্বেও শুধোন হোমে—কিন্তু আপনি একা এই দশ-বারোটি ছাত্রী নিয়ে জাতির ভবিষ্যতে কী অবদান রেখে যাবেন?

—কিছুই নয়। আমি শুধুমাত্র একটি আদর্শকে, একটি সৎ চিন্তাধারাকে বাঁচিয়ে রাখতে চাই।

—তার চেয়ে আপনার পরিকল্পনার কথা সরকারকে বলুন না—এখন তো জাতীর সরকার। একটা আবেদনপত্র করে তুলুন।

পণ্ডিত আবার হাত দুটি জোড় করে বলেন, ইচ্ছা হয় আপনারা সে আবেদন করুন। আবেদনে আমার আস্থা নেই। আমি পুরাতনপন্থী। আপনাদের ঐ ফাস্তা, সোস্যোলজি, ইকনমিকসেও আমি বিশ্বাসী নই। আমাকে নিজ গৃহকোণে শুধুমাত্র এই একটি আদর্শের প্রদীপ শিখা জ্বালিয়ে রাখতে দিন আপনারা।

নব্যপন্থী হয়তো তা সত্ত্বেও প্রতিবাদ করে: কী বলছেন আপনি? অনুশোলন ছাড়া কোন ভাল কাজ হয়? এই ফেমো-কেমোর যুগে—

পাঁচকড়ি আবার হাত দুটি জোড় করে প্রতিবাদ করেন পূর্বেই বলেছি আমি পুরাতনপন্থী। সমাজে আমার আস্থা আছে—কিন্তু সীমিত ক্ষেত্রে, ধর্মনৈতিক ক্ষেত্রে, ধন বণ্টনের ক্ষেত্রে। কিন্তু ঐ সমস্তই জীবনের সকল ক্ষেত্রে আমি সমাজবাদী নয়। জ্ঞানের প্রদেশে আমি গণতান্ত্রিক প্রদেশ-সমূহকে অনুমোদন করি না। জ্ঞান বিতরণের প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপনা কি হবে সে বিষয়ে সহস্র কণ্ঠের চীৎকারের অপেক্ষা একজন বিদ্যাসাগর, একজন স্যার গুরুদাস অথবা একজন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠ-স্বরকে আমি বড় বলে মনে করি।

অন্তরে খুকুমণি বলেছে।

খুকু এখন অনেক বড় হয়ে গেছে। না, খুকু আর সে নয়। বেনী দোলানো বয়-সন্ধি বয়সের মেয়েটিকে গ্রামের সবাই এখন 'সবিতা' নামে ডাকে। সেও পণ্ডিতের ঐ নবা-চতুষ্পাঠীর ছাত্রী। কলকাতা থেকে পালিয়ে এসে ভালই করেছিলেন ন্যায়রত্ন—আর কিছু নয়, গ্রামের খুকু-বাড়ন্ত পল্লবকে খুকু নিঃশেষে নিয়ে বেড়েছে। সোনার গাঁ-বাসী অত অকবুণ নয় যেমন ইয়াসীন নয়। তারা এই মা-হারা মেয়েটিকে বুকে টেনে নিয়েছে। এ বাড়ির বউ তাকে চুলের ফিতে কিনে দেয়, ও বাড়ির বউ তাকে গামছা সেলাই, সে বাড়ির মেয়ে তাকে শাড়ি পরানো শেখায়। পড়াশুনায় মেয়েটি সমস্ত দিন এবাড়ি-ও-বাড়ি, ও-পাড়া ও-পাড়া করে বেড়ায়। বনে কিংবা কচি আম চাখতে চাখতে সে দিব্যি গাছের গায়ে ঠেস দিয়ে কাঠবিড়ালিদের ছোটাছুটি দেখে, বাসের সঙ্গে হাতে হাতে ধামসেন কাজ করে, বাসন মেজে আনে পুকুর থেকে, ছোট খড়ার করে জল ভরে আনে। ঘর-দোর রোজ ঝাট দেয়, মাদুর মাদুর বিছানার চাদর, বালিসের অড়, জামা-কাপড় কাচা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। কে বলবে ন-দশ বছরের মেয়ে। তার সবচেয়ে ভাল লাগে ছিপে-ছিপিতে জলে উবুড় করা কলসীটা বুকের তলায় নিয়ে চুপচাপ ভেসে থাকতে। ছিপিতে সুখের এবং নারীর সুখের মিল। ছিপির জলে

নতুন পড়া একটা মেয়ের গায়ের কাঁচুলী খোলা ছেলে ওড়-ওলানী আর লালতে পাতার ঝলমল মুটো ঘাটের রাজবাড়ির চেহারার একটা পারিপার্শ্বিক পর্দা তৈরি হয়েছে। মেয়েদের ঘাটটা ও পাশ থেকে দেখা যায় না। পাড়ার মেয়ে-বউ নির্দিষ্টদিনে সা-খুলে স্নান করে, সাবান মাখে। সবিতা একটা পিতলের ঘড়া তার বুকের তলায় নিয়ে পা-ছুঁড়তে ছুঁড়তে অনেক গভীর জলে চলে যায়। ঘাটের-গিন্নী হয়তো বকুনি দিয়ে ওঠে,—ওলো ও পোড়ারমুখী, অত গাঁয়ের জলে যাসনি মা, ঘাটে বেটাছেলেরা কেউ নেই, জলসী উল্টে গেলে তুলে দেবারিবে।

সবিতা হাত পা ছোঁড়া বন্ধ রেখে বুকের তলটা কুলকুচি করে ফিরিয়ে দেয়। তারপর ঘাটোর্ধ্বিনীকে ওখান থেকেই চিৎকার করে বলে, ঠাকুমা, উচ্চারণ তোমার নিভুল হয় নাই। ও সন্ধ্যটী গাঁয়ের নয়, গাঙ্গীর; গ পূর্ব্বক ছী ধাতুর ত!

ঠাকুর বাড়ির নবীন ঘাটে বসে গায়ে বাতা মর্দ্দাচ্ছিল, সে খিল্-খিল করে হেসে ওঠে, বলে : বয়স। মেয়ের যত শেষ, ঠিক পণ্ডিতমশাই বনতে করছে!

সবিতা জবাবদিহি করে না, আবার হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে ১.ল. বাপরে বাপ, সিপাহি তো ঘোড়, কবে নৌকি তো ঘোড়ি ঘোড়ি।

ছড়াটাতেই ঘাটলাটা মিশ্ধ হয়ে ওঠে। পণ্ডিতমশাইকে প্রায় উঁচুতে হাত উঁচানোর ভয়ে কথা বলতে হয় না। সবিতাই এখন সে দায়িত্বটা নিয়েছে। বাড়িতে গরু আছে। গো-সেবার দায়িত্বটা খুকুর। ধুয়ে নিয়ে আসে নিজের হাতে। ঝিম দু'আনাই সের দুধ দুয়, ফ্যান দিয়ে কখনও ঘন করে, কখনও বা পেরু দিয়ে ছানা করে। ডাক্তারমা বলেছেন, বাবাকে রোজ একটু করে ছানা দিতে। বাত-ব্যামে তো উনি খাবেন না, ছানাটা তাই খাওয়া দরকার। দুই ব্যামোর কারণটা ঘোষপিসির কাছ থেকে ভাল করে লিখে নিতে হবে। ঘোষ-পিসির হাতের ঘইটা অবশ্যভাবে জমে। সেটা ঘোষপিসির কোন বিশেষ গ্রাহকের কল্যাণের জন্য, না ওরে-বাবার কারসাজি, অথবা কোন ভুক্ত-ভাক, কিছু জানেন না সবিতা। তবে পাঁইয়ে পাঁইয়ে ঘোষপিসির কাছ থেকে কারণটা সে লিখে নেবে।

ঘটীবিকাকৃত দেওয়া সেই কলের পুতুলটাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। কবে, কেমন করে সে সেটা হারিয়ে ফেলে খুকু জানে না, যেমন জানে না কবে, কেমন করে সে ঐ পুতুল খেলার বয়সটা পার হয়ে এল। ছোটা সংসারটাই যে এখন ওর পুতুলের সংসার। কাঠের পুতুল দিয়ে আর কি হবে! এখন সে যে রীতিমত একটা জ্যান্ত পুতুল পেয়েছে। ঘটীন ডাক্তার দেওয়া সেই কাঠের পুতুলটার মতই এই জ্যান্ত পুতুলটা নিতান্ত অসহায়—খেতে দিলে খায়, শুইয়ে দিলে ঘুমায়। না, কাঠের পুতুলের মত চুপচাপ পড়ে থাকতে জানে না খুকু, লক্ষ করে দেখেছে, মাঝরাতে ওর ক্লান্ত পুতুলটা চৌকির ওপর উঠে বসে আপন মনে বিড় বিড় করে কি যেন বকে যায়। তা হক, মানুষটা পুতুলের মতই অসহায়—কপালের উপর চুলগুলো তুলে সারা রাত খুকুকে দেখে নিতে হয়, বাবা খেল কিনা।

অনেক অনেক দিন পরে বেদনার সমুদ্র অতিক্রম করে পলাশতলা পণ্ডিত আবার এই তীরভূমির সান্নিধ্যে শান্তির সন্ধান পেয়েছেন। এইটুকুই চেয়েছিলেন তিনি: ছোট একটা ঘর, নিজের হাতে গড়া বাগান, কয়েকটি অন্তরঙ্গ মানুষ, একটিমাত্র পরিচারিকা, আর তাঁর খুকুর নিরাপত্তা। ব্যস, আর কিছু নয়। তাই এখানে এসে পেয়েছেন। মন তাঁর অবসাদে কানায় ভরে গেছে। এখানে এই সাত পুরুষের ভিটেতেই যদি শেষ নিঃশ্বাস ফেলতে পারেন, তবে কোন ক্ষোভ থাকবে না আর তাঁর। এই অন্তরঙ্গদেরই একদিন তারক-বন্ধু স্মরণ করে-ছিলেন 'গদাধর তর্কবিত্ত', করেছিলেন, 'অনুদর্শন তর্ক-পঞ্চানন। এই তো তাঁর কাশী, এই তো তাঁর বৃন্দাবন। একটু সুস্থ হয়ে পড়িয়ার ইচ্ছা। আহা, সে বেচারি এই শান্তি-রাজ্যের সন্ধান পেল না। না পাক, সে পেয়ে, বেশ পেয়েছে,—না, কেমন অনু-শোচনা রাখবেন না পণ্ডিত তাঁর মনের কোনে। শুধু শেষ নিঃশ্বাস ফেলার আগে যদি ঐ মা-হারা এক ফোঁটা মেয়েটাকে কোন সুপাত্রের হাতে দিয়ে যেতে পারেন, তাহলে তাঁর আর কোন বাসনা অপরিতাপ্ত থাকবে না। কিন্তু তা কি হবে?

পলাশতলা জ্যোতিষী নিতান্তই ঠুলো পণ্ডিত; কিন্তু কোন কোন বিষয়ে তাঁর চিন্তাধারা রীতিমত প্রগতিশীল। মুখে তিনি বলেন যে, তিনি পরচীন-পন্থী—কিন্তু সেটা ঠিক নয়। তাঁর চরিত্রে এমন কিছু থেকে অন্তত একটা বৈপরীত্য আছে। তাতে অবশ্য বিস্মিত হবার কিছু নেই। যখন যোড়ন তর্কালঙ্কার, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মশাইও তো ঠুলো পণ্ডিত ছিলেন। তাঁদের চরিত্রেও ঐ আপাত-বৈপরীত্য লক্ষ করা গেছে। পলাশতলা পণ্ডিত বাল্য বিবাহের বিরোধী। মা-মণির বিবাহের কথা তাই তিনি এখন চিন্তা করেন না। এই প্রগতিশীল চিন্তাধারা যা থাকলে তিনি তাঁর পাঠকক্রমের মধ্যে সহায়-বিজ্ঞান অথবা রাষ্ট্রনীতিকে অন্তর্ভুক্ত করতেন না নিশ্চয়। তিনি বলতেন, পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন, জ্যোতির্বিজ্ঞানের মত ও দুটিকে পাশ দিয়েও মেয়েদের মেয়েদের প্রবিন করতে চলে যেতে পারত; কিন্তু তোমাদের স্বাধীন ভারতবর্ষ যে আবার পলাশ ছাড়া মেয়েদের দিয়েছে নির্বাচনের অধিকার।

মোট কথা পণ্ডিত এখন সুখী। না, ভুল হল:—সুখী নয়, তিনি আনন্দময়।

কলকাতা শহরটাকে এড়িয়ে তাঁরা; কবে এসেছিলেন আক্রান্ত হয়ে। একটা পরিণত বেদনাবোধকে অন্তরে বহন করেই যে সেদিন গঙ্গার পথে রওনা হয়েছিলেন, একথা অনস্বীকার্য। বলা চলে, মরম-ব্যথার আকর্ষণে নয়, মানসিক প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধেই কেন্দ্রচ্যুতা হয়ে ঐ পাপচক্র থেকে ছুটে বেরিয়ে এসেছিলেন সেদিন। সে বেদনাও আত্মমেলনী ধাতুতে গড়া নয়, তাও পরস্বৈপদী। মিত্রের অপমানের জ্বালা তত্তটা বেদনাহত হয়ে নি, যতটা হয়েছিলেন তাঁর আন্তরিক পরিপার্শ্বস্থ ধর্ম হয়ে যাওয়ায়। কী অপরাধ এতদিন? অতগুলি ছাত্রকে শুধু পরীক্ষা সমুদ্রই পার করিয়েছেন।—একটাও মানুষ গড়ে তুলতে পারেন নি। সেদিন ক্লাসের একটা ছেলেও উঠে দাঁড়িয়ে বলেনি —পণ্ডিত মশাই আমাদের পিতৃ, স্বাধীন, তাঁকে দিয়ে এতদিন যাদ করা অপরাধ, অনু-চিত, পাপ। হেডমাস্টার মশাই, অঙ্কমাস্টার, চন্দ্রকোনাস্যার,—এঁরা সকলেই উঁচুতে শিক্ষিত ছিল,— এঁরা সকলেই ছাত্রি গঠনের পাঠ্য বাদ দিয়ে গেছে নিজেদের। পণ্ডিতের সমস্যাটাকে মানবিক বোধ দিয়ে কেউই দেখলেন না। সহানুভূতি নয়, সহৃদয়তা নয় —শুধু যান, শুধু উপহাস, শুধু আঘাত করেই কর্তব্য শেষ করলেন।

তা হোক, তবু সর্বান্তঃকরণে তিনি ওদের মার্জনা করে চলে এসেছিলেন।

মনে আছে, কালিঘাট স্টেশনে মা-মণির হাত ধরে যেদিন ট্রেনে উঠে বসে-ছিলেন, সেদিনটার কথা। গাড়ি যখন প্ল্যাট-ফর্ম ছেড়ে বেরিয়ে এল, তখন শূন্য দৃষ্টি-আকাশ উদ্দেশ্যে তিনি আন্তরিক প্রার্থনা-মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন—

। যদিহ ঘোরং যদিহ ক্রূরং যদিহ পাপং তাচ্ছান্তং তচ্ছিবং সর্বমেব শান্তং ন:।

বলেছিলেন, পৃথিবীর সমস্ত পাপ-তাপ, ক্লেদ-ক্লেদ, অন্যায়-অকল্যাণ নিঃশেষে বিদূরিত হয়ে যাক। জগতে অবন্ত শান্তি, অবিরাম কল্যাণ, এবং অমলিন আনন্দ চিরবিরাজ করুক।

ওঁ শান্তি:। শান্তি:। শান্তি:।

খুকু এসে খবর দিল, বাবা ডাক্তারমা এসেছেন।

দেবতাদারুতরোপনিষদ গ্রন্থখানা সরিয়ে রেখে দুজন মানুষই উঠে দাঁড়ান। খড়ম পায়ে দিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসেন বারান্দায়, অন্ধকার থেকে আলোতে, এসে চোখ দুটো একটু ধাঁধিয়ে যায়। চশমাটা কপালে তুলে দেখেন ডাক্তার বরাবরকার মাপাসে দাঁড়িয়ে আছেন।

—এস, এস ডাক্তার। বস—ওরে মা-মণি ছেলে ডাক্তারদের জন্য একটা জলচৌকি দিয়ে যা।

—জলচৌকির আবশ্যক নেই পণ্ডিত মশাই, আমি এই বারান্দার সঙ্গেই।

—না না, ওতে তোমার অসুবিধে হবে। তোমার ঐ পোষাক এখানকার আসনের উপযুক্ত নয়, অথবা বলা যায় এ আসন ঐ বিদেশীয় পোষাকের উপযুক্ত নয়।

ডাক্তার চশমার ফিতা খুলতে খুলতে হেসে বলে। পণ্ডিত মশাই, আমি কিন্তু পায়ের্যাম তৈল অথবা তৈলাধার পাত্র এ সমস্যা সমাধানের জন্য আসিনি।

হা হা করে অট্টহাসি করেন পণ্ডিত। ডাক্তারের কথাগুলি বেশ।

ইতিমধ্যে খুকু একটা বেতের মোড়া রেখে যায়। ডাক্তার চেয়ারে বসে যাওয়ার উঠে আসে। পণ্ডিত মানুষেই ভদ্রলিখিলেন, ডাক্তার মোড়াটাকে একপাশে সরিয়ে মানুষেই অমন পদ্মাসনে এসে পা-মুড়ে বসে পড়ে। বলে। ডাক্তারখানা থেকে সোজা আসছি, তাই এই প্যান্ট-শার্ট—না হলে আপনার কথে ধুতিচাদর পোষাক পরেই আসতাম।

পণ্ডিত বলেন, তাতে কি? পোষাকটা লজ্জা নিবারণের জন্য, এবং সেটা, রুচি অনুযায়ী হওয়া বাঞ্ছনীয়—বিশেষ তোমাকে সাইকেলে চেপে গন্তব্যস্থলে যেতে হবে। ধুতি-পাঞ্জাবি সাইকেল-আরোহীর উপযুক্ত পোষাক নয়।

ডাক্তার বলে, আপনার এই 'ফরমাল আউটলুক' আছে বলেই আপনাকে এত ভাল লাগে।

পণ্ডিত হেসে বলেন, কিন্তু এবার যে কথাটা বলব সেটা তোমার ভাল লাগবে না।

—কি কথা?

—বিদেশী পোষাকটাকে অনুমোদন করেছি আমি, কিন্তু তোমার বিদেশী শব্দ গুচ্ছোমাটাকে আমি অনুমোদন করছি না। 'ফরমাল আউটলুক' শব্দগুলির পরিবর্তে তুমি অনায়াসে 'আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি' বলতে পারতে।

ডাক্তার ঘাড় নেড়ে বলে, ঠিক কথা। বাংলা বাক্যালাপে অহেতুক ইংরাজি শব্দের প্রয়োগ অবাঞ্ছনীয়। যাক, কাজের কথাটা পথেই বলে নিই। আমার স্ত্রী অবশ্য চতুরদর্শী বলে করেছেন। উদ্দেশ্যটা অত্যন্ত স্বার্থপরের মত; অর্থাৎ আমাকে হাত পুড়িয়ে কুশ ফলে রান্না করে খেতে হবে, অনেকটা এই আপনারই মত। তা সে যাই হোক যতে তিনি একজন সদ্য-বন্ধুকে সেবা করতে চান। বন্ধুজন-তোমনের যাত্রিতটা অত্যন্ত গুরুতর, সেটি আপনাকে নিতে হবে—

পণ্ডিত হেসে বলেন, 'গুরু' বিশেষণটা তার গুণবাচক? যাত্রিতের না ভোজনের?

ডাক্তার হেসে বলেন, সেটা আমার জানার কথা নয়। আমি ভুক্ত নয়। আমি ভেবে রেখেছি, এই সূত্রে একদিন আমার কোয়ার্টারে, মানে আমাদের আপনার পদধূলি পড়তে পারে। এ সূত্রে আপনার চেয়ে নিশ্চয়ান সদ্বন্ধেক্ষণ—

নাছোড়বান্দা ভঙ্গিতে হাত তুলে থামিয়ে দিয়ে বলেন, আজ কথা বলা না ডাক্তার। এখনও নিরোধিত হলাই, নাম্বাধীন মশাই প্রীতিত। তাছাড়া আমার শরীরটাও, ধরো-ছোঁও, মনুষ্যধারীত—

ডাক্তার হাত নেড়ে বলে, কবে কবে, কেন কেউ হলে তর্ক করতাম না; কিন্তু আপনার 'আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি'-র কথা জানা থাকায় একটু তর্ক করব। আপনি বিশ্রাম করে আমার জন্য প্রতীক্ষা করুন।

পণ্ডিত হেসে বলেন, কর তর্ক।

—আমার বক্তব্য আমি প্রথমে এদের স্ত্রী কমকে সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধুজন বলে মনে করি এটা আমাদের দুজনের বাল্যকালের রুচির সমস্যা। সে বিষয়ে আপনার মতামত জানতে চাইনা।

বাদানুবাদের মাঝে ছিলেন বলরাম, সুরুতে ছিলেন সন্দীপন পাঠশালার গুরু-মশাই। আপনি তাহলে 'বাদানুবাদের উপাদান' বলেন কেন? তার পরোক্ষাপক্ষ এবং গুরু-স্থানীয়দের ছেড়ে?

পণ্ডিত স্মিত হেসে বলেন, তোমাকেও একটা উপাধি দান করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। ডাক্তার নবজীবন তর্কচঞ্চু। বেশ কি বলছিলে বল?

—আপনি জানেন আমরা নৈকষা-কুলীন। আমার স্ত্রী নিরামিষ আহার করেন; পক্ষান্তে মদ-মাংসিও করে থাকেন। তিনি মদ্য দীক্ষাও নিয়েছেন। এখন বলুন, আপনার জন্য কি স্বতন্ত্র আয়োজন করতে হবে?

—না না না। এ কি কথা? তোমার স্ত্রী আমার মায়ের মত। তাঁর স্বহস্তে পাক করা অন্ন গ্রহণে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নাই।

—বাহ, মাংস, পোঁয়াজ, রসুন আপনি খান না জানি। আমাদের বাড়িতে ও সব আসেও না। আমার স্ত্রীও ও সব খান না। তার কোন বাধা নিষেধ আছে?

—আছে আমি ইষ্টদেবতাকে সমর্পণ করেছি। ওটা যাদ।

—তবে ঐ কথাই রইল। কাল একটু সকাল করে আসবেন। এই এগারোটা নাগাদ। আর আপনি ফিরে এলে আমি খুকুকে নিয়ে যাব। সেও খানিক্ষণ বাড়িতে দুটি সংসার পাবে।

—উত্তম। উত্তম।

ডাক্তার উঠে পড়েছিলেন, হঠাৎ কি ভেবে বলেন, একটা কথা পণ্ডিত মশাই। বাঁধাদিন পূর্বে আপনি কি ভেবে গ্রাম ত্যাগ করে গিয়েছিলেন তা আমি শুনেছি। কিন্তু আপনি আবার গ্রামে ফিরে এসেছিলেন কেন সেটা আমি জানি না।

পণ্ডিত স্মান হেসে বলেন, কলিকাতা ফিরার সময় বলা যাবে ডাক্তার। একদিন তোমাকে সবিস্তারে সমস্ত ঘটনা বলব। আমাদের দিন তো সমাপ্ত হয়ে এল, দেখ, তোমরা যদি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিটা কিছু পরিবর্তন করতে পার। আমি কলিকাতা ত্যাগ করেছিলাম অত্যন্ত দুঃখ আঘাতে। নিদারুণ অপমানে এবং দৈহিক পীড়ন সহ্য করে—

—দৈহিক পীড়ন!

—হাঁ ডাক্তার। মুষ্টাঘাতে আমার একটি দন্ত স্থানচ্যুত হয়েছিল, আমার কিন্তু সমূলে উৎপাটিত হয়েছিল—

ডাক্তার প্রেরকক্ষণ কোন জবাব দেয় না, তারপর বলে—কী হয়েছিল বলুন তো?

—আজ নয় ডাক্তার। অন্য একদিন বলব।

—আপনি কি তাদের ক্ষমা করে এসেছিলেন?

—হ্যাঁ, সর্বান্তঃকরণে।

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ।

পণ্ডিতই আবার বলেন, দেখ ডাক্তার, পৃথিবীটি মানুষের জীবনে তার বাক্তিগত সমস্যা আসে, আমরা আমাদের পূর্ব-নির্ধারিত সামাজিক বোধের সংস্কারে তার যথোচিত বিচার করি না, বা ভ্রান্তিপূর্ণ বিচার। তাই চোর কেন চৌর্যকর্মে প্রবৃত্ত হয়, নারী কেন পতিব্রতাবৃত্তি অবলম্বনে বাধ্য হয় তা আমরা বিচার করতে চাই না। তস্কর এবং পতিতাকে ঘৃণা করি, তার পাপ-বিধানের ব্যবস্থা করেই আমরা সামাজিক কর্তব্য সমাপন করি। আমার জীবনে আমি একটি ভুল কথা বলেছিলাম—কিন্তু তাকে তো কই ঘৃণা করতে পারি নাই? সমাজে সে অবহেলিত, তবু তার অন্তরাত্মার কথন আমি আমার অন্তরে অনুভব করেছিলাম। যা আমরা চর্মচক্ষে দেখি শুধু সেইটুকুই সত্য নয়, সত্য তদপেক্ষা গভীর, তদপেক্ষা বৃহৎ—এবং সেই সত্যের জন্য অবধারিত।

ডাক্তার বলে, কিন্তু মনে হচ্ছে, আপনার দেশে অসতোরই জয় হয়েছিল?

—না। আমি সাময়িকভাবে আহত হয়েছিলাম। সত্য সূর্যের মত; মেঘলোকে সে সাময়িকভাবে আচ্ছাদিত হলেও তার তেজ-মুক্তি অনস্বীকার্য।

ডাক্তার বলে অর্থাৎ আপনি বিশ্বাস করেন, সত্যমেব জয়তে।

পণ্ডিত মৃদু হাসলেন।

এ হাসিকে ডাক্তার চেনে। বলে, মনে হচ্ছে আপনার কিছু আপত্তি আছে?

—তা আছে।

—বলেন কি? ঐ 'সত্যমেব জয়তে' উপনিষদের?

—ঠিক তাই।

—চটা কিন্তু আমাদের জাতীয় মন-কারের পতাকায় বাণী।

—আমি জানি।

—আপনার আপত্তিটা কোথায়?

—আপত্তিটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। ঐ উপনিষদটা একটি শ্লোকের একটি চরণের উদ্গান। পূর্ণ চরণটা হচ্ছে 'সত্যমেব জয়তি নানৃতম্' অথবা পাঠান্তরে 'সত্যমেব জয়তে নানৃতম্।' আমার পক্ষের

মনোভাব এই নিবিড় পাঠের ভিতর আত্ম-বিস্মৃতি ঘটাবে। 'সত্য' স্বীয় মহিমায় অন্তর্হিত হয়। এই কথার ভিতর কি লুকানো আছে একটি মন্ত্রোচ্চারণ—'তুমিই সত্যকে অন্বেষণ করো' আমাদের সবচেয়ে ছুটতে হইবে না। 'চর্যা' পড়ে এ ভ্রান্তির অবকাশ নাই। বিশেষতঃ 'নাথ-গীতি' সম্পর্কিত আমি ভয় হয় কোন মনোভাব থেকে? 'অশ্রদ্ধা' যে অন্তর্হিত হতে পারে না এ কথাটা স্বীকার করার বিনয় কোথায়? নাকি ওটা অন্তর্হিত প্রাণে লুকানো অন্তর্দেশে ইঁদুর গর্তের মত বলতে 'অন্তর্মুখ'।

ডাক্তার উঠে পড়ে বলে—এবার আমার স্নানাহার করাই বোধহয় ভাল।

পণ্ডিত হাসলেন। ডাক্তার বিদায় নিয়ে চলে যায়।

এই ডাক্তার নবকৈশোর সান্যালকে সবার চেয়ে স্নেহ করেন পণ্ডিত। অল্পদিন হল সে এ গ্রামে এসেছে। সরকারী গ্রামোন্নয়ন কেন্দ্রের চিকিৎসক হয়ে। বয়স ছাব্বিশ বছর। ডাগোডগলে জুলফি। ফর্সা সুশ্রী স্বাস্থ্য আর সবচেয়ে বড় কথা মনটা উদার। গ্রামের সবলোকই সে দিয়েছে হয়ে উঠেছে অল্প কয়েক মাসে। পাস করে বের হবার পরে এই তার প্রথম চাকরি। বছর কয়েক হল বিবাহ করেছে। একটি পুত্র সন্তানও জন্মেছে তার। পণ্ডিত ওদের বাড়িতে কোনদিন যান নি। সরকারী ডাক্তারখানা থেকে মা-বাপের জন্য ঔষধ আনতে গিয়ে ডাক্তারের সঙ্গে তাঁর আলাপ। ডাক্তার প্রবলা অনেক বারই এসেছে তাঁর ভিটায়।

সকালবেলা আহ্নিক সেরে ছাতা মাথায় দিয়ে সবার সকালই হাজির হলেন ডাক্তারের সরকারী আবাসে। চিনেমাটির পাকা বাড়ি। হাসপাতাল সংলগ্ন। ডাক্তার ওঁকে আপ্যায়ন করে বসায়। ইলেকট্রিকের বেই. একটা হাতপাখা এনে বাতাস করবার উপক্রম করতেই পণ্ডিত বলেন, পাখাটা আমাকে দাও, না হলে বড় অস্বস্তি হয় আমার। ডাক্তার পরিহাস করে, তাই কি হয়? আমার অতিথি ব্রহ্মার মাতায় হবে তাহলে পণ্ডিত মাথা নেড়ে বলেন, উঁহু, বাক্স পেটরাগুলো তোমার নিস্তার হত নাই তক্ষক। অতএব মাতৃ হীন(তঃ) অতিথি। তুমি অতিথি-ধর্ম পালন করছ না, করছ আতিথেয়তা; আতিথেয়তা অতিথি যে বিলম্বে 'তা'। সুতরাং প্রবলতুক বন্ধ পরোক্ষের পাখা আমাকে নরপশু কর।

পরের ভুল পরোক্ষ যে পণ্ডিতমশাই সহ্য করেন না এ কথা জানা ছিল ডাক্তারের। লজ্জিত সে হাতা পেতে নেয়, পাখাটা পণ্ডিতের হাতে দেয়।

একটু পরেই চাকর এসে খবর দিয়ে যায়, ভিতরে চা'ই করা হয়েছে।

হস্তপদাদি প্রক্ষালন করে পণ্ডিত এসে বসলেন একটি ফুলকাটা পশমের আসনে। পাশেই একটি পাথরের গ্লাসে একটি পাথরের ঢাকা। সম্ভবতঃ পানীয় জল আছে তাতে। আসনের সম্মুখস্থ স্বল্পউচ্চতে ফল ছিটানোই ছিল। ডাক্তারের স্ত্রী এসে নত হয়ে পণ্ডিতের পদধূলি নিলেন গলায় আঁচল দিয়ে। পণ্ডিত আশীর্বাদ করলেন, কল্যাণমস্তু।

তারপর স্বহস্তে অন্নব্যঞ্জনের থালাটি নিয়ে এসে ব্রাহ্মণের সম্মুখে রাখলেন। পণ্ডিত ডাক্তারকে বলেন, তুমি বসবে না?

—না পণ্ডিত মশাই, আমাকে আবার একবার হাসপাতালে যেতে হবে। তারপর ফিরে এসে স্নান করে খাব।

—ও।

পরে সেবককে নিবেদন করে ব্রাহ্মণ আহারে মনোনিবেশ করেন।

একটু পরে ডাক্তার বলে, হাসপাতালটা কেমন হয়েছে?

পণ্ডিত প্রত্যুত্তর দিলেন না, মৃদু হাসলেন।

ডাক্তার গিন্নি একটা হাতপাখা নিয়ে পাশেই বসেছিলেন। কোন সঙ্কোচ না করে স্বামীকে বললেন, ওঁকে বিরক্ত কর না। খেতে বসে উনি কথা বলেন না, বুঝতে পারছ না?

—ও। সরি। মানে, দুঃখিত। আমি বরং এই ফাঁকে একবার হাসপাতালে ঘুরে আসি। উনি যখন কথা বলবেন না, তখন আহেতুক সময়ের মত দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে?

পণ্ডিত হেসে সায় দিলেন।

পরেন না করেও পণ্ডিত মশায়ের আহার কার লক্ষ্য করে ছোটেটি একে একে বাঞ্জনগুলো যোগান দিতে থাকে। পণ্ডিত যখন নিতান্ত স্বাদু-ব্যঞ্জনে বাধা দিতে শুরু করলেন, তখন ছোটেটি বললে,—না পরেন পাতে থাকে না। আপনার পসাদ তো আমিও খাব, সস্তিতও খাবে।

তবু হাতেন বাঁধন মুক্ত করলেন না অন্নদাতা পণ্ডিত।

—প্রসন্নতঃ কাউটুকু ফেলে রাখবেন না। আর হিশ্বাদন সমস্ত আমার নিজে হাতে করা—

পণ্ডিত তৃপ্তির হাসি হাসলেন পুনঃ।

আহারান্তে মুখ প্রক্ষালন করে পণ্ডিত একটা ভ্যাল্কসের ইজিচেয়ারে এসে বসলেন। পাথরের রেকাবিতে করে ওরেঞ্জ টুকরা হাতপাখা এনে ডাক্তারের স্ত্রী বসেন, উনি যখন এ গ্রামে চাকরি পেয়ে এলেন তখনও আমি জানতাম না এটা আপনার গ্রাম। অথবা আপনি এখানে থাকেন। তারপর ওঁর মুখে আপনার নাম শুনে বুঝতে পারলাম।

পণ্ডিত একটু অবাক হয়ে এতক্ষণে মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেন। এ পর্যন্ত তার পরের দিকে নজর রেখেই কথা-বার্তা বলেছেন। স্বাস্থ্যবতী সুশ্রী মেয়েটির বয়স কত হবে? বছর পাঁচেক। কোলে একটি শিশু, হাবার আধো-আধো, কপালে একটি সিঁদুরের টিপ।

পণ্ডিত বলেন, আমি কি তোমার পূর্বে পরিচিত ছা?

মেয়েটি ঘাড় নিচু করে বললে, আমি শান্তি।

শান্তি? কোন শান্তি? নামরতা মশায়ে সমস্ত অতীত জীবনটা হোলপাত করেও কোন শান্তিবালিনির কথা স্মরণ করতে পারলেন না। এরমিতে স্মৃতিশক্তি তাঁর অত্যন্ত প্রখর, কিন্তু নামুষের নাম তাঁর মনে থাকে না, বিশেষ স্ত্রীলোকের নাম। স্বীকার করলেন সে কথা, বললেন, আমি তো মা তোমাকে ঠিক সনাক্ত করতে পারলাম না—

—বর্ধমান জেলার চণ্ডীদহে আমাদের বাড়ি। মেয়েদের স্কুলেই নেমে ছেড়ে হয়। আমার বাবার নাম শ্রীকৃষ্ণলাল বাগচি।

অবাক বিস্ময়ে পণ্ডিত অনেকক্ষণ এক-দৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন মেয়েটির দিকে। তাঁর বিস্ময় ক্রমে রূপান্তরিত হয় অপরূপ রোমাঞ্চে। অর্গলিত হৃদয়ের দুটো ওরে তাঁর ওলটপালট। হাত দুটি যুক্ত করে তিনি কপালে যেন উৎক্ষেপ করলেন।

শান্তি বলে, এ কথা কিন্তু উনি জানেন মা।

—কোন কথা? ও। বুঝেছি। কিন্তু কেন? তাকে বলনি কেন মা?

শান্তি প্রত্যুত্তর দেয় না। মেঝিনীনিবদ্ধ দৃষ্টিতে চুপ করে অপেক্ষা করে।

পণ্ডিত দুটাঁ হো হো করে অট্টহাসো ফেটে পড়েন। বলেন, কেন? তোমার কি আশঙ্কা হয়েছে যে আমার পরিচয় পেলে সে আমাকে সৈরধ-সমীরে আহ্বান করবে?

শান্তিও হেসে ফেলে, বলে তা নয়, তবে আপনার কথা ভেবেই—

: খুব সাবাস। তুই আমার মেয়ের মত। দেখ্ দেখি কাণ্ড। কী হিমালয়ান্তিক ভ্রান্তির মধ্যেই পড়েছিলাম! ঈশ্বর মঙ্গলময় —তাই মা আজ তোর সব হয়েছে। ঘর, বর সন্তান। বা। বাঃ। কুয়াশা ঘারা নিশিতা ধূরতরা। যুদ্ধকে লাভ করবার পথও যেরূপ কুয়ধার, তাঁর সৃষ্টি রহস্যের মর্মোদ্ধারের পথও তেমনি কুয়ধার। কোন পক্ষেই আমি আমাদের পথে তার আশীর্বাদ আসবে আমরা কিছুই বুঝি না।

বৃদ্ধের চোখে জল এসে গিয়েছিল। চশমাটা চোখ থেকে খুলে পাঞ্জাবির হাতায় চোখদুটি মুছে নেন।

শান্তি গলায় আঁচল দিয়ে আবার পেন্নাম করল তাঁকে। পরক্ষণে তাকে আশীর্বাদ করলেন পণ্ডিত। মনটা জানায় জানায় ভরে গেছে তাঁর। বাড়ি ফেরার পথে বারে বারে মনে মনে পেন্নাম করেছেন সেই অজ্ঞাত শক্তিকে। যা যিশু না বিজ্ঞানীদের। তাঁকে জানি না, তাঁর কথা কেমন করে জানতে হবে তাও জানি না। তবে এটুকু জানি যে তিনি আছেন। তমসার ওপারে তাঁর অস্তিত্ব মর্মে মর্মে অনুভব করেছেন বৈদিক ঋষি কবি। নিজ মহিমা তিনি হিরন্ময় পাত্র দিয়ে আবৃত করে রেখেছেন। তা হক, তবু পণ্ডিতের প্রাণের আহ্বান তিনি শুনেছেন :

UNIVERSITY

মনে হলো সমস্ত ভেঙে। কে তে দুঃখ কল্যাণময় তে তে পলাশি। হে সুখদ। তোমার চোখ কল্যাণের ভেরেছিস্থ প্রসাদগুণ কর, তোমার কল্যাণময় স্বরূপ আমাকে উপলব্ধি করতে দাও, অনুভব করতে দাও।

এই তো তাঁর কল্যাণময় স্বরূপের পরিচয়। চল্লিশের গল্পের অজ্ঞাত যুবক দলের হাতে বন্ধু-বিচ্ছেদ দেখা দিয়েছিল বলেই না পরমেশ্বরের এমন করুণাধারায় সিক্ত করতে চেয়েছেন ঐ তরুণী মেয়েটির উপর। আর তাই না আজ সে তাদের ক্ষমা করার মত ক্ষমায় ক্ষমায় ভরে উঠেছে।

বাঃ বাঃ। চমৎকার। বাসুদেব, তুমিই সত্য।

দিন সাতেক পরে সকাল বেলায় লাই মাছকে ঠিক করে কাঁস দিয়ে বেঁধে বিচ্ছিলেন পণ্ডিত; খুকু এসে খবর দিল—বাবা, তোমার সঙ্গে কয়েকজন দেখা করতে এসেছেন।

নায়েব-কর্তা আর কাছারিঘরের সরিয়ে রেখে সসম্ভ্রমেই পণ্ডিত এগিয়ে এসেন তাঁর বাইরের দিকে। খুকু ইতিমধ্যেই একটি মাদুর বিছিয়ে আগন্তুকদের বসতে দিয়েছে, পান জর্দার ডাবাটা রেখে গেছে। অপরিচিত কেউ নয়—সকলেই নায়েবমশায়ের পরিচিত। তিনজনেই গ্রামের মাতব্বর গেরস্থীর লোক, সমাজের মাথা। অর্থাৎ টাকা পয়সা ওয়ালা লোক। নরেন দত্তের অবশ্যই ধান গ্রাম আছে; কিন্তু তার উপার্জনের বড় গদা তেজারতির খাতে। খুব সোনার গাঁ নয়, আশপাশের অনেকগুলি গ্রামে তাঁর তেজারতি কারবারের বেশ ভাল জাল পড়ে। বড় বড় রুই-কাতলারও সে জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে যাবার উপায় থাকে না। ওর গ্রন্থি, ওর ফলক, তার ভেতরের ওঁড় লাল-লাল ছোট্ট-ছোট্ট নানান গ্রন্থের তন্তুজালে বাঁধা পড়ে। নরেন দত্ত সুতরাং গ্রামের একজন নামজা ব্যক্তি।

বিনীতভাবে এগিয়ে এলেন যুবক ললিত চাটুজ্যেমশাই। ইনিও স্বনামধন্য। পূর্ব-পুরুষ কলকাতার সরকারী দপ্তরে উঁচুপদেই কাজ করতেন। উপরন্তু পুনর্বাসন বিভাগের জেনারেল, বাঁ একটা তহবিল তছরূপ না ঘোল তদন্তের ঝামেলায় তাঁর চাকরিটি যায়। বেশ কিছু দিন ধরে পার্টিশন কোর্ট-ঘরের জমাই মামলা লড়তে হয়েছে নাকি। ঘরের জমাই মামলা লড়তে হয়েছে নাকি। সে সময়ে অকূল পাথারে তাঁদের সর্বস্ব-স্বান্ত হতে হয়েছিল। শোনা যায়, দীর্ঘ পাঁচ বছর মামলা চালিয়ে যখন তিনি একেবারে কপর্দকশূন্য তখন হাকিম রায় দিয়ে বলেছিলেন—ললিত চাটুজ্যে বেকসুর খালাস। অনারেবল এাকুইটেড! মনের দুঃখে ললিত চাটুজ্যে বাড়িঘর থেকে নেমে সোজা হিমালয় চলে যান। পুরো একটি বছর তিনি হিমালয়ে তপস্যা করেন। তারপর হিমালয়েই কোন এক মহাপুরুষ তাঁকে সংসারাশ্রমে ফিরে আসতে বলেন। ফিরে এলেন তিনি সোনা মুঠি ধরতে পারতেন। তা সেই সোনামুঠি ধরে নিয়েই ললিত চাটুজ্যে আবার ফিরে আসেন সংসারাশ্রমে। বর্তমানে তিনি বেশ প্রাকটিস জমিয়েছেন গড়মিসমাঠে। নতুন বাজার তুলে-ছেন, গ্রন্থি কিনেছেন, একটা গঞ্জ জাঁকিয়ে বসার ব্যবস্থাও করেছেন। সবই মহাপুরুষের আশীর্বাদে। তবে লোকে আড়ালে বলে থাকে—ও হিমালয়ে টিমালয় কিছু নয়—চাটুজ্যেমশাই এক বন্ধুর বাড়ি যেতেছিলেন, এবং তাঁর অর্ধেক উপেয়ুলে আছে ঐ তহবিল-তছরূপের ব্যাপারটা। তা হলে যাই হোক চাটুজ্যেমশাই বর্তমানে গঞ্জের একটি মাথা।

আর এসেছেন ভবেন চক্রবর্তী। এবার উপনয়নের পুরুকালে পণ্ডিত গঞ্জ ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন পঞ্চায় বিশ-পঁচিশ বছর পূর্বে।

পণ্ডিতকে নমস্কারের জন্যে ঝুঁকতে দেখে ললিত চাটুজ্যেমশাই সাদর আহ্বান জানান—আসুন আসুন ন্যায়রত্নমশাই।

এই সাত-সকালেই আপনাকে বিরক্ত করতে এলাম।

পণ্ডিত আসন গ্রহণ করে বলেন। বিলক্ষণ। বিরক্ত বিসের? বলুন কি ব্যাপার?

—আপনার সহীর পঞ্জিক কেমন আছে বলুন?

পণ্ডিত হাসামুখে বলেন, না আমার কোন অসুবিধা নাই।

তিনজনের কেউই অবশ্য এ রসিকতায় অর্ধেকটাও করতে পারেন না; মুখের ভাব দেখার প্রতীক্ষা এঁরা কেউই করেন নি।

ভবেন চক্রবর্তী বলেন, সরাসরি কাজের কথায় আসা যাক পণ্ডিতমশাই। আমরা তিনজন আপনার স্বরে পঞ্চায়ী—হাত দুটি জোড় করে সে।

পণ্ডিত এবারও হাসামুখে বলেন, বাজনের স্বরে বলিহারী পঞ্চায়ী?

ললিত চাটুজ্যেমশাই ছাত্রের এক বক্তব্যুত্ব। মহাভারতখানি পড়া আছে তাঁর। তাই ভবাবে বেশ খানিকে নিয়ে বলেন—বিষয়টা যে সাঙ্ঘাতিক। তাই সাঙ্ঘাতিক বাজনের স্বরে আজ রাজসিক বলিহারী এসেছেন। জানাতে আমরা দুজন সমীয়ায়। কি বল হে তুমি?

পণ্ডিত গম্ভীরভাবে বলেন, অবতরণিকা তো হল, এবারে মূল বক্তব্যটা শুনি। ভবেন ইতস্তত করছে দেখে ললিত চাটুজ্যেই বলেন, ভবেনের ইচ্ছা তার স্বর্গত পিতৃদেবের নামে গঞ্জের একটা স্কুলের স্কুল খুলবে। গঞ্জে স্কুলের কোন স্কুল নেই;—কিন্তু শিবহীন যজ্ঞ তো হতে পারে না, তাই আপনার স্বারেই সর্বাগ্রে এসেছে। একা আসতে ওর সাহস হচ্ছিল না, তাই আমাদের দুজনকে চুপিয়ে এনেছে।

পণ্ডিত বলেন, কেন? তবাদাসের একটা আসতেই বা [illegible] থাকতে পারে?

—তাঁর স্মৃতিরক্ষা [illegible] পঞ্চিতা করতে চায়, তিনি [illegible] ঠিক সদ্ব্যবহার করেন নি, তাই ও কুণ্ঠিত হচ্ছিল—

পণ্ডিত মৃদুস্বরে সমে বলেন, আপনি তুলনাতুলে উপ্তি করলেন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়; কার স্মৃতিরক্ষার্থে পাঠশালাটি তৈরী হতে চলেছে এ বিষয়ে আমার বিন্দু-মাত্র কৌতূহল নাই—নিঃসন্দেহে এ কার্য সদ্বর্ষবোধেই, তবেন যদি স্বর্গীয়া বিশ্বতাকে স্মরণীয় করতে ইচ্ছুক হয় তবে তাকে আমি সর্বান্তঃকরণে আশীর্বাদ করছি শুধু আশীর্বাদ নয়, সে আমার সন্তানীয় সহানুভূতিও পাবে।

ললিত চাটুজ্যে উৎসাহের আতিশয্যে বক্তব্যের ঠাহরে পঞ্চকে একটা চলচ্চাঞ্চল্য করে বসেন। ঘরের দত্ত পঞ্চায় কাশিয়ে ওঠে। চাটুজ্যে বলেন, এ— এই। আমি তোমায় তখনই বলেছিলাম যা ভবেন ন্যায়রত্নমশাই হচ্ছেন খাঁটি মানুষ। উনি ঐসব ছোটখাটো ছেলেখেলার মধ্যে নেই নিশ্চয়ই বলেছে না—অবশ্যই ব্যয়ের বিধান যা কিছুই তবাদাস। অর্থাৎ যে মহাপুরুষ সাতাত্তরের বিপ্লবান তাঁকে দেখে আনন্দ হয়, তাঁকে শ্রদ্ধা করার কিছু, নেই। তুমি তো ওঁর আসতেই চাইছিলে না।

তবেই নরেনকর্তার মন-উপবনে মনমানা থেকে খপ্ করে এক খাবলা নম তুলে নেন।

পণ্ডিত হেসে বলেন, বড় দুঃখ বাক্ত করলেন তো? এ ব্যথা কোথায় পেয়েছেন? শরৎকালে না পূর্বাচলে সাঁঝে বেলাভূমীর্ষে?

ললিত চাটুজ্যে মনের ঠিকটা মনে মনে মাপতে চেষ্টা করছিলেন, তাঁর হেসে পাড়ে বলেন, কেন বলুন তো কিছু ভুল বলেছি আমি?

—না, তেমন কিছু নয়। সেরাতেই অর্থ, মনে হয় আমি যা অনুধাবন করেছি—এ গ্রহণে : আমলকে তিনি ভেবেছেন তাঁর হৃদয়ের তাঁত হল না!

—ওতো একই কথা। বলে, ভবেনের সম্মুখে মনমানাকে মনমাঝে পাচার করে-ছেন।

ভবেন এসব সূক্ষ্ম আলোচনার বড় পাচ্ছিল না; তবু খুশী হয়েছে সে পাকাপাকা পণ্ডিতদের যে এত সহজেই তার কথা বোঝে সেটা সে আন্দাজ করেছে। উৎসাহের আতিশয্যে সে সিরকম পাঞ্জাবির পাশ পকেট থেকে সিগারেট এবং দেশলাই বার করে। কিন্তু, সামনে লক্ষ্য একটা ধর্মা-স্তিক শিরশ্চালনে হুঁকার খেয়াল হয় তার। থাক, দরকার নেই। খেয়েকালে সিগারেট খেতে দেখলে বুড়োটা না আবার বিগড়ে যায়। বুদ্ধিমানের অনুশাসনগুলো আবার

পাঞ্জাবির পকেটেই পাচার করে। বেশ কিনা? তাবে বলে, ইস্কুলটা আমরা একেবারেই তুলতে চাই পণ্ডিতমশাই। আপাতত ক্যাশ হেডের আর ফাইভ। ললিতবাবু ইংরাজি পড়াবেন ঠিক হয়েছে। অবৈতনিক আবশ্যিকভাবে আর ফিফথটাও। এখন আপনি যদি ফার্স্টক্লাসের আর সাবসেক্সটাও—

—'ফার্স্টক্লাসের আর সাবসেক্সটা' কেন বাবা? আমরা কেউই তো এখনও সাহেব নই। ও দুটো আপাতত বাংলা আর সংস্কৃতই থাক না।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, তা ঐ বাংলা আর সংস্কৃতটা যদি আপনি পড়ান—

—বিদ্যারতনের গুরু—

—আজ্ঞে আমি আমাদের কাছারি-ঘরের বর্ণপরিচয়ের ঘর ছেড়ে কিছুদিন। ত্রয়ি-লহরী হবার পর আমলা-গোমস্তা-মোক্তারদের তো সব বিদায় দিয়েছি। ছত্রগুলোর এখন আছে শুধু চামচিকে।

—বিদ্যারতনের পরোপকারক কে হবেন?

ললিত চাটুজ্যে এবার আমি আমিত্বের বলেন: সেই যার উপাধিটা আপনাকে করে দিতে হবে। সত্যি কথা বলতে কি এখেন ছাড়া অন্যদের কোন দিন পড়ে নি। তবে অভ্যেসটা ও আমিই মানে। আমিও ইংরাজিটা ছোটবেলায় পড়েছি। কিন্তু শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা আমাদের কারও নেই। আপনি এই নিয়েই ঠাকুর দাঁড়িয়েছেন। আপনিই পরোপকার-নিযুক্ত হবেন; তবে হ্যাঁ, পদের পদের অবশ্য আপনাকে কিছু কিছেলা করতে হবে।

—বিবেচনার অর্থ?

—অর্থাৎ ঐ অর্থ কিছুই বিবেচনা। মানে আপনাকে পুরো মর্যাদা পদমর্যাদার ওজন দিতে পারবে না। আপাতত মনে পঞ্চাশটি মুদ্রা পরিমাণ দেবে। আপনাকে কিন্তু কিছু বেশী টাকার রসিদে সই দিতে হবে।

পণ্ডিত অবাক হয়ে বলেন, সেকি? এমন কাণ্ড করার অর্থ?

—আজ্ঞে অর্থ নয়, অনর্থ। এবার সরকার আইন করেছেন শিক্ষকদের একটা ন্যূনতম বেতন দিতে হবে। না হলে প্রোভি-ডিরেক্সনের ফান্ড বরখাস্ত পুরো হবে না। সরকারী সাহায্যও পাওয়া যাবে না। কিন্তু ওজনের আর্থিক মর্যাদা এখন এমন নয়, যে আমাদের তিনজনকেই সে পুরো মর্যাদা দিতে পারে।

—আপনারা দুইজন কি ও ভাবে মাহিনা গ্রহণ করবেন?

—উপায় কি বলুন?

—উপায় অবশ্য দেখুন, বিদ্যারতন একটি পবিত্র স্থান; তার মূলেই এমনও ওজনটা থাকতে পারে না তাহলে বিদ্যমান আমাদের মার্গ হতে যাবা। আমি বরং কিছুদিন পড়াবার মাহিনা,—আমি অবৈতনিক পরোপকারক হিসাবে চতুর্থ পত্রপাঠে স্বীকৃত; কিন্তু, অন্যান্য সকলকে সরকার-নির্ধারিত ন্যূনতম বেতন দিতে হবে।

—তা সরকার নারায়রত্নমশাই, আমরা তো আর মাহিনা নিতেই যাচ্ছি আছি।

—কিন্তু, প্রতিষ্ঠানের পরোপকারক হিসাবে আমি যে তা পালন করতে স্বীকৃত নহি!

ললিতবাবু, এবং ললিত চাটুজ্যের দৃষ্টি বিনিময় করেন: এ আবার কি নতুন অঘোরা।

পণ্ডিত আবার বলেন, তা ভিন্ন এত দক্ষিণাতেই বা কি পড়েছেন? আসুন না, আমরা সর্বপ্রথমে মনের গুরুত্বে গিয়ে কিছু, বুদ্ধিগুদ্ধি সংগ্রহ করি।

ললিত চাটুজ্যে বলেন, তাতে দুটো প্রব্লেম আছে পণ্ডিতমশাই। পড়বার পাঠ্যদের কাছে টাকা দিলে ইস্কুলের নামকরণ নিয়েও পাঠ্যদের মতামত নিতে হবে। 'সুরেন্দ্রনাথ গার্লস স্কুল' পাঠিতও করা হয়তো শেষ পর্যন্ত সম্ভবই হবে না—

—না হয় নাই হল। নামটা সোনার পাথর বাটিকা। বিদ্যালয় হলেই বা ক্ষতি কি?

—বাঃ! তাহলে ভবেনবাবুরা এর মধ্যে মাথা গলাবে কেন?

পণ্ডিত গম্ভীর হয়ে বলেন, বুঝলাম। এরা শিক্ষার্থ অন্তর্বিরোধী?

—ভবেন আমাদের বন্ধুর এই কেন্দ্র থেকে প্রায়েরালি ইলেকসনে দাঁড়াচ্ছে। তার আগেই স্কুলটা খুলতে পারলে একটা সুবিধাজনক হয়। ইলেকসান পার হয়ে গেলে সবস্ত দৌড়াদৌড়িটাই হবে পণ্ডশ্রম।

নারায়রত্ন গাত্রোত্থান করেন। মৃদু হেসে বলেন, এতক্ষণে আপনাদের পূর্বাভাষের নির্মিলিতার্থ আমি সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছি। আচ্ছা আসুন আপনারা। আমি একপক্ষের ইষ্টকাঙ্ক্ষিতার চিন্তও নাই।

তিনজনেই চমকে ওঠেন। ইহাঁর এভাবে অন্তর্ধানের মর্মার্থটা নেবে আসতে সময় এঁরা কেউ আশঙ্কা করেন নি।

ললিত চাটুজ্যে অবাক হয়ে বলেন, ওটা কি হল পণ্ডিতমশাই? আপনি এখন হঠাৎ মত পরিবর্তন করে বসলেন যে?

ম্লান হেসে পণ্ডিত বলেন, আজ্ঞে না। মত পরিবর্তন আমি করি নাই। আমার উপলব্ধিতে কিন্তু, ভ্রান্তি ছেড়ে গিয়েছিল। আপনাদের কাছে যা চোখ আমার কাছে তাই ছিল ধুলো, এবং আপনাদের কাছে যা ধুলি ছিল মূল্য আমার নিকট তাই মনে হয়েছে সোনা। এইমাত্র।

—আপনি কী বলছেন তার মাথা মুণ্ড; আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না।

—আরও পরিষ্কার করে বলব? আমার ছিলেবেলার সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এখন কিন্তু পত্রপাঠযোগ্যের ব্যক্তি ছিলেন না, যে তাঁর স্মৃতিরক্ষার জন্য আমার কিছুমাত্র আগ্রহ থাকবে এবং শ্রীমান ভবানন্দের এখন যেন চরিত্রগুণে আমি মুগ্ধ হই নাই যাতে সে এই কেন্দ্র থেকে আমাদের পার্টিনার্থিত করতে পেরিয়ে না হলে আমি মর্মাহত হব। আমার নিকট ঐ স্থানীয়তা বিস্তারের আয়োজনটাই ছিল একমাত্র আকর্ষণ, যা নাকি আপনাদের আমার পাওনায়।

তখন এবার আর অবোধ বন্ধুর দিকে তাকায় না। পাঞ্জাবির পকেট থেকে সিগারেট এবং দেশলাই বার করে একটি সিগারেট ধরায়। এত দুঃখ যোগায় ছেড়ে গেল, আবার সামনেই আপনি আমার বাবার সম্বন্ধে এত বড় কথাটা বললেন?

চাটুজ্যে বলেন, আহা থাক না ভবেন, ভাবনারই কথাটা কিছু, নয়!

ভবেন গর্জন করে ওঠে, আপনি চুপ করুন। আপনাকে কে ওকালতি করতে ডেকেছে? আমি পণ্ডিতমশায়ের কাছে কৈফিয়ৎ চেয়েছি।

পণ্ডিত সিগ বন্ধুর আদেশের একটি ছিলের কথা মনে পড়ে যায় মুখে পণ্ডিতের বলেন—কৈফিয়ৎ! কৈফিয়ৎ কিসের তথা-ভ্রম? সুরেন্দ্রনাথ তোমার পিতা, তিনি তোমার পূজ্য; কিন্তু, সত্যই কি তিনি পত্রতাস্বরূপীর ব্যক্তি ছিলেন? এ অপিসে সাতের ওপরোচনায় কেন ছেড়ে বাধা করছ আমাকে?

রাগে কাঁপতে কাঁপতে ভবেন বলে, আপনি ভয়ঙ্কর বড় পণ্ডিত আমি দেখে নেব। আপনি ভুলে যাবেন না, আমার বাবাই আপনাকে ঘাড় ধরে গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দিয়েছিলেন, আপনি ভাববেন না, পরোয়াজন হলে আমিও আপনাকে ছিটেফোঁটা ছেড়ে উচ্ছেদ করতে পারি। আমিও বাবুদের ছেলে। আমিও ঘেন্নাপাশ দিতে পারি।

এবারও হেসে পণ্ডিত বলেন, কথাটা 'ঘেন্নাপাশ' নয় 'ঘৃণাপাশ'। তা ও উচ্চা-রণ তো তোমার ছিলেবেলা আসবে না বাবা। কিন্তু, ভবানন্দ—

ওঁকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে ভবেন বলে, বেশ দেখা যাবে। আমিও দেখে নেব আপনি কত বড় পণ্ডিত।

পরমন্ত পণ্ডিত। এ নামটা ভুলেই গিয়েছিলেন নারায়রত্ন। তাই তো, এ নামটা তো তাঁর আজও ঘুচল না।

ক্ষুব্ধের কণ্ঠস্বরে সম্বিৎ ফিরে পান আবার। দেখেন, আগন্তুকরা কখন চলে গেছেন। শুধু, বলছে, তখাবাকে না চটালেই পারতে বাবা। ওর বা চক্ষুলে হাল, একটা কুরুক্ষেত্র কাণ্ড করবে।

পণ্ডিত ধরুন, হেরা পায়ে দিতে দিতে শুধু, বলেন, 'কুরুক্ষেত্র' বলিল কেন রে? কথাটা 'কুরুক্ষেত্র'।

শুধু, কিছু, বলে বলে নি। ভবেন তার পিতার উপযুক্ত পুত্র হয়ে উঠেছে ইতিমধ্যে। প্রতিবাদী তার নেই, কিন্তু, প্রতি-বাদের মেজাজটা আছে। কমতাটাও। ভূবাধি-কারীর বাগানবাড়িকে কমতার দাপটে তার পিতা পিতামহ সমাজের মাথায় চড়ে বসে একদিন অবৈচ্ছাচার করেছেন; যান অন্যেরা খেয়াল-খুশীতে, আমার-উপরে করেছেন

গলায় গামছা দিয়ে। যাহোক বাকি পড়ার ধরে পণ্ডিতকে বেঁধে ফেলেছেন জমাদার-বাড়ির ঝাড়ের সঙ্গে। তবেদের বাবা সুরেন্দ্রনাথের লাঠিয়াল বাহিনী সর্দারকে না চেনে কে? যেমন ওজনের ছিল তার কাঠামো তেমনি নির্মম ছিল তার অন্তঃকরণ। কর্তাদের হুকুমে হাতায়াতি গামছাকে গলার আগুন ফেলে পাকিয়ে দিয়েছে। সে মহেশ সর্দার আজ এখন নেই—গ্রামিমারী হস্তান্তরের সঙ্গে সঙ্গে তাকেও বিদায় দেওয়া হয়েছে। তবু, তবেদের হুকুম তামিল করবার লোকের অভাব নেই। গামছার নতুন মোহাবন্ধের হাতে বেঁধে সে শক্তি সঞ্চার করেছে; সে গ্রামে আর উত্তরাধিকার সূত্রে নয়, আপন অধিকারে তাকে সমাজের মাথার উপরে বসতে হবে। তাই সে এবার এই কেন্দ্র থেকে নির্বাচনে দাঁড়াতে চায়। কোন পক্ষের টিকিট পাবে তা সে ভাবে না; সেটা বড় কথা নয়। বেয়াৎ না হলে নির্দলীয় হয়েও দাঁড়াবে সে। বলে তো ভোট দিলেই হল। আসল কথা নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া। বিধান-সভায় গিয়ে বসবার অধিকার পাওয়া। তার-পর কি করে কি করতে হয়, সেটা তার ভাল রকমই জানা আছে। তবেদের অসুবিধা হচ্ছে এই যে তার নামে বিস্তর বদনাম রটে গেছে এ অঞ্চলে। সকলেই জানে সে অত্যন্ত বেশী পরিমাণে ঘুষ খায়। ঘ-তারাস্ত আরও কিছু আনুষঙ্গিক দোষও তার আছে। তা থাক। সে তো অনেক অনেক মহাপুরুষেরই আছে। ভোটাররা তো আর তাকে জামাই করছে না। ছোট কথা আগামী বছর নির্বাচনে প্রার্থী হতে হলে তাকে সপ্তাহে কিছু ভাল ভাত এখন থেকেই করে ফেলতে হবে। ইউনিয়ন বোর্ডের সড়কটা পাকা করানোর জন্য সে উপর মহলে খুব লেখা-লেখি ছোটাছুটি করেছে। গ্রামের স্বাস্থ্য-কেন্দ্রের জন্য ছয় বিঘা জমা ছাঁই সর-কারকে দান করেছে। ওটা অবশ্য বন্ধ। জমা ছাঁই, ফসল হত না কিছু লাভ তা ছাড়া তাকে নামে খাজনাটুকু এত দিনও দেয় না। এ ভালই হয়েছে। এবার সে চেয়েছিল মেয়েদের জন্য গ্রামে একটি স্কুল খুলতে। অন্ততঃ বছরখানেক চলেও যদি কাজ হয়ে যায় তাহলে তার কার্যোপযোগী হতে পারে। সে হিসাব করে দেখেছিল এ কয় মাস স্কুলটা জমা-মাহিনায় চালালে তার এমন কিছু খরচ হত না। তারপর অর্থাভাবে নির্বাচনের পর স্কুল যদি উঠে যায় সে কি করতে পারে? গ্রামের জনৈক পণ্ডিত পদস্থ ভট্টাচার্যকে সবাই সম্মান করে। তাঁর নামটা প্রধান শিক্ষক হিসাবে দেখাতে পারলে কাজ হত; কিন্তু বুড়ো কিছুতেই রাজি হলেন না। বেল, সেও দেখে নেবে এক হাত। সেও বাপ কা বেটা।

দিন সাতেক পরের কথা। পণ্ডিত বসে বসে একটি পুঁথি পড়ছিলেন, তাক পিয়ন একখানি চিঠি দিয়ে গেল তাঁকে পণ্ডিত প্রথমে হলেন। চিঠিখানি তাঁর নামে এবে-বারেই আসে না। তিন কুলে তাঁর কেউ নেই। তার যা কলকাতায় কেউ পত্রলেখন করে না। আর কলকাতে বা তাঁর আছে কোথায়? কখ থাকা। উল্টে পাল্টে দেখলেন। মোটা মোটা হরফে তাঁরই নাম লেখা আছে বটে। খুব, গরু, দুইতে মোহরও দেছে। পণ্ডিত চিঠিখানি খুলে পড়লেন।

অবাক কাণ্ড। মেয়েলি হাতের হস্তা-ক্ষরে অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তি তাঁকে লিখছে, যে সে অত্যন্ত অসৎ উপায়ে বিপুলভাবে ধনশালী হবার বন্দোবস্তের মেয়ে; তাই এই বাইশ বছর বয়সেও সে অবিবাহিতা। পিতা-মাতা গত হয়েছেন। ভাইয়ের সংসারে থাকার সম্পত্তি ভাইও তার সম্পত্তিভাগের দাবিত্ব নিতে অস্বীকার করেছে। তাই সে পণ্ডিতমশায়ের কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করছে। লিখেছে, 'আপনি আমাকে চিনিতে পারিবেন না। আমাকে হয়তো দেখিতা থাকিবেন। আমি এ গ্রামেরই মেয়ে। আপনি আমাকে শ্রীচরণে স্থান দিলে আমি আপনার পরি-চারিকা হিসাবে থাকিতে পারি। তাহার বেশী দাবী করিবার সাহস আমার নাই।'

পণ্ডিত দুর্গতিহর বিচলিত বোধ করেন, না হলে হুঁকোটা তুলে নিয়ে তখনই বর্ণাশুদ্ধিগুলি সংশোধন করতে বসতেন। পত্রখানি তিনি লুকিয়ে ফেলেন। কে এই যুবতী? পরিচয়হীনা সকলেই তাঁর পরি-চিতা। কেন, ব্যাহ্মণ পরিবারে এ রকম একটি মেয়েকে দেখেছেন বলে তো মনে করতে পারেন না। তিনি কী সাহায্য করতে পারেন? তাঁর গৃহে ঐ মেয়েটিকে স্থান দেওয়া চলে না। অনাত্মীয় ঐ বয়সের একটি মেয়েকে আশ্রয় দিলে সেটা দৃষ্টিকটু হবে। তিনি নিজেকে চেনেন, সেদিক থেকে অবশ্য মেয়েটির কোন বিপদের আশঙ্কা নেই; কিন্তু গ্রামাসমাজ এটা অনুগ্রহে দেখবে না। সেজন্য পণ্ডিত সমাজকে দোষও দেন না। তিনি তো সামান্য ঘরস্থানমুখ, স্বয়ং সাঁতা দেবীও অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে সমাজের দাবী মিটিয়ে ছিলেন। তাছাড়া মেয়েটি পত্র শেষে লিখেছে: 'আপনার অনুমতি পাইলে আপনার শ্রীচরণে প্রণাম করিতে যাইব।' কিন্তু অনুমতি তিনি দেবেন তাকে? দেবেন কেমন করে? একবার মনে হল মা-বাবার সঙ্গে পরামর্শ করেন। কিন্তু সে বেচারি নিতান্ত শিশু। সে তাঁকে কী পরামর্শ দেবে? একবার মনে হল তারাতারাকে চিঠিখানা দেখান —কিন্তু তাতেও কেন কেন মন থেকে সায় পেলেন না। স্থির করলেন, এ বিষয়ে তাড়াহুড়ো করা কিছু নয়, দু-চার দিন চিন্তা করে কি করণীয় তা স্থির করবেন।

কিন্তু চিন্তা করবার অবকাশ তিনি পেলেন না। তিন দিনের মাথায় ঐ অপরি-চিতা মেয়েটি আবার একখানি পত্রাঘাত করে বসল। এবার তার দাবী অরেও চেপেছে। এবার দুর্গতিহর পেরেশন লিখেছে যে খোলাখুলি লিখেছে, পণ্ডিত যদি তাকে পায়ে স্থান না দেন, তার নারীত্বের ক্ষতি করে নেন, তবে সে আত্মঘাতী হবে।

কী আশ্চর্য! মেয়েটি কি পাগল? নিজের নাম সে লেখে নি। ঠিকানা লেখে নি, তাহলে পত্রের উত্তর সে আশা করছে কেমন করে? সে কি করে নিশ্চয়ে পণ্ডিত তাকে চিনতে পেরেছেন? এ তো দয়া ভিক্ষালাভ পত্র দেখা। পণ্ডিতমশাই এখন এমন ধাঁধায় পড়েছেন যে এ পত্র আর কুকুরকে অথবা ডাক্তারকে দেখানো চলে না। অথচ কিন্তু একটা তো করতে হয়।

দুদিন পরের কথা। গামছা আর বড়া নিয়ে বুকু, শিবাঁই দিকে চলে গেল। পণ্ডিত পাটি পাতবার জোড়া খুঁজে ফিরছিলেন। হঠাৎ একটি ছেলে এসে বেড়ার গায়ে সাইকেলটা ঠেকিয়ে রাখল। সেই খুলে ভিতরে এসে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল পণ্ডিতকে। ছেলেটিকে তিনি চিনতে পারলেন না, বললেন—কে বাবা তুমি? আমি তো ঠিক—

—না স্যার, আমাকে আপনি চেনেন না। কিন্তু কথা ছিল, মনে আছে কি?

একটু বিস্মিত হয়েই পণ্ডিত মাথের উঠে বসলেন। ছেলেটি তার ঝোলা সাইকেলের পকেটে হাত চালিয়ে একখানা খাম বার করে আনল, বললে, আপনার একখানা চিঠি আছে স্যার।

—কার চিঠি?

—খুলে পড়লেই বুঝতে পারবেন।

পণ্ডিত আপত্তি করেছেন আপাতত। বলেন, সেটা পরিধান করেছি পরে, কিন্তু তুমি এ পত্রখানি কোথায় পেলে?

—খুলেই দেখুন না স্যার। আমি তো আর চালিয়ে যাচ্ছিনে।

পণ্ডিত আর বাক্যব্যয় না করে খামটা খুলে ফেলেন। হাঁ, যা আশঙ্কা করেছিলেন তাই। এবার মেয়েটি পত্রলেখার নিজের নামও লিখেছে—'রত্না'। লিখেছে, 'আপনার পত্রের জবাব না পাইয়া এই ছেলে-টিকে পাঠাইলাম। আপনার মতামত এর মারফতে জানাইবেন।'

পণ্ডিত আশ্চর্যান্বিত হলেন, 'রত্না কে? তোমার কোন আত্মীয়া?

—হাঁ স্যার, এক রকম আত্মীয়াই। আমার দিদির মত।

—কোথায় থাকেন তিনি

—এই কাছেই।

—তাঁর ঠিকানা কি?

—সবই বলব স্যার, আগে বলুন আমার দিদিকে কি আপনার চরণে ঠাঁই দেবেন?

পণ্ডিত গম্ভীর হয়ে বলেন, তোমার দিদিকে বলবে বিরুদ্ধমতিভ্রান্তির সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নাই।

ছেলেটি দাঁত দিয়ে নখ কাটতে কাটতে বলে, সে কথাটা আপনি নিজেই তাঁকে বললে ভাল হয় না স্যার?

একটু ভেবে নিয়ে পণ্ডিত বলেন,

ঠিক বলেছ তুমি। আমি নিজেই তাকে বুঝিয়ে বললে ভাল হত; কিন্তু এ স্থানে তার যাওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

—না মামা, এখানে ওসব ঝামেলা তো হতেই পারে না। এখানে জলবায়ু ভেদে থাকে। আপনি যদি অনুমতি দেন আমি কাল ওকে আপনাকে রত্নমালির বাড়ি দিয়ে দিতে পারি।

—আর কে আছেন সেখানে?

—আর কে থাকবে? রত্নমালি ছেলে একাই থাকে। দিনকুলে তার কেউ নেই।

—তথাস্তু। তাই যাও তুমি। তবে ছোকরার সঙ্গে আমি যখন থাকলাম তখন তখন তোমাকেও উপস্থিত থাকতে হবে।

ছেলেটি ঘাড় চুলকাতে চুলকাতে লাজুক মুখে বললে, এ কী একটা কথা হল মামা? হুকুম হল আপনি আমার বাপের বয়সী; আপনি যদি রত্নমালিকে দুটো মনের কথা বলেন, সেখানে আমার থাকাটা কি ভাল দেখায়?

—কী লোভন আর কী অশোভন তা আমাকেই স্থির করতে দাও। তোমার উপস্থিতিতেই আমি তোমার শিষ্যকে কয়েকটি উপদেশ দিতে চাই।

—বেশ তাই হবে মামা। কাল ঠিক সন্ধ্যেবেলায় আমি আসব।

—উত্তম!

পণ্ডিত স্থির করলেন ও বাগানের একটা আলাদা করা দরকার। সন্ধ্যে কোথায় চলেছে? ঐ ছেলেটি কেমন করে এতদূরে নিরক্ষরের মত বুদ্ধিমান পত্র পাঠাচ্ছে, লিখতে পাঠাচ্ছে? ও কি কোন মনের অসুখে ভুগছে? সে কি সত্যই বিভ্রান্তচিত্তা? না কি সংসারজনের তাড়িতে অন্তরঙ্গ-মন্ত্রা-সহচর কোন বোধ আর ওর অবশিষ্ট নেই? তাই ভোর তিনি ছেলেটিকে সব কথা বুঝিয়ে বললেন। হাঁ, এক সময়ে পাঁচ বছরের একটি শিশুকে মানুষ করে তোলবার পরোক্ষভাবে তিনি স্বিতীয়বার দারপরিগ্রহে স্বল্পই স্বীকৃত হয়েছিলেন। কিন্তু তাও আর পাঁচ বছর আগেকার কথা। না-মণি এখন আর শিশু নয়; সে এখন অনেক বড় হয়ে উঠেছে। তার আর অভিভাবিকার প্রয়োজন নেই। সে নিজেই এখন জননী—ন্যায়রত্নই এখন তার অসহায় সন্তান। ওঁর জীবনে নারীসঙ্গের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। সে প্রয়োজন অবশ্য কোন দিনই অনুভব করেন নি। এছাড়া অবশ্য সেই ছেলেটির প্রয়োজনের কথা তার পূর্ণ পরিচয় জেনে নিতে হবে। কোন সৎপাত্রের হাতে তাকে সমর্পণ করা যায় কিনা দেখে দেখতে হবে। সেটা সম্ভব না হলে কোন অসচ্ছলের পরিবারে ছেলেটির যোগাযোগটি গড়েপিটে দেবার ব্যবস্থা করা যায় কিনা সে চেষ্টাও করে দেখবেন। ছেলেটির পাঠানো যে তীব্র ঘৃণা পত্রব্যবহারে ছেলেটির সেটা করে এসেছে, সেটা মনে করলেও মুখোপাধ্যায় হয়ে যাচ্ছিল অকারণ। তত বড় পত্রোত্তরের আগেই একটি বন্ধুজনী অন্তরে লম্বা-সরল কাগজখানিতে বিনাশ্রমে দিতে পারে সেটাও তো ভেবে দেখতে হবে।

পরদিন ঠিক মোকুলি বেলায় ছেলেটি এসে হাজির হল। সাইকেলে চেপেই। হাতে তার একটি টর্চ। খুব পরিশ্রম করে, কোথাও চড়ে যায়?

—এজ্ঞে, পত্রোত্তরে আছে না। তাই পালাই। সুখে করে যাও।

সন্ধ্যের পর আজকাল আর সচরাচর বাইরে যান না, খুব একটি বিস্মিত হল হচ্ছে; কিন্তু দ্বিতীয় পত্রোত্তর করল না। পাখা বন্ধ করে দিল ভিতর থেকে।

পত্রমা বলপথ দিয়ে টর্চ ফেলতে ফেলতে ছেলেটি আসছে চলেছে। পণ্ডিত নিঃশব্দে তাকে অনুসরণ করছেন। লোকালয়ের বাইরে এসে ছেলেটি বললে, একটা কথা মামা, রত্নমালি ছেলেটা লাজুকই ভাল, ছোকরা নিরক্ষর সে নয়; তাকে বকবকি করবেন না তো?

পত্রোত্তর পণ্ডিতের মনটা কঠিন হয়ে ওঠে, বলেন,—না তিরস্কার করব না। বুঝিয়ে বলব শুধু।

—ওকে আপনার চরণে ঠাঁই দেবেন তো মামা?

—সে পত্রোত্তর তোমার শিক্ষার সঙ্গেই আলোচনা করব।

ছেলেটি আড়চোখে একবার মুখের দিকে তাকায়। অন্ধকারে তাঁর মুখটা ভাল দেখা গেল না।

—এ কোথায় চলেছ তুমি?

—এই এসে পৌঁছি মামা; ঐ যে আলো দেখা যাচ্ছে।

পত্রোত্তরের এখনে যে কতকগুলি ঘুটীর ছিল তা পণ্ডিতের জানাই ছিল না। সকলের পত্রোত্তরে একটা বাগানের কতকগুলো লোক উঠে হয়ে বসে প্রতীক্ষা করছে। একটা উৎকট গন্ধ নাকে গেল পণ্ডিতের। এ গন্ধ তাঁর চেনা। কালিতারা ফোঁকেন এ গন্ধ তিনি ইতিপূর্বেও পেয়েছেন। পেয়েছেন তেঁতুলের গন্ধে। পণ্ডিত বুঝতে পারেন এটা একটা ঘরের দোকান। পাড়াটা ভাল নয়। ঐ ছেলেটির কর্মস্থলী, কী কোন নাম তার, তার পক্ষে এ পাড়ায় এ রকম অবস্থিতি একটা ধারা ঠিক নয়। পণ্ডিত সেই ভাবেন। মেয়েটির জন্য আরও একটু উৎকণ্ঠিত বোধ করলেন।

এ পথ সে পথ দিয়ে ছেলেটি এগিয়ে চলে। খুব একটি ঘরে বাতি জ্বলছে। একটি কুটীরের পাশে দুটি ছেলে দাঁড়িয়ে ছিল। —পণ্ডিতকে আসতে দেখে তারা দুজনে ছেলে এ ওর গায়ে লুটিয়ে পড়ল হয়ে কয়েকটি আসায় তারা দরজাটা বন্ধ করে দিল।

সাইকেলটা একটা ঝোপের ধারে ঠেকিয়ে রেখে ছেলেটি অনুচ্চস্বরে ডাকল —রত্নমালি!!

ঘরের ভিতর আলো জ্বলছিল। এক ওদিকেই সাড়া পাওয়া গেল। মহিলাটি বোধহয় ওই আহ্বানের প্রতীক্ষাতেই ছিল এতক্ষণ। খুট করে দরজাটা খুলে গেল। পরমুহূর্তে একটি মেয়ে এসে দাঁড়াল খোলা দরজার ওপাশে।

—রত্নমালি, ইনিই পণ্ডিতমশাই।

মেয়েটি পথ ছেড়িয়ে বললে,—আসুন।

ভদ্রচালিতের মত পণ্ডিত পায়ে পায়ে এগিয়ে এলেন।

ঘাটির ঘর। ঝকঝক তকতক করছে। নিঃশব্দ হুকুম মোকর দিয়ে নিকানো। ঘরে একটি চৌকি পাতা। বালপাশে মাদা চাদর বিছানো আছে। পাশাপাশি দুটি মাথার বালিশ—বেশ চওড়া চৌকিটা। ওপাশে একটা কুলুঙ্গিতে লক্ষ্মীর পট। কাল বৃহস্পতিবার, তাই। লক্ষ্মীর পটে গাঁদার মালাটা এখনও শুকিয়ে যায় নি। চৌকির মাথায় কয়েক একটা নিচু কাঠের টুল। তাতে একটি পিতলের সেকাকিতে কিছু ফুলই ফুল। তার সৌরভে মনটা স্নিগ্ধ হয়ে যেন পণ্ডিতের। ওপাশে একটি ঘড়ি টাঙানো আছে, তাতে ঘানকম পাঁচ, সাড়া তুলছে। ঘরের এপাশেতে একটি হারমনিয়াম।

মেয়েটি সতরঞ্চিটাকে মাদুর কুলুঙ্গির উপর। তারপর একখানা মাদুর বিছিয়ে দিয়ে বললে, বসুন।

পণ্ডিত চটিজোড়া ঘরের বাইরেই খুলে এসেছিলেন। মেয়েটির দিকে এখনও চোখ তুলে তাকিয়ে দেখেন নি। পত্রোত্তরের মুখ অবস্থায় তিনি শুধু দেখেছিলেন আলতা-রাঙা। দুটি শুভ্র চরণ আর সেই চরণযুগলকে বেষ্টন করা একটা সোনালী প্রতিপাড় শাড়ি।

পণ্ডিত পা মুড়ে মাদুরের উপর বসে বললেন।

মেয়েটিও বসল মাদুরের অপর পত্রোত্তরে, বেশ দূরত্ব রেখে। সেখান থেকেই মৃদু হেসে বললে—আপনি যে শেষ পর্যন্ত আসবেন তা অবশ্যই ভাবি নি আমি।

এবার পণ্ডিত চোখ তুলে তাকালেন মেয়েটির মুখের দিকে এবং তৎক্ষণাৎ মুখ ঘুরে গেলেন। তাঁর বুকের ভিতরে মোচড় দিয়ে উঠল। আহা। এ যে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীপ্রতিমা! এরই জন্য উপযুক্ত পাত্র জুটছে না? দেবের মানুষে কি অন্ধ? টানা-টানা কাজলকালো দুটি দীর্ঘায়ত চোখ, কপালে একটি সিঁদুরের টিপ, গলায় একটি পুঁতির মালা। আট ঘরে বাঁধা খোঁপায় জড়ানো একছড়া বেলফুলের মালা।

পণ্ডিত এতক্ষণে স্থিরচিত্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, খেয়াল করেন নি তিনি ঘরে পদার্পণ করা মাত্র ঘরের একমাত্র দরজাটি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আগন্তুক ছেলেটি আদৌ ঘরে পদার্পণ করে নি, সেটাও খেয়াল হল না বৃদ্ধের।

পরমুহূর্তেই পণ্ডিত দৃষ্টি নত করলেন। কালী মাসীমাকে ওর অলক্ষ্যে-প্রীতম চন্দ্রনাথের দিকে তাকিয়ে পণ্ডিত হঠাৎ এক নিঃশব্দতায় অনেক কথা বলে গেলেন, বললেন—বা রে। কেন তুই এমন পাগলামি করছিস মা? আমি বৃদ্ধ, ব্রহ্মণ-পণ্ডিত। তুই কি ধর্মবিশ্বে তোর নিজ পরিচিতির কোন দিন খোঁজ নাই? তুই যে পুরোর পুরুষ রে। তুই আমার ব্রহ্মকন্যা, নচেৎ তোকে পূজার করতাম আমি। তোর ঐ রূপের জন্যে আমি যে সাক্ষাৎ চামুণ্ডাকে দেখতে পাচ্ছি মা।

মেয়েটি কেমন যেন ভয়চকিত হয়ে যায়। বলে—আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, আপনি...মানে...আপনিই পণ্ডিতের ভাগ্নে-চার্য তো?

—হ্যাঁরে পাগলি। তুই তখনকে চিঠি লিখেছিলি।

—কিন্তু আপনিই কি আমার বাবার আগে আমাদের ডাক্তারবাবুর সঙ্গেই বিবাহ করতে চেয়েছিলেন?

হা হা করে হেসে ওঠেন বৃদ্ধ, বলেন, ওই তো অনেক সংবাদ রাখিস রে। তা প্রমাণ দে—

—তাহলে...আর মানে—

মেয়েটি লজ্জাসঙ্কোচে থেমে যায়।

পণ্ডিত বলেন, সুশীল ওর কথা, সে তার দুঃখের কথা। দুঃখের কিন্তু আনন্দের। কাউকে কখনও বলি নাই। আজ তোকে বলব। তুই যে আমার মা। মায়ের কাছে না বললে আর কাকে বলব? আর তাছাড়া তোর এসব কথা জানাও দরকার—

অকপটে পণ্ডিত সব কথা বলে গেলেন, দীর্ঘ সময় ধরে কোন প্রশ্ন বোধ করলেন না, কোন সঙ্কোচ বোধ করলেন না। কিসের লজ্জা-সঙ্কোচ? ও মেয়েটিও তো লজ্জা-সঙ্কোচ বিসর্জন দিয়ে তার সন্তানের কথা পণ্ডিতকে অকপটে জানিয়েছে। তিনি ওকে 'মা' বলে ডেকেছেন; মায়ের কাছে লজ্জা কিসের? তাছাড়া পণ্ডিত চেয়েছিলেন ডাক্তারের স্ত্রীর প্রকৃতকথা জানতে পারলে এই অসহায়া মেয়েটি মনে বল পাবে। মুক্তির বাই যাই বলতে বলতে পণ্ডিত কিন্তু তন্ময় হয়ে গেলেন। মুক্তলেন, মনের একটা কোণে দীর্ঘদিন একটা নিরুদ্ধ অভিমান পুঞ্জীভূত হয়েছিল—কারও কাছে মন খুলে বলতে পেরে মনটা হালকা হয়ে গেছে। পণ্ডিতমার মৃত্যুর কথা থেকে শুরু করে একে-একে সব কথাই বললেন। মা-মণিকে নিয়ে কিভাবে স্বামীর ঘরে আশ্রয় ভিক্ষা করে ফিরেছেন। শ্বশুরবাড়ির নির্যাতন, ঘুলোকের ঘরের ভাসানো বললেন, চন্দ্র-কান্তের কথা, ডাক্তারের কথা। শেষে বললেন, চণ্ডীগড়ে ফিরে যাবার বিষয়ে কথা যাবার কথা। রেলস্টেশনের সেইদিন কেন তাঁকে কিভাবে চন্দ্রনাথ ফেলে পণ্ডিতে দিয়েছিল, ফুলের মালা গলায় দিয়েছিল তার বলতে ভুললেন না। তারপর সেই ব্রাহ্মণকন্যার নিজস্ব পরিচয়। শেষে পণ্ডিতের হাত ছেড়ে দিয়েছিল, সন্ন্যাস নিয়া উপার্জিত করেছিল। চক্ষুতাকে অবশ্যই তিনি কেমন করে ফিরে এসেছিলেন তাও বললেন সবিস্তারে। এই তারপর সেই পুত্রের জন্মদান যেমন করে তাঁর উঁচু মাথাটা ধুলায় লুটিয়ে দিয়েছিল।

এত দিন এ নিরুপায় অপরাধের কোন মীমাংসাকরণ হয় নি, আজ কি জানি কেন তাঁর অন্তরের অন্তঃস্থলে যে সঞ্চিত নিরুদ্ধ বেদনাই মূর্ত হয়ে উঠল, বাঙ্ময় হয়ে উঠল। বৃদ্ধ জানতেও পারলেন না, তাঁর শীর্ণ গাল বেয়ে কতবার এল ধারা নেমে এল। মেয়েটি কাঠের পুতুলের মত বসে আছে একেবারে নিঃসাড়। স্তম্ভিত হয়ে গেছে সে। বোধ করি সে নিঃশ্বাসও ফেলছে না, পাছে ব্যাঘাত হয় বাল্ক অশ্রুতপ্ত কথনের। দীর্ঘ কাহিনী শেষ করে বৃদ্ধ বললেন, তবেই দেখ মা, সেই ডাক্তারবাবুর কলাটির আজ সব হয়েছে, সে স্বামী পেয়েছে, সন্তান পেয়েছে, সংসার পেয়েছে। তুই-ই বা এমন ছেড়ে পড়াশিস কেন? আমি নিশ্চয় করে বলছি, ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখ, তোরও সব হবে, তোর এমন চন্দ্রনাথের মত বল—

হঠাৎ মুখ তুলে পণ্ডিত দেখেন তাঁর পোড়ার ভাই গানে নেমেছে পরমোৎসাহে বাবা। কী একটা কথা বলতে গেলেন তিনি, কিন্তু, তার আগেই বাইরে একটা কোলাহল শোনা গেল।

চমকিত পণ্ডিত সহসা বাস্তবে ফিরে আসেন। উঠে দাঁড়ান। বলেন, এত কোলাহল কিসের?

পরক্ষণেই দ্বার খুলে গেল। বিস্ময়াহত পণ্ডিত দেখেন দ্বারের ও পাশেও কুড়িজন লোক ঠেলাঠেলি করে দাঁড়িয়ে। তাদের পুরোভাগে তবেন চক্রবর্তী।

ওরা ঘরে পা দেয় না। তবেন বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে বলে—বাঃ বাঃ বাঃ! তুমিও এসে জুটেছ এ পাড়ায়? এ্যাঁ? নারায়ণ! নিকিরি নিকিরি চিরকাল ওধারে।

নরেন বলে—এর মানে কি? আপনাকে আমরা সচ্চরিত্র বলে জানতাম।

তৃতীয় একজন বলে—বেশ্যাকে আপনি ব্রতনার ঘরে রাত কাটাতে এসেছেন? ঘেন্নাপিত্তি! ছি ছি ছি ছেলে-পড়লেন একটা বেলাপল্লীতে।

—কী! কী বললে? —স্তম্ভিত হয়ে শুনছেন পণ্ডিত।

তবেন বলে, শালা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।

—শালা পাষণ্ড পণ্ডিত।

ভট্টাচার্য মশাই মেয়েটির দিকে মুখ ঘোরান। তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে চেয়ে-চোখ তেকে বলেন, তুমি তুমি.

কথাটা তাঁর শেষ হয় না। তার আগেই তবেন পিছন থেকে পণ্ডিতের টিকিটা চেপে ধরে ঝাঁকুনি দিতে। বাকিরা একটা মজার ব্যাপার ঘটে যাবার আগেই হাততালি দিয়ে তবেনের সঙ্গে যোগ দিল। হাসি এল।

তবেন মদ্যপান করে এসেছিল, জ্ঞান ছিল তার ঈষৎ। মুহূর্তে তার থেকেই আলস্য হয়ে গেল। এবার ব্রতনার মুখোমুখি হয়ে বললে: বড় স্পর্ধা তোর। তুই আমার মদ্য দিস্।

এক পা এগিয়ে আসে সে। চমকে ব্রতনা সরে যায় চৌকির ও পাশে। কিন্তু তবেনের হাতের তখন ঘন চেপে গেছে। অকস্মাৎ একটা অমানুষিক গালাগাল দিয়ে মুষ্টিবদ্ধ হাতে সে এগিয়ে যায় ব্রতনার দিকে। ব্রতনা সেখান থেকেই চিৎকার করে ওঠে—মহেন!

মুহূর্তে ঘরে প্রবেশ করে পড়ে একজন মধ্যবয়স্ক লাঠিয়াল। বলিষ্ঠ গঠন তার, খালি গা, মাথায় একটা গামছা বাঁধা, গলায় একটা শিঙলের মালা, হাতে তেলপাকা একটা লাঠি। সেখান থেকেই বজ্রগম্ভীর স্বরে বলে,—মা?

—এই লোকগুলোকে মার করে দাও।

মহেন ঘরের ভিতর চলে আসে। বাঁ হাতটা তখনও মুঠিতে তবেনকে ধরে রাখে। ডান হাতে তবেনকে ঠেলা দিয়ে ব্রতনার কাছে এনে বলে: ছোট কর্তা। একটি কথা নয়, বাইরে আসেন।

তবেন গর্জন করে ওঠে

এমন নেমকহারামি করলি?

মহেন হা হা করে তার মুখে হাসি বলে—এটা কি কইলেন ছোট কর্তা? ওরে আপনি নিমকহারামি কন? যখন চরিদার সরকারে কাম করতাম, আপনের হুকুমের মানুষের জামা নিছি। তখন এই দিদিঠাকরুনের নিমক খাই—এঁদেরে হুকুমে আপনের নিলার পারি। আসেন, বাইরে আসেন।

তবেনের গলে, ছোকে আমি—

তার কথাটাও শেষ হয় না। মহেন ওর হাতে ঝাঁকুনি দিতে তবেনের কব্জিটা ছেড়ে গেল। ঘরে একটা হুড়োহুড়ি ঢাল মারে। তবেনের হুকুমে হরিদল, হাত ধরাধরি এ একটি কথা কইলে ঘাড় ধরা যাবে ওরুন কিন্তুক।

তবেনের মাথা নিচু করে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে। তার অনুচর সঙ্গীও গেল পিছু পিছু। মহেন সর্দার গেল তাদের সঙ্গে।

বৃদ্ধা পণ্ডিত মশায়ের দিকে ফিরে বলে, বাড়ি যান পণ্ডিত মশাই, কেউ আপনার গায়ে হাত দেবে না।

—কিন্তু মা, তুমি কি তুমি কি.

—হ্যাঁ পণ্ডিতমশাই আমি তাই! ভুল আপনার হয়েছিল, ভুল আমারও হয়েছিল ওরা আমাকে বলেছিল একজন ফিরে পাগল। গুরোকে নিয়ে ওরা নির্মোহ মজা করতে চায়

আমি আপনার দুঃখের কথা কিছুই জানতে চাই না। আমি জানতাম না, ওরা আপনাকে এতখানি কষ্ট দিতে পারবে। আপনাকে একবার দেখতে চাই।

বৃদ্ধ বলেন, ও-সব কথা থাক। তবে যাই না।

—একটু দাঁড়ান। আপনাকে একবার প্রণাম করব আমি।

—থাক থাক আবার প্রণাম কেন?

মেয়েটি এসে এগিয়ে হাত বাড়িয়ে তাঁর সম্মুখে গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করতে গিয়েও থেমে পড়ে। উর্ধ্বমুখে প্রশস্ত ললাট চোখের দৃষ্টি পণ্ডিতের দিকে মেলে ধরে বলে, আপনাকে ছোঁব পণ্ডিত মশাই?

পণ্ডিত তার শিরোদেশে দৃষ্টি রেখে মাথায় হাত রেখে তার চোখমুখের মায়া স্নেহমাখা মমতাময় স্পর্শ করেন।

হঠাৎ মিতার ওঠে মেয়েটি। তার মাথাটা নেমে আসে নাগরাহের দুঃখভারের উপরে। পণ্ডিতের পায়ের পাতায় লাগে সিঁদুরের দাগ, আর চোখের জল। পণ্ডিত বলেন, কাঁদছিস কেন মা?

মেয়েটি মুখ তোলে, ফুঁপিয়ে বলে—সে আপনি বুঝবেন না পণ্ডিত মশাই। আমি খারাপ মেয়ে মানুষ। নিতা দু বেলা আমি মুখের গালাগাল শুনি। কিন্তু কিছুই না বলে আজ আপনি আমাকে যে মর্যাদা দিয়েছেন তা আমি জীবনেও পাই নি। জানি, এখন আর ও কথা বলবেন না আপনি; এখন সব সময় পর—

পণ্ডিত ওকে থামিয়ে বলেন—ও-সব বলিস না। আমি অন্তর্যামী নই। আমি এখনও ভুল করি। আমি এখনও হয়তো ঘাটছি তোর জন্যে আমি সন্ধ্যেতে রাস্তাটাকে দেখে গেলাম। মনমরা হোস নে। শান্ত হ। তোর কল্যাণ হবে।

পণ্ডিত বেরিয়ে গেলেন ঘর ছেড়ে। তিনি জানতেও পারলেন না, বৃদ্ধপায়ের ওপরে মাথা রেখে লুটিয়ে পড়ে ফুলে ফুলে তখন কাঁদছিল বারো।

ডাক্তারবাবু যখন দিয়ে মিত্র আসছিলেন নাগরাহে। তিনি যেমন যেন বিহ্বল হয়ে পড়েছেন। সমস্তটাই তাহলে একটা বিরাট বড়যন্ত্র? গয়না সমাহে তাঁকে ছেড়ে পালিয়েছে করতে, তাঁর উঁচু মাথাটা ধুলোয় লুটিয়ে দিতেই এভাবে জব্দ আজ এক সপ্তাহ ধরে একটা বড়যন্ত্রজাল বিস্তার করে চলেছে। মানুষ এত নীচ! তবে তো পশুদের সঙ্গে মানুষেরও কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু এত বড় দুনিয়ার কি শান্তির ছায়া কোথাও নেই, যেখানে তিনি তাঁর মা-হারা মা-হারাকে নিয়ে জীবনের বাকি ক'টা দিন শান্তিতে কাটিয়ে যেতে পারেন? যেখানে ষড়যন্ত্র নেই, চক্রান্তকারীরা নেই, জবা-নবরা নেই?

পায়ে পায়ে বাড়িতে এসে ঢোকেন এক পহরে রাতে। কৃষ্ণা পঞ্চমীর চাঁদ তখন সবে উঁকি মারছে পুবে-আকাশে। ঘর অন্ধকার। মা-মণি ঘুমোয় তাহলে কি কেন? না কি সে ঘুমিয়ে পড়েছে? দাওয়ায় উঠে দাঁড়িয়েছেন কি দাঁড়ান নি হঠাৎ দরজা খুলে ছুটে বেরিয়ে আসে খুকু। কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ সবলে বাবাকে জড়িয়ে ধরে হু হু করে কেঁদে ফেলে। বৃদ্ধ পণ্ডিত সেই কান্না পঞ্চমীর স্নান জ্যোৎস্নালোকে তার অশান্ত-বিশ্ব কিশোরী মুখটি তুলে ধরে বলেন, কী হয়েছে রে, অমন করছিস কেন?

খুকু, চুপ করে দেয় না। আবার মুখটা বাবার বুকের মধ্যে গুঁজে দিয়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকে।

পণ্ডিত ওকে বাধা দিলেন না। গভীর-স্বরে কেঁদে ওকে মনটা হালকা করতে দিলেন। তারপর বললেন, বলবি মা, তোকে কি কেউ কোন কটুকথা বলেছে?

খুকু মাথা কাঁকিয়ে বলে, হুঁ।

—কে বলেছে?

—আমি তাদের চিনি না। চার পাঁচটা ছেলে এসেছিল একটু আগে। তোমার নাম করে তাদের আমি সেই বয়সে ভুলে বসেছি—

খুকুর মুখে ছুটে ওঠে বুঝতে, দাঁতে দাঁত চেপে বলেন, তোর গায়ে স্পর্শ করে-ছিল?

আবার ডুকরে কেঁদে ওঠে খুকু।

পণ্ডিত ধীরে ধীরে বসে পড়েন দাওয়ায়। মনে পড়ে যায় অনেক দিন আগেকার কথা। সেদিন স্কুল থেকে ফিরে এসে তিনি দেখেছিলেন দুঃখবারে মাথা ঠুকতে ঠুকতে তার পাঁচ বছরের মেয়ে রাতে ডাকছিল আর বলছিল—আর দুষ্টুমি করব না আমি। মা গো তুমি ফিরে এস। আর একজন অপেক্ষামান কক্ষে খুকু কি করছিল তিনি জানেন না। সেদিনের মতই কি মাথা খুঁড়ছিল দুঃখবারে? সেদিন সেই পাঁচ বছরের মেয়েটি তার লজ্জার কথা বাপের কাছে স্বীকার করতে পারে নি—সে ছেকে এনেছিল কাকুদিদিকে। আজ খুকু তার লজ্জার কথা কাকে বলবে?

খুকুও বসে পড়ে বাবার পায়ের কাছে। তাঁর দুটি হাঁটুর মধ্যে মাথাটা গুঁজে দিয়ে বলে —জান বাবা, ওরা তোমার নামে খুব খারাপ কথা বলছিল, খু—ব খারাপ কথা। বলছিল, তুমি যেখানে গিয়েছ সেখানে নাকি....মানে তুমি নাকি.....

খুকু কথাটা শেষ করতে পারে না।

কান্নায় আবার ভেঙে পড়ে সে।

বৃদ্ধ তাঁর বলি রেখাঙ্কিত দুটি হাত ওর মাথায় বুলাতে বুলাতে বলেন, শোন, তুই যখন সপ্তমবর্ষীয়া বালিকামাত্র তখন আমাকে কয়েকটি ছেলে পত্রপাঠ পত্রার করে-ছিল। মনে আছে তোর?

খুকুর কান্না থেমে যায়।

—তিনচার দিন আমি লজ্জাশায়ী হয়ে পড়েছিলাম। ওরা আমার একটি দন্ত উৎপাটিত করেছিল, আমার শিখা নির্মূল করেছিল, মনে নেই?

কেশ প্রসাধনের শ্রেষ্ঠ উপকরণ

বেঙ্গল কেমিক্যালের

ক্যান্থারাইডিন

হেয়ার অয়েল

এই অনুপমীয় সুরভি কেশ তৈল চুলের রোগা নষ্টের ও পরিপুষ্ট রাখে, কেশ-গুচ্ছকে ঘন, সুদীর্ঘ ও মসৃ-ণ করে তোলে এবং চুল পড়া বন্ধ করতে সাহায্য করে।

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা • বোম্বাই

কানপুর • দিল্লী

খুকু উঠে বসে। মুখ উঁচু করে মা বাবা চেয়ে তাকিয়ে থাকে।

পণ্ডিত আসন ছেড়ে বলে যান, সোনা তুই কিছুই পরিষ্কার করতে পারতিস না। তবু আমাকে পরশুদিন জিজ্ঞেসও করেছিলি—বাবা ওরা তোমাকে এমন করে পাঠাতে চাইল কেন? তুমি কি কিছু দুষ্টুমি করেছিলে? আমি তোর কাছে স্বীকারও করেছিলাম, বলেছিলাম—না মা-মণি কোন দুষ্টুমি আমি করি নাই। তবে ভুল করেছিলাম; কী মনে পড়ে?

এবার খুকু মাথা নেড়ে সায় দেয়।

—সেদিন তুই তার উত্তরে কিন্তু না খুকুই বলেছিলি—আর কখনও তাহলে ভুলও কর না বাবা। আমি পরিষ্কার হতে বলেছিলাম, বলেছিলাম—না মা, আর কখনও এমন ভুলও করব না। আমি আমার পরীক্ষা-শুদ্ধি ভঙ্গ করি নাই রে। সেবার একটা প্লানিতে আমার অন্তঃকরণ পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। এবার, না, এবার কিন্তু মাত্র প্লানি অনুভব করছি না। হাঁ, আমি বেলা-ভূমিতেই গিয়েছিলাম মা, সেখানে একজন দেবীকে দেখে এলাম।

—দেবী!

—হাঁ মা-মণি! সাক্ষাত জগদ্ধাত্রী! তুই আর ছোটটি নস্। সমস্ত বৃত্তান্ত এবার তোকে সবিস্তারে বলব। আয় ঘরে আয়।

রাত্রে খুকুকে পাশে নিয়ে শুয়েছিলেন পণ্ডিত। সমস্ত কথা খুলে বলেছেন তাকে। পণ্ডিতের কথা, বক্তার কথা। মনটা হালকা হয়ে গেছে তাঁর। রাত অনেক হয়েছে, তবু বুঝতে পারেন খুকু এখনও ঘুমোয় নি। চুপ করে শুয়ে আছে। বাইরে বাবার হাত ধরে বেরোতে যেতে হলেন, ভাবছিলাম, ওরা তো আমাদের ছাড়বে না। আমার মধ্যে এখন ক্ষমতা নাই যে ঠেকে রক্ষা করি; অবশ্য স্থির নিশ্চয় আমি তাহলেও ওরা শুধু তোকেই থাকতে বলবে। আমি পিতা, তোর রক্ষণাবেক্ষণ করা আমার কর্তব্য। কিন্তু, আমি অধর্ম, আমি পশু!

খুকু উঠে বসে। বলে—চল বাবা, আমরা এখান থেকেও চলে যাই।

—আমিও সেই সিদ্ধান্তে এসেছি যে আর একটি দিনমানও এখানে থাকতে চলবে না। এরা মানুষ নয়, পিশাচ! যে কোন মুহূর্তে ওরা তোর চরম সর্বনাশ করে বসতে পারে। তবেন এই গ্রাম সমাজের মধ্যমণি। তার বিরুদ্ধাচরণ করতে কেহই সাহসী হবে না। না! বেশ বুঝতে পারছি—কলকাতা শহরের মত এই গ্রামটাতেও বিষক্রিয়া শুরু হয়েছে! এও সংক্রামক ব্যাধিতে ভুগছে। কিন্তু, মা, এমন তো হবার কথা নয়, এমন তো হতে পারে না।

—কেন বাবা?

পণ্ডিত চুপ করে যান। তেমন করে তিনি বোঝাবেন তার মা-মণিকে, তিনি যে বিশ্বাস করেন গ্রামদেবতার বলিষ্ঠমানি ভূতানি গ্রামেতে। স্বার্থান্ধ কোথাও না কোথাও নিশ্চয় আছে। এই ভূমিষ্ঠাতেই আছে—যেখানে সবই থাকবে ঘন, যেখানে বাতাস মধুর, যেখানে সমস্ত মধুময়, যেখানে গোপাট-ওষধি-বিনায়ক-সূর্য সমস্তই মধুময়। শুধু কলকাতা নয়, আর বাঙলা দেশের একটা গ্রাম দেখেই তিনি কেন ভাবছেন যে সেই সার্বভৌমটা স্বপন। সে কেন নিশ্চয় আছে কোথাও না কোথাও। তাঁরা ঠিকমত খুঁজে বার করতে পারছেন না। কিন্তু, খুঁজলে হয় বার করতেই হবে!

—চল বাবা, কাল সকালেই আমরা চলে যাই। আতঙ্কগ্রস্তাড়িত খুকু বলে বসল।

—তাই যাব। সমস্ত তালাবন্দ করে যাব। ঠিক যেমন সেবার কলকাতা ত্যাগ করে বেরোতে পেরেছিলাম শুধু পশ্চাদ্দেশের সূর্যে মঙ্গলকে দেখিয়ে দিয়ে যদি তাড়াতাড়ি বাড়ি।

—সেই ভাল বাবা। পণ্ডিত মহাশয় বাড়ুয্যে একটু ঘুরে পড়ে।

—এবার তাহলে ঘুমিয়ে পড়, মা।

খুকু, চোখ বোজে। এবার আর খুকু ঘুম আসছে কিনা কথা বলে না।

এবারও কিন্তু তালাচাবি দিতে তাকিয়ে দেখছিল সেই সিমেন্ট তালাটা।

পরদিন সকালে দেখা গেল বাপ-মেয়ে পোঁটলা কাঁধে নিয়ে রেল লাইনের ধারে ধারে ডিসপেনসারি হাসপাতালের পাশ দিয়ে কোথায় যেন হেঁটে চলেছে!

সূর্য উঠছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের

সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা

পশ্চিমবঙ্গ

এখন অনেক বেশী লোক পড়ছেন বর্তমানে প্রচার সংখ্যা ১১,০০০

বিক্রয়—সংখ্যা
প্রতি সপ্তাহে

অগস্ট, ১৯৬৬	৪৭৫
অগস্ট, ১৯৬৭ *	৫,৫৯৫
অগস্ট, ১৯৬৮,	১,২৭৯
অগস্ট, ১৯৬৯ *	৯,৩৯১

(*যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে)

আপনিও নিয়মিত পড়ুন। প্রতি সংখ্যা : দশ পয়সা

'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকায় বিজ্ঞাপনও নেওয়া হচ্ছে। বিজ্ঞাপন প্রচারের একটি উপযুক্ত মাধ্যম 'পশ্চিমবঙ্গ'
বিশদ বিবরণের জন্য নীচের ঠিকানায় লিখুন বা যোগাযোগ করুন :

বিজ্‌নেস ম্যানেজার, তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার, রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা—১

প. ব. (তথ্য ও জনসংযোগ) বি ৩০১৩ * ৬১

ঘুম পাড়ানি মাসী পিসী যাও, পালিয়ে যাও

দূরবীণ খাঁ

রবীন্দ্রনাথ একবার লিখেছিলেন—"বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বান এই ছড়াটি বাল্যকালে আমার নিকট মোহ মন্ত্রের মতো ছিল এবং সেই মোহ এখনো আমি ভুলিতে পারি নাই। আমি বালকের সেই মনের ভাব অবিকল স্মরণ করিয়া এ লেখাকে স্পষ্ট বুঝিতে পারিব না, ছড়ার মাধুর্য এবং উপযোগিতা কী। বুঝিতে পারিব না, কেন এত মহাকাব্য এবং খণ্ড-কাব্য, এত ইতিবৃত্ত এবং নীতিপাঠের, মানবের এত পরাভবের কথা, এত গলদ্ঘর্ম তাহার পরিণতি বার্থ এবং বিস্মৃত হইতেছে, যখন এই সকল অসংগত অর্থহীন মেঘচুম্বকৃত লোকাতীত লোক স্মৃতিতে চিরকাল পুরোহিত হইয়া আছিতেছে।"

আর ছড়ার এই চির নবীনতার কারণ নির্ণয় করে লিখেছিলেন—"ভালো করিয়া দেখিতে গেলে কিন্তু ইহার মতো পুরাতন আর কিছুই নাই। বেদ কাল নিজা পড়া অনুসারে কত নূতন পরিবর্তন হইয়াছে, কিন্তু শিশু তত সহজ, বয়সের পূর্বে যেমন ছিল আজও তেমনি আছে; সেই অপরিবর্তনীয় পুরাতন বালকের মানবের মনে নিত্য নূতন হইয়া ছন্দ গঠন করিতেছে—অথচ সর্বপক্ষের ছিল সে যেমন নবীন, যেমন অকৃত্রিম, যেমন মধু, যেমন মধুর ছিল, আজও ঠিক তেমনি আছে। এই নবীন চিরত্বের কারণ এই যে, শিশু পকৃতির সৃজন; কিন্তু বয়স্ক মানুষ বহুল পরিমাণে মানুষের নিজকৃত রচনা। তেমনি ছড়াগুলিতে শিশু-সাহিত্য, তাহারা মানব মনে আপনি জন্মিয়াছে।"

কিন্তু আজকের ছড়া—কস্মিনকালেও ছড়া নামে যা লেখা হচ্ছে তা পকৃতি থেকে অনেক দূরে। এমন কি যাঁদের দ্বারা এগুলি লেখা হচ্ছে—তাঁদেরও মনের ঠিক কতটা কাছাকাছি তা সঠিক ভাবে বলা চলে না। ছড়া ছোটদের জন্য লেখা, কিন্তু যাঁরা লেখেন তাঁরা পায়ই বয়স্ক। আর এই ছড়ায় সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশে ছড়া লেখার মূলে সর্ত সেই শিশু মনটাই কল্পনাই হারিয়ে ফেলেছেন। তাই আজকের ছড়ার বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানী ছড়ায় শিশু মনের ছোয়া বয়স্কের চাপেই অনেক বেশী দাঁকিয়ে। হয়তো এটাই স্বাভাবিক—কেননা, আজকের দিনে যখন সবাই সাহসের দিকে ছুটে চলেছেন, তখন কোথায় পিছু ফিরে তাকানো সম্ভব। তাই সমকালীন ভাবনায় আজকের পূর্ব পাকিস্তানী ছড়া লোচ্চার। আর ঠিক এই কারণেই পূর্ব পাকিস্তানী ছড়া, আমার প্রাপ্তিকের ছড়া হলেও ছড়া বলতে আমরা যা বুঝে আসছি ঠিক তা নয়।

পূর্ব পাকিস্তানী ছড়া পড়ার আগে পূর্ব পাকিস্তানের স্বনাম ধন্য কবি শহীদ কাদরীর একটা ছড়া ভূমিকা হিসেবে উল্লেখ করছি।

"ঘুম পাড়ানি মাসীপিসী
যাও পালিয়ে যাও
পূর্ব দুলুকে জাগলো সবাই
পাড়া কি আর পাও।"

বস্তুতঃ এই ছোট্ট ছড়াটি পূর্ব পাকিস্তানের ছড়া সাহিত্যের মোড় বদলের সূচনা করেছে। ছেলে ভোলাবার ছলা, ঘুম পাড়ানি মাসী পিসী তাড়াবার ছলাই ছড়া। কিন্তু সেই ঘুম পাড়ানি মাসী পিসীকেই পালাতে বলেছেন কবি, কেননা, 'পূর্ব দুলুকে জাগলো সবাই'। পূর্ব পাকিস্তানের আর যারা ছড়া লিখছেন—তাঁরা জাগরণীকেই তুলিয়ে রাখতে চাইছেন। ফলে ছড়ার গায়ের সুর বদল ঘটেছে।

যদি বলা যায়, ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের ভাষা আন্দোলনের সময় থেকে পূর্ব পাকিস্তানের নবজাগরণ শুরুলিম সমাপ্ত নয়, বাঙালী সমাজের স্বাধীনতা প্রচেষ্টার শুরু হয়েছে—তবে বোধকরি সেই ব্যাপ্তি করবেন না। সাংস্কৃতিক ভাই-দের রহমান লিখেছিলেন—"একুশে ফেব্রুয়ারী যদিও ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি-বাহক, তবুও এ কেবল ভাষা আন্দোলনেরই দিবস নয়, একুশে ফেব্রুয়ারী আমাদের সমস্তান্তিক সংগ্রামের পতীক দিবস।.... আমরা বুঝতে পেরেছিলাম মুখের ভাষা কেড়ে নেওয়া হলে আর কোনো কিছুই কেড়ে নেওয়ার বাকী থাকে না। আমরা তাই সমবেত হয়েছিলাম—ভাষের পক্ষে শিক্ষক, পক্ষের পক্ষে বুদ্ধিজীবি, আমরা দাঁড়িয়ে-ছিলাম একের পিছনে অন্যে, একের পাশে অন্য। পূর্ব বাংলার জনসাধারণ গড়ে তুলে-ছিল সংগ্রাম পরিষদের।....আমরা পকৃতে বরবাদায়, পকৃতের বিরুদ্ধে বাঁচতে হলে আমাদের প্রেরণ পথ'। কিন্তু চূড়ান্ত ফল আমরা জানি না। তাই পূর্ব পাকিস্তানে সংস্কৃতির সংগ্রাম চলেছেই চলেছে। আর ছড়া সাহিত্য এই সংগ্রামেরই হাতিয়ার। পূর্ব পাকিস্তানের এক ছড়া সমালোচক লিখে-ছেন—"ছড়া আজকাল জুড়ি হয়ে উঠেছে। তাইল বদলে যাচ্ছে ছড়ার শরীর। এক সময় এখনকে যে সব ছড়া লেখা হত তার বেশীর ভাগই ছিল মিষ্টি মিষ্টি শব্দের দোলায় দোল খেলার ঘুম ঘুম আবেশের। এখন ছড়া ঘুম ভাঙানিয়া।"

পাকিস্তানের সাম্প্রতিক ইতিহাস ঔতে এসে ছড়ে ধরা আর সমস্তান্তিক বাঙালীদের ইতিহাস। এই ধারাদের ছড়ির বিশ্লেষণ করে কবি শামসুর রহমান একটি ছড়ায় লিখেছেন—

"দুই বাঁশি এক ধারা
তখন হবে ধারা।
ধারায় ধারে ধারে
উঠবে পাড়া কেঁপে।
দুইন ভাঁজন ফেপে
সাড়া দেব ভবে।
সাজনে পাবো ঘরে
ভবে ভবে ভবে।"

সত্তাকাল নদী আরও তীক্ষ্ণ হয়ে-ছেন—

"ঢাকত এসে বলে রাজন
কি ধারণা আছ বিরাণী?
কটমটিয়ে চাইলো রাজা
বলে, পত্রোর শির আনি?
ওতেও রাজার অনুচি তাই
'এখন সে-না হলে কি ভাই
বলে, পত্রোর শির আনি?
মুচকি হেসে রাজা এবার
ছিয়ান ফেলে ছিয়ানই।"

এই ধারার ছড়াকে, বলা বাহুল্য সে যুক্তফ্রন্টের দলই ধাঁচতে পারে। কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক ও ফ্রোহকুফ্রতে একটা বিভেদ রয়েছে। সেই জন্যই সবাই 'ফ্রোহকুফ্র'দের নয়। শামিত বসে শামসুর রহমান লিখে-ছেন—

"পক্ষ, দেখো এই অবয়বকে
যদি ধরা যায় পাঁজরেই
তবে, কেন হায় করলে না তুমি
তোতা পাখি আবদেই?
খাঁচায় বসে ভাসে কিসের মতো
নাড়তায় লেজখানি
তীক্ষ্ণ আদুরে ঠোঁট দিয়ে যেন
খুঁটিতায় দানাপানি।

ছিলতো সুযোগ কত ধারের
কথা বলি কুড়োবার
বইতে হতো না নিচের
কথা বলবার ঘুরেফিরে।'

'সত্যের দিব [illegible] বাক্যের ধারা
গল্পের মূল কথা এমনি। একজনের
বিনিময়ে পেতে চাই আর একজনের সম্মতি।
মোহাম্মদ মোস্তফাও একটি ছড়াতে
বলেছে—

'খুলে তোমার এই ভালো কলের হৃদয়
ওতে যন্ত্রের দুষ্টু কুলির বন্ধন
ধারহারা ভাঙ্গ ছেদের প্রতিশ্রুতি
এর ফলে হয় মন-মেজাজের স্বাধীনতা।

সুখে থাকো এমন মোদের
মেহিন সম্রাট-ছেলেরা ধরণীতলের তাই যে যেই
বরঞ্চো বুদ্ধিমানী কথা চুড়ে বলতে পারে,
কিন্তু আসল সাধকুলে নবী লিখেছেন—

'সত্য কেউ যে বলেই থাকে
সবাই কুপুত্র বাড়িয়ে হাত।
বললে কিন্তু এবার কেউ
আকাশ থেকে পড়বে ভাত
যেন সবাই।'

এখনকার উন্মাদ
গল্পের ধরন লিখেছেন—

'বাহিম চাচা বুদ্ধিন
পাগলি ভাত
চিমসে পেটে বোলায় পড়ে,
ঠান্ডা হাত।
আসল কালো আঁধার ঘরে
এই বয়েই ঘুমুরে নরে
দেখার ছেলেও বাম বাহিমের
শুনোপাত।
সব আসরের সেরা
এও এক আসর ঘাত।'

পুরোনো দিনের গল্প বদলে [illegible] যারা আর বার বদলে বেড়াত তাদের এরা লিখেছেন রফিকুল হক—

'সাগর আমার হাওড়ালালে
ছিল হাওড়া রে
নাট পরে মুর্তি আমি চৌদ্দলী
নাচিরে
বাবার প্রাসাদে ঘোড়াশালে
ছিল ঘোড়ারে
কত ঘুরে আছ ছোটে ছোটে
পা যে ঘোড়া রে।

কিন্তু পাক রাজা কি তাঁর পুত্রদের
দেশ কিছুই করেন নি? নিশ্চয়ই করেছেন।
পরিকল্পনার পর পরিকল্পনা করেছেন,
আশ্বাসের পর আশ্বাস দিয়েছেন, ছেড়েছের
পর ছেড়ের দিয়েছেন, সর্বশেষ চেরেন উন্মাদের
একটি ছড়ায়—

'বিশ্বটা চড়াই বলছে
হেসে চড়াই রে
চাষ খুলবে খালি
ছেলেরা চলাই
এলাম ঘরের
মেয়ে কাছে
সমান আছে টাকার
সাহসের ফলছে।
আসছে বছর প্রথমের দল
যেন ভালো
হবে না আর দীন দুঃখীর
মুখে কালো
চড়াই বলে এই মতে
কী যে কাম
বাঁচলে এবার তবেই ভিন
বছের নাম

এর কারোর নিজের [illegible] কোটি মানুষের আর কিছু, না থাক, ভিন ভাষা ভাষা মানুষ ভাষা ভিন্ন, আর তারা [illegible] চায়ও না নিজে ছেলেমিলো, ভিন্ন ভিন। [illegible] ভিন্ন এক [illegible] পুরো [illegible] দাবিদাওয়া—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

'[illegible] এখন [illegible]
[illegible] ছেলের [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

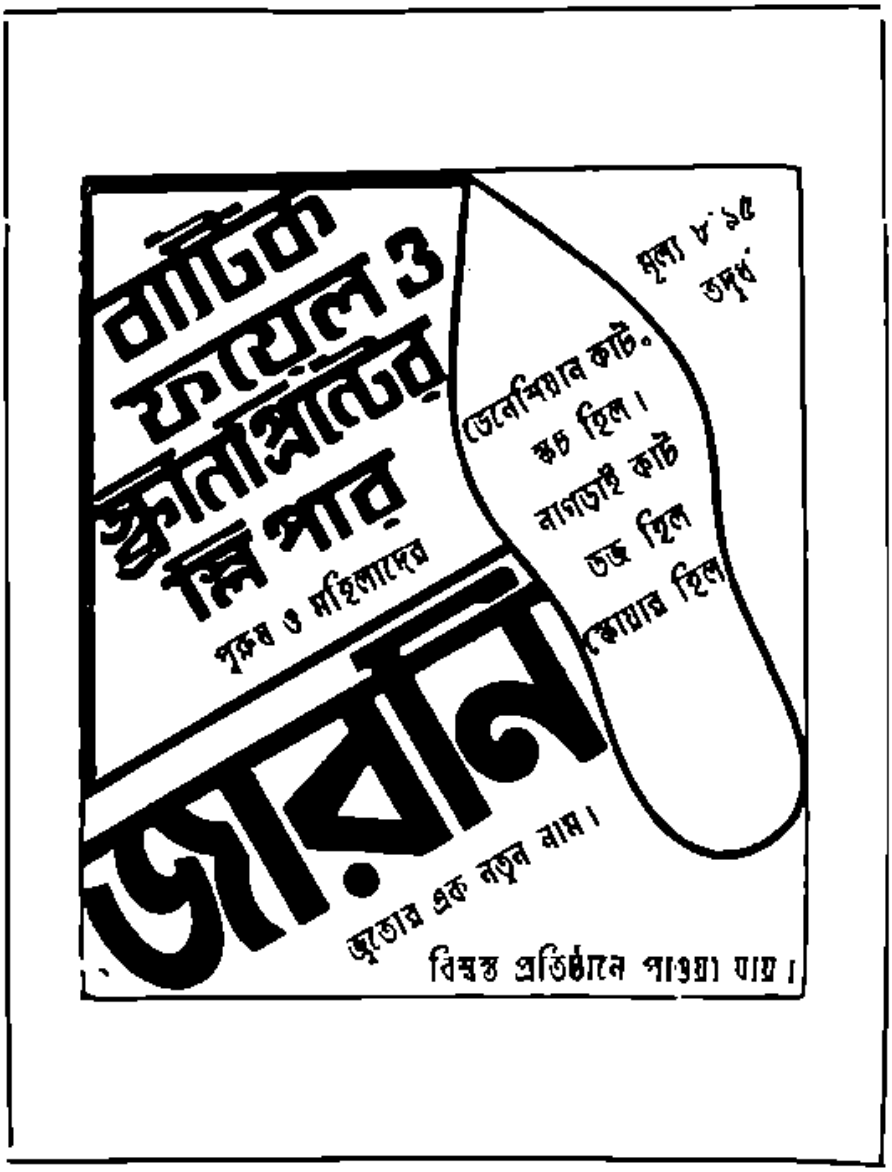

নাকি সোনার ছেলে
ঘুমোচ্ছে, চিনতে
পারলুমনে প্রাণ দিলো যে
মাকেও বাঙাল কিনতে।

পাহাড়তলীর ঘরে চড়োয়
বাঁশ দিলো আঁশি
চেহারাটার লোকের নজর
লাগলো তাতেই ফাঁসি।

পড়োতরেণী। পড়োতরেণী
ঘুমাচ্ছ নেমে মাঠে
আমার ঘরণ, আমি
চলেছি এই বাটে।"

সমকালীন সাহিত্যের চোখ ফিরেছে বিচ্ছিন্নতার দিকে। সেখানে চাঁদের না ঘুমোনো—শরীর না ঘুমে এই পরিচয়ের চেহারাটা হয়েছে। শুধু কবিতাগুলোর ছত্রগুলোরা ফিরে-ফিরে দিকের পানে তাকিয়েছেন—পাকিস্তানের একটি

"দিন ঘুমুলে ওরা
মেঘনা ধারা বোনা
ছেলে মরণ ছেলে
বাড়ি করে ভাই এসো।
০ ০
বলি ওরে তারা
দিন ঘুমুলে মারা
ওদের কাছে জানি
নেই মানুষের দাম
পড়ছে ছিটেফোঁটা।"

সমাজ চেতন উদ্দীন তোয়াজউদ্দীন সাহেব লিখেছেন—

"চলমান জাও কী
আরও বেশী চাও কি
উঠল নাথ শিশু ফেলে
মা বোন বাপ ফেলে
পড়ে আছে শূন্য ঘাট
তাও চাও আও কি
চলমান জাও কী।"

আজকে এই ১৯৬৯ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে কোনো কবি কি লিখতে পারবেন—

আয় আয় চাঁদ মামা টি দিয়ে যা
চাঁদের কপালে চাঁদ টি দিয়ে যা

—বোধহয় না। কিন্তু, কি লিখবেন আজকের ছড়াকার চাঁদ নিয়ে—যদিও সহীদের ওপর "ঘুম পাড়ানি ছড়া উপহার করি—

"চাঁদমণী যদি মাগো নিতুই যাবে
বলতো খোকার মা
আয়রে চাঁদা আয়
আয়রে খোকার মামা
চড়বি খোকার সাথে:
আমার সোনা ঘুম যদি না
একলা সোনার ঘুম পাবে না
আয়রে নেমে আয়
হাওয়ায় চড়ে আয়—
আয়রে চাঁদা ভাই,
ঘুম দিয়ে যা খুকুর চোখে
চুমু দিয়ে যা নিখিল মুখে
তোর গায়েতে ছিটিয়ে দেবো
দেবো-আসতো গন্ধ
আয়রে চাঁদা ভাই
আয়রে চাঁদা আয়
খোকার কল্লে আয়
আয়রে খোকার মামা
চাঁদমণী এখন নয় যে তেমন আর
নয়তে তেমন অবাক কিছু
চাঁদের বুড়ি নিছক মিছে
সবই জানা দেখছি তবে
তবুও শুধু যাও
সবাই এখন জানছে তারে
থাক না তবেই সুদূরে পাতে
আজকালকী সব আজব কথায়
ভুলবে না কেউ আর।

তাই তো এখন হয়তো খোকার মা
বলবে না চাঁদ টিপটা দিয়ে যা—
বলবে বুঝি,
লক্ষ্মী সোনা, খোকন সোনা
ঘুমিয়ে পড়ো রে,
ঘুমিয়ে পড়ো সোনার দাদু
ঘুমিয়ে পড়ো রে,
ঘুম ফুরোলে রাতের শেষে
তোমায় দেবো চাঁদের দেশে
ঐ সুদূরে হাওয়ার ভেসে
চাঁদ তরীতে চড়ে,
সেখানে থেকে ফিরবে যখন
নোতির মালা পরবে তখন
হাসবে লোকে ভালবাসায়
ভুবন আলো করে।
ঘুমিয়ে পড়ো সোনার দাদুরে
ঘুমিয়ে পড়ো সোনার যাদুরে
ঘুমিয়ে পড়ো রে. ."

মাত্র কয়েকজনের ছড়া বেছে নিয়েছি কিন্তু আরও অনেকে আছেন যাঁরা ছড়াকে সৃষ্টি করেছেন, ঘুম পাড়ানিয়া গানকে রূপান্তরিত করেছেন ঘুম ভাঙানিয়া গানে। নাম কেউ বহু দিন পরে স্বাধীনতা-পরবর্তী পূর্ব পাকিস্তানের ইতিহাস লিখতে বসেন, তবে লেখকের এই ছড়াগুলিই হবে তার মহান উপকরণ।

আমার বাবা ও আমি

—মুর্তজা বশীর—

আজ আমার আর কোন লজ্জা নেই যদি কেউ আমাকে পরিচয়ের শেষে বলেন, আমি মহম্মদ শহীদুল্লার ছেলে।

কিন্তু এককালে করতাম। তাঁর মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত। সেই পরিচয়ে আমি ক্ষুণ্ণ হতাম। আমার অহমিকায় বেশ আঘাত লাগত। আমি সবসময়ে চাইতাম আমার নিজের পরিচয়ে পরিচিত হতে। মুর্তজা বশীরের পিতা ডঃ মহম্মদ শহীদুল্লাহ এটাই আমি চাইতাম। ডঃ মহম্মদ শহীদুল্লাহর ছেলে মুর্তজা বশীর এই পরিচয় কোনদিন আমার কাম্য ছিল না। অথচ, শৈশবে তাঁর পরিচয়ে আমি ছিলাম গর্বিত, অহঙ্কারী। আমার চালচলন কথাবার্তা সবকিছুর মধ্যে সেই গন্ধটা ছিল। ক্লাসের ছেলেদের কাছে আমি ছিলাম এক বিস্ময়কর বস্তু। সবাই আমার বন্ধুত্বে সৈক হতো। আমি হয়েছিলাম তাদের কাছে এক অমূল্য সম্পদ। আমি তাতে বেজায় খুশী হতাম। অন্যের পয়সায় কিছু খাওয়া আমার আত্মসম্মানে লাগত। কিন্তু কিনে নিজের পয়সায় খাওয়া সম্ভব ছিল না। বাসা থেকে টিফিন আসত। হাতে বাড়তি পয়সা দেওয়া হতো না। যদি কোনদিন কিছু চেয়েছি অমনি বন্ধুদের মধ্যে রীতিমত কাড়াকাড়ি হতো কে আমাকে দেবে বলে।

পড়াশুনা করার মন একেবারেই আমার ছিল না। পরীক্ষা না দিলেও পাশ করতাম। ম্যাট্রিক পরীক্ষার সময় আরবী পরীক্ষায় আমার চোখ একেবারে কপালে। কিছুই বুঝতে পারি না, জানি না। আমাকে একটা বই এনে দিলেন পরীক্ষার হলে শিক্ষক। আমি দেখে দেখে লিখলাম। আর তিনি দরোজায় দাঁড়িয়ে পাহারা দিলেন। আরবী আমার এমনিতে ভালো লাগত না। ষষ্ঠ শ্রেণীতে যখন বাধ্যতামূলকভাবে আরবী, ফার্সী, উর্দু বা সংস্কৃত নিতে হতো তখন বাবু অবশ্য চেয়েছিলেন আমি সংস্কৃত পড়ি। কিন্তু আমার মা চাইলেন না।

আর ছেলে, এই অধিকারে ছোটবেলায় আইকে আমি কোনোক্রমেই করতাম না। অনেক সময় অশোভন ব্যবহারও করতাম। কেননা আমি ভাল করেই জানতাম আমাকে কেউ কিছু বলবে না, বলার সাহস নেই। ঠিক এ সময় একজন লোকের কথায় আমার সমস্ত সত্তা যেন কাঁচের মত গুঁড়িয়ে গেল। আমি নিজেকে দেখলাম। একটা অপদার্থ মূর্খ ছাড়া আরও কিছুই আমি নই। নিজের ওপর ধিক্কার এল। ভদ্রলোক বলেছিলেন, এমন কিছু করো যাতে লোকে তোমাকে চেনে। তোমার বাবা কদিন বাঁচবেন। তাঁর মৃত্যুর পর কেউ তোমাকে পুঁছবে না। যে সম্মানে তুমি আজ তৃপ্ত সেটা তখন মাটিতে মিশে যাবে। তোমার বেয়াদপীতে কেউ কটু কথা বলে না কারণ, তাহলে তোমার বাবাকেই বলা হবে।

ঘরে এসে আমি কেঁদেছিলাম। রাত্রের মুকুট পরে আমি হাটতাম, হঠাৎ যেন আমি ভিখারী হয়ে গেলাম। বাবু আমার কীর্তি-কলাপ শুনতেন। কেউ কেউ তাঁর কাছে আমার সম্বন্ধে নালিশও করতেন। তিনি বেশ মুখ করতেন। আমাকে ডেকে আপসোস করতেন। একবার দশম শ্রেণীতে পড়ার সময় প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির দাবীতে স্কুলে গোলমাল সৃষ্টি করেছিলাম। হেডমাস্টার আমার উপর বিরূপ হয়েছিলেন। তিনি বাবুর কাছে আমার ব্যাপারে অভিযোগ করতে চেয়েছিলেন। আমি জানতাম, তিনি এতে অপমানিত বোধ করবেন। সেই লজ্জায় আমি বাড়ী থেকে পালিয়ে গিয়েছিলাম। মাসের প্রথম দিন ছিল। সংসারের সব টাকা মার বেরাজ থেকে নিয়েছিলাম। আর বাবার সুটকেস থেকে আরো কিছু টাকা। লক্ষ্ণৌয় চলে গিয়েছিলাম। কিন্তু আবার ফিরে এসেছিলাম। বাসার জন্য মন খারাপ হয়েছিল সাংঘাতিক। বাবু আরাম কেদারায় বসে বই দেখছিলেন। আমাকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন। আমার ভীষণ ভয় করছিল। হয়ত তিনি মারবেন। কিন্তু তিনি মারলেন না।

ধীর গলায় প্রশ্ন করলেন, কোথায় গিয়েছিলে?

মাথা নিচু করে জবাব দিয়েছিলাম,—লক্ষ্ণৌ পর্যন্ত।

আমার জবাবে তিনি ক্ষুণ্ণ হলেন। বললেন, আগ্রায় গিয়ে তাজমহল ও দেখতে পারতে।

তারপর দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, আমার ছেলে তুমি। নটোরিয়াস বা ক্রেমাল হবে। মাফামাফি কিছু হও আমি তা চাইনি।

এ-কথার পর থেকেই নিজে চেয়েছি আপন নামে পরিচিত হতে। স্বাবলম্বী হয়ে দাঁড়াবার প্রেরণা পেয়েছি। এর পরেই নামের শেষ থেকে 'উল্লাহ' শব্দটা নির্দয়ের মত মুছে দিয়েছি। ছুঁয়ে একটা মুক্তির স্বাদ পেয়েছি। তৃপ্তিতে গর্বিত হয়ে উঠেছি। অবশ্য আমার এই পারিবারিক চিহ্নটুকু ছুঁয়ে ফেলা বাবু সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

আমার ওকটা চিঠি এসেছিল। বাবু তখন ষ্টাডি লাইব্রেরী ঘরে বইয়ের পাতায় নিমগ্ন। পিয়ন তার সম্মুখে চিঠি রাখতেই তিনি চোখ বুলিয়ে চিঠিটা ফেরৎ দিলেন পিয়নকে। ঘটনাচক্রে আমি তখন সেখানে ছিলাম। কৌতূহলী হয়ে চিঠিটা হাতে বাড়িয়ে নিয়ে নাম পড়তেই দেখলাম এটা আমার। বাবুকে বললাম।

তিনি সোজা আমার তাকালেন।

সে দৃষ্টি এত রুক্ষ যে তাকান যায় না সেদিকে।

আপসেই মাথা নীচু হয়ে যায়। সেই মুহূর্তে আমাকে মনে হয়েছিল নিরপরাধী

আবেগভরে। পিতা শাহজাহানের সম্মুখে নতজানু।

অকম্পিত গলায় বললাম, 'উন্নাই' কেটে দিয়েছি। নিজের পরিচয়ে দাঁড়াতে চাই। আপনার পরিচয়ে নয়।

অনেকক্ষণ তিনি তাকিয়ে থাকলেন আমার দিকে। আমি সেখান থেকে পালিয়ে তবে বেঁচেছি।

মা অনুযোগ করতেন, তুই কি তোর বাপের চেয়ে বড়? এত দেমাক কেন তোর?

তাকে কিছুতেই বুঝাতে পারতাম না এটা অহঙ্কার নয়। এটা আত্মবিশ্বাস।

বাবু কিন্তু কোনদিন মেনে নিতে পারেন নি আমার এই নতুন নাম। তিনি সব সময় লিখতেন দুর্তজা বশীরুল্লাহ ওরফে দুর্তজা বশীর। কচিৎ তিনি লিখতেন দুর্তজা বশীর। তবু তিনি আমার নামের বানান সংশোধন করে দিয়েছেন। আমি দুতে দীর্ঘইকার দিতাম। তিনি একদিন ডেকে বললেন, মূর্খের দীর্ঘইকার হয়। তুমি ত মূর্খ নও। তুলি লিখবে দুতে হ্রস্বইকার দিবে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম প্রথমে আমি শুনেছিলাম আমার মার কাছে। শুনেছিলাম এক অদ্ভুত ঘটনার ভেতর দিয়ে। আমাদের ঘরে রবীঠাকুরের ছবি ছিল দেয়ালে টাঙানো। সে ছবি দেখিয়ে মা জিগ্যেস করেছিলেন হাসির ছলে, বলত কে ইনি!

আমি চট্ করে জবাব দিয়েছিলাম কেন বাবু। মা হেসেছিলেন, দূর বোকা। ইনি ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। একটা আশ্চর্য মিল ছিল তার সঙ্গে বাবুর চেহারার। আমি কিছুতেই সেদিন বিশ্বাস করিনি মার কথা। বহুদিন পর্যন্ত আমার খোলমাল হতো ছবি দেখে। কোনটা যে কার ঠিক ঠাহর করতে পারতাম না।

বাবু যখন বাসায় থাকতেন আমাদের হৈ-চৈ করা বারণ ছিল। আমার মা তার কাছে আমাদার যেতে দিতেন কম। তাই যা কিছু আবদার সব ছিল মাকে ঘিরে। আমি যখন ইতালিতে ডিক্লমা সম্পর্কে পড়বো ঠিক করেছিলাম সে খবর মাকেই আমি প্রথম জানাই। মা বাবুকে বলতে তিনি ডেকেছিলেন আমাকে। বড্ড ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম আমি। এবং তিনি যখন জিগ্যেস করেছিলেন আমি মেকু মিয়ে কথা বলেছিলাম। যাকে যে-কিছু বলেছি তা অস্বীকার করেছিলাম। বাবু তা সত্ত্বেও আমাকে দু'বছর পড়ার টাকা দিয়েছিলেন। না করেন নি।

জীবনের প্রথম সিনেমা দেখেছি তার সঙ্গে। রমনা এলাকায় থাকতাম তখন আমরা। আমি তখন স্কুলের নীচু ক্লাসে পড়ি। আমাকে ব্রিটানিয়া হলে দেখিয়েছিলেন, সুইস ফ্যামিলি রবিনসন ছবিটা। ছবি দেখে আমি ও বাবু ফিরছিলাম ঘোড়ার গাড়ী চড়ে। হঠাৎ তিনি আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন, সিস বাজাতে পারো? সিস বাজাতে আমি জানতাম না। তিনি সিস দিলেন মৃদুভাবে। আমি কিছুতেই পারিনি। অনেক করে তিনি আমাকে দেখাবার চেষ্টা করলেন।

যখন পারলাম তার সারা চোখমুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তারপর তিনি বললেন, সিস যখন তখন দিও না। এটা করা খারাপ। নতুন একটা আবিষ্কার তখন আমি করেছি; কিন্তু তার দিকে তাকিয়ে সিস দেওয়া ভুলে গেলাম। মন আমার খুব খারাপ হয়ে গেল।

বাবু আমাকে হাকেজ করতে চেয়েছিলেন। মৌলানা এসে আমাকে কোরাণ দুরুস করাত। প্রায় দু সেপারা আমি কণ্ঠস্থ করেছিলাম। মফস্বলে বদলীর সজায় তিনি আমাকে সংগে করে নিয়ে যেতেন। সেই সজায় আমাকে আজান দিতে হতো। বাবু খুব খুশি হতেন। কিন্তু আমি চাইতাম আর্টিস্ট হতে।

তাই ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাশ করার পর আমার আর্ট কলেজে ভর্তি হবার বাসনা কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারলেন না তিনি। যখন দেখলেন আমি হাফেজ হতে চাই না তখন তিনি আলিগড়ে আমাকে ভর্তি হতে বললেন। আমি আমার মতে অটল থাকলাম। বাবু অসুখী, বাবুর চিরজার আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারল না তিনিও এক কঠিন ধর্মের সম্মুখীন হলেন। ধর্মীয়বিধানের বাইরে কোন কিছু করতে তিনি মনে প্রাণে সায় দেবেন না। প্রথমে তাঁর ঘোর বিরোধিতা করলেন। রাগারাগি করলেন তীব্রভাবে। তবুও আমার একগুয়েমী মনোভাব এবং জেদ কিছুতেই ভাংতে পারলেন না। মা অনেক করে বুঝালেন। পরিবেশের দোহাই দিলেন। বাবু আমার সঙ্গে কয়েকদিন কথা বললেন না। রোজ নামাজ পড়তে ডাকতেন, তাও ডাকলেন না।

একদিন ডাকলেন। জিগ্যেস করলেন তা'হলে কি ঠিক করলে?

আমি আমার মতামত জানালাম।

তিনি শান্ত কণ্ঠে বললেন, সখের জন্য শিখবে, বেশ ভাল। বি-এ পাশ করে নিয়ো। আমি প্যারিসে ছিলাম, আর্টিস্টরা দেখেছি না খেয়ে মরে। আমি জবাব দিয়েছি শখেতে আমি শিখছি না। অর্থের মোহ আমার নেই। কিছুক্ষণ চুপ করে বললেন, বেশ। তবে সিনারী এঁকো। আমার হাতে টাকা তুলে দিলেন। আমি আর্ট কলেজে ভর্তি হলাম। আমার মনোভার রইল না।

বাবুর কথায় অবশ্য আমি রাখিনি, প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকতে আমার কোনদিনও ভাল লাগেনি। মানুষ অনন্ত। তাদের হাসি, কান্না, দুখ, দুঃখ, ভালবাসা প্রেম হয়েছে আমার ছবির বিষয়বস্তু। শেষের দিনে মানুষের হতাশা নিয়ে ছবি এঁকেছি প্রচুর।

ইতালিতে দু'বছর পড়ার জন্য খরচ দিয়েছিলেন তিনি। অনেকে এ-জন্য তাকে অনেক কথাই বলেছে। তার ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত দিতেও কার্পণ্য করেনি। বিদেশ থেকে আমি ফিরে আসার পর তিনি এ সব আমাকে জানিয়েছিলেন। শুনে আমি আহত হয়েছিলাম।

বলেছিলাম, আপনার কি তাই বিশ্বাস? এ প্রশ্নের জবাব আমাকে তিনি দেননি। শুধু বলেছিলেন, তোমার ভরণপোষনের জন্য আমি খরচ বহন করেছি। কিন্তু আমি জানতাম, বেশ ভাল করেই উপলব্ধি করতাম এটা তার মূলের কথা নয়। দেরিয়েল বয়সবন্দিনে আক্রান্ত হয়ে যখন তিনি বারবার জানতে চাইতেন, আমি কি করছি। সে সময় ছোট ব্যাগে মুরাল করছিলাম। মা মারা যাওয়াতে কাজে বিঘ্ন ঘটেছিল,

কিছুতেই মন বসাতে পারছিলাম না। তিনি প্রবোধ দিতেন, মন বসাতে হবে। কাজ করে যেতে হবে। বাবুর কথায় আমার চোখে পানি এসে জড়ো হয়েছিল। বলেছিলাম, দোয়া করবেন।

তিনি সেই কৃশ পক্ষাঘাতগ্রস্ত— হাত কষ্ট করে উঁচু করলেন দোয়া চাইলেন। কত পড়লা পাব শুনে পিঠে মৃদু চাপড় দিয়ে বলেছিলেন, নাউ টাই আর এ রীচ ম্যান।

নয় নম্বর কেবিনে তাঁর দর্শনার্থী সেদিন ছিলেন ডঃ এনামুল হক। তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন আমাকে। সবশেষে বললেন, আর্টিস্ট। ডঃ এনামুল হকের সঙ্গে আমার এর আগে সামনা-সামনি পরিচয়ের সৌভাগ্য হয়নি। তিনি সস্নেহে বললেন, বেশ নাম করেছে। বাবু হাসলেন। সারা মুখমণ্ডলে ছড়িয়ে গেল সেই রেখা। পরিতৃপ্তির সংগে ক্লান্ত চোখজোড়া বুজলেন।

আমি ধন্য হলাম: মুদ্রাবন্ধের আমার চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধনীতেও তিনি আসতেন। পত্রিকায় আমার উপর লেখা প্রতিটি প্রবন্ধ মনোযোগ দিয়ে পড়তেন। তার ক্লিপিংও সযত্নে রাখতেন। একবার এক ইংরাজী দৈনিকে এক প্রবন্ধে আমার নাম ভুল লেখা হয়েছিল। তিনি সেই পত্রিকার চিঠিপত্তর বিভাগে আমার নাম সংশোধন করে চিঠি দিয়েছিলেন।

বাংলা একাডেমীতে সমকালীন চিত্রকলা নামে এক প্রদর্শনীতে আমার তেজ লিজার্ড নামে একটি ছবি ছিল। তিনি ছবিটা দেখেছিলেন। বাসায় এসে তিনি সোজা আমার ঘরে ঢুকে বলেছিলেন; জানো তোমার সেই ছবিটা আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না। আমার ভেতরটা নড়ে ওঠে। সেদিন আমার মনে হয়েছিল, আমার পক্ষে এরচেয়ে বড় সম্মান হয় না। আমি এখনও বিশ্বাস করি, আর কোন সম্মান এটাকে ম্লান করতে পারবে না। এ সম্মান সর্বত্রেই অতুলনীয়।

আমি জবাবে বলেছিলাম, সেই মৃত টিকটিকিটা এই ক্ষয়িষ্ণু সমাজে মানুষের প্রতীক। আমরা যেখানে জীবনমৃত। আমি আপনি সবাই। আমরা প্রেতাত্মা, অশরীরী। আমরা চলছি বলছি শুধু আমাদের মাঝে প্রাণ নেই।

আমি বোধকরি বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম। তাঁর সেই উজ্জ্বল চোখজোড়া আমাকে অবাক হয়ে দেখছিল। সে দিকে চোখ পড়তেই আমার মনে হলো আমার সব জড়তা নিমিষে মিলে গেছে।

বাবু কি যেন বললেন, আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। এর কয়েকদিন পর আধুনিক চিত্র ও আধুনিক শিল্পী এই নামে এক আলোচনা সভায় এ, কে, রোকী তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, আপনার ছেলেও একজন আধুনিক শিল্পী?

জবাবে হেসেছিলেন তিনি, আধুনিক চিত্রের মতই আমার ছেলে দুর্বোধ্য। কালেভদ্রে আমার ঘরে আসতেন তিনি এবং দরজায় শব্দ না করে ঢুকতেন না। একদিন আমার ঘরে ঢুকে দেওয়ালে টাঙ্গানো আমার এক ছবি দেখে বললেন, এসব ভূত কেন আঁক? আর্টিস্ট তুমি, সুন্দর জিনিস আঁকবে। তাঁর অযাচিত উপদেশে আমি বিরক্ত হয়েছিলাম। ক্ষুব্ধ হয়ে জবাব দিয়েছিলাম, সুন্দরই যে আঁকাতে হবে তার কোন মানে নেই। আমার কথায় এক কৌটাও বিব্রত হননি। বলেছিলেন, প্যারিসে ল্যুভে আমি দেখেছি। কত চমৎকার শিল্পকলা। সেগুলো সুন্দর।

ল্যুভ এবং অন্যান্য মু-জিয়মের চিত্রকলার প্রচুর রিপ্রোডাকশন ছিল তাঁর কাছে। ছোট বেলায় সেগুলো আমি চুরি করে দেখতাম। আর্ট কলেজে ভর্তি হবার পর সেসব তিনি আমাকে ডেকে আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন। প্যারিসে আমি যখন ল্যুভিয়মগুলোতে ঘেমি আমার বারবার মনে হয়েছে এসব আমার চেনা। এগুলো কোনটাই নতুন নয়।

কিন্তু আমার মনে সবচেয়ে দুঃখ ছিল আমার ছবি বিক্রির টাকা তিনি কখনো গ্রহণ করতেন না বলে। সংসারে আমি কিছু আমার তরফ থেকে টাকা দিতাম আমার খাবার খরচ বাবদ। বাবু অবশ্য জানতেন না। আমি জোর করেই আমার মাকে দিতাম। সংসারে গলগ্রহ হয়ে আছি এ কথাটা কিছুতেই ভাবতে পারতাম না। বিবেকের কাছে খোঁচা খেতাম।

বাবার একবার সাংঘাতিক টনসুলেটিস হয়েছিল। তিনি আমার মাকে ডেকে জিজ্ঞেস করেছিলেন সংসারে আমি কোন টাকা দেই কিনা। মা জবাবে জানিয়েছিলেন, আমি দিই। শুনে তাড়াতাড়ি তিনি বলেছিলেন, ওর টাকা নিওনা ওটা হারাম।

তারপর আমি সংসার থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছি। একই বাড়ীতে ভিন্ন হয়ে থাকা যদিও আমি ভাবতে পারিনি, তবুও আমাকে হতে হয়েছিল। আমাকে আমি পেয়েছিলাম ঠিকই, তবে তাঁর স্নেহের সংসারে আমি তাঁটা হয়ে থাকতে চাইনি, তাই আঘাত বুক পেতে সহ্য করেছিলাম।

এমনি আরো আঘাত আমি পেয়েছি। আর্ট কলেজে পড়াকালীন সাম্যবাদী রাজনীতির প্রতি ঝোঁক আমার ছিল। তিনি রাজনীতি জিনিসটা কখনো পছন্দ করতেন না। আমাকেও সে জন্যে সুনজরে দেখতেন না। বহুদিন তিনি আমাকে ঘরে ঢুকতে দেননি। শীতের রাতে কনকনে ঠাণ্ডায় আমি বাড়ীর বারান্দায় বসে রাত কাটিয়েছি। আমাকে একবার মেরেছিলেন। ছেলে যখন দু'মাস অন্তরীণ ছিলাম, তিনি একবারও দেখতে আসেননি। চিঠিও দিতেন না। এমনিতে প্রচণ্ড ঘৃণা ছিল তাঁর রাজনীতির প্রতি। অথচ, একবার তাঁর এক অদ্ভুত রূপান্তর আমি দেখেছিলাম যা আমার কাছে মনে হয়েছে একটা স্বপ্নের মত। অবিশ্বাস্য।

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারীতে আমি যখন রক্তাক্ত কাপড়ে ঘরে এলাম তিনি ছুটে এলেন। আমার কাছ থেকে প্রতিটি ঘটনা আগ্রহের সঙ্গে শুনলেন। তারপর তাঁর এক কালো আচকান ছিঁড়ে টুকরো কাপড়টা বেঁধে দিতে বললেন তাঁর বাঁ হাতে। আমার হাতেও নিজে বেঁধে দিলেন। বললেন, নিজের মাতৃভাষার জন্য যদি তোমার প্রাণও যেত আমার কোন দুঃখ থাকতো না।

স্কুলে প্রতিটি পরীক্ষায় বাংলায় কম নম্বর পেলে তিনি রাগ করতেন। আর কোনও বিষয়ে পাশ করি চাই না করি বাংলায় প্রথম শ্রেণীর মার্ক না পেলে নিস্তার ছিল না। বাংলায় প্রথম শ্রেণীর

মার্ক কোন দিন আমার ভালো চাহেনি। তাই বন্ধুনীর অভাব ছিল না। তাঁর বন্ধুনিকে আমি যজ্ঞ বেশী ভয় করতাম। ইতালী থেকে ফিরে আসার পর যখন চাকুরীর জন্য নানা জায়গায় দরখাস্ত দিয়েও চাকরী পাচ্ছি না তখন আমার মনে সন্দেহ জাগল, তিনি আমাকে বকলেন। আমাকে ভাবতেন অপদার্থ। একটা অপরাধ বোধ সব সময়ই আমাকে ঘিরে থাকত।

আমি পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতাম সহজে তাঁর সুমুখে আসতে চাইতাম না।

একদিন তাঁর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল। তিনি সোজাসুজি প্রশ্ন করলেন, কি চাকুরী পাও না তুমি? সবে পনেরো দিন হয় বিদেশ থেকে এসেছি, এমন সময় তাঁর এ প্রশ্নে আমার অভিমান হলো। আমি মনে মনে ঠিক করলাম চলে যাবো এখান থেকে।

করাচী যাবার টিকিট কিনে নিয়ে সুটকেসে কাপড় ঠিক করছিলাম আমাকে দেখে তিনি চমকে উঠলেন। আমাকে অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করে তারপর বলেছিলেন, কোথায় যাচ্ছ?

: করাচী।

: সেখানে কি করবে?

: জানি না।

হঠাৎ যাচ্ছ' আমাকে বলা প্রয়োজন মনে করো না? আমি নিরুত্তর হয়ে কাপড় গোছাতে লাগলাম। তিনি বললেন, আমি তোমার বাবা, এটা তুমি ভুলে যেও না।

আমি নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাই, জবাব দিলাম আমি। আমাকে স্বাবলম্বী হতে দিন।

স্বাবলম্বী হওয়ার প্রয়াস তাঁর মনে কোন আক্ষেপ সৃষ্টি করতো না। তিনি চাইতেন, আমি আত্মনির্ভরশীল হই। আমি যখন লাহোরে ছিলাম, তখন মাঝে মাঝে আমাকে চাকায় চলে আসতে লিখতেন এবং এও লিখতে ভুলতেন না মনে আমি স্বাবলম্বী হই।

তিনি সব সময় বলতে ভুলতেন না, তুমি বিদেশে থাক। আমি তোমাকে দেখছি না। কিন্তু খোদা তোমাকে দেখছেন। তাঁর কথা মনে সর্বদা রাখবে। নামাজ পড়বে, রোজা করবে। নামাজ এবং রোজা আমি করার উৎসাহ পেতাম না। তাই বহুবার তিনি বিছানাপত্তর বেঁধে বাড়ী থেকে চলে যেতে চেয়েছেন। মা তাঁকে নিরস্ত করেছেন। আমিও আমার অর্থ সঙ্কটের জন্য বাড়ী থেকে চলে যেতে পারিনি। আমার অর্থ-সঙ্কট তাঁকে সব সময়ই পীড়িত করত। লাহোরে আমার বাসায় যেতে চেয়েছিলেন তিনি। দেখতে চেয়েছিলেন কিভাবে থাকি আমি। আমি থাকতাম সামনাবাদে। ঘর বলতে একটা খুপরি। না আছে এতে চুনকাম। আসবাবপত্রেরও বালাই নেই। ক্যানভাসের কোনে কাপড় থাকে ঝুলে। মেঝেতে রাখা আট দশটি ইটের স্তূপের ওপর পাশী রেখে বসি। তাই আমার ইতস্ততের শেষ ছিল না। লজ্জা অবশ্য আমি পাচ্ছিলাম না মোটেই। আমার ঘরের দৃশ্যে কি ভাবে তিনি দুঃখিত হবেন তাই ভেবে কষ্ট পাচ্ছিলাম।

টাঙ্গায় আমরা যাচ্ছিলাম। কেউ কোন কথা বলছিলাম না। হঠাৎ খাপছাড়া ভাবে বলে উঠলেন তিনি, জীবনে যদি উন্নতি করতে চাও তবে তিনটে জিনিষ থেকে বিরত থেকো। তিনি কি বলতে চেয়েছিলেন আমি বুঝতে পারিনি। আমাকে নীরব থাকতে দেখে কের বললেন, অবশ্য তুমি কিছু মনে করো না। তিনটে জিনিষ হলো ওয়াইন, ওয়ার এবং ওম্যান, মেয়ে মানুষ, বিবাহ আর মদ সব জাহান্নামে যাক।

আমার ঘরের ভিতর ঢুকে তিনি মাঝখানে দাঁড়ালেন। চারধার ভাল করে দেখে হাসলেন। বললেন তুমি একটা একসেনট্রিক। ঘরের দেয়াল ঘেঁষে চারপেয়ে। তারওপর একটা সতরঞ্চি ও চাদর পায়ের কাছে ছিল গুটানো। তাড়াতাড়ি পেতে দিয়ে তাঁকে বসতে বললাম। তিনি বললেন উটের ওপর। কোমরে তিনি বাঁধতেন চাওড়া চিটা পাঞ্জের বেল্ট। তার ভেতর থেকে তিনি একশ টাকার একটা নোট বের করে আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। আমি নিতে সঙ্কোচ বোধ করছিলাম। এ দান গ্রহনে আমার মন সায় দিচ্ছিল না। এ যেন অনুগ্রহ, অনুকম্পা।

আমাকে চুপচাপ নিশ্চল থাকতে দেখে বিছানার ওপর নোটটা সযত্নে রাখলেন। তারপর মৃদু স্বরে বললেন, যখনই তোমার টাকার দরকার হবে আমাকে লিখবে।

মনে রেখো আমাদের সম্পর্ক পিতা-পুত্রের।

তিনি আজ বেঁচে নেই।

বেঁচে থাকলে হয়ত তাঁর পরিচয়ে আমার পরিচয় ক্ষুণ্ন করত আমাকে। কিন্তু আজ আমার বলতে মোটেই দ্বিধা নেই— আমি মুর্তজা বশীর, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লার পুত্র। কোন কুণ্ঠা আজ এতে নেই।

একথা আর তিনি কোন দিনও জানতে পারবেন না। জানবেনও না। আমি চীৎকার করে বললেও শব্দ সে তাঁকে ঘিরে ধরবে না। তাই আজ, চিরদিন এক অপরিসীম বেদনারমহীরুহ আমার হৃদয়ে শুধু যন্ত্রণার অগ্নিবান ছড়াবে। ছায়া দেবে না।

• পূর্ব পাকিস্তানের 'দৈনিক পাকিস্তানের' সৌজন্যে।

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লা

স্কেচ : মৃণালা বসীন

স্বয়ং নায়ক

শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

[illegible] ঘুষ্টি খুক, কিম্বা একটা ঘুঁত, এমন একটা-কিছু খুঁত দুই চোখ ধরে জীবনটাকে ফ্র খোপার মত পেটাপট আছাড় মেরে খোপাদুরস্ত করে ছেড়ে দেবে।

পঁয়তাল্লিশ বছরের চেনা মা বিশ বছরের চেনা বউ আঠারো ষোল ছোঁড় বারো বছরের চেনা ছেলেমেয়ে একঘেয়ে হয়ে গেছে মামুলী হয়ে গেছে নামতার মত মুখস্থ হয়ে গেছে। দুইয়ের নামতার মত।

এর চেয়ে কিটাকে মা বানিয়ে কেসলে প্রাক্তুতকি ফের উথলে উঠবে। বয়েসে বছর পনেরোর ছোট কিটাকে। মেথরানিটাকে বউ করে নিলে ফুলশয্যার রাত ফিরে আসবে। বছর খানেকের জন্য মেথরানিটাকে।

'সেই সাথে মধু চৌধুরীর ওল পুরুল-ঘার্কা নাভিনাভনীগুলোর বাপ হয়ে বসলে তা সোনার সংসার।

কিন্তু কতদিন? সেই সোনার সংসারও কতদিন।

সব সংসারেই মোড়ায় , মোড়ায় লাগার ফলেও শেষ অব্দি সোনার থাকে কোন্ সংসার?

একঘেয়ে হয়ে যায় মামুলী হয়ে যায় দুইয়ের নামতার মত মুখস্থ হয়ে যায়।

ব্যবহৃত ব্যবহৃত ব্যবহৃত হয়ে

হয়ে যায় ওরোরের মাংসের মতন।

অফিসের, ক্লাবের বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজন ওই ওরোরের মাংস। মা ষষ্ঠ ছেলে মেয়ে ওই ওরোরের মাংস। বাজে শেক্সপীয়র হাসি কান্না কাজ আড্ডা ওই ওরোরের মাংস। সব ওই ওরোরের মাংস। সব সব সবকিছু।

খবরের কাগজ চমক আনে—লটারিতে লাখ! চাঁদে মানুষ।

কিন্তু হাতে আচমকা পাঁচ লাখ এসে গেলেও এই দুনিয়াতেই তো থাকতে হবে! চাঁদে পাড়ি দিলেও ফিরে তো দুনিয়াতেই আসতে হবে?

এর চেয়ে পৃথিবীকে যদি এক লাথিতে চাঁদে পাচার করা যেত। তাই ওরোরের মাংসের মতন এই পৃথিবীটাকে।

'পৃথিবীটাকে চাঁদে?' দু চোখ রাজীবের ঠিকরে বেরোয়।

গম্ভীর চালে বলে 'উঁহু, তাতেও লাভ হবে না। পৃথিবী বানচোৎ আমাকেও চাঁদে নিয়ে তুলবে।' ধমকা শ্বাস ছাড়ে,' আবার যে-কে সেই।'

'তোর কী হয়েছে বলতো? কদিন ধরেই দেখছি'—

না তাকিয়েও টের পায় ভাষাচাকা-খাওয়া কৃপালকে লোকনাথ ইসারায় থামতে বলছে। তার দিকে আড়ে তাকিয়ে নিজের মাথায় আঙুলের টোকা দিতে দিতে বাকি সবাইকেও মুখ খুলতে মানা করছে।

হায়, ওরা ভেবেছে মাথায় আমার গোলমাল দেখা দিয়েছে। কিন্তু ওরা কি ভুলে গেল সাত দিনও হয়নি স্পেশাল ইনক্রিমেন্ট পেয়েছি? খানিক আগেই এঘরে এসে আমরা কালকের স্টেটমেন্টের তারিফ করে গেছে যেমন? ওদেরই সামনে করে গেছে?

আসলে ওরা এই জীবনের কেবা গোলাম। প্যাকলজের কুকুর। পাশ থেকে চুন পললেই ওদের জ্বালা।

বেকুবের দল বাঁচতে ব্যাকুল।

কিন্তু বাঁচাটা কি এতই জরুরী? জীবনের ছেঁড়া টেনে চলার চেয়ে কষমারি

কিন্তু আছে? গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়া বা ঠেসে ঘুমের বড়ি গেলা কি বেশি রোমাঞ্চকর নয়? বেঁচে থাকার চেয়ে ঢের-ঢের বেশি রোমাঞ্চকর?

ছটার মাস ঘরে থেকে বেঁচে ওঠা অবিশ্যি সবার সেরা রোমাঞ্চ। কাশ্মীর-রাণীখেতে ঘুরে আসার মত।

কিম্বা কারো সাথে জীবনটা বদলা-বদলি করে নেওয়ার ব্যবস্থা যদি থাকত! ছটার মাসের জন্যে বদলাবদলি করে নেওয়ার ব্যবস্থা।

থাকলে কার সাথে বদলাত?

রাষ্ট্রপতি গিরি থেকে বেহারা ভানু অব্দি জনাপঞ্চাশেককে বাতিল করে ভবতোষকে বেছে নেয়। পা-কাটা ভবতোষকে।

সকলের দুটি পা, ভবতোষের দুটোই হাঁটু থেকে হাঁটাই। এমনটি আর কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি।

দিনরাত বিজ্ঞানাবলী। প্যান না ধরলে পেজ্ঞাপ করতে পারে না। ঘুম না বাড়ালে ঘুমো খেতে।

ঘুমিয়াটাকে তালাক ঠুকেও ঘুমিয়ার কাছ থেকে নিজের পাওনাগণ্ডা উসুল করে নিচ্ছে ষোল আনা। সাবাস ভবতোষ! সাবাস!

ভবতোষ হলো মালতীরও স্বামী? পা-ওলা ভবতোষের প্রেমে পড়ে পা-কাটা ভবতোষকে বিয়ে করে মালতী তার প্রেমের পরাকাষ্ঠায়, মানে নিখাদ বাহাদুরির প্রমাণ দিয়েছে। স্বামীর পা গজালে নির্ঘাত সে খুশিতে পাগল যাবে। নক্সা বেরুলার ইন্টারভিউয়ের জন্যে রিপোর্টাররা শুকুনের পালের মত ঘিরে হামলে পড়বে।

ওভারটাইমের নামে এর-ওর সাথে সিনেমা-রেস্তরাঁ-হোটেলের ঘরে যাওয়া ছাড়ান দিয়ে আগের মত স্বামীর সাথে মালতী হররোজ অফিস থেকে সোজা বাড়ি ফিরবে। হরগৌরী হয়ে ফিরবে।

কিন্তু জ্যোৎস্না কী করবে? পা-কাটা ভবতোষ স্বামীগিরি-ফলানোর জন্যে চড়াও হতে বললে জ্যোৎস্না কী করবে? লজ্জাবতী জ্যোৎস্নারাণী? সতীলক্ষ্মী জ্যোৎস্নারাণী?

'এই যে শশাঙ্ক—শোন শোনো।' ভাবনা মুলতুবি রেখে হাঁকডাক শুরু করে দেয়। 'বোসো। সিগারেট খাও।'

'সিগারেট—'

'আমি অফার করছি—দোষ নেই—খাও।'

নিজেই শশাঙ্কর মুখে সিগারেট গুঁজে দেয়। ধরিয়েও দেয়।

'আচ্ছা ভাই, তুমি তো বিজ্ঞান বোঝো, প্রবন্ধটবন্ধ লেখ, রেডিওতে টক দাও—আচ্ছা বলো তো ভাই বিজ্ঞান কি এমন-কিছু ইনভেন্ট করতে পারে যাতে মানুষ কিছু দিনের জন্যে মরে গিয়ে

আবার বেঁচে উঠবে, কিম্বা প্রাণ চাইলেই কারো সাথে জীবনটা বদলা-বদলি—'

'মানুষ আদৌ মরবে কেন বলুন?' নাকে-মুখে গল-গল করে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে শশাঙ্ক অভয় দেয়, 'ভবিষ্যতে বিজ্ঞান এমন ব্যবস্থা করবে—'

'মানুষ মরবে না?'

'দরকার না হলে মরবে না। যতদিন খুশি বাঁচবে।'

'যতদিন খুশি বাঁচবে?'

'যতদিন খুশি। ছটার শো বছর'—

'ছ-চার শো বছর বাঁচবে?'

'নিশ্চয়। স্কিজোফ্রেনিক্যালি মানুষের ছ চার-শো বছর বাঁচা কিছু আশ্চর্য না।' শশাঙ্ক সোজা হয়ে বসে। 'মানুষ মরে কেন? শরীরের যন্ত্রপাতি অকেজো হয়ে যায় বলেই তো? সেটা বদলে নিলেই ল্যাঠা চুকে গেল। এখন যেমন ব্লাড কিনতে পাওয়া যায় মানুষের পার্টসও তখন কিনতে পাওয়া যাবে।'

'ধুর!' কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে ওধায়, 'তা তোমার কবে নাগাদ মানুষের পার্টস বাজারে বেরোবে?'

'সেটা বলা শক্ত দাদা। তবে বিজ্ঞান যেভাবে এগোচ্ছে—'

'কিন্তু মানুষের যেসব পার্টস চোখে দেখা যায় না—যেমন মন, আত্মা, বিবেক—সেগুলো? সেগুলোও কিনতে পাওয়া যাবে তো?'

শশাঙ্ক থাই যাবড়ে।

'কী? কথা বলছ না যে? মন আত্মা, বিবেক—'

'ওগুলো তো এখনই কিনতে পাওয়া যায়রে। তোর অন্তত জানা উচিত।'

রাজীবের কথায় কান না দিয়ে দুহাত শশাঙ্কর কাঁধ চেপে ধরে, 'ও ভাই। জবাব দাও—ওগুলোও কি একদিন বাজারে বিক্রি হবে?'

'আমি আসি দাদা'! জোর করে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে শশাঙ্ক উঠে দাঁড়ায়,সরে পড়ে।

ভারি ঘমে যায়। না তাকিয়েও বোঝে লোকনাথ ইসারা করেছে। তার দিকে আড়ে তাকিয়ে নিজের মাথায় টোকা দিতে দিতে ইসারা করেছে।

হায়, ওরা ভেবেছে মাথায় আমার গোলমাল দেখা দিয়েছে। কিন্তু ওরা কি ভুলে গেল সাতদিনও হয়নি স্পেশাল ইনক্রিমেন্ট পেয়েছি? খানিক আগেই এ ঘরে এসে আমার কালকের স্টেটমেন্টের তারিফ করে গেছে যেমন? ওদেরই সামনে ওরে গেছে।

আসলে শশাঙ্কটা জানে না যে মন আত্মা বিবেক মুক্তির ধার ধারে না। বিজ্ঞানের জারিজুরিও তাই খাটবে না।

এই মন নিয়ে এই আত্মা নিয়ে এই বিবেক নিয়েই ছ-চারশো বছর তবে কাটাতে হবে?

নতুন নতুন পার্টস কিনে দেহের খোল-নলচে পাল্টে ফেললেও ওগুলো থাকবে ইনটাক্ট?

সেরেছে!

আতঙ্কে দিশে হারায়ছিল, আইডিয়াটা হঠাৎ মাথায় উঁকি দেয়। চকিতে উঠে দাঁড়ায়। ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা অ্যাকাউন্টসে গিয়ে ঢোকে। শশাঙ্কর চৌদ্দিলে ঝুঁকে পড়ে।

হরিসের দূতে বলে 'একবার যাইবে এসো।'

'আ-আমি এখন খুবই ব্যস্ত দাদা।' লজ্জায় হয়ে যায় নাকাশ।

'জরুরী ব্যাপার, এসো।'

'ছুটির পরে—'

'না, এখুনি—'

'কিন্তু এখন যে—'

'চাটুয্যের পারমিশান নিতে হবে? চাটুয্যে আমাকে দেখেছে। আমার সাথে বেরোলে ওর বাপও কিছু বলতে পারবে না। কিন্তু, আমার কথা যদি না শোনো—যেমন আমার হাতের মুঠোয়—'

'চলুন। তবে তবে লজ্জায় উঠে দাঁড়ায়। পেছন পেছন আসে।

করিডরে তার কাঁধে দুই ধাক্কা বসিয়ে শুধায়, 'আচ্ছা ভাই বিজ্ঞান তো এমন ব্যবস্থাও করতে পারে—'

'আমি বিজ্ঞানের কিছুই বুঝিনা দাদা। বিশ্বাস করুন—আপনি ঐতিহাসিক লেখক আর আমি সারাদিন ভাইরেক্ট পড়ে—কাঁদে লাগবে। লজ্জায় কেঁদে ফেলার যো করে। 'আমায় ছেড়ে দিন—আপনার পায়ে পড়ি—'

'আঃ। ন্যাকামি কোরো না।' সরোষে হরিস হাঁচকি জোরসে কাঁধে এক ঝাঁকানি দেয়। 'লজ্জাটা আগে শোনোই না ভাই। ধরো, মনের সাথে খুনিবনা হচ্ছেনা—আমি এক ডোজ বিষ খেয়ে মনটাকে খুনি করে ফেললাম। তারপর মাংসের লোভ বাড়ার মত বেড়ে, ভালো করে বুঝে ডিসাইডেড হয়ে ফের নিজে ফেললাম। বিবেকটা বাগড়া দিচ্ছে—আমি একটা ছুঁচ খোলাস নিয়ে সেটাকে বের করে আনলাম—'

'হয়েছে। ওকে ছেড়ে দিয়ে এখন বাড়ি চলো।'

'মানে'? ঘুরে দাঁড়িয়ে রুখে ওঠে'। 'তোরা? তোরা কেন—'

'বাড়ি চল।'

রাজীব আর লোকনাথ আচমকা দুজন ছেলে আর্মস ধরে টানতে শুরু করে দেয়।

'কী হচ্ছে কী। ছেড়ে দে—ছেড়ে দে বলছি।'

'যেমনকে বলা আছে—'

'যেমন কালই বলেছিল দরকার হবেনা—'

'ছেড়ে দে—নইলে কিন্তু—ভালো হচ্ছে না মাইরি।'

'যেমনই তার গাড়িতে বাড়ি পৌঁছে দিতে বলেছে।'

'অফিসের ডাক্তার কাল বাড়িতে যাবে, তারপর—'

'তোরা কি ক্ষেপেছিস—'

রাজীব বলে, আমরা কিছুই জানছি না দাদার। ডাক্তার যা ম্যানেজমেন্ট ভাববে। পেয়ারের লোক যখন—'

লোকনাথ বলে, 'নেহাত কলিগ, অনেক দিন একসাথে যে কাজ করছি—'

'ডাব না। কক্ষনো আমি—'

'সিন ক্রিয়েট করিস না, সবাই জানে—এখুনি ভিড় জমে যাবে।'

'তখন পাড়োয়ানরা এসে ছ্যাংলোলা করে—চল্ ভালোয় ভালোয়।'

আক্রোশে অপমানে বাধা দলদল করে। সত্যি সত্যিই সবাই তাকে পাগল ভেবেছে? সাতদিনও হয়নি যে স্পেশাল টনিক্রিমেন্ট দিয়েছে, সকলের সামনে কালই যে তার স্টেটমেন্টের তারিফ করে গেছে সেই যেমন পর্যন্ত?

অফিস-কাটিয়ে প্রতিবাদ করতে গিয়েও সামলে নেয়। সে হবে আরও কেলেংকারি। আমি মাতাল নই বলে মাতালের দলাবাজির মত কেলেংকারি।

'আমিও এর শোধ তুলব।' হিসিয়ে ওঠে। 'নইলে আমার নামে কুকুর পুষিস।'

ঝটকা মেরে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে গটমট করে এগিয়ে যায়।

রাজীব আর লোকনাথকে ঘড়িসার্ভ বানিয়ে গটমটিয়ে যায়।

জাম্পিস ট্যাক্সিটা পেয়ে গিয়েছিলাম। বাড়ি আনতে রাজীব গ্যারাজে-আর সিগারেট কিনতে লোকনাথ দোকানে গেলে খালি ট্যাক্সিটা চোখে পড়েছিল জাম্পিস।

নইলে অফিসের ছোট সাহেবের গাড়িতে অফিসের দুই বন্ধু অতদূরে পৌঁছে দিলে ব্যাপারটা নিশ্চয়ই অন্যরকম পড়ে যেত।

ক'দিন ধরেই আড়ালে আড়ালে যা ফিসফাস চলছে। ক'দিনেই মুখগুলি সবার যেমন আমসি হয়ে এসেছে।

মা সরাসরি করেও আমল না পেয়ে 'তোমার কী হয়েছে বলো তো?' বলে কাল রাত্তিরে জোৎস্না কোঁপানি শুরু করেছিল. 'আমার কী হল গো।' বলে এখন শুরু করে দেবে ভিরেই আত্মা।

বউ কাঁদলে মা শিহিরে থাকবে না। কান্নার সাথী হওয়ার ভয়ে ইস্কুল-কলেজ থেকে ছেলেমেয়েদেরও জরুরী তলব করা হবে। যেমনের গাড়ি নামতে রাজীব লোকনাথই হয়ত তাদের নিয়ে আসবে।

দরদ দেখানোর এমন মওকা পাড়া-পড়শীই কি ছাড়বে। মুকুন্দে দরদ দেখানোর এমন মওকা।

সে হবে এক হিড়িকিড়ি কাণ্ড। যাচ্ছেতাই ব্যাপার। ভাগ্যিস ট্যাক্সিটা পেয়ে গিয়েছিলাম!

কিন্তু রাজীব লোকনাথ এখন যদি বাড়ি গিয়ে হাজির হয়? সবাইকে হুঁশিয়ার করে দেওয়ার জন্যে?

কাল যদি অফিসের ডাক্তার গিয়ে যায়?

ট্যাক্সি থেকে নেমে তবল ডেকারের সামনে হাঁপিয়ে পড়বে?

হায়! মরেও কি পার আছে। অপঘাত! মৃত্যুর যে পোস্টমর্টেম হয়। এক্সাক্টমর্টেম হলে যে—

হু হু হাওয়াতেও ঘাম ছোটে।

'কাঁহা যানা সাব?'

'বিশুকা পাস।'

'জী?'

'মানে—আরএকটু আগে—দাদুনের মোড় যে।'

বিশু ছাড়া এখন গতি নেই। আজটার জন হাফপ্যান্ট বয়েসের বন্ধু। সেই বয়েসের যাবতীয় কীর্তির কমরেড। বিশুর কাছে লজ্জা কিসের।

সর্দারজীকে আড় একটা টাকা বকশিস দিয়ে গলিতে ঢোকে।

কলিং বেল ঠেলে ধরে।

দরজা খোলে চাকর। 'কাকে চাই'?

'ডাক্তার বাবু আছেন?'

'এখন তো—'

'বলো, জরুরী দরকার—ভীষণ জরুরী দরকার—আমি ওর ছেলেবেলার বন্ধু—আমার নাম—'বলতে বলতে নিজেই 'বিত!' 'বিত!' বলে হাঁক শুরু করে দেয়। চাকরকে ঠেলে ঘরে ঢুকে পড়ে। 'বিত—বিত—'

বিত এসে বলে, 'আরে লেখক যে! কদ্দিন পরে! এই মাত্র ফেরে উঠলাম। তুই না হলে—যাক, তারপর আছিস কেমন? বোস বোস। রত্ন, তুই যা। বোস না।'

বেওয়াজ মাফিক মুখখানাকে হাসি হাসি করে তুললেও ভেতরে ভেতরে অস্বস্তি বোধ করে যাকুন।

ক বছরেই কী বদলে গেছে! চেহারার কী চেকনাই। বাড়িতেও শার্টট্রাউজার পরে থাকে। পাক্কা সাহেব।

এই বিত কি সেই বিত ইস্কুলে যে নাকের সিকনি আঙুলে নিয়ে আচারের মত চাটত?

'ওপরে যাবি? চল। ওয়ে ওয়ে গল্প করা যাবে।'

'তোর বউ কোথায়?'

'ওপরে, ডাকব?'

'না না না।' ওপরে যাওয়ার আগ্রহে হঠাৎ ঝপ করে বসে পড়ে। হাঁটু মুড়ে বসে।

'ও কিন্তু তোর ভীষণ অ্যাডমায়ারার। আমি অবিশ্যি আজকালকার লেখার পাঁচটাচ্যাচ—'

'মামিমা—?'

'মা তো গত বছর—'

যাক! খানিক স্বস্তি তবু। লোকার পা এলিয়ে দেয়। 'আমি বড্ড বিপদে পড়ে—'

'বিপদ?' বিত পাশে বসে। 'কিসের বিপদ?'

'হাসপাতালে যাওয়ার কথা ভাবতেই পারি না, চেনাজানা ডাক্তারের কাছে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না, আবার গ্যাসে ব্ল্যাকমেল করে সেই ওষুধ অচেনা ডাক্তারদের কাছে—'

'হয়েছেটা কী?'

'মাসখানেক ধরে যে আমার কী ভাবে কাটছে বিত। চব্বিশ ঘন্টা দুশ্চিন্তা! রাতে ঘুম হয় না, কেবল দুঃস্বপ্ন দেখি, জেগে স্বপ্ন দেখি, আবোল-তাবোল ভাবি, কাউকে সহ্য হয় না, কিছু ভালো লাগেনা—ভবিষ্যত ভেবে—কী যে ভেজারাস কণ্ডিশান-রে বিত'!'

'যেত্তেরি! ব্যাপারটা খুলে বলবি তো।'

'ব্যাপারটা—।' ভেবেছিল ঘরোয়া করে কথা বলতে বলতে কথার তোড়ে বলে ফেলবে, কিন্তু সেটা না হয়ে ওঠায় চোখ মুখ প্রাণপণে কাতর করে তোলে। সাথে সাথেই আবার হাসে এক ঝলক। 'ব্যাপারটা—'

'হ্যাঁ, ব্যাপারটা কী? কী হয়েছে?'

'তুই ডাক্তার, ছেলেবেলার বন্ধু—'

'অফকোর্স'।'

'ব্যাপার এক কাণ্ড!'

'মানে?'

'চল-কি অফিসে স্ট্রাইকের সময় হঠাৎ কিছু টাকা হাতে এসে গেল—'

'স্ট্রাইকের সময় টাকা এসে গেল?'

'ও কথা যাক। যা বলছিলাম—ভাবলাম এবার নতুন সাবজেক্ট নিয়ে নতুন টেকনিকে একটা উপন্যাস লিখব, তাই জার্নিক এক্সপিরিয়েন্সের জন্যে—কিন্তু এভাবে ফেঁসে যাব ভাবতেও পারিনি। প্লিজ-ওয়াকার হলেও মেয়েটাকে দেখে একবারও—'

'আচ্ছা।'

'তুই হাসছিস বিত।' কঁকিয়ে ওঠে।

'হাসব না! পাতোল কাঁহাকা। মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচতে হলে ম্যাক্সিমাম পরে বেরোতে হয় জানিস না? ভিজলে সর্দি তো হবেই।'

'সর্দি?'

'ও আজকাল সর্দির মতই। একটা কি ছুটো কোসে'ই—'

'অ্যাঁ!'

চটপট সোজা হয়ে বসে। 'আর আমি কি না সুইসাইড করার কথা পর্যন্ত ভেবেছি। শুধু পোস্টমর্টেমে সব জানা-জানি হয়ে যাবে বলেই—'

'শালা এই বুদ্ধি নিয়ে গল্প বানাস! তুই একটা বোকা পাঁঠা। আস্ত বোকা পাঁঠা।'

মানানসই গালাগাল দিয়ে বন্ধুর পিঠে বন্ধু হাত বুলোয়, 'ভয় নেই রে ভয় নেই—তোকে ওরি। ব্লাডটা আজ দিয়ে যা, কাল থেকেই—চল, বউয়ের কাছে যাই।'

বন্ধু বন্ধুকে টেনে তোলে।

জোর পর্যন্ত একতলা থেকে ছাদে উঠবার সিঁড়িটি হল। পনের বছর ধরে এই ভাড়াটে বাড়িতে বাস করছেন প্রিয়রঞ্জন। এ বাড়ির ছাদ আছে কিন্তু ছাদে উঠবার সিঁড়ি নেই। আরো অনেক কিছুরই অভাব ছিল বাড়িতে। বাথরুম ছিল না, রান্না ঘর ছিল না। একে একে সবই করে নিয়েছেন প্রিয়রঞ্জন। সপরিবারে বাস করতে হলে এ সব করে নিতেই হয়।

বাড়িওয়ালা পরেশবাবুকে বার বারের অনুরোধ করে দেখেছেন প্রিয়রঞ্জন, সবই তো করে দিলাম এবার আপনি সিঁড়িটা করে দিন।

পরেশবাবু বলেছেন "মাফ করবেন মশাই। রিটায়ার করবার পরে শুধু একটি সিঁড়িই আমি তৈরি করতে পারি। রাবণের স্বর্গের সিঁড়ি। সে আপনার বসে থাকলে আপনার ছাদে ওঠা হবে না।"

প্রিয়রঞ্জন হেসে বলেছেন, 'আরো অনেক উঁচু জায়গায় উঠতে হবে এই তো?'

পরেশবাবু বলেছেন, 'তার অনেক দেরি আছে। আপনি আমার চেয়ে অন্তত বিশ বছরের ছোট। আপনার অনেক আগে সেখানে গিয়ে আমি সিঁড়ি তৈরি করতে শুরু করব। আপনি ধীরে সুস্থে আসবেন।

যে রাজ্যের কথা পরেশবাবু বললেন সেখানকার ডাক অমন বয়সের হিসাব ধরে আসে না সে কথা প্রিয়রঞ্জন জানেন। তবু বিদ্যা আর অর্থ চিন্তার সময় নাকি নিজেকে অজর অমর ভাবতে হয়। যদিও এর কোনটাই প্রিয়রঞ্জন বাবুকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করেনি তবু মনটেতনে অজর আর অমর হবার বাসনা করে না থাকে? প্রিয়রঞ্জনেরও হয়তো আছে!

প্রাণপনে চাইবার শক্তি নেই কিন্তু তাই বলে কি বহু বাসনার হাত থেকে কেউ নিস্তার পায়? প্রিয়রঞ্জনও পাননি। সেই বাসনার সহস্রধারার একটি ছিল সিঁড়ি।

কিন্তু এ বাড়ির সিঁড়ি সে হবে না তা প্রিয়রঞ্জন প্রায় ধ্রুব বলেই জেনে নিয়েছিলেন। এই ছোট বাড়িটি পরেশবাবুর একার নয় ভাগের। আরো দুই অংশীদার আছেন, তাঁর ছোট ভাই আর মৃত মেজ ভাইয়ের ছেলে। তাদের মা বেঁচে থাকলে গলা পায় না, তাদের বাড়িও তেমনি এতদিন সিঁড়ি পাচ্ছিল না। সে বাড়ি আবার ভাড়াটে বাড়ি। যে ভাড়াটেকে আজকাল আর সহজে তোলা যায় না। যখন তখন বলা যায় না 'না পোষায় চলে যাও।'

তাই এ বাড়ির পরিবর্তন পরিবর্ধন নিয়ে কখনোই ওঁরা মাথা ঘামাতেন না।

কিন্তু পনের বছর বাদে মাথা ঘামাবার ভার শেষ পর্যন্ত প্রিয়রঞ্জনের উপরই পড়ল। দুঃখকর ঘটনা ঘটল একটি।

পরেশবাবুর ভাইপোর অকাল মৃত্যু হল। তারপর নানা ঘটনা পরম্পরায় প্রিয়রঞ্জন বাড়িটি কিনে নিলেন। সস্তায় নয় বরং একটু চড়া দামে। ভাবলেন আবার কোথায় যাব। থেকে যাই এখানেই।

এ যেন পনের বছর ধরে একটি মেয়ের সঙ্গে ঘরসংসার করবার পর ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিসে গিয়ে তার স্বামীত্বের অধিকার নিয়ে আসা। নবপরিণীতার সঙ্গে শুভদৃষ্টি এখানে নেই, নববধূর সঙ্গে ক্রমে ক্রমে সম্পর্ক গড়ে তোলার রহস্য এখানে অনুপস্থিত। এ শুধুই মৃত স্বামিত্বের আকস্মিক প্রসাদ। অধিকার বোধের কিঞ্চিৎ পরিতৃপ্তি। তবুতো কিছুদিন। এটুকুও তো না হতে পারত। তাঁর মত অনুচ্চাভিলাষী মধ্যবিত্ত মানুষের পক্ষে এই বিত্তটুকু ব্যর্থ হয়।

প্ল্যান টাল্যান্ পাস করাবার পর প্রিয়রঞ্জন এবার একটি সিঁড়ি তৈরীর কথা ভাবলেন। বৃদ্ধ এক ইঞ্জিনীয়ার ভার নিলেন সেই অবতরণিকার আর দ্বিতলে একখানি দুখানি ঘর নির্মাণের। তিনি বললেন, সিঁড়ি বেয়ে শুধু খালি হাতে উঠে লাভ কী। ঘর তৈরি করুন বাস করবেন। নতুন করে গৃহপ্রবেশ হবে। আমার হলোব্লকের কারখানা আছে। অন্তত টুকি জাইস পার্সেন্ট কম খরচ পড়বে।' তাছাড়া বাস করেও সুবিধে পাবেন। ঘরের দিকে ঠাণ্ডা, শীতের দিনে গরম থাকবে ঘর।

প্রিয়রঞ্জন মনে মনে হিসাব করে দেখলেন তারপর বললেন, 'আচ্ছা করুন। সিঁড়িটি কিন্তু আগে চাই।' সিঁড়ি তৈরির আগে বাড়ির সামনে শিয়রে বাঁশের ভারা বাঁধা হল। সেই ভারা বেয়ে মিস্ত্রীরা ওঠে, ওঠেন প্রিয়রঞ্জনের অত্যুৎসাহী স্ত্রী অঞ্জনা, আর ওঠেন সত্তর বছরের বৃদ্ধ ইঞ্জিনীয়ার ভদ্রলোক। কিন্তু যাঁরা জুতো পায়ে কালো রংয়ের ট্রাউজার আর সাদা সার্ট পরে তরতর করে তিনি বাঁশের ভারা বেয়ে উপরে উঠে যান। কখনো কখনো বা ফিরে তাকিয়ে বলেন, 'আসুন মিঃ রায় দেখবেন আসুন। আপনিও তো বাঁশের ছেলে। এত ভয় কিসের।'

প্রিয়রঞ্জন বললেন, 'তার না, আপনি সিঁড়ি তৈরি করে দিন। সেই সিঁড়ি বেয়ে উঠব।'

ডঃ দত্ত হেসে বললেন, 'সিঁড়ি ছাড়া বুঝি ছাদে উঠতেন না? আচ্ছা, 'সিঁড়িই আপনার আগেই করে দিচ্ছি।'

মিস্ত্রী লাগিয়ে শক্ত ছাদের শক্ত সিঁড়ি একটা খাড়া করে দিলেন ইঞ্জিনীয়ার দত্ত। রেলিং রেলিং পরে হবে। আগে তো প্রিয়রঞ্জন ছাদ দেখে আসুন।

প্রিয়রঞ্জন প্রাক্তন 'মাস্টারমশাই পরেশ বাবু দিয়ে বললেন, 'বোস মশাই, সিঁড়ি একটা কোন রকমে খাড়া করেছি! আপনি এসে উদ্বোধন করুন।'

পরেশবাবু আরো বৃদ্ধ হয়েছেন। একটু হেসে বললেন, 'সব কমপ্লিট করুন তারপর যাব। দূর থেকে আশীর্বাদ করছি এ সিঁড়ি আপনার উন্নতির সিঁড়ি হোক।' বন্ধুই বছরের বৃদ্ধা মাকে বললেন প্রিয়রঞ্জন, 'মা তুমি কি উঠতে পারবে? যেতে পারবে ছাদে?'

মা এখনো হেঁটে চলে বেড়াতে পারেন কিন্তু সিঁড়ি বেয়ে ওঠা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি সিঁড়ির গোড়ার কাছে এসে একবার ওপরের দিকে তাকালেন। তারপর হেসে বললেন, 'কত বছর আগে যদি এসব করতে বাবা তাহলে হয়তো যেতে পারতাম। এখন আর পারব না। তোমার বাবা থাকলে'—প্রিয়রঞ্জন বললেন 'বাবা থাকলে যেমন করেই হোক লাঠিতে ভর দিয়ে উঠলেও উঠতেন। তোমাকেও আমি আস্তে আস্তে হাত ধরে নিয়ে যেতে পারি।'

মা বললেন, 'না বাবা। শেষে একটা হিতে বিপরীত হবে। মরবতোনা হাত পা ভেঙে অচল হয়ে পড়ে থাকব। তোমরা ওঠো, 'আমি দেখি। তোমরা উঠলেই আমার ওঠা হবে।

প্রিয়রঞ্জন স্ত্রীকে বললেন, 'যাও এবার কলসী কাঁখে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওঠো।'

অঞ্জনা বললেন, 'সোনার কলস এনে দাও তবে তো কাঁখে নেব!'

প্রিয়রঞ্জন জানেন তাঁর ওঠাও বাকি নেই যাওয়াও বাকি নেই। কিন্তু সোনার কলস কেন ভালো পিতলের একটি কলসও এখন আর নেই বাড়িতে। জলতুলবার জন্যে আছে শুধু পলিথিনের বালতি। পিতলের কলসী মাটির কলসী সবই এখন অতীতের সোনার স্মৃতিতে জড়ানো। তাদের আর যাবতবহোগ্যতা নেই তারা এখন আর্টের সামগ্রী।

ছোট ভাইকে কিছু বললেন না প্রিয়রঞ্জন। সে ভাবে লাগার এসব আদিখ্যেতা। যুবক ছেলেকে কিছু বললেন না প্রিয়রঞ্জন। সে ভাবে বাবার এসব ছেলেমানুষী। তিনি সান্ত্বনা দিয়ার জন্য প্রচুর বাক্য করছেন। যা তুচ্ছ করতে পারতেন তাকে মূল্যবান করে করছেন।

তরুণ ভাইপো টিকলুর ছাদে ওঠা-নামার বিরাম নেই। ছাদ দেখা তার এই প্রথম নয়। দশ বার বছর বয়সে পাইপ বেয়ে সে ছাদে উঠেছে। এখন সিঁড়ি বেয়েও উঠছে।

ইঞ্জিনিয়ার দত্ত বললেন 'ভাই মশাই চলুন ছাদে তখন যে খুব গরম দেখছিলেন এখন মিইয়ে গেলেন কেন।'

প্রিয়রঞ্জন একটু হেসে বললেন চলুন। দেখি গিয়ে আপনার কীর্তি।'

ইঞ্জিনিয়ার বললেন 'কীর্তি আর আপনাকে দেখাতে পারলাম কই। তবে আশা আছে একদিন পারব।'

এখনো আশা আছে। প্রিয়রঞ্জন লক্ষ্য করেছেন এই সত্তর বছরের বৃদ্ধ যেন সাতাশ বছরের যুবকের মত উৎসাহ নিয়ে কাজ করছেন, কথা বলছেন। প্রিয়রঞ্জন দেখেন আর অবাক হয়ে ভাবেন এই উদ্যম উৎসাহের উৎস কোথায়?

প্রিয়রঞ্জন ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে ঘুরে ছাদ দেখলেন। একই পরিচিত পরিবেশ। শুধু একটু উপর থেকে দেখা। খানিক দূরে পূর্বদিকে দেখা গেল বড় রাস্তার একটি ছোট্ট অংশ। গাড়ি অশ্বত্থ অশ্বত্থ শুধু মধ্য ভাগটুকু দৃষ্টি গোচর। যাত্রী বোঝাই একটি বিভল বাস সেই পথখণ্ডটুকু পার হয়ে চলে গেল।

মিস্ত্রীরা এসে বকশিস চাইল, আমাদের কিছু জল খেতে দিন। প্রথম উঠলেন সিঁড়ি দিয়ে।'

প্রিয়রঞ্জন পাঁচটাকার একখানা নোট ওদের হাতে দিলেন।

ওরা খুশী হয়ে চলে গেল

ইঞ্জিনিয়ার বললেন 'রামদেরকে ভালো করে কাজ করে ওরা। বাবু তোমাদের আগে খুশী করে দেবেন।'

প্রিয়রঞ্জন ভাবলেন সিঁড়ি ওদেরও। কেউ হাত দিতে সিঁড়ি গড়ে, কেউ ভাঙতে সেই সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে ওঠে। কেউ বা আসার পড়িয়ে পড়িয়ে পড়ে। সিঁড়ির আর এক নাম অবতরণিকার সিঁড়ি শুধু-উর্ধারোহনের নয় অবতরণেরও। আমরা একদিক থেকে উঠি আর একদিক থেকে পড়ি শ্বাস-প্রশ্বাসের মত এই উত্থান পতন যুগপৎ চলে।

মিস্ত্রীরা ঘর তৈরী করছে ভালো করে দেয়াল গাঁথছে। কালো কালো বড় বড় ইট। মাঝখানে ফাঁকা। এক একটি ব্লক দশখানি ইটের সমান।

ইঞ্জিনিয়ার ঘুরে ঘুরে সব দেখে এলেন। ফিরে এসে প্রসন্ন মুখে বললেন 'বেশ কাজ চলছে

অনেকগুলি ইট একদিকে জড় করা রয়েছে। প্রিয়রঞ্জন তার ওপর বসে পড়লেন, বললেন 'আসুন ডঃ দত্ত? বসুন এসে এখানে।'

বৃদ্ধ ইঞ্জিনিয়ার তাঁর ফোকলা দাঁতে হেসে বললেন 'কী ব্যাপার। এরই মধ্যে টায়ার্ড হয়ে পড়লেন? চলুন তা হলে নেমে যাই।'

প্রিয়রঞ্জন বললেন 'না না বসুন একটু চা খাবেন? চা আনতে বলব?'

ইঞ্জিনিয়ার হেসে বললেন 'না না এই অসময়ে চা খাব না। খেয়ে খেয়ে বেরিয়েছি। আমার সব কটিন বাঁধা। আপনাদের মত নিরঙ্কুশ: ধরবার মতো আর নেই। আপনি কি খুশী হননি মিঃ রায়? যা দেখছেন এতো শুধু স্ট্রাকচার কাজ শেষ হোক তখন খানিকটা কারুকার্য দেখতে পাবেন। আপনার ভালো লাগবে।

আকাশে দুপুরের মেঘডাকা রোদ কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার সব সময় ছত্রপতি। তিনি ছাতাটি খুলে প্রিয়রঞ্জনের মাথায় মেলে ধরলেন।

একটু বাদে প্রিয়রঞ্জন বললেন ডঃ দত্ত আমি আপনার জীবন কাহিনী শুনেছি।

সেই মাটিতে এ আপনি জার্মানী থেকে উৎখাতই হয়ে এসেছেন। চল্লিশ বছর বয়সে আপনার জীবন ছোর জীবন-সংগ্রাম। আপনি হলো ব্লক নিয়ে কাজ করেছেন, মাটি আর বাঁশের তৈরি বাড়ি নিয়ে।

ইঞ্জিনিয়ার বললেন, 'এই গরীবের দেশে বেশি ব্যয় করবার ক্ষমতা কটা লোকের আছে বলুন? আমি সম্প্রতি ভাল ব্যবস্থা করতে চেয়েছি।'

প্রিয়রঞ্জন বললেন কিন্তু আপনি আজও উপযুক্ত স্বীকৃতি পাননি?'

ইঞ্জিনিয়ার বললেন, 'কই আর পেলাম। টাকার অভাবে কিছু করতে পারছিনে। গভর্নমেন্টের কাছে লাখখানেক টাকা চেয়েছিলাম, পঞ্চমমত একটা ফ্যাক্টরি করব। কিন্তু আদায় করতে পারিনি। এখনো হাঁটাহাঁটি, ঘোরাঘুরি, লেখালেখির পালা চলছে। দিনের মধ্যে বেশী দুই ঘন্টা আমার রেসপণ্ডেন্স আর টাইপ করার কাজে।'

প্রিয়রঞ্জন বললেন 'কিন্তু আপনার ওই পরিতৃপ্তির উৎস কোথায় বলুন তো? আপনি তো তেমন কিছুই পাননি।

ইঞ্জিনিয়ার সোজা হয়ে বললেন তারপর প্রিয়রঞ্জনের দিকে চেয়ে হেসে শান্তভাবে বললেন 'কে বলে পাইনি। টাকা হয়নি, বাড়ি-গাড়ি হয়নি।

কিন্তু নিজে, আমি এখনো খাটতে পারি, কাজ করতে পারি, কাজ করে আনন্দ পাই। আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি মিঃ রায়। তিনি যা করেন তাই হয়। তিনি যা দেন আমরা তাই পাই। কিন্তু ভিখারীর মত হাত পাতলে হবে না, ওই মিস্ত্রী মজুরের মতই আমাকে খাটতে হবে। নিজের উপর আমার বিশ্বাস আছে মিঃ রায়। এই বিশ্বাস আমাকে তিনিই দিয়েছেন।'

প্রিয়রঞ্জন কোন কথা বললো না। এই বৃদ্ধের জটিল ইঞ্জিনিয়ারিং তত্ত্ব আর সরল আধ্যাত্ম বিশ্বাস দুইই তাঁর কাছে দুর্বোধ্য। জীবন কি এতই সহজ সরল? কে জানে? সবাইর জীবনের প্যাটার্ন তো এক রকম নয়। কারো সোজা কারো বাঁকা। যে না কখনো সোজা কখনো বাঁকা, কোন বিষয়ে সোজা কোন বিষয়ে বাঁকা?

আরাম চেয়ারে বসে বৃদ্ধ ইঞ্জিনিয়ার তাঁর নিজের কথা বলতে লাগলেন, 'তা ছাড়া জানেন মিঃ রায়, আমি আমার ফ্যামিলির কাছ থেকে অনেক সাহায্য পেয়েছি। তারা আমার জন্যে যথেষ্ট স্যাক্রিফাইস করেছে। আমার স্ত্রী আমার ছেলেমেয়েরা। তারা আমার কাজকে বাতিক বলে মনে করেনি শুধু খেয়াল বলে উড়িয়ে দেয়নি। তারা আমার কাজকে যোগ্য মর্যাদা দিয়েছে।

প্রিয়রঞ্জন পরিতৃপ্ত পরিতৃপ্ত বৃদ্ধের দিকে বিস্মিত ভাবে তাকালেন। একটু হেসে বললেন 'আপনার ছেলেমেয়ে যেন কটি?'

ইঞ্জিনিয়ার হেঁসে বললেন, 'আপনাকে একবার বলেছিলাম। ভুলে গেলেন? আপনি ফিগার অফ স্পীচ নিয়ে ব্যস্ত। অঙ্কের ফিগার মনে রাখেন না। ছেলে-মেয়ের সংখ্যা অনেক। বুড়ো বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়ে হয়েছে মশাই। সংহারের বিদ্যা জানি। তবু সেদিকে যাইনি। পালন-পোষণ করেছি। যথাসাধ্য লেখাপড়া শিখিয়েছি। বিয়ে থা কারো দিতে পিরিনি। তবে চেষ্টা করছি। কিন্তু ছেলেমেয়েরা মাথা পাতে না। বলে বাবা তুমি আগে দাঁড়িয়ে নাও। কথা শুনুন। এখনো ওরা আমাকে নিজের পায়ে দাঁড়াবার জন্য ভরসা দেয়, পিঠ চাপড়ায়।"

ইঞ্জিনিয়ার হাসলেন। দু'তিনটি দাঁত নেই মুখে। প্রিয়রঞ্জন একদিন জিজ্ঞাসা করছিলেন, 'বাঁধিয়ে নিচ্ছেন না কেন?'

ইঞ্জিনিয়ার হেসে বলেছিলেন, 'তা'হলে লোকে ভাববে আমার সবগুলি দাঁতই বুঝি বাঁধানো। আমার এই উনসত্তর বছর বয়সে উনত্রিশটি দাঁত যে এখনো অকৃত্রিম লোকে তা বিশ্বাস করবে না। তা ছাড়া খেতেটেতে কোন অসুবিধা হয়না। পাঁঠার হাড় মুরগীর ঠ্যাং দিব্যি চিবিয়ে খেতে পারি। শুধু কথাটা একটু অস্পষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু মরছি স্পষ্ট করে বলি নে এই জেনারেশনের ছেলেমেয়েরা কি আর আমাদের সব কথা বুঝবে? চলুন ওঠা যাক।'

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ওঠার কথাই বলতে লাগলেন ইঞ্জিনিয়ার। তাঁর কাজ দেখে এ পাড়ার কেউ কেউ এসে খোঁজখবর নিচ্ছে। একজন যুবক ইঞ্জিনিয়ার এসে তাঁর সঙ্গে আলাপ করে গেছেন। খুব উৎসাহ দেখিয়েছেন। এই পাড়াতেই আরো দু একটা কনট্রাক্ট পাবার আশা পেয়েছেন ইঞ্জিনিয়ার।

তিনি মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'ভাববেন না, মিঃ রায় এই সিঁড়ি আপনি আরও বাড়াতে পারবেন। তিন তলা অবধি নিয়ে যেতে পারবেন। আমিই করে দেব সেই কাজ।' আমাকে কিছু কাজের সুযোগ দেবেন মিঃ রায়। আমি কাজ করতে পারলেই খুশী।'

প্রিয়রঞ্জন ভাবলেন, 'কাজ তো আমিও করতে চাই। কিন্তু আমার মধ্যে আর একটি অকাজের লোক যে বাসা বেঁধে আছে তাকে তাড়িয়ে তোলা বড় কঠিন। সেই দু'জনের সংঘাতকে দিয়ে আমি যদি জোর করে কাজ করাতে যাই সে অকাজ করে বসে। আমার সৃষ্টিকে সে অপসৃষ্টির অপমানে কলঙ্কিত করে। স্তরে স্তরে অনাসৃষ্টির উপহাস ছড়িয়ে দেয়। এই বৃদ্ধ ইঞ্জিনিয়ারের মত সরল বিশ্বাস আমার নেই অমন কর্মঠ জীবন আমার নেই। নেই অমন অধ্যবসায় আর অটুট মনোবল। অমন অখণ্ড ক্ষমতা আমি কোথায় পাব। আমার বিভিন্ন বাসনা যেন বিভিন্ন ব্যক্তি সত্তার সামিল। আমি মনে মনে একটি উর্ধ্বারোহনের সিঁড়ি আঁকি তার মধ্যে। যদিও জানিনে সেই সিঁড়ি কিসের। সীমিত গণ্ডীর মধ্যে যশের না অর্থের না প্রেমের? না অধ্যাত্মবোধের আত্মোপলব্ধির? না কি একই সঙ্গে চতুর্বর্গ ফলের। আমি কী পেতে চাই জানিনে, কোথায় উঠতে চাই জানিনে। উঠতে চাই কিনা তাতেও আমার সংশয়। কারণ অবরোহণে অপচয়ে অক্ষয়ে আত্ম-হননেও আমার উল্লাস কি কম? আমি নিরন্তর এই আরোহন অবরোহনের খেলা নিয়ে আছি। কখনো খেলা, কখনো তা দুঃখ যন্ত্রণা। আমি কখনো দর্শক কখনো পাঠক, কখনো বা আত্মচরিতের লেখকও।'

ইঞ্জিনিয়ার বললেন, 'কী হল মিঃ রায়। থেমে পড়লেন যে? চলুন।'

প্রিয়রঞ্জন বললেন, 'হ্যাঁ চলুন। এবার নামা যাক।'

আমাদের মেয়ে

জসীমউদ্দীন

এ মেয়ে সাগর দিয়ে পাড়ি
মাটির মায়াবী চাঁদ
ভেঙে সে যাবে আষাঢ় ;
ডাকে সে অনেক দূর
ধরণীর শেষ প্রান্ত ছাড়ি।

এ মেয়ে সাগর দিয়ে পাড়ি।
সোনার তরঙ্গ ফণী
মাথায় ফেলিল মণি,
চরণ রাখিয়া তার পরে

চলিবে চির নির্ভয়
আরোহী জগতের হুঁশ ;
টাপাবে দিগন্ত রেখা
দীপ্ত পদ ভরে।

আকাশ অশনী ধায়
ছিন্ন মেঘের গায়,
লিখিবে গরল লেখা
বিদ্যুৎ অক্ষরে।

ধরি তার কেশবাস
গ্রলয় হানিবে শ্বাস,
জ্বালাইয়া কালানল
আকাশ গহ্বরে।

এ মেয়ে ফুলের ঘায়
মরিও মূরছা যায়,
কাঁদিয়া আকুল হয়
সামান্য কারণে।

তবু এই ভীরু মেয়ে
সাহসিকা সব চেয়ে
এ মেয়ে ধরিবে খড়্গ
অসুর নিধনে।

গলায় নরমুণ্ড মালা
ললাটে মার্তণ্ড জ্বালা,
সমাজ সবের পরে
নাচিবে তাণ্ডবে।

ভাঙিবে বিধি বিধান,
ধর্মে ধর্মে বাধবান
বৈষম্য বিশৃঙ্খলা
খণ্ডিত এ ভবে

এ মেয়ে আনিবে নব ঊষা,
ঊষর তারার বুকে
দাঁড়াবে দিগন্ত পথে,
মেঘেরা হানিবে তারে
সোদিতাক্ত চুমা।

বুভুক্ষার হাহাকার
খর্পরে ঝালিবে তার,
জ্বলিবে অভাব বহ্নি
খড়্গের ফলকে।

নাচিবে যে ভয়ঙ্করী
নিজ ছিন্ন মুণ্ড ধরি,
ছড়াইবে রক্ত বীজ
গোলকে গোলকে।

সেই রক্তধারা পরে
জনমিবে ঘরে ঘরে
শত শত বহ্নিনাগ
দীপ্ত চক্ষু ভরে।

শারদীয়া ধ্বনি, ১৩৭৬

তাদের হুঙ্কার ধ্বনি
দিগন্তে উঠিবে রণি,
পালাবে তামসী নিশি
আকাশ পরশে।

এ মেঘে বাঁধিবে পুনঃ ঘর,
এবারে নদীর রেখা
রুপালী আঁখরে লেখা,
কত না সুখের কথা
তরঙ্গে গাহিবে অহরহ।

ছোট সে কুটিরে তার
সোহাগ ধরে না আর
সোণালী রোদের ঝর
কলার পাতায় নাচে ঘুরে।

উঠানে সবজী লতা
তাহার মনের কথা,
মেলিয়া কোমল পাতা
দোলায় লাউলাখানি ঘুরে।

ঘর ভরা সুখ তার
মন ভরা খুশী তার,
গানের পাখায় তার
হইয়া হকাবে সুরে সুরে।

উঠানের ফুলগুলি
তাহার আদরে দুলি
সুবাস কোঠরা খুলি
দিবে সে সবার বুকে পুরে।

দুটির ঘাস

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

দুটি আমার দুটি।

বাজলে ডৌ—
হাত ধোবো
আলপনা ক'রে দুটি!

দুটি আমার দুটি।

বাঁধে যে ভিত
ঘরে নীড়
তারই তাকে দুটি।

দুটি আমার দুটি

রইল বুক
যা হয় হোক
ঢেলে দিয়েছি দুটি।

দুটি আমার দুটি।

ফুলের ঘাড়
নামায় ভাঁড়
ঝলক বন্ধু উঠি।

দুটি আমার দুটি।

ঠিকরে পা
আছাড়ে আঃ
বুজব চোখ দুটি

দুটি আমার দুটি।

ফিরে যা তুচ্ছ
যা, পিছু নিস্ না—
ফিরে যা রে হিংসুটি।

আমি সকলের সঙ্গে

কৃষ্ণধর

আমি সকলেরই সঙ্গে সঙ্গে, সঙ্গমিত্র তেপান্তরে
বিরহে অমনা, পাশাপাশি, কাছাকাছি
বিবৃতিবিহীন কথায়, উজ্জ্বল তরঙ্গে ভেসে ভেসে
ভঙ্গুর ভেলায়।

আমি মানুষেরই মুখ দেখে সর্বক্ষণ আলস্যে কর্মে ও নিদ্রায়
জাগরণেও আছি, দশটা পাঁচটা ট্রামে বাসে
পাদানিতে ঝুলে নৈমিত্তিক জবাতায়, কখনো বা
দাঁতে দাঁতে ক্ষোভ চেপে, আমি প্রতিদিন।

গ্রীষ্মের প্রখর নখে-ক্ষত থেকে অবিরল রক্ত ঝরে পড়ে
আষাঢ় শুকোয় এমনি এমনি হাওয়া লেগে
তখনও আকাশে খুঁজি মেঘ আর ছায়া
শান্তির সিঞ্চিত জল দিতে পারে প্রাণের আরাম
দুই হাতে তুলে নেই ভীষণ তৃষ্ণায়।

ফুল ফুটলেও আছি, থাকি মরু বিস্তৃত বালুতে
উন্মুখ কাশফুলে, কাঁটা ঝোপে পাথুরে জমিতে
বৃষ্টি বা পায়ের শব্দে ঘুমটুকু ভেঙে যায়
এ জন্মের ওরে গ্রেনেডের প্রচণ্ড আওয়াজে
কাঁদানে গ্যাসের ধোঁয়ার অনিচ্ছায় কান্না আসে চোখে
যৌবনের দুর্বহ লজ্জা, কোলাহলে কান পেতে থাকি
ফুটপাথে জন্ম নেয় অন্নদিন থাকে নিয়ে থাকতে হবে
আমাকেই এইভাবে তরঙ্গে তরঙ্গে ভেসে ভেসে
ভঙ্গুর ভেলায়।

কবিতা

শংকর চট্টোপাধ্যায়

দশদিকে ঘুরে যাই
দশদিকেই তোমার চিত্রের উদ্বোধন
যেন বাগান, তুমি জনপ্রিয় কুসুমটি হয়ে ফুটে আছো
গাতার চাপে ঢাকা পড়ছে হাত তোমার, মাথা তোমার
দেখছি পদতল কখনো রাঙানো
দেখছি বর্মহীনা বলেই, প্রভু তোমায় ঘিরে দিচ্ছেন দশ দিকে।

দশদিকে ঘুরে যাই
মনে মনে জলযন্ত্র খুলে পথিককে ডাকি
'কে আছো উন্মাদী
কে তুমি আমার চোর ?
চোখের জলেই মিলন হবে আমাদের।'
আমার সমর্পণ তাই পথের লালধুলো উড়িয়ে দিগ্বিদিকে ছুটছে
আমার নির্বাচন তাই প্রতিটি বস্তুকেই উল্টে পাল্টে বাজিয়ে দেখছে,
এমন বর্মপ্রাণ করেছ আমাকে, যাতে দশদিকই ক্রমাগত টলে যাচ্ছে।

বিফল অসুখ নয়

দেবারতি মিত্র

ওদের দালান কেন করি, ধুলো ঝরে মানুষের পাতে
এ দীন হৃদয় কেন বেঁচে থাকে জানায় আমাকে !
একটি অত্যন্ত দামী ক্ষীণ সুতো তুমি ছিঁড়ে যাও
একবার পাশ ফিরে শুলে, দুলোধা অসুখ থেকে
সেরে উঠে কোনদিন প্রতিরোধ থাকে না সকালে।
হয়তো ঝরেছি মুখ মানুষের আমি ভগ্নজানু
প্রায় মরে যাই আজো কোনও চোখ অপাঙ্গে চাইলে।
রহস্যের অসঙ্গত ফল সে কি কেবল শরীর,
ইন্দ্রিয় কি পিতামহ উত্তর পুরুষ অন্ধকার।
কেন তুমি বারবার জেনেও অলীক ভয় আনো
আমাকে কাঁদিয়ে শোনো আবর্তন একই সঙ্গীত ?
এত বেশী শীত লাগে, আমার আঙুল ভুল করে
জীবনের ভালোবাসা তবু ভেঙে দেয় এই বুক,
তোমার উপমা নয় প্রত্যয়ের বিফল অসুখ।

শারদীয়া অমি, ১৩৭৬

অংকুরের সাথে কথোপকথন

গৌরকিশোর ঘোষ

এখন সংগ্রাম বড়ো
এ মাটি কঠিন
জীবন নির্মম
তাই নীরসের সাথে যাও
দুপাশে বিস্তার কর
শাখা যত পার
প্রশাখা বাড়াও
অযুত পল্লব
শিকড় ঢুকিয়ে দাও
গভীরে পাতালে
যেখানে রসের উৎস
স্বার্থপর হও
এ মৌসুম অনিশ্চিত
বায়ুর প্রভাব
এই আছে এই নেই
প্রাণের ভাঁড়ারে
অল্পই সঞ্চয়
অগণন প্রতিদ্বন্দ্বী
বৃদ্ধ অক্ষয়
কে বাঁচে কে মরে
নিজের চিন্তাতে
স্থির হবে
ওঠো মাথা তোল
স্বার্থপর হও
বড় হও আরও বড়
আকাশ নিরীক্ষ
ডাল পালা ছেটে ফেল
দীর্ঘতর দীর্ঘতম হও
সকলের আগে
সূর্যের আলো ছোঁও
এবার নিশ্চিত বলে
প্রতিদ্বন্দ্বী পরাভূত
জীবন মৌরসী তাই
শীত গ্রীষ্ম
বায়ুর ভ্রূকুটি
খেলা খেলা মনে হবে
হে বৃক্ষ হে বট
এবার উদার হও
এবার আশ্রয় হও
অকাতরে ছায়া দাও।

সেই মৃত গাছ

রাম বসু

সান্ধ্যলীন রোদের নিলিপ্ত
মৌন বৃন্তে ঝরা গাছ
আমার হৃদপিণ্ড কে উপড়ে এনেছে
আমি স্নায়ু গাছের তলায়।

মৃত গাছ, জন্তু
কুরুক্ষেত্রের আকাশ শিহরনে
এখনো রক্তের গন্ধে ভরা
আমি বিষাদে আবৃত
খুরের ধুলোয় ঢাকা ঝুঁড়ে।

শুকনো ডাল বুকে মাথা তুলে
আকাশে মানুষ বুঝি এইভাবে দাঁড়াতো দুরন্তায়
লক্ষ খাবার গন্ধ জমানো-সময়ে।

অথবা সে ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র, যিনি
দিবাতাপ তুলে দিয়ে আকাশ কপোত, আজ
আমাদেরই মতো ভগ্ন, নিরর্থক।
মুখ
রঙ-চটা টিনের তোরঙ্গ
জিভে
কাচ ফুটে আছে বহুদিন
দেহে
সব বাহীর বিষাদ
আমি গাছের তলায়।

বুকে হাটে ঝিরঝিরি-আঁধার
গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়ে
ইঁদুরের সাদা দাঁত সে যেন শিকড়ে।

কেউ যদি বলে এই গাছের তলায়
ভালবাসি, অযুত হতো না, সোনা
মনে হয় আমি যেন বাড়ি যেতে পারবো, এই ভেবে,
এখনো রয়েছে কেউ আর পাছে শিকড়ের কথা
পৃথিবীর সমতলে ছড়তো বা অঙ্কুরিত হবে একদিন
মাঝরাতে আমি হয়তো স্বপ্ন দেখবো অনন্ত পাখির।

মৃত মৌন গাছ আমার শিয়রে।

শারদীয়া ধ্বনি, ১৩৭৬

নিশির ডাক

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

ছিলাম ঘুমন্ত, কে যেন আমার নাম ধরে স্পষ্ট ডাকলো
তিনবার, শিয়রের খুব কাছ থেকে
বাঘ, চেনা কণ্ঠস্বর—
ধড়মড় করে উঠে বসি, আমি-সমেত খুব অন্ধকার ঘর
খোলা জানলার পাশে নিঝুম রাত
তার পাশে স্থির আকাশ।
দরজা খুলে বারান্দাতেও উঁকি মেরে দেখলাম
কোথাও কেউ নেই, বাতাস ও জ্যোৎস্নার মেশামেশি
পৃথিবী ও পৃথিবী ছাড়িয়ে অপরীরী স্তব্ধতা—
অথচ স্পষ্ট ডাক শুনেছিলাম, চেনা গলা অথচ নাম জানি না!
কের বিছানায় শুয়েও খটকা যায় না
তবে কি আমারই আত্মা ডেকে উঠেছিল আমাকে
ঘুমের মধ্যে?
অত্যন্ত ব্যস্ত ডাকে কোনো একটা জরুরি কথা বলতে চেয়েছিল?
কি?
শুধু ঘুমের মধ্যেই সে কথা বলা যায়?
জেগে উঠে ভুল করেছি!

সব সময় মনে হয়, আমার একটা ক্ষমা চাইবার আছে
কিন্তু অপরাধটা ঠিক চিনতে পারি না
সব সময় মনে হয় আমি একটা বিশেষ জরুরি কাজের কথা ভুলে গেছি
অথচ মনে পড়ে না
প্রেমের মধ্যে কোনো ছলনা, অশোচরে কোনো পাপ
বুঝি ঘটে যাচ্ছে যে-কোনো সময়
ঘুমের মধ্যে আমার বিস্মৃতির ওপার থেকে ভেসে আসছিল
সেই কণ্ঠস্বর!
কেন জেগে উঠলাম?

[illegible]

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

অন্ধের সমস্ত মন যেমন চাক্ষুষ
তেমন নিয়ম, বন্দী, মুক্তিজলপুর
এই দেশে, শস্যক্ষেত্র পর হয়ে দূরে গ্রাম, মানুষের ভীড়
এখনো নিষ্পাপ প্রেমে…
তবুও কোথায়
শুকনো খোল, জলের কাঙাল নদী নিরবধি
যে দাতা সে সবকিছু দেয় না যেহেতু
এইসব মৃদু কান্না, ক্রমবর্দ্ধমান ভেদাভেদ
মানুষের মনে এসে সত্তা ও কঠিন হতে থাকে
অন্ধ শুধু তেমনই চাক্ষুষ…
দূর থেকে শুরু ক'রে একদিন সমগ্রে পৌঁছায়।

নাগরদোলা

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

ঘুরনডাঙার মাঠে সেবার মেলা হয়েছিল খুব
সারিসারি নাগরদোলা সারাদিন এক অদ্ভুত শব্দ করতে করতে
ওপর থেকে নিচে, নিচু থেকে ওপরে
চঞ্চল মানুষের ঘোরাফিরা—
ভুলে বান্ধবীর পাশে দাঁড়িয়ে সেই প্রথম
মানুষের উত্থানপতন দেখার অভিজ্ঞতা।

তারপর কখন সঙ্গে হয়ে গেছে—
হাত ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে বান্ধবীর সঙ্গে
কখন নিজেই নাগরদোলায় উঠে বসেছি জানি না,
কিংবা বসি নি;
কিন্তু একটা অদ্ভুত ঘর্ঘর শব্দ
আমার শিয়র ঘরে রয়েছে এখন—
মাটি ছুঁতে-না-ছুঁতে তুলে দিচ্ছে ওপরে
খোলা আকাশে নিশ্বাস নিতে-না-নিতে ফেলে দিচ্ছে মাঠে।

চিৎকার শোনা যায় না, এমন একটা ঘর্ঘর শব্দ
সারাদিন সারারাত।

আর্তারক্ত

বিজয়া মুখোপাধ্যায়

জন্মের সময়
ঈশ্বর আমার হাতে এক অতিরিক্তকে
গুঁজে দিয়েছিলেন।
শিশু বয়সে সে আমার চোখের জলে বাস করত,
যৌবনে সে আমার কণ্ঠলগ্ন ক্ষীরের পুতুলি,
বার্ধক্যে আমার সমগ্র সত্তায় ব্যাপ্ত হবে তার
অতি সন্নিধান।

মৃত্যুর দিন ঈশ্বরের কাছে সে ফিরে যাবে।
তার আগে আমরা কেউ কারুর হস্তচ্যুত হব না।
লোকে বলে তার নাম অভিমান।
কিন্তু তার কি অন্য নাম হতে পারত না, যেমন—
অহংকার, শুদ্ধ বিবেক কিংবা ভালবাসা?

কথা ঠিক দিতে পারছি না

সুধেন্দু মল্লিক

আবার ছাখো ওরা আমাকে মাটিতে রোপন করছে
আমি কি পাচ্ছি আলোকস্নান ?
বাগান বা রাস্তার শোভা
বাড়াবো পরক্ষ মতো !
আবার ছাখো ওরা আমাকে কেবল জড়িয়ে রেখেছে।
দুখের সন্ধানে যাওয়া দুহাতের খোলাপ গুচ্ছ
সে আমার ইহজীবনের পরমার্থে ছুট পড়েছে।
আজীবন অন্ধকারাগার তার আবার ফিরেব পত্তর !

এই যে দূর বাড়ির থেকে তোমাদের কলধ্বনি
কলহের সংমিশ্রণ অথবা প্রেমের জোয়ার
ঘ। কিন্তু ভাসতে ভাসতে বেখেয়াল তীরভূমিতে
লাগছে নৌকার মতো তাতেই কৃতজ্ঞ থাকছি।
আবার আমাকে কেন। প্রয়োজন কার প্রয়োজন ?
আচ্ছা সে দেখা যাবে, না, কথা ঠিক দিতে পারছিনা।
বলতে বলতেই ছুট একেবারে খাঁখা বাড়িতে
যেখানে বারান্দা ধরে খুলতা দাঁড়িয়ে রয়েছে—
আবার ছাখো ওরা আমাকে মাটিতে রোপন করছে।

নিরপেক্ষ ঘরনা

সত্যানন্দ ভট্টাচার্য

প্রথাসিদ্ধ—কৃষ্টির তাত্ত্বিক আলোচনা।
করে চলন
বিশুদ্ধ সংবাদের—আর্থে উদাসীন,

চলে অভিসার
বাস্তবাধূল, যজনহীন শিল্পের নিশানা।
কিন্তু দিশা তার, না হয় নির্ণয়
উল্লিখিতের হরফ কালো
সত্যাসিদ্ধ দেখে, তাকে প্রতারণা।

নিরপেক্ষ—তান শুধু, মুখোস পরা বীভৎস কুরূপ
জনলোভা ঐকামেল করা
গোপন হিংসা ঐ মহলের
থাকে অবগুণ্ঠনে—ব্যক্তিচার প্রজ্ঞার অজানা।

কপট—নিভৃতে হানে প্রতিকারহীন উদ্যত অশনি
ভ্রূকুটিতন্ত্রে তারে তরঙ্গিত দেখি
আনন্দঘন কৃষ্টি প্রতিভাত পনি।
কিন্তু ভাষার ছন্দে কম্পিত না হয় বক্ষিতের ঘর
নিরালয় শিল্প-সাহিত্য-বার্তা শুধু নক্সীর হলনা।

যে রকমই কথা ছিলো

অমিতাভ দাশগুপ্ত

যেরকমই কথা ছিলো
ফিরে যেবে, তা দিয়েছি তার বহু গুণ।

শালের পাতায় ভরে যদি দিই দীর্ঘশ্বাস
হবে পোড়ামাটি দিয়ে গড়ে তোলা
সবাক-প্রতিমা,
যদি একটিল
আবেগ-প্রবণ হই
বয়ে যাবে নদী,
তর্জনির ইষৎ হেলনে
তছনছ করে যেবে
ঘর বাড়ী তোরঙ্গ আলিম—
যে রকমই কথা ছিলো ফিরে যেবে ঢের, বহু গুণ।
এখনও প্রত্যাশা ঘোরে মাথার ভিতর জানাজানি,
তিন সন অজন্মার পরও বসে আছি,
ফুটি-কাটা খেত,
উদ্ভিদ ওঠে না জেগে—কাঁকা মাঠে জাগে না সঙ্কেত,
তিন্ দেশে ভেসে যায় ভেলা—
অথচ নির্দিষ্ট ছিলো, খেলা হবে। কবে হবে খেলা ?

পাঁচ বিষয়ে

তরুণ সান্যাল

এক সময় সকলেই তারা
সবাই যে-যার পথে চলে গেল
পড়ে রইল
তিনটি ঝুমো কালিপড়া ইঁট, গাদা ছাই
টুকরো টুকরো কাঠ কয়লার কুচি
ভাঙা সরা মাটির পাতিল

সময় অনেকে বলে
এমনি করে কাটে
পুরনো বন্ধুরা অন্য পথে, কোন দিকে চলে যায়
এমন-কি সঙ্গিনীরাও একে একে

তিনটি ইঁটের পারে
কালো হয়ে আসা ও আকাজ্জাগুলি তোরে
নবর শিশিরে শিউরে ওঠে

এই বর্তমান
ভূত ভবিষ্যৎ
আ কেমন উপরপর উপরপর ফুটছে
চলপিণ্ডে আমারও

চন্দন পাতাটি ঘুরছে ফিরছে, হাওয়া
অন্যমনে ফুটো ছিঁড়ছে
বি-মনা নিঃশ্বাসে ঘামকা, ধুলোয়
কাপট তুলছে, ওরা
এখন এখানে থাকলে
ও-পাতাটি ফটপট ছটফট ডানা
লাফ দিতো তিনটি ইঁটের জ্বালাঘুঁচিতে, অথচ
পচনে ও বিস্মরণে ওরাতো সবাই গেল
আরও কিছুক্ষণ পরে বৃষ্টি ধুয়ে দেবে সবকিছু।

নবীন বর্ষাচিন পাঠে যখন

শান্তি লাহিড়ী

দেবালয়ের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে তুমি ঘণ্টাধ্বনি করবে
রোজ সন্ধ্যায়।
এলাচ লাকচিনির গন্ধে বিভোর দিনশেষের নৌকোয় বসে
আমি তা শুনতে পাব।

পথের গোপন আড়ালে তুমি যখন আলোর জন্য কাঁদতে
আমি শুনতে পেতাম।
আমি শুনতে পেতাম জলতরঙ্গের সঙ্গের সঙ্গে মিশে মিশে
একাকার সমুদ্রের বুকের তলে পাথর ভাঙার শব্দ—
যাবজ্জীবন কারাবাসে পাতাল মাথা কুটছে
স্বর্গকে ছাপিয়ে উঠবার।

আমি এখন বালিয়ো চলেছি।
বুকের আঁচলে যে আগুনের দীপ জ্বেলেছে
তার নেশা আমাকে ঘরে বাঁধতে পারে না—
দূরে প্রবালের লাল নেশা রক্তে ভয়ঙ্কর দোল খায়।

যতদিন না ফিরি
দেবালয়ের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে তুমি ঘণ্টাধ্বনি কোরো।

ঘুম ভেঙে কেন

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

শিশুর শোয়ার ভঙ্গি বড় অসহায়
তাই ঘুম এসে তাকে আক্রমণ করে।
সে সময় অবয়ব অহরহ বদলে যায়, আর
অযুত হাসিকান্নার পরস্পর বিরোধী রেখায়
ফুটে ওঠে বিগত জন্মের সব অসমাপ্ত কথা।
তোরে, ও। জবাকুসুম সঙ্কাশ সূর্য
পাখি হয়ে এসে তাকে জানালায় ডাকে।
ফুল গন্ধ মিশে সমস্ত শরীর জুড়ে
অবিরল ফুটতে থাকে;

অবশেষে জননীর অগোচরে একদিন জেগে উঠে শিশু
"হাঁটি হাঁটি পা পা" ক'রে প্রত্যন্ত চৌকাঠে বাধা পেয়ে
দুএকবার আছাড় খায়; তারপর পৃথিবীর
ধুলো পথে একবার ধরা দিলে—হায়!
সে আর চায়না ঘুম, তার জন্ত বেড়ে ওঠা শিক্ষার্থী শরীর
পথিকের মতো প্রাণবন্ত ঈর্ষায় হাঁটে, ভিড়ে মিশে যায়।

খাটে হয়

মোহিত চট্টোপাধ্যায়

ভালো ক'রে জড়িয়ে না রাখলে, সব মেয়েদেরই ঠাণ্ডা লাগে
সারা রাত ধরে কাশে।
পাগলাটে ধরনের খানিকটা বাতাস আঁচলে বেঁধে দিতে হয়
যাতে পূর্ণিমার দিকে শাড়িটা উড়ে গিয়ে জ্যোৎস্নার গরম হতে থাকে
ফলে ভালো ঘুম হয়।

ভালোবাসলে মেয়েদের রোমকূপ আরো একটু সিক্ত হয়
গায়ে খানিকক্ষণ জ্যোৎস্না পড়ে থাকলে আস্তে আস্তে চামড়ার ঘসে যায়
কোথাও জমে একটু ধাক্কা লাগল
টুং-টাং শব্দগুলো হাঁটুর কাছে মাথামাথি হয়ে লেগে থাকে
এমন কি কপালে উড়ন্ত পাখির ছায়া পর্যন্ত আটকে যায়
উথলে-ওঠা নদীর কেনা কোমরে মোটের মতো কেঁপে থাকে।

এ-সব কিছুই কুসর্গের ঘটনা
গায়ের শিরক কিংবা হৃদমূল থেকে শোনা।
পত্র-পল্লবে অনেক কিছুই রটনা হয়—
মাটির ভিতরে সোনার কলসিতে
ঈগরণ করে ফুটছে খাঁটি রসের আসল রস,
চুমুক দিতে হয় তো ঐখানে।

পরীণ হবার কথা ছিল

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

প্রবীণ হবার কথা ছিলনা কি আমাদের ?
প্রবীন হবার কথা ছিল
অথচ এখনো মুঢ় শৈশব গেল না—
প্রিয় পৃথিবীর মুখে বার্ধক্যজনিত ক্লান্তি
চোখের তারায়
প্রজ্ঞানপথের স্পষ্ট মানচিত্র
ঠোঁটে
সহবেদনার ম্লান হাসি
কতো অসহায় প্রিয় পিতামহী
প্রবীণ হলোনা দেখে অবসন্ন পিতাসূর্য অন্তরে ঘুরায়

যোজন যোজন পথ পার হয়ে এসেও মানুষ
প্রবীণ হলোনা—
তাই অপরের বুকের স্পন্দন
কেমন বোঝে না
তাই অপরের হৃদপিণ্ডের তলে—
প্রোথিত ফলকে কোন্ অক্ষয় খোদিত
তাহা জানার সাধনা—
মানুষের নেই
তাই প্রতিবেশিদের বুক থেকে
জলন্ত পাঠকাঠি এনে জ্বালাতে পারে না নিজ নিস্তব্ধ উনুন
আপন ছায়াকে বিশ্বছায়া ভেবে খেলা করে শিশুর মতন
সন্ধ্যার অরণ্য ফেলে দীর্ঘ শ্বাস
একাকী বৃক্ষের ছায়া কাঁপে ইতস্তত:

আহারে এমন অঙ্গে

জিল্লার আলি

আহারে এমন অঙ্গে ধূলোর প্রলেপ
কে গড়ায় মর্মরে অঙ্কিত চিত্র সুবিশাল
বাহু মেলে কার মুখ নির্দেশিত করে।

কা'র মুখে ভালোবাসা
উদ্ভাসিত পশ্চিম আকাশ
কা'র মুখে কামনার পীতা ক্ষুণ্ণ নিপুণ বিকৃতি
দিন নেই রাত্রি নেই
গ্রীষ্ম-বর্ষ-বসন্ত বলয়ে
দুর্বার ধনুক তারে দু'পায়ে মাড়ায় তবু
কা'র মুখ
দু'পায়ে মাড়ায় তবু বিদর্ভিত স্মৃতি—

আহারে ধূলোর অঙ্গে চেয়ে দেখ .
জন্ম আছে প্রীতি।

অমা সূর্যাস্ত

রবীন সুর

দিনান্তের সূর্যমুখী বেঁকে আর বিসর্জনের ঘাটে জলন্ত পশ্চিমে
সারাদিন লণ্ডভণ্ড সময়ের ভস্মাকার চিতাভস্মগুলি
ক্রমশঃ ধিতিয়ে এসে ঝাড় করে বিলম্বিত গ্রীষ্মের বাতাস
সমস্ত দিনের ক্রমাগত রক্তপাত
ভবঘুরে জীবনের অন্তহীন ক্ষুধার সুস্থতা
দিগ্বিদিকে হতাশ্বক উল্কাগুলি কান্না হাহাকার
এখন নদীর মধ্যে সম্মিলিত কুশীলব একে একে নিঃসঙ্গে দাঁড়ায়
এবং তরল এই গোধূলির রক্ত মাখা বিশাল শরীর
ধীরে ধীরে বাষ্পায়িত মাইল মাইল ব্যাপ্ত দিগন্ত সীমান্ত
দিগন্ত পেরিয়ে স্তাখো রক্তে রক্তে অলৌকিক মেঘকে ভাসায়

একটি দিন শেষ হলে
একটি সূর্য অন্তের তিমিরে
আমাদের দুঃখহীন সুখগুলি
আমাদের সুখহীন দুঃখগুলি আরও রক্তে সিক্ত হয়ে গেল
তবুও প্রার্থনাগুলি অবিনাশ বাহুর উত্থানে
যেখানে প্রাক্তন স্মৃতি যন্ত্রণার ধূপে
সময়ের অন্ধকার পার হয়ে আরও বহুদিনের অন্বেষা
বুকের ভিতর রাখে। যখন দিনের
আলোয় উজ্জ্বল মুখ মানুষের সঙ্গে মানুষের
প্রাত্যহিক দিনগুলি
ঘরের ভিতরে ঘর
যখন নদীর জলে রক্ত নেই সুরের মেঘের সমাহারে
শ্বেতাভ সুন্দরতম বাসনার তৃপ্তির প্রহর
জলে পা ডুবিয়ে
পার্থিব দিগন্ত রেখা অপার্থিব স্বপ্নের শৈশব
খেলা করে নিশ্চিন্তির প্রার্থনায় গোধূলির দাস্ত চরাচরে
কারণ পিয়নে তার কেউ নেই হত্যাকারী কোনও অন্ধকার
উদ্যত কৃপাণ হাতে জেগে নেই মূর্তিমান শোনিত পিপাসা।

শারদীয়া ধ্বনি, ১৩৭৬

সে খেয়ালী ছেলেটি কোথায়?

দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়

এক ঝালি ছায়া নদী-নীল-ধারা নাম কাজল :
দুধারে বালুর চর ঝিরিঝিরি শান্ত দুপুর
এলো মেলো বন-কাউ, ফুল-পাকা গন্ধ
ঘন্ত ফাটিত রোদে দুধ-সাদা কাশফুল উড়ায় চুলছে !

কেঁপে সে রুপালি বালু-মুচমুচে, উষ্ণ, কোমল
কে ছেলেটি চলে ঐ একাএকা রোদের দুপুরে ?
এক মাথা এলো চুল, পকেটেতে নুন আর লঙ্কা,
ঘুরে ঘুরু রেল-পুল আকাশের উজ্জ্বল নীল রোদে কাঁপছে !

চলছে তো চলছেই কে ছেলেটি নিজের খেয়ালে
পার হয়ে বন ছায়া ছমছম্ দুর নির্জন ?
দুপুরের নিঃশ্বাসে দুরু দুরু নদীটির বুক
ছোট ছোট ঢেউগুলি মসৃন ভিজে বালি ভিত্ত দিয়ে চাটছে !

শতস্ত পাখিরা বোবা : মাছরাঙা পাখি নয়, ছবি :
ঘুম-ঘুম নিঝুম, যেন কোন্ উদাসীর স্বপ্ন :
চুল চুল-বন কাউ, কিম ধরা বন-লতা গুল্ম :
গুমগুম্ রেল-পুল, উড়িয়ে ধোঁয়ার চুল রেলগাড়ী চলছে !

সে দুপুর আজো আছে : আজো আছে সেই বালুচর
নির্জন নীলকাশে আজো নামে সেই নীল রোধ :
নিঃসাড় বালুতটে বন-কাউ এখনো কিম্বায় :
পারের কিনার ঘুঁষে স্রোতের নুপুর আজো নদীকূলে বাজছে !

কেবল পকেটে নিয়ে নুন ঝাল, এলো মেলো চুলে
বালুচরে ঘুরে মরা সে খেয়ালী ছেলেটি কোথায় ?
তারে আর দেখিনা তো। সে কোথায় হলো পলাতক !
তার কি দুপুর শেষ ?—বালুচরে কুদু কুদু কাজল কাঁদছে।

এই ঘরে

তপন দাশ

বিশ্বাস অবিশ্বাসের তাড়া খেয়ে যাও ওঁজে
আমাকে চলে আসতে হয়
আমি সেই মাত্র দেখেছিলাম
আয়না মুছে সবুজ তোয়ালে
তুমি টিপয়ের ওপর রাখলে—
এবং শংকর
অথবা শংকরের আত্মা সেভিং লোশনে
বলে গেল এই ঘর বড়ো অসহায়
আমি রাত্রে আলাদা বিছানা অন্য কারো সান্নিধ্য
ঘরে পেতে চাই—সে কে ?
কোন নারী আমার শরীর বেদ কুন্তলে ঘুচে নেয় ?

সে বড়ো দুরারোগ্য কঠিন অসুখ
এই ভালবাসা
এই ঘুনঘুড়ি···ঠাণ্ডা হাসা
বরাবর চলে গেলে সেই আদিকেন লেপের ভিতরে
মৃত্যুর স্বাদ পাওয়া যায়।

দয়া পরবশ কোন বন্ধুর কেউ চায় না
তবু যাও ওঁজে শবদেহের গন্ধ পেতে আমাকে
এই ঘরে
বারবার আসতে হবে—এই ঘরে
স শরীরে না ভুলে প্রেতের অসুখ পোষাকে
এই ঘর আয়না মোক্ষম বিছানায়।

ভোরের মনে

শ্যামলেন্দু রায়

ক্যানভাসে এঁকে রাখি তোমার প্রতিমা।
হালকা তুলির দাগে
তোমার ঠোঁটের পাশে
সেই সেদিনের মতো লেখা
হাসিটির ছায়া—
আমলকীবনে পথ চলতে গিয়ে
হঠাৎ ঝলকে পড়া
যেন এক ফালি অন্ত সোধূলির
রাঙা রৌদ্রের মায়া।

কতোদিন আমি ঘুম দেখিনি
আয়নায়, কতোদিন আমি স্নান করিনি
কতোরাত্রি তোমার কথা ভেবে ভেবে
আকাশের তারাকে অভিসম্পাত দিয়েছি।
কাজল দীঘির ওপারে
তুমি এসে থমকে দাঁড়িয়েছিলে,
তোমার চোখের কোলে ঝলোঝলো
বেদনার তরংগ, তোমার ঠোঁটের পাশে
বকুলতলার মিষ্টি হাসির বন্যা।
আমার বুকের মধ্যে উথাল পাথাল ঢেউ—
যেন শেষ রাতে লঙ্কের মৃত্তীব্র হুইস্‌ল্
কেঁপে কেঁপে ওঠে।
রক্তের মধ্যে তোমার গুঞ্জন।
ক্যানভাসে এঁকে রাখি তোমার প্রতিমা।

আমার এই দেশকেই ভালো বেসে

বিজয়কুমার দত্ত

অনন্ত মুহূর্তময় বিজড়িত ধ্বনির
আকাশ বিস্তৃত ভাষা ভরে যাবে ব'লে
আমি আছি কান পেতে আজ কতকাল—
কোথাও মধুর কণ্ঠে তবু গান কেন যে শুনি না।
বুকের অনার্দ্র, নীল লাঞ্ছিত শিরায়
সব রক্ত জমে যায় শারদ সন্ধ্যায়।

প্রত্যহ বিক্ষোভ ঘানা বেঁধে ওঠে বিচিত্র এখন
আমি ভাবি এইবার হবে বিস্ফোরণ
বন্যার দুরন্ত জলে রাসেরিক অপমৃত্যু, ধ্বংস-জরা-ক্ষত
আমাদের অনিবার্য অযোঘ নিয়তি—
যদিও জেনেছি, তবু অজর তৃষ্ণায়
দেহ-মনে যুদ্ধ করি, ভেঙেপড়ি, রক্তমাংসে আচ্ছন্ন হাদুর
অনুভবে আভাসিত প্রতিমা তোমার।

সম্রাজ্ঞী : তোমার শ্রাবিমা

অরুণ কর

বহুদিন স্বপ্ন ও নিদ্রার মধ্যে পাই ঘুম, বহুদিন
দ্বিধা ও অস্থির জলে সূর্যের শরীর দেখে ফেরা
এখন স্বেচ্ছায় তাই ভেতর কবাট, খিল তোলা—
বাঁধন বিহীন রাধা হোল
ফুলের শরীর ঘেটে
বিষ ও রক্তের জলে স্নান শেষ হোল, শীতল
রাত্রির কাছে শোক, সন্তর্পিত দুখ কেন
অসম্ভব পিছিল হয়ে ওঠে
প্রেমের মতোন পাপ
আলিঙ্গন ছিঁড়ে যায়, ঘাম ও বীর্যের কণা হায়
স্নায়ুতেই মেরুর প্রাচীর অব্দি উঠে আসে, যেন
আমি সুবর্ণমিনার থেকে করে গেছি, ভীষণ পাতাল
তীব্র হাত মেলে আচ্ছন্ন করেছে যেন
মার্বেল মহিমা ছুঁড়ে ফেলে আমি
ঘন, জমে ওঠা মেঘ ও আগুন
নিয়ে খেলা করছি

মিছিলে উড়েছে ধূলো, অন্তঃপুর, সম্রাজ্ঞী
তোমার শ্রাবিমা আমি পার হয়ে যাব

খাঁচার ভিতরে

শিবেন চট্টোপাধ্যায়

সমস্ত প্রদীপগুলো একে একে নিভে যাচ্ছে
দেউটি অন্ধকার
সকালের হরবোলা কখন নিশ্চুপ হয়ে
খাঁচার ভিতরে
পড়ে আছে।

চারিদিকে আজ বড় অন্ধকার আঁকালো সময়।

তবুও এখন কারা ঘুম মাঠে হাহাকারে কাঁদে
ভবিষ্যৎ দিনরাত্রি আলেয়ার আলোর আড়ালে
পাতা করলে
ভূমিকম্পে
কেঁপে ওঠে
অরণ্যের রাত।

ঘরে ঘরে আজ তাই ঘুনের প্রাচীন গন্ধ
অতীতের দীর্ঘশ্বাসে দোলে
দেউটি ঘুড়ে তীব্র অন্ধকার
সমস্ত প্রদীপগুলো একে একে নিভে যা
নিভে যাচ্ছে
ঘুরন্ত হাওয়ায়
সকালের হরবোলা এখন নির্ঘর দেহে
খাঁচার ভিতরে
পড়ে আছে।

শুনি এক ফৌজ

শান্তিকুমার ঘোষ

শুনি এক ফৌজ আক্রমণ করে যেন
কাঁপ-দিই ঘ-পড়া অশ্বগুলি, উচ্চ নাদ, মুখ থেকে ফেনা
পিছে তার কালো বর্মে উদ্ধত দাঁড়িয়ে রক্ত রথী
লাগাম অবজ্ঞা ক'রে, নিয়ে আন্দোলিত কশা

তারা যুদ্ধের আহ্বান হাঁকে রাত্রির গহনে
নিদ্রায় গোঙাই আমি, শুনি দূরে কোথা বেগে পাক খায় হাসি
তারা ঘুঁড়ে চলে হৃদয়ের বিষাদ
যা মেরে' হৃদয়ে এই—যেন তা নেহাই

আসে তারা বিজয় উল্লাসে হাঁকা দিয়ে দীর্ঘ কেশদাম
তারা সিন্ধু থেকে উঠে আসে, রব তুলে যেতে যায় ভূমিময়
হে হৃদয়, নেই জান কোনো যা দ্বারে তোমার ঠেকাতে হতাশা ?

অকস্মাৎ/ঈ

বেলাল চৌধুরী

যোদ্ধার কোন শত্রু নেই বলে, আমি
কেটে দিলুম আমার জিভটা
কালার সঙ্গে তাকে বিবাদ হয় না
জেনে, আমার কান দুটোতে ঢেলে দিলুম তপ্ত সীসে

অন্ধের কিবা দিন কিবা রাত্রি
তবে উপড়ে দিলুম চোখের মণি দুটো
কিন্তু দেখি হায় কী কপাল
সবই কেমন কাকতালীয়

যোদ্ধারও শত্রু মেলাই আছে
কালার সঙ্গে ঝগড়া করতে লোক লাগে বেশীই
আর অন্ধ হেঁজিপেজি সে তো ভারী বেচারা
ওৎ পেতে আছে লক্ষজন
বাগিয়ে নিয়ে তার যষ্টিটি

আমাকে উদাসীন হতে বলো না

ফিরোজ চৌধুরী

শব শব গুলোকটা হত্যাকাণ্ডের পর আমি খানিকটা স্তিমিত হয়েছি বটে
তবে এমন কিছু পালটাইনি যাতে বিনিময়ে
দু'বাহু প্রসারিত করে বলা যায়—এই তো আমি :
আমার আরো কিছু সময় দাও
কিন্তু উদাসীন হতে বোলো না।

স্মৃতিরা চোখের ওপর সারাক্ষণ সঙ্কেত মেঘের মতন ভাসছে
শব শব ছবি—ছবির পর ছবি
চারদিক ওভারলীফ লীওরা ছাড়িয়ে যেন দ্বিতীয় জগৎ নেই
প্রতিটি কথা এখন লঘুছন্দে নেচে ওঠে
প্রতিটি মুহূর্ত কী ভয়ানক শরীরী
চিঠির বাক্সে হাত রেখে ফেলে উঠি
প্রতিকৃতির দিকে বেশীক্ষণ তাকাতে পারি না
আমার এত সব ছিল কোথায়!

সময়ের সাথে পাল্লা দিতে
আমি
পরাজিত নায়ক হতে চাই
আমাকে উদাসীন হতে বোলো না।

স্কেচ : রথীন মণ্ডল

মাতৃমন্দির পুণ্য অঙ্গন করো মহোজ্জ্বল আজ হে

কলকাতা মেলা ১৯৬৯ ১৫-২৩ অক্টোবর

মিলনের সুরই বাঙালীর শারদীয় উৎসবের মর্মবাণী। সেদিন ভাইয়ের সঙ্গে মিল হয় ভাইয়ের; মুছে যায় ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায়ের ভেদ।

এবারে পূজার সময় আমরা মহোৎসবের আয়োজন করেছি কলকাতায়, ভারত-বর্ষের মহোত্তম মিলন-কেন্দ্রে। বাঙালীর সমাজ সংস্কৃতির পরিচয় দান এ-উৎসবের লক্ষ্য। বাংলা দেশের সঙ্গীত, নৃত্যনাট্য, যাত্রা, চিত্রকলা, চলচ্চিত্রের বিচিত্র অর্ঘ্যে সাজানো হয়েছে অনুষ্ঠান-সূচী। বিদেশ থেকে এবং ভারতের নানান রাজ্য থেকে যাত্রীরা আসবেন কলকাতা-মেলায় যোগ দিতে।

ভিনদেশী বন্ধুদের স্বাগত জানান। সপরিবারে ও সবান্ধবে আপনিও যোগ দিন এই সর্বজনীন মিলনোৎসবে।

বিশদ নির্দেশনার জন্য যোগাযোগ করুন

ট্যুরিস্ট ব্যুরো
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
৩/২ ডালহৌসী স্কোয়ার (ঈস্ট) কলিকাতা-১
ফোন:২৩-৮২৭১ গ্রাম:'TRAVELTIPS'

IPC-TB-920BEN

আন্তর্জাতিক
অর্থ-সঙ্কট !
ইন্দিরা
ভারতে নকশালের
সাংঘাতিক
বাংলাদেশে
পূজার ঢক্কানিনি

১৯-- সালে কি রুশচীন যুদ্ধ বাধবে ?

নিত্যপ্রিয় ঘোষ

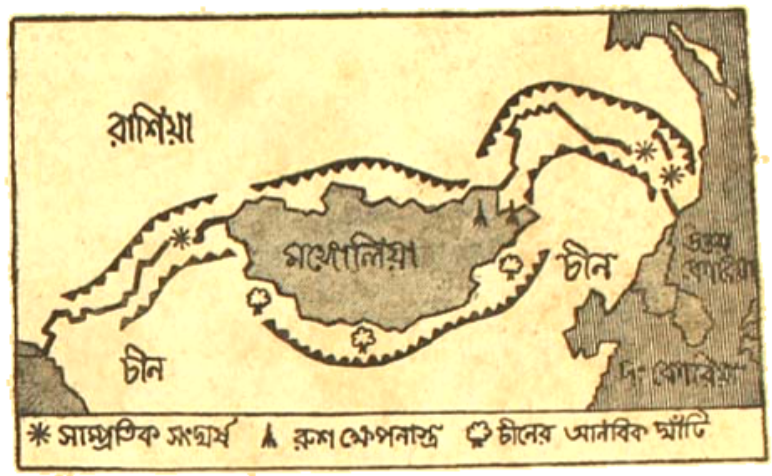

রাশিয়ার সঙ্গে চীনের ক্রমবর্ধমান বিরোধ কি শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের পর্যায়ে পৌঁছিবে, অথবা যদি রুশচীন যুদ্ধ বাধে তাহলে সেই যুদ্ধের দিন কি ঘনিয়ে এসেছে, এই প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর বোধহয় কেউই প্রত্যাশা করেন না। কিন্তু রুশচীন সঙ্ঘর্ষ শুধু যে মৌখিক তর্ক এবং গালাগালির পর্যায় ছাড়িয়ে উঠেছে, সেবিষয়ে অনেকের নিঃসন্দেহ ধারণা জন্মাচ্ছে। এই দুই কমিউনিস্ট দেশের বিরোধ শুধুই ভাবাদর্শ নিয়ে নয়; শুধুই সীমান্তসংঘর্ষ নিয়ে নয়; শুধুই পৃথিবীময় প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা নিয়ে নয়, বরং এই সবকটি বিরোধ নিয়ে এবং আরো কিছু। এবিষয়ে স্পষ্ট কোন ধারণার জন্য যুদ্ধ সম্পর্কে রাশিয়ার এবং চীনের বক্তব্য এবং সেই বক্তব্যের পার্থক্য পরিষ্কার জানা উচিত।

যুদ্ধ ও শান্তি

১৯৪৩ সালে আণবিক বোমা বিস্ফোরণের পর যুদ্ধ এবং শান্তি সম্পর্কে রাশিয়ার ধারণা পুরোপুরি পালটে গেছে। এর আগে তার ধারনা কী ছিল তা নিয়ে আলোচনা না করে বরং তার পর ধারনাটি কী হয়েছে সেবিষয়ে আলোচনা করাই বোধহয় আজের হবে। রাশিয়ার বর্তমান ধারণা হল এই :

(১) পৃথিবীর সভ্যতা এবং আজিত মানুষকে বাঁচাতে হলে, বিশেষ করে সমাজতন্ত্র গড়ে তুলতে হলে শান্তি অত্যাবশ্যক।

(২) শান্তির জন্য সমাজতান্ত্রিক ও অসমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান প্রয়োজন। অবশ্য ভাবাদর্শের লড়াই চলতে পারে। জাতীয় মুক্তির লড়াইও চলতে পারে। অভ্যন্তরীণ উপায়ে বিপ্লব সংঘটিত হলে ভালোই।

(৩) যুদ্ধ না হলে, সমাজতান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার মধ্যে শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতা চলবে। এবং যেহেতু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা উন্নত ধরণের সেই হেতু ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ধ্বংস ঘটবে।

(৪) ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের জন্য যুদ্ধ থেকে শান্তিপূর্ণ উপায় অনেক শ্রেয়। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং প্রতিযোগীতার ফলে এটা এখন সম্ভবও বটে। রাশিয়া বিশ্বাস করে বটে যে সশস্ত্র বিপ্লব হতে বর্তমান বিশ্বেও সম্ভব, কিন্তু বুর্জোয়া এবং ঔপনিবেশিকেরা যদি সমাজবাদীদের সশস্ত্র সংগ্রামে নামতে বাধ্য করে তাহলেই সশস্ত্র বিপ্লব করা উচিত। কিন্তু শান্তিপূর্ণ উত্তরণ যদি সম্ভব হয়, তাহলে তা-ই কাম্য।

রাশিয়ার এই বক্তব্য, বিপ্লবের চাইতে শান্তি ভালো, চীনের মতে অমার্কসীয়। যুদ্ধ যে অবশ্যম্ভাবী এটা চীনও বিশ্বাস করে না, এমন কি সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে সমাজবাদীরা মুখোমুখি দাঁড়ালেও, যুদ্ধ হবে না। তার কারণ চীন মনে করে সাম্রাজ্যবাদীরা আসলে কাগুজে বাঘ, বাহ্যাড়ম্বর যতই থাক তার কোন শক্তিই নেই। আর যুদ্ধ যদি বাধেই তাহলেও সমাজবাদীর জয় অবশ্যম্ভাবী। সাম্রাজ্যবাদীদের আছে আণবিক বোমা, কিন্তু সমাজবাদীদের আছে আদর্শ এবং আদর্শের জন্য লড়াইয়ের প্রেরণা, যা আণবিক বোমার চাইতে অনেক বেশী শক্তিশালী।

যুদ্ধ সম্পর্কে চীনের এই ধারণা, রাশিয়ার মতে, সম্পূর্ণ অবাস্তব। যুদ্ধ বাধলে শুধু আদর্শের প্রেরণা বাস্তব অবস্থাকে অতিক্রম করতে পারে, এটা সে বিশ্বাস করে না। বাস্তব অবস্থাটা কী ? সেটা হল আমেরিকার প্রচণ্ড সামরিক শক্তি। তাকে কাগুজে বাঘ মনে করা নেহাৎই বালোচিত। দ্বিতীয়ত, যুদ্ধ যদি বাধে তাহলে চীনের ধারণা, সেই যুদ্ধ অনেকদিন চলবে এবং সমরের সঙ্গে সঙ্গে দুর্বলতর শক্তিগুলো ক্রমশই সবল হয়ে উঠবে এবং সবল শক্তির জয় হতে হতে ক্ষয় হয়ে যাবে। এই ধারণার জন্য অ্যাটমাইজেশনের দিকটিকে রাশিয়া সম্পূর্ণ ভ্রান্ত করে, তার ধারণা, অ্যাটমাইজেশনের ফলে দুর্বল শক্তি দুর্বলতর হতে হতে সম্পূর্ণ নিস্তেজ হয়ে পড়ে, সবল আরো সবল হয়ে ওঠে।

লোকসংখ্যাকে চীন একটি বিরাট অস্ত্র মনে করে। কিন্তু রাশিয়া মনে করে, লোকসংখ্যা কোন অস্ত্রই নয় যদি না তার সঙ্গে সামরিক অস্ত্র এবং সেই যুদ্ধকে চালানোর মতো অর্থনৈতিক শক্তি না থাকে। ব্রিটেন মুষ্টিমেয় জনবল নিয়ে ভারতবর্ষ জয় করেছিল। ১৮৯৪ সালে জাপান চীনকে দমন করেছিল, সুতরাং জনবল কোন বলই নয়। চীন যে বলে ১৯৪৩ সালে জনবলের দাপাদাপি চীন জাপানকে পর্যুদস্ত করেছিল, তা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। জাপান সে সময় যদি প্রশান্ত মহাসাগরে নানা জায়গায় আটকে না পড়ত যদি না আমেরিকা যুদ্ধে না নামত, যদি না রাশিয়া উত্তর ও উত্তরপূর্ব চীনে জাপানী সৈন্যবাহিনী ধ্বংস করে না দিত, তাহলে তার অগণিত লোক নিয়েও চীন আবার

জাপানের কাছে ধরাশায়ী হত। সুতরাং মাও সে তুঙ কথিত 'জনবলই একমাত্র বল' নেহাৎই চপলতা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পরবর্তী বিশ্বে রাজনৈতিক সামরিক স্ট্র্যাটেজি নির্ধারণ করার জন্য সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে, কীভাবে আণবিক যুদ্ধ এড়ানো যায়—এই হল রাশিয়ার মূল বক্তব্য। চীন বলে রাশিয়া এখন মার্কসবিরোধী তত্ত্বে বিশ্বাস করে। কেননা যুদ্ধের ফলে ধ্বংস কতটা হবে তাই দিয়েই সে যুদ্ধের প্রকৃতি বিচার করে, যুদ্ধের অপরিহার্যতা স্বীকার করে না। মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি হল যুদ্ধকে বিচার করা তার শ্রেণীচরিত্র দিয়ে। যুদ্ধ ছাড়া সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস করা যাবে না। এই মূল মার্কসবাদকে অস্বীকার করা অর্থ মার্কসকে অস্বীকার করা। রাশিয়া বলে, আণবিক যুদ্ধের পরিণাম কী হতে পারে তা দিয়েই বিচার করতে হবে যুদ্ধের শ্রেণীচরিত্র। যেহেতু যুদ্ধের ফলে সমাজবাদী রাষ্ট্রের ধ্বংসের সম্ভাবনা। সুতরাং যুদ্ধকে এড়ানোই একমাত্র মার্কসবাদী কর্তব্য। যুদ্ধের জন্য সদা প্রস্তুতি এখনই দরকার এই চীনা তাদ্বকে রাশিয়া আত্মঘাতী মনে করে। মাওসেতুঙ যে বলেছিলেন, আণবিক যুদ্ধ হলে জগতের অর্ধেক লোক মারা যায় যাক, বাকি অর্ধেক সমাজবাদে উত্তীর্ণ হবে। এই আশাকে রাশিয়া নেহাতই অবিমৃষ্টকারিতা বলে বিবেচনা করে।

রাশিয়ার ধারণা ধনতন্ত্রবিরোধী সংগ্রামের কেন্দ্রবিন্দু অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা। চীনের ধারণা, জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম। চীনের আরো ধারণা, দেশে দেশে জাতীয় মুক্তির যুদ্ধ সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া উচিত। রাশিয়ার ধারণা, সমস্ত দেশে জাতীয় মুক্তির যুদ্ধ শুরু এখনই সম্ভব নয়। যেখানে যেখানে যুদ্ধ করা উচিত এবং সেখানেও যদি শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিপ্লব সম্ভব হয় তাহলে সেটাই শ্রেয়।

চীন ও রাশিয়া মোটের উপর যুদ্ধ ও শান্তি বিষয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করে। চীনের ধারণা আমেরিকার আণবিক যুদ্ধের ভয়ে রাশিয়া ধনতন্ত্রের কাছে সম্পূর্ণ নতিস্বীকার করেছে। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা করে ধনতন্ত্রের ধ্বংস সম্ভব নয়। রাশিয়ার ধারণা, চীন পেতি-বুর্জোয়া মনোভাবে ভোগে। তার নেতারা সবাই অ্যাডভেঞ্চারিস্ট। চীনের যুদ্ধ সম্পর্কীয় মূল বক্তব্য সম্পর্কে রাশিয়ার বক্তব্য :

(১) যুদ্ধবিজ্ঞান সম্পর্কে চীনের বক্তব্য সম্পূর্ণই অ্যাডভেঞ্চারিজম্,

(২) ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো যে তাগুজে বাঘ, এই ধারণা যুক্তিপ্রমাণিত নয়, সম্পূর্ণ ভ্রান্ত,

(৩) দীর্ঘদিন সামরিক যুদ্ধ চললে তার পরিণতি সমাজতন্ত্রের পরাজয়,

(৪) যুদ্ধ সম্পর্কে চীনা তাত্ত্বগ্রহণ করলে জনসাধারণের দুর্গতির সীমা থাকবে না,

(৫) পারমাণবিক যুদ্ধের পর শুধু চীনারাই বেঁচে থাকবে। এই আশা চীনের রাজাত্যাহংকার ছাড়া আর কিছু না। চীনের এই গর্ব অতীতাশ্রয়ী, ভবিষ্যৎনির্ভর নয়।

(৬) চীনারা যে শুধু অমার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাস করে তাই নয়, তারা জানেও যে তারা অমার্কসীয় তত্ত্বে বিশ্বাস করে। সংখ্যা এবং আদর্শ বর্জে, অর্থ নৈতিক বাস্তব অবস্থাটা কিছু নয়, চীনের এই ধারণা সম্পূর্ণ মার্কসবিরোধী।

সোভিয়েট সামরিক পত্রিকায় সালে এই জন্যই লেখা হয়েছিল,

"The Chinese theoreticians seperate war a form of extreme violence from its material base and convert it into exclusively an act of will. Engels wrote that violence is not a simple act of will but demands very real pre-requisites for its accomplishment, especially certain well-known tools, of which the more advanced hold an advantage over the less advanced and further that these tools must be produced."

পারমাণবিক তর্ক

যুদ্ধতত্ত্ব বিষয়ে, বিশেষ করে সংখ্যা

বনাম অর্থনৈতিক শক্তি, আদর্শ বনাম বাস্তব অবস্থা এই তর্কে, সোভিয়েট চুক্তি অনেক বিশ্বাসযোগ্য হলেও, আন্তর্জাতিক ঘটনাতে অবশ্য সোভিয়েট রাশিয়া চীনের কাছে পদে পদে বেকায়দায় পড়েছে। কিউবার ঘটনা, ইউরোপে ঠাণ্ডা যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে রাশিয়া আমেরিকার কাছে নতি স্বীকার করছে, সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে, এই ধারণা নিতান্ত ভুল নয়। রাশিয়ার নেতাদের অবশ্য 'মহাবস্থান'এর তত্ত্ব আছে। কিন্তু পারমাণবিক অস্ত্র নিরোধ চুক্তি বিষয়ে রাশিয়া একেবারেই স্বার্থপরের মতো কাজ করেছে এটা অমূলক সন্দেহ নয়। যুক্তি এবং ব্যবহারে, রাশিয়া অনুমোদিত পারমাণবিক পরীক্ষা বর্জন ব্যবস্থা কোনমতেই সমর্থনযোগ্য নয়, সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করলে। এবিষয়ে চীনের ধারণা কী ?

চীন বলে, পারমাণবিক যুদ্ধ কাম্য নয়, এটা ঠিকই। এবং রাশিয়া যে বলে চীন পারমাণবিক যুদ্ধ চায়, তার চাইতে ভুল ধারণা আর কিছু নেই। কিন্তু চীন বিশ্বাস করে, পারমাণবিক যুদ্ধ ছাড়া বাঁচার আর কোন গতি নেই, তাকে বাঁচতে হলে পারমাণবিক যুদ্ধ করতেই হবে, এবং সেই যুদ্ধ হলে মানুষজাতি নিশ্চিহ্ন হবে না, বরং নিশ্চিহ্ন হবে ধনতন্ত্র সমাজব্যবস্থা। কিন্তু যেহেতু পারমাণবিক যুদ্ধ ঘটবেই সেই হেতু, সমাজতান্ত্রিক পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ে তৈরি থাকা উচিত। তাহলেই ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো এই অস্ত্র ব্যবহার করতে সুযোগ পাবে না, তাদের শক্তি কাগুজে বাঘে পরিণত হবে।

কিন্তু পারমাণবিক পরীক্ষা বর্জন চুক্তি করে রাশিয়া চাইছে, কেবলমাত্র রাশিয়া আর আমেরিকারই পারমাণবিক অস্ত্র থাকুক। বাকি সব রাষ্ট্র তা হলে হয় রাশিয়া বা আমেরিকার তাঁবেদার হয়ে পড়বে। যদি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির শক্তিবৃদ্ধিই রাশিয়ার কাম্য হয় তাহলে পরীক্ষা বর্জন চুক্তি সই করতে বাধ্য করে তাদের পারমাণবিক বোমা বানাতে নিরস্ত করা হচ্ছে কেন? আর এই চুক্তিতে যেহেতু মাটির নিচে পরীক্ষা বর্জিত নয়- তার ফলে আমেরিকার পারমাণবিক শক্তিবৃদ্ধি থামার কোন সম্ভাবনাই নেই, সুতরাং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির পারমাণবিক ভীতি আরো বেড়ে যাবে! কোন্ যুক্তিতে রাশিয়া বলছে যে কেবল রাশিয়াই যাবতীয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের হয়ে পারমাণবিক অস্ত্র বানাবে? প্রকারান্তরে, রাশিয়া কি আমেরিকার মতোই সাম্রাজ্যবাদী হয়ে উঠছে না? সমস্ত পৃথিবীকে দুই ভাগে ভাগ করেই রাশিয়া আর আমেরিকা নিজেদের মধ্যে ভাগবাঁটোয়ারা করে নিচ্ছে না? পারমাণবিক চুক্তি রুশচীন সম্পর্ককে সম্ভবত সবচাইতে বিষাক্ত করে তোলে।

উত্তরী রণাঙ্গনে যুদ্ধে ব্যস্ত সৈন্যের পরাজয়

সীমান্ত সংঘর্ষ

রাশিয়ার সঙ্গে চীনের সীমান্তরেখা প্রায় চার হাজার মাইলের উপর। পৃথিবীতে এত বড়ো সীমান্ত রেখা, দুইদেশের মধ্যে, আর কোথাওও নেই। এর উৎপত্তি হয়েছিল যখন অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে রাশিয়ার জারেরা মধ্য এশিয়া দখল করে, সাইবেরিয়া দখল করে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত রাশিয়ার সীমা বিস্তৃত করে। এর অনেকটাই চীনের মাঞ্চু সাম্রাজ্য থেকে ছিনিয়ে নেওয়া। এই বিস্তৃত সীমারেখা অবশ্যই বেশির ভাগ স্থানে অস্পষ্ট, ফলে সংঘর্ষের কারণ। যতদিন পর্যন্ত সোভিয়েট রাশিয়া এবং ধনতান্ত্রিক চীনের মধ্যে সদ্ভাব ছিল ততদিন পর্যন্ত এই অস্পষ্ট বিস্তীর্ণ সীমারেখা নিয়ে কোন গুরু সংঘর্ষের সূত্রপাত হয় নি। ভাবাদর্শগত বিরোধ প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সীমান্ত সংঘর্ষের চেহারাও ক্রমশ পালটে যাচ্ছে। তার ফল বর্তমান বিষময় রুশচীন সম্পর্ক। উসুরী নদীতে চেনপাও দ্বীপ নিয়ে মার্চমাসে যে সঙ্ঘর্ষ তা আর শুধু সীমান্ত সংঘর্ষ বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সবচাইতে বিপজ্জনক পরিস্থিতি এই জন্যই উদ্ভূত হয়েছে যে চেনপাও দ্বীপ নিয়ে কোনো অস্পষ্টতা বা বিবাদ আগে ছিল না। চেনপাও দ্বীপ সম্পর্কে রাশিয়া কোন ম্যাপ বহির্জগতে প্রকাশ করেনি, করেছে চীন। সেই ম্যাপে চীন উসুরি নদীর উপর বেশ কয়েকটি দ্বীপ রাশিয়ার অন্তর্গত বলে স্বীকার করে নিয়েছে, কিন্তু চেনপাওকে দেখিয়েছে চীনের বলে। শুধু তাই নয়, চীন একথাও বলছে যে, ১৯৬৪ সালে রুশচীন সীমান্ত আলোচনার সময় রাশিয়া চেনপাও যে চীনের তথা স্বীকার করে নিয়েছিল। কিন্তু ১৯৬৯ সালে চেনপাও আক্রমণ করে রাশিয়া পূর্ব শর্ত লঙ্ঘন করেছে।

উসুরি নদীর উপর সীমান্ত নির্ধারিত হয়েছিল ১৮৬০ সালে। পিকিঙ চুক্তি অনুযায়ী জারের রাশিয়া সে সময় চীনের উপর খবরদারি করে এই চুক্তির শর্ত ঠিক করে। দুবছর আগেকার চীনরুশ আইগুন চুক্তি বিষয়ে রাশিয়ার আপত্তি হয়ং মার্কস বলেছিলেন, "ইংরেজদের দয়ায়, প্রথম আফিঙ যুদ্ধের ফলে, রাশিয়ার হাতে এই চুক্তি আসে যার ফলে আমুর নদীতে রাশিয়া নৌবহর চালানোর সুবিধা পায়। তাছাড়া আরো পায়, চীনে বাণিজ্য করার অবাধ সুযোগ। দ্বিতীয় আফিঙ যুদ্ধের ফলে রাশিয়া আরো পেল টাটারি গালফ থেকে বৈকাল হ্রদ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকা। এই

পার্টিয়েরের এলা পরেও চীনা বাহিনী

এলাকার উপর সবচেয়ে জারেরই দীর্ঘদিনের লোভ ছিল।"

১৮৫৮ সালের আইগুন চুক্তি অনুসারে উসুরি নদীর পূর্বদিকের অঞ্চল রাশিয়া ও চীনের যৌথ কর্তৃত্বে থাকবে স্থির হয়। যতদিন না পর্যন্ত এর সীমা রেখা নির্ধারিত না হয়। দুবছর পর রাশিয়া জোর করে ঐ অঞ্চল দখল করে নেয়। আরও নেয় আমুর নদীর উত্তর তীরের কিছু অঞ্চল। এই জোর করে নেওয়া জমির পরিমাণ প্রায় চার লক্ষ বর্গ মাইল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীর এক চূড়ামণি লর্ড কার্জন রাশিয়ার এই কৃতিত্বে ঈর্ষান্বিত হয়ে বলেছিলেন, এত সস্তায় এতবড়ো ডোমিনিয়ন পাওয়া ভাগ্যের কথা। ১৮৫৯ সালেই, অর্থাৎ পিকিঙ চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার আগেই, রাশিয়ার সৈন্যরা একটি চীনা বন্দর দখল করে নিয়ে তার নাম দেয় ভ্লাডিভোস্টক যার অর্থ, পূর্বদিকের প্রভু। বর্তমানে রাশিয়ার নেতারা যখন ভ্লাডিভোস্টককে তাঁদের পবিত্র সীমারেখা বলে দাবি করেন তখন তাঁরা নিশ্চয়ই ১৮৫৮-৬০ সালের জারদের অসৎ কর্মের কথা মনে করে বলেন না।

১৯১৭ সালে বিপ্লবের পর অবশ্য সোভিয়েট নেতারা বারবার বলেছিলেন তাঁরা জারের উত্তরাধিকারী নন, তাঁরা জারের অন্যায়ের সংশোধন করবেন। তাঁরাই চুক্তির অন্যায় শর্তগুলি জেনে চীনের জনসাধারণ যখন হতবাক, কেননা চীন সেই যুদ্ধের অংশীদার না হলেও, চীনেরই অংশ দানটুক প্রদেশ মিত্র জাপানকে দিয়ে দিল মিত্র শক্তিরা, তখন ১৯১৭ সালের বিপ্লবী নেতাদের আশ্বাস পেয়ে তাঁরা আশ্বস্ত হলেন, বহুদিনের অন্যায় এবার দূর হবে।

১৯১৮ সালে রুশচীন ধসড়া মৈত্রচুক্তি তৈরি হল, তাতে বলা হল।

"The Government of the Russian Socialist federated Soviet Republic declares null and void all the treaties concluded with China by the former governments of Russia, renounces all seijures of chinese Icritory and all Russian concessions in china, and restores to china, without any compensation and forever, all that had been predatonily seized from her by the Tsarist Government and the Russian bonrgeoisie."

আশ্চর্যের বিষয়, সোভিয়েট নেতাদের এই আশ্বাস শেষ পর্যন্ত কাজে পরিণত হয় নি, সীমান্ত রেখাও নতুন করে নির্ধারিত হয় নি। ১৯৪৯ সালে গণতান্ত্রিক চীন প্রতিষ্ঠিত হবার পরও নয়। তারপর থেকে এ বিষয়ে চীনের নেতৃবৃন্দ দাবি করছেন: ইতিহাসের উত্তরাধিকার হিসেবে যে সীমান্ত সমস্যা চীন ও রাশিয়াকে বিব্রত করছে, তার মীমাংসা আলোচনার মাধ্যমেই করতে হবে, যতদিন তা মীমাংসা না হয়, ততদিন স্থিতাবস্থা চালু থাক।

চীনের অভিযোগ, চীনের এই যৌক্তিক দাবি রাশিয়া কখনোই মানে নি। রাশিয়া বার বার চীনের ভূমি দখল করেছে, সশস্ত্র প্ররোচনার সৃষ্টি করেছে। লোক হত্যা করেছে। প্রমাণ, চেনপাও দ্বীপ। ১৯৬৭ থেকে ১৯৬৯-এর মধ্যে রাশিয়ার সৈন্য ষোলবার চেনপাও দ্বীপ আক্রমণ করেছে, সীমান্ত চৈনিক সৈন্যদের আহত করেছে এবং চীনের অস্ত্রশস্ত্র লুঠ করেছে। পক্ষান্তরে রাশিয়াও বরাবর সীমান্ত চীনের প্ররোচনামূলক কাজের অভিযোগ করেছে। কিন্তু চীন কোথায় কেবে কীভাবে সীমান্ত সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে তার কোন স্পষ্ট প্রমাণ দাখিল করছে না। চেনপাও দ্বীপ অবশ্য বৈদেশিক নিরপেক্ষ এমন কি ধনতান্ত্রিক জাপানেরও সাংবাদিকেরা গিয়ে স্পষ্টতই রাশিয়াকে দোষী সাব্যস্ত করেছেন। সীমান্ত সংঘর্ষে চীন যে দোষী সে কথা স্বীকার করতে বুডাপেস্ট ও মস্কো কমিউনিস্ট শীর্ষ সম্মেলনের কমিউনিস্ট নেতারাও রাজি হন নি।

সীমান্ত সম্পর্কে রাশিয়ার একটি বক্তব্য অবশ্যই যুক্তিপূর্ণ। রাশিয়ার বর্তমান সীমারেখা সবটাই সোভিয়েট রাশিয়া কর্তৃক নির্ধারিত হয় নি, হয়েছে ইতিহাস কর্তৃক, যার বেশির ভাগের জন্যই দায়ি পূর্বতন জারেরা। তেমনি চীনের বর্তমান সীমান্ত নির্ধারিত হয়েছিল চীনের পূর্বতন জন্মী সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা। যেমন রাশিয়া, তেমন চীন, উভয় দেশেরই পূর্ব প্রভুরা অন্যায়ভাবে তাঁদের দেশসীমা আপন ইচ্ছায় বাড়িয়ে গিয়েছিলেন। সুতরাং রাশিয়া চীনের কোন অংশ কার হওয়া উচিত তা বর্তমান সীমা দিয়ে বোঝা উচিত নয়। একথা চীনও স্বীকার করে। চীন সেজন্যই রাশিয়া-অধিকৃত চীনের সমস্ত অংশই দাবী করছে না। চীনের দাবি, রাশিয়া শুধু একথা স্বীকার করুক যে,

চীনের সঙ্গে রাশিয়া ১৯১৭ সালের আগে পর্যন্ত যে-সব চুক্তি করেছিল, তা জোর করে করেছিল। এই সব চুক্তি যে অন্যায় ভাবে হয়েছিল তা ১৯১৭ সালের বিপ্লবী সোভিয়েট নেতারা স্বীকার করেছিলেন। সেকথা স্মরণ করে আলাপ-আলোচক সুরু হোক। চীনের এই দাবি অন্যায় তা কেউই বলেন না, রাশিয়াও না। কিন্তু রাশিয়া এই দাবি কাজে পরিণত করছে না।

এশীয় নিরাপত্তা চুক্তি

আফগানিস্থান থেকে জাপান পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকা নিয়ে ব্রেজনেভ যে এশীয় নিরাপত্তা চুক্তির প্রস্তাব করেছেন, তাতে চীন সোভিয়েট সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হতে দেখছে। এবং এই চুক্তির কল্পনা যে হঠাৎ একদিনে গজিয়ে ওঠেনি, বরং গত দশ বছর ধরে সোভিয়েট নেতারা যে-ভাবে এগুচ্ছেন তারই পরিণতি, এ বিষয়ে চীনের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। বিপ্লবাত্মক জনযুদ্ধের পরিবর্তে নিরপেক্ষ বুর্জোয়াদের সঙ্গে হাত মেলানোর চেষ্টা সুরু করে রাশিয়া দশ বছর বা তারো আগে। ভারতবর্ষের মত প্রধান প্রধান দেশীয় এবং বৈদিশিক নীতির প্রতি রাশিয়া সমর্থন জানিয়ে এসেছে, নেহেরুকে এবং নেহেরুর কংগ্রেসকে রাশিয়া বরাবরই অভিনন্দিত করেছে, এবং নেহরু যে গণতন্ত্রবিরোধী নেতা হিসেবে কাজ করছেন সে বিষয়ে রাশিয়ার কোন সন্দেহ ছিল না। নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে রাশিয়ার দহরম-মহরম এমন পর্যায়ে ওঠে যে ১৯৫৮ সালে ক্রুশ্চভ যে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক ডাকার কল্পনা করেছিলেন তাতে ভারতবর্ষকে গ্রহণ করলেও চীনকে বাদ দিয়েছিলেন। চীনের সঙ্গে ভারতবর্ষের সংঘর্ষে রাশিয়া ভারতবর্ষকে সমর্থন জানিয়ে ভারতবর্ষের সমরসজ্জার জন্য প্রভূত পরিমাণে অর্থসাহায্য করেছিল। চীনের পক্ষে রাশিয়ার ওই আচরণ ভুলে যাবার কথা নয়।

চীনের বদ্ধমূল ধারণা এশীয় নিরাপত্তা চুক্তির উদ্দেশ্য চীনকে ঘিরে ফেলা ছাড়া আর কিছু নয়। ভারতবর্ষে সোভিয়েট প্রভাব এখন সুদূর প্রসারী। এরই সঙ্গে রাশিয়া চেষ্টা করছে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশে প্রভাব বিস্তার করতে। বর্মা, থাইল্যাণ্ড, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপিন, দক্ষিণ কোরিয়া জয়েন্তাজার রাশিয়ার কূটনীতিকেরা এখন অত্যন্ত তৎপর। জাপানে রাশিয়ার প্রভাব বিস্তৃত হলেই এই বিশাল অঞ্চল রাশিয়ার কুক্ষিগত হবে। সাইবেরিয়ার প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করার লোভ দেখিয়ে রাশিয়া বর্তমানে জাপানের সঙ্গে যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা করছে, তা থেকেই রাশিয়ার উদ্দেশ্য সাধিত হচ্ছে, অনুমান করা যায়। চীনের সন্দেহ, রাশিয়ার কুক্ষিগত এই বিস্তীর্ণ এলাকায় ভারতীয় জনসাধারণকে রাশিয়া ব্যবহার করবে

কাকিটের ভূমধ্যস্থ ঘাটিতে উদ্যত ক্ষেপণাস্ত্র

কাজানের গোলন্দাজ হিসেবে আর জাপান গোলাবারুদ হিসেবে সামরিক প্রয়োজনবিদ্ধ।

এশীয় নিরাপত্তা চুক্তি সম্পাদন করতে রাশিয়ার সম্মান বহুগুণে বেড়ে যাবে। বুডাপেস্ট এবং মস্কো কমিউনিষ্ট শীর্ষ সম্মেলনে রাশিয়ার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে, পৃথিবীর সমাজতান্ত্রিক শক্তিগুলোর পূর্ণ সমর্থন সে পায় নি সেখানে! চেকোস্লোভাকিয়ায় রাশিয়ার উপস্থিতি পৃথিবীবাসীর কাছে তাকে হেয় করেছে। সুতরাং এশীয় নিরপত্তা চুক্তি করতে পারলে রাশিয়া তার হৃত সম্মান পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবে, এই রাশিয়ার বিশ্বাস।

এশীয় নিরাপত্তা চুক্তি ফ্রান্সের সামরিক চুক্তি হলেও তাকেও অর্থনৈতিক সহযোগিতার ছত্রছায়ে ঢেকবার প্রাণপণ চেষ্টা করেছে রাশিয়া। পূর্ব ইউরোপে কমোকোনের আকালে রাশিয়া যে পূর্ব ইউরোপকে সম্পূর্ণভাবেই করতলগত করেছে—রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক সব দিকেই—সে বিষয়ে আজ আর কোন সন্দেহ নেই। কমেনকে যে ভাবে পূর্ব ইউরোপকে রাশিয়ার তাঁবেদার করেছে ঠিক সেইভাবেই এশীয় নিরাপত্তা চুক্তি এশিয়াকে তার তাঁবেদার করে তুলবে। শুধু পার্থক্য এই, ইউরোপে রাশিয়াকে আমেরিকার সঙ্গে ভাগ নিতে হচ্ছে, এশিয়ায় রাশিয়া অবিসংবাদী নেতা। শুধু গণ্ডগোল চীন। তাই প্রয়োজন চীনকে ঘিরে ফেলা।

রাশিয়ার এই খেলা নতুন নয়। চেকোস্লোভাকিয়া আক্রমণ করার সময় রাশিয়া তারস্বরে চিৎকার করে সে পশ্চিম জার্মানী চেকোস্লোভাকিয়া আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছে। এখন রাশিয়ার সুর অন্য রকম। কখনও সে বলে চীন আমেরিকার সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে, কখনও বলে চীন পশ্চিম জার্মানী, চীন ইংল্যণ্ড ষড়যন্ত্র চলছে। রাশিয়ার ধারণা, এই ধরণের প্রচার রাশিয়াকে কম্যুনিষ্টদের আত্মাভাজন করে তুলবে রাশিয়াই যে কমিউনিজমের ধারক-বাহক সে বিষয়ে কারো কোনো সন্দেহ থাকবে না। দুঃখের বিষয়, রাশিয়ার বহু গোপন কর্ম ফাঁস হয়ে যাওয়ায়, রাশিয়ার উদ্দেশ্য বিষয়ে আর কারো কোনো সংশয় নেই। চেকোস্লোভাকিয়া আক্রমণের পূর্বাহ্নে আমেরিকাকে জানিয়ে দিয়েছিল তার উদ্দেশ্য। এই বছর মার্চমাসে আমুর-উসুরি সংঘর্ষের সময় রাশিয়া চীনকে আলাপ-আলোচনার জন্য যে প্রস্তাব পাঠায়, সেই প্রস্তাবের অনুলিপি আগেই আমেরিকায় পাঠাতে হয়েছিল, যাতে আমেরিকা ভুল না বোঝে। সুতরাং রুশ-মার্কিন সোস্থি সম্পর্কে চীন যদি বিরুপ ধারণা করে, তাহলে সঙ্গতভাবে চীনকে সন্দেহবাতিকগ্রস্ত বলা যায় না।

এশীয় নিরাপত্তা চুক্তির এই ব্যাখ্যা শুধু যে চীন করছে তাই নয় মার্কিন সাংবাদিক জোসিফ অ্যালসবেরিরও একই ধারণা। তিনি অবশ্য রাশিয়ার উদ্দেশ্য সাধিত হবে

বলে মনে করেন না। চীনের প্রস্তাবিত সোভা এবং দাঁতাচোঁ চুক্তিরও উদ্দেশ্য ছিল চীনকে ঠেকিয়ে রাখা। চীনকে ঠেকিয়ে রাখা হয়ে নি, বরং সোভা এবং দাঁতাচোঁট এখন চুরমার। রাশিয়ার এশীয় নিরাপত্তা চুক্তিরও ঠিক তাই দশা হবে বলে ক্রালসবেরির আশঙ্কা। কারণ, এশিয়ার জনসাধারণ গত পনেরো বছরে অনেক বেশি রাজনীতিতে সচেতন হয়ে উঠেছে। ক্রালসবেরি এবিষয়ে বলছেন, 'শুধু মজার কথা এই যে ওয়াশিংটন পনেরো বছর আগে যে-খেলা খেলে বিপর্যস্ত হয়েছে, পনের বছর পর রাশিয়া সেই একই খেলা খেলে জয়ী হবার স্বপ্ন দেখে।

এশীয় নিরাপত্তা চুক্তির উদ্দেশ্য কী, সেবিষয়ে হরত তর্ক আছে। চীন হরত রাশিয়ার সব কাজকেই চীনের স্বার্থবিরোধী বলে মনে করছে। সেটা প্রধান কথা নয়। প্রধান কথা হচ্ছে এশীয় নিরাপত্তা চুক্তির প্রস্তাব রুশচীন সম্পর্কে আরও ঘোলাটে করে তুলেছে। এবং এরমধ্য দিয়ে চীন দেখতে পাচ্ছে সোভিয়েট রাশিয়ার একটি সমাজতান্ত্রিক-সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হয়ে উঠার সুস্পষ্ট চিহ্ন। তার বক্তব্য, পুরাতন জারেরা ঠিক যেভাবে সাম্রাজ্যবিস্তার করার প্রয়াসী ছিল, ঠিক সেভাবেই লেলিনের বংশধরেরা সমাজতান্ত্রিক আদর্শ ভুলে গিয়ে সাম্রাজ্যবাদীতে পরিণত হচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদীদের বাঁচবার উপায় বৈদেশিক বাজার দখল করা। বলতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতিভূ আমেরিকার পতন উদ্‌ঘাটিত হয়েছে ভিয়েতনামে। সুতরাং তাদের কোন সম্ভাবনা নেই এশিয়ার প্রভাববিস্তারে। সেই দায়িত্ব নিয়েছে রাশিয়ার সোস্যাল-ইম্পি-রিয়ালিষ্টরা। উদ্দেশ্য এবং পরিণতি অবশ্য সেই একই সাধারণ জনগণকে শোষণ করা।

এশীয় নিরাপত্তা চুক্তির দর্শ কী আজও জানা যায় নি। এটা সামরিক, অথবা অর্থনৈতিক অথবা মোটাই পঞ্চশীল ধরনের শান্তির আশা? তবে এটা ঠিক, চীনকে বাদ দিয়ে এশীয় নিরাপত্তা চুক্তির কল্পনা অনেক চীনবিরোধী লোকের কাছেও বিরাট হাস্যকর ঠেকছে।

শেষের কথা

রাশিয়া আর চীনের মতভেদ যে দুস্তর আকার নিয়েছে, একথা এখন পরিষ্কার। কিন্তু এর পরিণাম কতটা দূর? কোসিগিন-চৌএন-লাই সাক্ষাৎকারের অর্থ কী? যুদ্ধ প্রায় লেগে যাচ্ছিল, কোনমতে থামান গেল। অথবা, যুদ্ধ এড়াবার শেষ চেষ্টাও ব্যর্থ হল?

যাঁরা কমিউনিষ্ট নন, তাঁরা বিশ্বাস করেন না যে দুই কমিউনিষ্ট এভাবে পরস্পর মারামারি করে শক্তিক্ষয় করে ফেলবে। তাঁরা অবশ্য সোভাতেই ভুল করেছেন। চীন রাশিয়াকে কমিউনিষ্ট মনে করে না, রাশিয়া চীনকে কমিউনিষ্ট মনে করে না। সুতরাং দুই দেশই পরস্পরকে আন্তর্জাতিক কমিউনিজমের পক্ষে অশুভ বলে বিবেচনা করে। সুতরাং যুদ্ধ যদি লাগেই সেটা আন্তর্জাতিক কমিউনিজমের জন্যই করা হবে, এটাই দুই দেশের ধারণা। শুধু একটি জিনিস পরিষ্কার, যে আমেরিকা ভিয়েতনামে তলিয়ে গেছে সেই আমেরিকা এই রুশচীন ঠাণ্ডা লড়াইয়ের ফলে আবার নিজেকে গুছিয়ে তুলছে।

সৈয়দ নৌসের আলি—শ্রীবিজয় বন্দ্যোপাধ্যায়

ও

দুইটি ঐতিহাসিক রুলিং

কৃত্তিবাস ওঝা

পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার ইতিহাসে দুইজন স্পীকার সৈয়দ নৌসের আলি ও শ্রীবিজয় বন্দ্যোপাধ্যায় দুইটি রুলিং দিয়ে দুইটি সরকারের পতন ঘটান। স্পীকারের রুলিং এর ফলে সরকারের পতন পরিষদীয় রাজনীতিতে অভিনব। স্পীকারের রুলিংএ প্রথম সরকারের পতন হয়ে ১৯৭৩ সালে মার্চ মাসে। ১৯৭৫ সালের ২৮শে মার্চ—কৃষিখাতে বাদ বরাদ্দ আলোচনায় Snap ভোটে সরকারের পরাজয় ঘটে—পরদিবস স্পীকার সৈয়দ নৌসের আলি বিধানসভা অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য মুলতুবী করে দেন, ফলে ৩১শে মার্চ স্পীকারের রুলিং মেনে নিয়ে তৎকালীন গভর্ণর স্যার আর, জি, কেসি ১৯৩৫ সালের ৯৩ ধারা অনুসারে প্রদেশের শাসনভার নিজের হাতে নিয়ে নেন। ইতিহাসের চাকা ঘুরলো বাইশ বৎসর পর ১৯৯৭ সালের ২৯শে নভেম্বর। স্পীকার শ্রীবিজয় বন্দ্যোপাধ্যায় যুক্তফ্রন্ট সরকারের পদচ্যুতি ও ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের মন্ত্রিসভার শাসন গ্রহণের এক অগ্নিগর্ভ রাজনৈতিক পরিবেশে বিধান সভায় ঐতিহাসিক রুলিং দিলেন যে বিধান সভাই মন্ত্রিসভা তৈয়ারী তাকে নাকচের অধিকার একমাত্র বিধান সভারই আছে—এই পট ভূমিকায় বিধান সভা অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবী ঘোষণা করা হল। সেইদিন ২৯শে নভেম্বর বিধান সভার দ্বারে যে তালা ঝুললো সেই তালা খুলেছিল ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৮ সালে কিন্তু সেইদিনও সেই রুলিংএর পুনরাবৃত্তি করলেন স্পীকার শ্রীবিজয় বন্দ্যোপাধ্যায়—তারপর আর বিধান সভার দ্বার খুললো না—ছয়দিন পরে ডঃ ঘোষ মন্ত্রিসভার পতন ঘটলো—রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর রাষ্ট্রপতিশাসন বলে নিজের হাতে শাসনভারগ্রহণ করলেন। সেই ২২ বৎসর আগে ১৯৭৩ সালের ৩১শে মার্চ ও ২২ বৎসর পরে ১৯৯৮ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী দুইটি দিনের দিনলিপি তুলে ধরছি অতীত দিনের পৃষ্ঠা থেকে।

অবিভক্ত বাংলার ব্যবস্থাপক সভায় তখন চাঁদের হাট। বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ পার্লামেন্টারিয়াগণ তখন ব্যবস্থাপক সভার সদস্য। স্যার নাজিমুদ্দিন রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী। ১৯৩৫ সালের মার্চমাস বাজেট অধিবেশনে লক্ষাওয়ারী আলোচনা শুরু হয়েছে। ২৮শে মার্চ রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী খান বাহাদুর মোহাম্মদ মুজিবুদ্দিন হোসেন কৃষিখাতে অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাব ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করলেন। ভোটের ফলাফলে দেখা গেল যে, সরকার পক্ষে ভোট পড়েছে ৯২ আর বিপক্ষে ১০৬। ভোটের ফলে টেজারী বেঞ্চের মুখ শুকিয়ে গেল আর বিরোধী হর্ষধ্বনিতে ফেটে পড়ল। বিরোধীপক্ষের নেতা আবুল কাশেম ফজলুল হক উঠে দাড়িয়ে বল্লেন ভোটে পরাজিত মন্ত্রিসভার পদত্যাগ চাই—অবিলম্বে পদত্যাগ চাই। সরকার পক্ষের এই পরাজয়ের কারণ ছিল উহার ২১জন সরকারপক্ষের সদস্য দলত্যাগ করে বিরোধীপক্ষে ভোট দিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের আইন সভার ইতিহাসে এই হল সর্ব্ববৃহৎ দলত্যাগের ঘটনা। ভবিষ্যতে ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে বা শ্রীশঙ্কর দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যে দলত্যাগ ঘটে তার সংখ্যা একদিনে আকস্মিক ভাবে ২১ জন হয় নাই। তাছাড়া পরবর্তীকালের দলত্যাগের কারণে নূতন রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি হয়েছিল—কিন্তু এই ক্ষেত্রে তা হয় নাই দলত্যাগ ছিল সম্পূর্ণ আকস্মিক। এ, কে, ফজলুল হকের বক্তৃতার পর মুখ্যমন্ত্রী স্যার নাজিমুদ্দিন উঠে দাঁড়ালেন এবং বল্লেন স্নাপ ভোটে সরকারের পরাজয় হয়েছে তবে এটা অনাস্থা ভোট নয় তবু অবস্থা গুরুতর এই অবস্থায় আমি নূতন করে আর কোন বাধাবরাদ্দ পেশ করতে চাই না আমি মাননীয় স্পীকার মহাশয়কে অনুরোধ করছি তিনি সভা মুলতুবী ঘোষণা করুন। স্পীকার জনাব নৌসের আলি সভা মুলতুবী ঘোষণা করলেন ২৯শে বেলা ৭টা পর্যন্ত। ২৯শে বেলা চারটায় বিধানসভার অধিবেশন বসল। সেইদিন কি বিধানসভার ভেতরে কি বাইরে তীব্র উত্তেজনা। সভা সুরু হতেই শ্রীপ্রমথ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একটি বৈধতার প্রশ্ন তুলে বল্লেন পূর্বকাল ভোটে পরাজিত হবার পর মন্ত্রিসভার কোন অস্তিত্ব থাকতে পারে না। শ্রীনলিনাক্ষ সান্যাল বলেন যে, পূর্বকালের ভোটের ফলের পর বর্ত্তমান মন্ত্রিসভার এক মুহূর্ত্ত গদীতে বসবার বা কোন সরকারী কাজ করবার অধিকার নেই। সরকার পক্ষ থেকে বলা হল যে, সরকারী পক্ষকে যদি পরাজিত করার ক্ষমতা বিরোধী পক্ষের থাকে তবে তারা সরাসরি অনাস্থা প্রস্তাব আনুন আজ আবার নূতন করে ভোট গ্রহণ করা হোক। স্পীকার সৈয়দ নৌসের আলি বিরোধী পক্ষের 'বৈধতার প্রশ্নের জবাব দিলেন—রুলিংএর মাধ্যমে। স্পীকার বল্লেন, নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত না হলে বর্ত্তমান বিধান সভার কাজ চলতে পারে না! স্পীকার বল্লেন—এটা এমন একটা ব্যাপার যে ট্রেজারী বেঞ্চে বিরোধী চলা করা দরকার। স্যার নাজিমুদ্দিন

প্রাকৃতিক ছোট অনাস্থা ছোট নয়—আমার মনে হয় সাংবিধানিক অবস্থাটা উপযুক্ত ভাবে বোঝা হয় নাই। মন্ত্রিসভা হচ্ছে সভার সৃষ্টি-সভা মন্ত্রিসভাকে গঠন বা বাতিল করতে পারে অন্য কোন পদ্ধতিই গণতন্ত্রের একেবারে মূলে আঘাত করবে। প্রাকৃতিক ছোট বড় কথা নয়-সমগ্র মন্ত্রি-সভা ছোক অথবা একজন মন্ত্রির বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রকাশের স্বীকৃতি পর হল কোন মন্ত্রির বায় বরাদ্দের দাবী অনুমোদন না করা বা অগ্রাহ্য করা। এইভাবে একজন মন্ত্রির বিরুদ্ধে অনাস্থা-সমগ্র মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধ অনাস্থা প্রকাশের-সামিল। এই অবস্থায় নূতন করে আস্থা প্রকাশের ও কোন অবকাশ দেওয়া যেতে পারে না এবং এই অবস্থায় কোন মন্ত্রী কাজ চালাতে পারেন কি না সেটাও গুরুতর সন্দেহের বিষয়। বৃহিবাতে বায় বরাদ্দের দাবী অনেকে সভার সিদ্ধান্তের মধ্যে সংখ্যা পরিষ্কের মতামত প্রতিফলিত হয়নি বলে বলা হচ্ছে মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে একবার রায় প্রকাশিত হবার পর এই জাতীয় পরেষনার কোন অবকাশই থাকতে পারে না। মন্ত্রিসভা হচ্ছে-বিধান সভার সৃষ্টি বিধান সভাই মন্ত্রিসভা বাতিল করতে পারে অন্য কোন পদ্ধতি গণতন্ত্রের উপরে আঘাত হানবে। সেইজন্য আমি এই মন্ত্রিসভাকে এই সভার মন্ত্রিসভা হিসাবে কাজ করতে দিতে পারি না তাই সভা অনির্দিষ্ট কালের জন্য মুলতুবী রইল।

৩১ মার্চ স্পীকার রুলিং দেবে বিধে বাংলা দেশের তৎকালিন গভর্ণর মিঃ আর ডি. কে সি, ১৯৩৫ সালের ভারত সরকারের আইনের ৯৩ ধারা প্রয়োগ করে শাসন ক্ষমতা নিজের হাতে নিলেন। তার পরের রাজা রাজনীতির ইতিহাস, দেশ ভাগের ইতিহাস, মাঝে সামাগ সময়ের জন্য রাজ্যের শাসন ভার গ্রহণ করেছিলেন সহীদ সোরাবর্দী খাজা নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভার খাদ্যমন্ত্রী তারপর বিধায়। কিন্তু একই ইতিহাস ঘটনা বাইশ বৎসর পর। খাজা নাজিমুদ্দিনের খাদ্যমন্ত্রী সোরাবর্দী যেমন এক স্পীকারের রুলিং মন্ত্রিসভা পতনের পর ক্ষমতায় এলেন তেমনি ১৯৬৭ সালে শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রিসভার খাদ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ অজয় মুখার্জী মন্ত্রিসভার পতনের পর ক্ষমতায় এলেন। খাজা নাজিমুদ্দিনের মন্ত্রিসভার পতন ঘটেছিল স্পীকারের রুলিং ও ২১ জন সদস্যের দলত্যাগের পর আর ১৯৬৭ সালে অজয় মন্ত্রিসভার পতন ঘটলো ১৭ জন সদস্যের দলত্যাগের পর তবে এই ক্ষেত্রে স্পীকারের রুলিং এল পরে।

১৯৬৭ সালের ২১ শে নভেম্বর রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর—রাত ৮-১০ মিনিটে এক আদেশ জারী করে শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের মন্ত্রি-সভা বাতিল করে দিলেন আর ডঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে এক নূতন মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ করলেন ডঃ ঘোষের নেতৃত্বে নূতন মন্ত্রিসভা গঠনের পর ২৯ শে নভেম্বর বিধান সভার অধিবেশনের আহ্বান করা হল। রাজা রাজনীতিতে সে আর এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত লয়। ২১শে নভেম্বর অজয় মন্ত্রিসভা বাতিলের পর জনমনে পরেষনার অন্ত ছিল না বিধান সভায় কি হবে। স্পীকার শ্রীবিজয় বন্দ্যোপাধ্যায় বলছিলেন তিনি পরিহসীয় রাজনীতির মর্যাদা রক্ষা করবেন। বেলা একটায় বিধানসভার অধিবেশন বসলো কিন্তু দশ মিনিটের মধ্যে অধিবেশন শেষ হয়ে গেল। স্পীকার শ্রীবিজয় বন্দ্যোপাধ্যায় রুলিং দিয়ে বল্লেন প্রাথমিক। তাতে তার মনে হয়েছে বিধান সভার অগোচরে অজয় মন্ত্রিসভা বাতিল ও ডঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষকে মুখ্যমন্ত্রী রূপে নিয়োগ এবং ডঃ ঘোষের পরামর্শে বিধান সভার অধিবেশন আহ্বান সংবিধান বিরোধী ও অকার্যকর। বিধানসভার প্রিভিলেজ রক্ষার জন্য আমার কি করা উচিত তা ভেবে দেখবার জন্য আমার সময়ের প্রয়োজন তাই বিধানসভার অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবী রইলো। বিধানসভা মুলতুবী ঘোষণার পরই বিধানসভা ভবনে শুরু হল লঙ্কাকাণ্ড। মুখ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ আহত হলেন একখণ্ড কাঠে আঘাতে, একটা বালিশ ছুড়ে মারা হল ডঃ ঘোষের উদ্দেশ্যে একটা লাল কালির দোয়াত ছোড়া হল—ছোড়া হল বই ডেস্ক প্রভৃতি। ডঃ ঘোষের বাঁ চোখের নীচে আঘাত লাগলো বেশী। স্পীকার শ্রীবিজয় বন্দ্যোপাধ্যায় এইদিন যে রুলিং দেন এবং পরবর্তীকালে ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৮ সালে সেই রুলিংএর পুনরাবৃত্তি ঘোষণা করে বিধানসভা পুনরায় মুলতুবী করে দেওয়ায় ডঃ ঘোষ মন্ত্রিসভার পতন ঘটলো। স্পীকার তার ঐতিহাসিক রুলিং দিয়ে সেই দিন ২২ বৎসর আগে স্পীকার সৈয়দ নৌসের আলির রুলিংএর উল্লেখ করেছিলেন। স্পীকার শ্রীবিজয় বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, এই সভার স্মরণ থাকতে পারে গত ৩রা আগষ্ট বিধানসভা মুলতুবী রাখার সময় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠিত ছিল। সংবিধানের ১৬৪ (২) অনুচ্ছেদ অনুসারে মন্ত্রিসভা বিধানসভার কাছে যৌথ ভাবে দায়ী ছিলেন। কোন মন্ত্রিসভা বহাল থাকবে কিনা তা স্থির করার অধিকার একমাত্র বিধানসভারই আছে। এই কারণে আমার পক্ষে ডঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষকে মুখ্য-

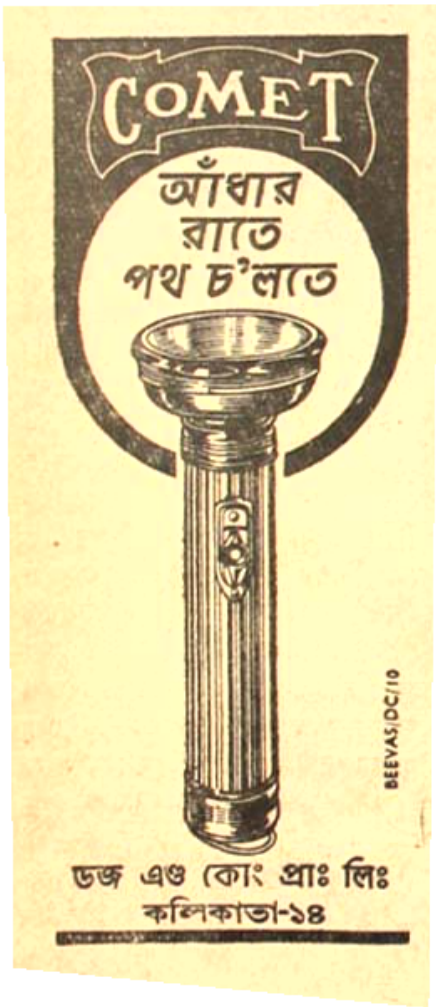

মন্ত্রী হিসাবে, বঃ শ্রীঅরেন্দ্র চন্দ্র মজুমদারকে ও ডঃ জাফির আলিকে মন্ত্রিসভার সদস্য হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া সম্ভব নয়। ১৯৬৩ সালে তৎকালীন স্পীকার সৈয়দ নৌসের আলি বলেছিলেন, "রাজ্যপাল বিধানসভার সিদ্ধান্ত রেকর্ডিস্ট করার কর্তৃপক্ষ মাত্র অন্য কোন পথ গ্রহণ করা হলে গণতন্ত্রের মূলে আঘাত করা হবে।" এই মহান বিধানসভার অগোচরে সভার নিকট দায়ী মন্ত্রিসভাকে অপসারণের জন্য যে পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে তা পরীক্ষা করে দেখা দরকার ১৯৬৭ সালের ২১শে নভেম্বর রাজ্যপাল এক আদেশ জারী করেন যার ফলে শ্রীঅজয় মুখার্জীর নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রিসভা বাতিল হয়। সংবিধানে রাজ্যপালের উপর এইভাবে মন্ত্রিসভা বাতিলের কোন ক্ষমতা ন্যস্ত হয় নাই। অতএব রাজ্যপাল কর্তৃক মন্ত্রিসভা বাতিলের কোন আইনগত ভিত্তি নেই। সংবিধানস্থ এই প্রশ্নটি প্রাথমিক পরীক্ষার পর শ্রীঅজয় মুখার্জীর নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেওয়া আইনসঙ্গত ও বৈধ বলে স্বীকার করে নেওয়া সম্ভব নয়।" বিধানসভা মুলতুবী হয়ে গেল এবং এই দিন রাত্রে রাজ্যপাল ধর্মবীর এক আদেশ জারী করে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধিবেশন সমাপ্তি ঘোষণা করলেন।

১৯৬৮ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী আবার বসলো বিধানসভার অধিবেশন। রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর বিধানসভার বাজেট অধিবেশন উদ্বোধন করতে এসে বিধান সভার দ্বারদেশে যুক্তফ্রন্ট সদস্যদের বাধা, সভার অভ্যন্তরে শালো পতাকা, ধর্মবীর ফিরে যাও ধ্বনির মধ্যে দুই মিনিট ভাষণ পাঠ করে ধস্তাধস্তি হট্টগোলের মধ্যে সভাকক্ষ ত্যাগ করে যান। পরে স্পীকার শ্রীবিজয় বন্দ্যোপাধ্যায় বিধানসভার অধিবেশন অবৈধ বলে পূর্বের রুলিং বহাল রেখে সভা মুলতুবী ঘোষণা করেন। বিধানসভা শেষ হয়ে যায় তারপর সৃষ্টি হল ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। রাষ্ট্রপতি রাজ্যের শাসনভার নিজের হাতে গ্রহণ করে রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন কায়েম করলেন। তারপর এল মধ্যবর্তী নির্বাচন। পরাজিত হলেন ডঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ আবার ক্ষমতায় এলেন শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় এবার স্পীকার হলেন শ্রীবিজয় বন্দ্যোপাধ্যায়। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার ইতিহাসে সৈয়দ নৌসের আলি শ্রীবিজয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুটো পরিবর্তে দুটো মন্ত্রিসভার পতন অবশ্যই হয়ে থাকবে।

বহুল প্রচারিত জনপ্রিয় উপন্যাসের অনবদ্য চিত্ররূপ

সৌমিত্র·তনুজা

অভিনীত

প্রথম কদম ফুল

কাহিনী·অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

রূপায়ণে: শুভেন্দু·তরুণ·সুব্রতা·ছায়াদেবী

অনুভা·পদ্মাদেবী·ভানু·অজিতবন্দ্যো·মিহির·সাধনা

চিত্রনাট্য·পরিচালনা·ইন্দর সেন

সংগীত·সুধীন দাশগুপ্ত

ইন্দ্রাণী সিনেমায় নিবেদিত ● সীমা নিবেদন পরিবেশিত

শারদীয়ার পরবর্তী আকর্ষণ :

শ্রী : প্রাচী : ইন্দিরা

"বিদ্বেষ করিয়া করিয়া জগৎ অবসন্ন। জাতিসমূহ বিদ্বেষের ফলে ধ্বংসোন্মুখ। বিদ্বেষের অনুশীলনে মানব সমাজের কোন কল্যাণ সাধিত হয় না। আজ ভারতের মহা সৌভাগ্য—সে জীবনযাত্রার নতুন প্রণালী দেখাইয়া দিক এবং জগতকে নতুন মন্ত্রে দীক্ষিত করুক।"

গান্ধীজী

গান্ধী জন্ম-শতবর্ষে
প্রণাম

বেঙ্গল এনামেল ওয়ার্কস লিমিটেড

৪১, চৌরঙ্গী রোড। কলিকাতা-১৬

যুগের আলোয় গান্ধীজী

নিমাই বসু

নিশ্চিত বিশ্বাস নিয়ে বলা যায় মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ব্রিটিশ ঔপনিবেশ ভারতের ধরার অন্তর ঘরে টান দিয়েছিলেন। যুগ চেতনা বলে যদি কিছু থেকে থাকে, তবে তার আত্মপ্রকাশ ঘটাতে দুধা অংশ নিয়েছিলেন গান্ধীজী। হয়ত তাঁর চিন্তাধারার মধ্যে বুর্জোয়া সমাজ-সম্পর্কের নিস্তরঙ্গ স্তর ছিল, যা তিনি বহু প্রচেষ্টাতেও অতিক্রম করতে পারেননি, তবু এ কথা সত্য সামন্ত-রাজনীতিকে গণ-রাজনীতিতে রূপান্তর করতে তিনি ব্রতী হয়েছিলেন। রাজায় রাজায় লড়াই নয়, 'প্রজা'র সঙ্গে রাজার লড়াই—অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করার লড়াই ভারতের সার্বিক মনমানসে এই লড়াই-বোধ ঐতিহাসিক বলে পরিচিত হবেই। গান্ধীজী বলতেন, "আমি অদ্বৈতে বিশ্বাসী। আমি মানুষের অন্তর্নিহিত অভিন্নতায় বিশ্বাসী। শুধু তাই নয়, সকল প্রাণী-জীবনের অভিন্নতায় তথা ঐক্যে বিশ্বাসী। সুতরাং আমি মনে করি, একজন মানুষ যদি আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করেন, সমগ্র পৃথিবীর মানুষ তাতে লাভবান হয়। তেমনি, যে পরিমাণে একজন মানুষের অবনতি হয় সমগ্র পৃথিবীর মানুষ সেই পরিমাণে অবনত হয়।" গান্ধীজী সমগ্র ভারতবাসীকে সবরকমের শ্রেণীবোধের, সাম্প্রদায়িকতার, বর্ণীয় ভেদাভেদের ঊর্ধে থেকে, এক সূত্রে সকলকে বেঁধে ফেলার যে বীজমন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন, ভারতীয় রাজনীতিতে তা যেমন ছিল আকস্মিক, তেমনি ছিল আগামী দিনের সুখবদ্ধ ভারতের নির্দেশক। ইতিহাসের বাণীই, এগিয়ে চলার আর এগিয়ে চলার নামই প্রগতিশীলতা,—গান্ধীজী সেই এগিয়ে চলার কথাই ভেবেছিলেন। ভেবেছিলেন, রাম-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে, যেখানে—

'দৈহিক দৈবিক ভৌতিক তাপা
রামরাজ নাহি কাহু হি ব্যাপা।'

অর্থাৎ, 'রামরাজ্যে কোন ব্যক্তির দৈহিক দৈবিক ও ভৌতিক দুঃখ নেই।' ভেদাভেদ ভুলে, স্বার্থপরতা ভুলে নিয়ে মানুষ পরস্পরের সম্প্রীতি ও বন্ধনের মধ্যে আবদ্ধ হবে। সবলকে একসূত্রে বেঁধে ফেলার বীজমন্ত্র উচ্চারণ তাঁর পূর্বেও হয়ত অনেকে করে-

শারদীয়া ধ্বনি, ১৩৭৬

ছিলেন, কিন্তু সম্ভবতঃ তিনিই প্রথম যিনি এই ধারণাকে একটি রাজনৈতিক স্তরে উপনীত করে প্রয়োগ করেছিলেন। জনগণের চেতনার স্তরে যে অরাজনৈতিক ধ্যান ধারণাগুলি একটা দুর্বলমান অবস্থান এবং অবস্থগত অনুভূতির কারণ হয়ে উঠেছিল, সেগুলিকে অতিক্রম করে ভারতে তিনিই বোধহয় প্রথম বললেন, অস্পৃশ্যদের কল্যাণেই ভারতের কল্যাণ। বিবেকানন্দ প্রমুখ প্রবক্তাদেও এ কথা বলেছেন, কিন্তু তাঁদের থেকে তাঁর বক্তব্যের মূল পার্থক্য হোল, তিনি তাঁর চিন্তাধারাকে একটা রাজনৈতিক ভিত্তিতে উপস্থাপিত করতে পেরেছিলেন। সম্ভবতঃ হরিজনরা, মুখ্যতঃ অস্পৃশ্যরা যে জাগতিক সুখসৌন্দর্যের কারণ, এবং তাদের একত্রিত করে গণ আন্দোলনে রূপ দেওয়া যায়, তা তিনি বুঝেছিলেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী, প্রতিহিংসাপরায়ন, তা জানা সত্ত্বেও তিনি বুঝেছিলেন, ভারতবাসী সংঘবদ্ধ হলে ব্রিটিশের মত শত্রুকেও হঠান যাবে। রাজনৈতিক দিক থেকে বিচার করলে জনগণের চিন্তার শিক্ষক হিসাবে তিনি সামাজিক-রাষ্ট্রিক-আর্থিক ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ রূপান্তরের বিষয়টিকে স্থান দিয়েছিলেন সবার আগে। বলেছিলেন, 'জাতির সমাজ-জীবন সত্যই যদি এমন নিখুঁত ভাবে গড়ে তোলা সম্ভব হয় যে সমাজের সকলে নিজের শক্তিতে নিজেকে শাসন বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। তবে জাতির শাসন কার্য পরিচালনার জন্য জনপ্রতিনিধি নির্বাচন ক'রে শাসকমণ্ডলী গঠনের প্রয়োজন হবেনা। এমন রাষ্ট্রকে বলা যায় সুনীতিনিয়ন্ত্রিত অরাজকতার (enlightened anarchy) রাষ্ট্র। ব্যক্তি এমন ভাবে নিজেকে শাসন করবে যে সে তার প্রতিবেশীর জীবনের কোন অধিকারের বিরুদ্ধে বাধা হয়ে উঠবে না। সুতরাং পরিকল্পিত এই চরমোন্নত আদর্শ রাষ্ট্রে রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে বিশেষ কোন জনসংঘের থাকবে না, কারণ সত্যি ক'রে 'রাষ্ট্র' বলে কিছু এখানে নেই। কিন্তু এই রকম একটা পরিকল্পিত পূর্ণ আদর্শকে তো সম্পূর্ণরূপে বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। এই কারণেই থোরোর সেই উক্তিটি ঐতিহাসিক খ্যাতি লাভ করেছে—'যে সরকারই সবচেয়ে কম শাসন করে, সেই সরকারই হলো সবচেয়ে ভালো শাসক' ('অদ্ভুত পথ যাত্রী,' সুবোধ ঘোষ, পৃঃ ৮৪-৮৫)।

মানবিকতাবাদী ঐতিহ্যের অধিকারী ছিলেন গান্ধীজী। হিউমানিষ্টদের বক্তব্য সচেতন, মহাত্মাজী ভারতীয়দের, সেই অদ্ভুতের পুত্রদের একই বাণী অনুধাবন করতে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিলেন। সাধারন কৌপিনধারী, লাঠি সম্বল করে যিনি ভারতের গ্রামে গ্রামান্তরে গিয়েছিলেন, তাঁর বাণী ছিল আমাকে অনুসরণ কর। ভিক্ষায় জীবিকা হয়, প্রাণ সঞ্জিত হয় না, এ কথা তিনি বুঝেছিলেন। যদি সর্বাংশে কল্যাণ প্রসবিত না হয়, তাহলে ব্যক্তি নির্ভর সমাজের কোন কল্যাণ হবে না। যুগ ধর্মকেস্বীকার করে, ইতিহাসের গতি নির্দেশক পথেই যে এই মানবতাবোধের মূল্যায়ন সম্ভব তা তিনি দেখিয়েছেন নিজের জীবনে, যেখানে বস্তুনিষ্ঠার সঙ্গে জড়িত রয়েছে তত্ত্বিষ্ঠ আত্মবোধ। একদিকে ব্যবহারিক জগতের আশা-নিরাশা, দুঃখ, রোগ শোক—আনন্দ, স্বাস্থ্য, অপর দিকে রয়েছে নিজের অন্তরের অন্তঃস্থল উপলব্ধ একটা আত্মিক পবিত্রতা, শুচিতা। উভয়ের পারস্পরিক সহযোগিতা নির্ভরতায় সামাগ্রিক মানবিক বিচার বোধের পূর্ণতা প্রাপ্তি হয়। মানুষের স্বার্থপরতা ব্যক্তি নির্ভর ব্যক্তি স্বাধীনতার সমাজ নির্ভর—এই স্বার্থপরতা যদি নীতি নিষ্ঠার পৃষ্ঠপটে আবদ্ধ হয়, তবে ব্যক্তির সর্বাংগীন কল্যানকামী মুক্তির বিকাশ সম্ভব। তাই মানবিক বিচার বোধকে স্থান দিয়েছেন সর্বাগ্রে। বলেছেন "The supreme consideration is man. (Young India ১০, ১১, ২৪ পৃঃ ৩৭৮)। বিখ্যাত রোল তেঁবিলা বৈঠকে তিনি বললেন' 'আমার দেশের সংবিধানে অস্পৃশ্য সমাজকে 'ভিন্ন শ্রেণীরূপে স্থান দিতে চাই না। আজকের অস্পৃশ্যকে কি চিরকাল অস্পৃশ্য করে রাখতে হবে? আমি বরং চাইব যে, হিন্দু ধর্ম নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক, কিন্তু অস্পৃশ্যতা যেন না থাকে।' মানবিকতা বোধে সঞ্জীবিত হয়ে, তিনি এমন একটি সমাজের কল্পনা করেছিলেন যেখানে নৈতিকতাই হবে জীবনের মাপকাঠি। নৈতিক ভিত্তিতে জীবনকে সুস্থ করে তুলতে। সর্বাংশের মানুষের আত্মশক্তির ভেতর এমন এক সামাজিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি হবে, যেখানে হিংসার, শোষনের, বিনাশের স্থান হবে না। আত্মশুদ্ধির ধারাতেই তা সম্ভব। নিজের অনুভূতি দিয়ে যখন অপরকে বিচার করা যাবে, তখনই নিজের ভুলগুলি ধরা পড়বে। আত্মশাসন করতে পারলে, ব্যক্তির মুক্তি অনিবার্য। সমাজ সম্পর্কের সূত্রগুলি অনুধাবন করতে দিয়েই তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছিলেন। হিংসা, মানুষকে অমানুষ করে তোলে, হিংসা, পৌনপৌনিক হিংসার কারণ হয়। সুতরাং হিংসা দিয়ে ব্যক্তি জীবন সুগঠিত হয় না। হিংসা মানবিকতা বিরোধী, এই প্রত্যয় তাঁকে এত বেশী মুহ্যমান ও ভাবিত করেছিল যে, তিনি বার বার আবৃত্তি করেছিলেন, 'পৃথিবীং মা হিংসীঃ'—পৃথিবীকে হিংসা করো না। ভারতের সেই শাশ্বত বাণীর উত্তরাধিকারী মহাত্মাজী অহিংসাকেই তাঁর রাজনৈতিক গণ আন্দোলনের হাতিয়ার করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাগ্রস্ত হননি। মহামানব গান্ধীজীর এই চিন্তাধারাই শেষ পর্যন্ত কোটি মানুষের মন্ত্র হয়ে উঠেছিল!

ইতিহাস মানুষের হাতে রচিত হয়। সেই মানবিক-সূত্র-অন্বায়ন-ভ্রষ্টা ইতিহাস তার গতিকে সবসময় এগিয়ে নিয়ে যায়। পিছনে ঠেলে দেয় না। মহাত্মাজীর মানবিক বিচারবোধের তীব্রতা এত বেশী ছিল যে, তিনি ইতিহাস-সঞ্জীবিত, লোকায়ত দর্শনকে ঊর্ধ্বলৌকিক থেকে বিচার করেছিলেন। এই চিন্তাধারা, যদি ও যুগের স্বাধীনতোত্তর ভারতের পরিস্থিতির উপর ফেলে বিচার করা হয়, তাহলে বক্তব্য আরো সুস্পষ্ট হবে। বুর্জোয়া অর্থনীতিতে চরম পরিবর্তন সম্ভব নয়। লোভাতুর মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে নীতি নিষ্ঠার রজ্জু দিয়ে বন্ধন সম্ভব নয়। এমন এক দিক-বলয় তৈরী হবে, যেখানে বস্তুতান্ত্রিক সুখ সুবিধার ভেতর, নৈতিকতা জয়ী হবে, এমন সম্ভাবনা কজনের ক্ষেত্রে সম্ভব? ব্যক্তিবাদিতার (Individualism) যে গুণই থাকুক, ব্যক্তিকে যত মহান ও শক্তিশালী করে তুলুক, তা সে সকল মানুষের স্বার্থ-

নির্ভর তা তো ভোলাবার নয়। মানবিকতার অর্থ এই নয় যে, নিজে বেঁচে থাকব, নিজে সর্বসুখ ভোগ করব। বরং অপরের সুখ দুঃখ ভাগ করে নেওয়াই মানবিকতা। বুর্জোয়া সমাজে যে সমস্ত বাণী বা আদর্শের মৃগমরীচিকা সৃষ্টি করা হয়, সেগুলিকেই শেষ পর্যন্ত মানবিক আখ্যা দেওয়া হয়। আসলে তা শোষণের যন্ত্রবিশেষ, এবং প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির হেরফের মাত্র। মানবিক বিচার বোধের সমৃদ্ধি যদি আত্মকেন্দ্রিকতার মধ্যে নিবদ্ধ হয় তবে তার চেয়ে দুঃখের আর কিছু থাকে না। গান্ধীজী নিজে মহাত্মা ছিলেন নিঃসন্দেহে বলা যায়, কিন্তু তিনি কজন 'মাহাত্মা' তৈরী করতে পেরেছেন? তিনি নিজে মানবিকতাকে সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছিলেন কিন্তু কজন দেশকাল পাত্রের ঊর্ধে থেকে মানবিকতাকে আশ্রয় করতে পেরেছেন? স্বার্থপরতা, লোভ এগুলি মানুষের প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তিগুলি একটা প্রতিক্রিয়াশীল মানসিকতার জন্ম দেয়। অর্থনীতির ক্রম-প্রসারতার সুযোগ নিয়ে, এই প্রতিক্রিয়াশীলতা বিদ্বেষভাব জাগায়—তা থেকেই সৃষ্টি হয় হিংসা। তখন দুটি পরস্পর সম্পর্ক দ্বন্দ্ব শ্রেণীতে রূপান্তরিত হতে দেরী হয় না। মানবিক বিচার বোধের গলাটিপে ধরে এই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি। যে হবার কথা আমার একান্ত আপন, সে হয় আমার বেতনভুক কর্মচারী, মাইনেকরা দাস মাত্র। যে হয়, আমার একান্ত প্রিয়, সে হয় আমার পণ্যজীবনের অংশীদার। মহাত্মাজী যে সময়ে গণ আন্দোলন সুরু করেছিলেন, সেই সময় হয়ত বুর্জোয়া অর্থনীতির অবশ্যম্ভাবী পরিনতির কথা ভাবতে পারেন নি।

বস্তুতান্ত্রিক জগতে 'বস্তু' আগে না 'চৈতন্য' আগে, সে প্রশ্ন অবান্তর। অবান্তর এই কারণে, আমরা আমাদের বুদ্ধি ও বিবেচনা থেকেই বুঝতে পারি, আমরা কি চাই। মানবিক শুদ্ধাচার তখনই সম্ভব যখন আমি আমার বস্তুগত ন্যূনতম চাহিদা মেটাতে পারব। রামরাজ্যে কেউ অনাহারে মরবে না, রোগে শোকে দুঃখে মরবে না। একথা যত সহজে বলা যায়, তত সহজে বাস্তবায়িত হয় না। উৎপাদনের উপায়গুলি যদি বিশেষ কয়েকজন ব্যক্তির হাতে থাকে, সামগ্রিক উৎপাদনের বন্টনের চাবিকাঠিটি যদি কয়েকজনের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়, তা হলে কিভাবে রামরাজ্য সৃষ্টি হবে? চাইলেই যদি পাওয়া যেত, তা হলে সৃষ্টির আদি থেকে, সেই সমস্ত প্রবৃত্তি গুলি থাকত না। মানুষের অভাব এবং সেই অভাব অতিক্রম করার জন্য প্রয়াস, একটা বৈজ্ঞানিক পরিবেশেই সাফল্য লাভ করতে পারে। একদল দেবে আর একদল নেবে, এই দেওয়া নেওয়ার সম্পর্ক হবে স্বার্থ—এই যদি নিয়ম হয় তাহলে স্বার্থকেই দেওয়া হবে অগ্রাধিকার। ব্যক্তিস্বার্থ যদি সমাজ স্বার্থে বিলীন না হয়, তা হলে স্বার্থের অপর নাম হবে প্রতিক্রিয়াশীলতা। মহাত্মাজী যে রামরাজ্যের স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেখানে যেন এ ধরণের স্বার্থ থাকবে না। জনতা সচেতন, পারিপার্শিকতার চাপে পড়ে মানুষ কি ভাবে স্বার্থকে দমন করে, আত্মশাসন করে, মানবসমাজ তৈরী করতে একাগ্র হতে পারে? আসলে গান্ধীজী বুঝেছিলেন, ব্রিটিশকে রোখবার মত শক্তিবল তাঁর নেই—জনমানসও তৈরী হয় নি। এ সময়ে অহিংসা সত্যাগ্রহকে কাজে লাগিয়ে, আর কিছু না হোক, জনগণকে একত্র করা সম্ভব হবে। গণ-আন্দোলন যদি স্পষ্ট রূপ নেয়, তবে তাকে ঠেকান কারোর দ্বারাতেই সম্ভব নয়। কারণ জনগণই সকল শক্তির উৎস। শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল গণ-প্রতিরোধ সর্বজয়ী, তাকে শেষ পর্যন্ত কাজে লাগাতে পারলে রামরাজ্যের প্রাথমিকস্তরে পৌঁছান সম্ভব হবে। কিন্তু তারপর? রামরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হলে মানুষ কি তাদের গণ-প্রতিরোধ ও গণশক্তিকে বজায় রাখতে পারবে? বিশেষ করে যদি সেই রামরাজ্যের উৎপাদন ব্যবস্থা সমাজ-নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত না হয়ে ব্যক্তি নির্ভর হয়?

সুদৃঢ় শাসকের মূল ধরে নাড়া দেবার জন্য মহাত্মাজী যে অক্লান্ত চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিলেন তারজন্যে ভারতের ভবিষ্যত নাগরিকেরাও কৃতজ্ঞ থাকবেন। বস্তুতান্ত্রিক বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তে তিনি যে নৈতিকতার আশ্রয় তুলে ধরেছিলেন তার সমালোচনা এই মুহূর্তে না করেও আমরা বলতে পারি, গান্ধীজী অন্যান্য ভারতের কাছে এক মুক্তিকামী মহানায়ক। দেশ-কাল ভেদে চিন্তাধারার পরিবর্তন ঘটে। যে কালের ভারতে তিনি নেতৃত্বের ভার পেয়েছিলেন, সেকালে তিনি যদি হিংসার পথ বেছে নিতেন, তা হলে হয়ত তাঁর বৈপ্লবিক শক্তির বিকাশ সম্ভব হোত না। ভারতের গণ-মানসের অপূর্ণতার সুযোগ নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ হয়ত সর্বশক্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে গণ-আন্দোলন দুর্বল প্রবণতাকে ধ্বংস করে দিত। এ মত হয়ত কেউ কেউ স্বীকার করবেন না। কোনকোন মার্কসবাদী হয়ত বলবেন, তাঁর অহিংস আন্দোলন গণচেতনাকে বিলম্বগামী করেছে। তাঁদের উক্তির অংশবিশেষ কে সত্য বলে মেনে নেওয়া যায়। মহাত্মাজী গণচেতনার জন্যই অহিংসাকে ব্রত করেছিলেন, গণচেতনার স্তর অতিক্রম করার প্রশ্নটি বিচার করেন নি। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামাই বুঝিয়ে দেয়, হিংসাকে যদি গণচেতনার ভিত্তিস্তর হিসাবে মেনে নেওয়া হোত তা হলে প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতে ভারতবাসী আরো কতগুণ বেশী মার খেত। সাম্প্রদায়িক দুষ্কৃতকারী, মারশিঠ, পাশব শক্তির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। ভারতের গণ-মুক্তির ক্ষেত্রে যদি হিংসাকে অস্ত্র হিসাবে ধরা হোত, তা হলে ব্রিটিশের-পৃষ্ঠপোষকতা মুক্ত হবার প্রশ্নটি গৌন হ'য়ে যেত। এর সুযোগ নিত ব্রিটিশ। বিপ্লবী লেনিনের ভাষায় বলা যায়, 'মুসলমান ও অমুসলমান সম্প্রদায়ের ঘনিষ্ট মৈত্রীকে অভিনন্দন··· এই মৈত্রীবন্ধন প্রাচ্যের সকল মেহনতি মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ুক' এই আমাদের কামনা···।' অথবা ভারতের কোটি কোটি মানুষ তথা মানবজাতির এক বিপুল সংখ্যা-গরিষ্ঠ অংশ 'অসাধারণ দ্রুতগতিতে মুক্তি সংগ্রামে নেমে পড়েছেন।' এই মুক্তি-সংগ্রামের অগ্রবর্তী নায়ক ছিলেন মহাত্মাজী। মহাত্মাজীর কাছে ভবিষ্যত ভারতে যদি ঋনী হবার কিছু থাকে তবে এই মুক্তি সংগ্রামের ভিত্তিস্তর তৈরী করার জন্যই।

ভীক হাতে দরজার কড়া নাড়ছিল ছেলেটি। আমার অন্তত: সেই রকমই ধারণা। যদিও শব্দটা আমি শ্রবণ করে শুনিনি, তবুও আওয়াজের চরিত্রটা আমাকে এই রকম ভাবাল। বাইরে শীতের রাত, তার ওপর সন্ধ্যে থেকে দমকা বাতাস আর বৃষ্টি, হাওয়া অফিসের স্যাটাই যার নাম 'দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া:।' এ সময় লেপের তলা ছাড়তে আমার যেন ভয় আসে। খানিক আগেই আমি লেপের তলায় সেঁধিয়েছি, পা হাত পা এখনো তেমন গরম হয়ে ওঠেনি, অথচ এরই মধ্যে দরজায় কড়া নাড়া। সুনন্দা ঘরে নেই, থাকলে দরজা খোলার হাঙ্গামাটা ওকে দিয়েই মিটিয়ে ফেলতে পারতুম। বেড় থেকে দু মিনিট কান সজাগ রেখে চুপ করে রইলাম। এ সময়ে দুটি উদ্দেশ্য আমার মধ্যে একযোগে কাজ করছিল। এক, দরজার কড়াটি আবার বাজে কিনা এবং ইতিমধ্যে সুনন্দা যদি এসে পড়ে। কিন্তু দরজার কড়া আবার বাজলেও সুনন্দা এলো না। অগত্যা আমাকে লেপের উষ্ণতা ছেড়ে মনে মনে একটা চলতি খিস্তি চটকাতে চটকাতে দরজা খুলতে হল।

দরজা খুলতেই অন্ধকার বারান্দা থেকে বৃষ্টি ভেজা দমকা বাতাসের একটা আচমকা ঝাপটা আততায়ীর থাবার মতো আমাকে আক্রমণ করল। বারান্দার আলো ছেলে দিতে দেখলাম, দরজার পাশে, একেবারে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে একটি মানুষ। বয়স আন্দাজ পনেরো থেকে ষোলর মধ্যে। পায়ের গোড়া অব্দি বৃষ্টির জলে ভেজা, জামার এখানে ওখানে জলের দাগ, একটা লোংরা চাদর দিয়ে গা ঢাকতে ঢাকতে সে বেজায় কাঁপছে। বিছানা ছেড়ে উঠে আসায় আমার মনটা এমনিতেই তেতো ছিল, ছেলেটিকে দেখে তা আরো বেড়ে গেল। রুক্ষ গলায় জিজ্ঞেস করলাম, তুমি দরজার কড়া নেড়েছো ?

ছেলেটি ভয়ে ভয়ে ঘাড় নাড়ল। ওর বেয়াদপি দেখে আমি তো অবাক। গলার স্বর রুক্ষ করাই ছিল, এবার তা আরো তীক্ষ্ণ হল, কি দরকার তোমার ? কড়া নেড়েছো কেন ?

আমার প্রশ্নে ছেলেটার মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া হল কিনা ভাল বুঝতে পারলাম না। কেবল দেখলাম, সে আরো জোরে কেঁপে উঠল। আমি একমুখ বিরক্তি নিয়ে ছেলেটির জবাবের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। ছেলেটি যেন তা টের পেল, তাই বার দুই চেষ্টার পর বলল, বাবু আমারে যদি দয়া করে বাড়ির মধ্যে একটু আশ্রয় দান, তবে এই রাতে বেঁচে যাই। বাইরে যেমন ঝড়, তেমনি জল।

ছেলেটির কথায় একটা আবেদনের ভঙ্গি ছিল ঠিকই কিন্তু এখন তা আমাকে স্পর্শে না। বরং এই রাতে একটা অচেনা ছেলেকে বাড়ির মধ্যে ঠাঁই দেওয়া যে কতখানি মূর্খতা তা ভাবতে গিয়ে সন্দেহের চোখে ছেলেটিকে আর একবার দেখলাম। বেশ চলচলে মুখ, চোখ দুটো ভাসা ভাসা, যতটুকু দেখা যাচ্ছে তাতে ওর দাঁত বেশ মজবুত আর চকচকে বলে মনে হল। খোলা দরজার সামনে দাঁড়াতে আমার বেশ কষ্ট হচ্ছিল। কেননা, থেকে থেকে বাতাসের ঝাপটা এসে আমার শরীরে ঝাপিয়ে পড়তেই আমার হাতে পর্যন্ত কাঁপন লাগছিল। অথচ এখন দরজাটি বন্ধ করা উচিত মনে হলেও আমি ঠিক বন্ধ করতে পারছি না, যেন কোথাও আমার হাত আটকে গেছে। ছেলেটি মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে কাঁপছিল, ওর এক মাথা চুলের ওপর জলের গুঁড়ো ছড়িয়ে আছে শিশিরের মতো। সম্ভবত ওর গা থেকেই উঠে আসছিল একটা সোঁদা গন্ধ যা এখন আমার নাকে আসছে। আমি কিছু না বলে বার দুই ওকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম এবং দেখতে দেখতেই এক সময় আমার মুখ থেকে বেরুল, এখানে কিছু হবে না, অন্যত্র চেষ্টা করো। ভেতরে কোন আড়ম্বর নেই। কথা শেষ করে দরজা বন্ধ করলাম আমি। ভেতরটা যেন উষ্ণ, তার চাইতেও উষ্ণ আমার ছেড়ে আসা বিছানা। আমি বারান্দার আলো নিভিয়ে তাড়াতাড়ি গিয়ে আবার লেপের তলায় ঢুকে পড়লাম। আহ। শীতের রাতের লেপ, এর চাইতে সুখকর আর কিছুই পৃথিবীতে নেই। আমার

গায়ে বাইরের ঠাণ্ডা ছিল, ভেতরের উষ্ণতায় তা কেটে যাচ্ছিল আস্তে আস্তে আর আমি যেন আস্তে একটা মাদী বেড়ালের মতো সেই সুখের ঘা চাটতে চাটতে ঘুমিয়ে পড়তে চাইছিলাম।

পুরোপুরি ঘুমিয়ে পড়ার আগে সুনন্দা এলো। ঘরে এলেও বিছানায় আসতে এখনো অন্ততঃ আধঘণ্টা। মুখে ক্রীম মাখা, চুল ঠিক করা তারপর পায়ের গোড়ালীতে ভিসারিন লাগিয়ে এবং জল খেয়ে লেপের তলায় সুনন্দা যখন এল তখন টেবিল ঘড়িতে এগারোটা। ঘরে আসা অবশ্য তবু সহ্য করা যায়, কিন্তু ঘরে এলেও এই দেরীটা যেন আমার সহ্যই হতে চায় না। বাইরে জল মেটে আসায় সুনন্দার ডান হাত ঠাণ্ডায় বরফ হয়ে আছে, ও এখন সেই হাত দিয়ে আমার গালে ঠাণ্ডা দিল।

'এই কি হচ্ছে।'

'আহা, এইটুকু ঠাণ্ডা বুঝি আর সহ্য হয়না'।

এইরকম কিছু ইয়ার্কি আর কথাবার্তার পর রোজই আমরা ঘুমিয়ে পড়ি। কিন্তু আজ সুনন্দার ইচ্ছে নয় আমি বুঝেছি। ও আমাকে মাঝে মাঝে ধাক্কা দিচ্ছিল আর সেই সঙ্গে চাপা স্বরে ধমক, এই ঘুমোবে না বলছি। কাল তো রবিবার।

আমি হাইটুলে আরো কাছে এগিয়ে গেলাম। আমার ভেতরে অন্যদিনের মতো সেই পুরনো ব্যাপারটা শুরু হয়ে গিয়েছিল, সেই. বোবা একটা যন্ত্রণা। সুনন্দার মধ্যে এসময় কী হয় ভগবান জানে, আমি কখনো ওকে জিজ্ঞেস করিনি। যেন কেউ পরমমূল কুলকুচি করে আমার রক্তের মধ্যে ফেলছিল। এবং তাতে এক জাতীয় উষ্ণতা ও এঁটো এঁটো ভাব আমার মধ্যেও নিঃশব্দে হেঁটে বেড়াচ্ছে। সুনন্দা এরকম সময়ে বরাবর নির্বিকার। যেন ওর কিছুই অসুবিধে নেই, ও যেমন খুশি করতে পারে এবং করছিলও তাই।

হঠাৎ ও মুখ তুলল, অন্ধকারে ঠিক বোঝা গেল না কেন, পরক্ষনেই আমার বুকের ওপর ওর মাথাটা নামিয়ে দিতে দিতে বলল, কে গোঙরাচ্ছে বল তো?

আমার বুকের ভেতরটা চমকে উঠল। মুহূর্তে সহসা দুলে উঠে আবার আস্তে আস্তে, ঠিক দোলন খাটির পেণ্ডুলামের মতো দুলতে লাগল। সুনন্দা অবাক স্বরে গলায় বলল, তুমি শুনতে পাচ্ছো না?

অন্ধকার বারান্দা থেকে একটা কাতরানির অস্পষ্ট শব্দ এতক্ষনে আমার কানে এল। আমি মুখে তাচ্ছিল্যের মুদ্রা করলাম, কে জানে কে গোঙরাচ্ছে।

সুনন্দা যেন অধৈর্য। সঙ্গে সঙ্গে ও বিছানার ওপরেই উঠে বসল, তারপর শব্দটা শুনে নিয়ে আবার শুয়ে পড়তে পড়তে বলল, যেন বাইরের বারান্দা থেকে আসছে। এই একবার দেখনা।

আমি সুনন্দাকে কাছে টানতে টানতে ওর ভাবনাটা উড়িয়ে দিতে চাইলাম, ধুর। তোমার যত অদ্ভুত বায়না।

সুনন্দা ঠিক আগের মতো আমার বুকের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে দিতে দিতে আবার উৎকর্ণ হয়ে উঠল, ওর গলার স্বরে উদ্বেগ আর ভয় স্পষ্ট হল আগের চেয়ে।

'এই দেখ না একবার, নিশ্চয়ই আমাদের বারান্দায়।'

অগত্যা আমাকে মুখ তুলতে হল। চেষ্টা করে গলাটা কে নিস্পৃহ করে বললাম, একটা বাচ্চা ছেলে কড় জলের জন্য বারান্দায় শুয়ে আছে বোধহয়। খানিক আগে, তুমি তখনো এঘরে আসোনি তখন—

আমার কথা শুনতে শুনতে সুনন্দা মুখ তুলছিল, সবটা শোনা শেষ হতেই সে আহত বিস্ময়ে যেন আঁতকে উঠতে চাইল,—তুমি ছেলেটাকে বারান্দায় ফেলে রাখলে! এই রাতে তো ছেলেটা নির্ঘাৎ মারা পড়বে।

সুনন্দা 'মারা পড়বে' শব্দটা এত জোর দিয়ে উচ্চারণ করল যাতে করে লেপের তলায় শুয়েও আমি একবার কেঁপে উঠলাম। এবং সঙ্গে সঙ্গে আমি যেন একটি মৃত্যুর দৃশ্য চোখের ওপর দেখতে পেলাম। নিখুঁত এবং পরিপাটি একটি মৃত্যু। আর আমার শুকনো তালুতে আঠা আঠা রক্তের একটা অনুভূতি। আসলে এরকম একটা ভয় সারা বছর আমার মধ্যে ঘুমিয়ে থাকে, সুনন্দা সেই ভয়টাকেই জাগাল নতুন করে।

আমি কণ্ঠস্বরে বিরক্তি আনলাম, মারা পড়লে আমি কি করতে পারি। অজানা, অচেনা একটা ছেলেকে রাত দুপুরে এনে তো বাড়ির ভেতর ঢোকাতে পারি না।

'তাই বলে ছেলেটা এই কড়জলের রাতে বারান্দায় পড়ে থাকবে? তাই কি পারে কেউ।'

'না পারে তো তোমার লেপের তলায় এনে শোয়াও, দিব্যি আরামে থাকবে।'

'তোমার অসভ্যতা রাখো।' সুনন্দা গলায় বিরক্তি ফোটাল। 'এই বলনা, সত্যি একটা বাচ্চা ছেলে?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ'।

সুনন্দা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। অন্ধকারে ওর নিঃশ্বাসের শব্দ পর্যন্ত শোনা গেল না। বাইরের ঐ উটকো ছেলেটাকে নিয়ে সুনন্দার এই অকারণ উৎকণ্ঠা আমার ভাল লাগছিল না। যেন ও খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছে ওর মহৎ দেখাবার জন্য। যদিও কেবল আমিই মনে মনে বুঝছিলাম, সুনন্দার কাছে আমি অপরাধী হয়ে পড়ছি এবং ঠিক সেই কারণেই সুনন্দার এই ব্যাপারটা ভেতরে ভেতরে আমাকে পীড়া দিচ্ছিল। সুনন্দা নিজের গলায় একতাল সহানুভূতি ছড়িয়ে বলল, ইস্! বাইরের বারান্দায় বেচারা ভিজে জবজবা হয়ে যাবে, এই তুমি যাওনা একবার। শুনছো না কী রকম কাতরাচ্ছে।

'কাতরাচ্ছে তো আমি কি করব।' আমি অসহিষ্ণু ভাব দেখালাম।

'তাই বলে ঘরে শুয়ে আমরা বাইরে একটা লোককে মরতে দেব।'

বাস্তবিকই এবার আমার মেজাজ চড়ে যাচ্ছিল। এক রাত্তির ঐ ছেলেটার জন্যে শনিবারের খোটা রাতটাই মাঠে মারা যেতে বসেছে। এতসব আপদ জোটেও যে কোত্থেকে। আমি এক ঝটকায় গায়ের ওপর থেকে লেপ সরিয়ে ফেলে বিছানায় উঠে বসলাম। অন্ধকারে ঠিক বোঝা গেল না সুনন্দা আমার এই আচরণে কি ভাবল! আমি খাট থেকে নামতে নামতে বললাম, আমি ভেতরে এনে দিচ্ছি, তোমার যা খুশি কর।

সুনন্দা আমার কথার পিঠে কোন কথা বলল না দেখে আমি অবাক হলাম। গোটা ঘর হঠাৎ ঝুড়িয়ে গেল, আমি

অন্ধকারেই দরজার দিকে এগিয়ে দিয়ে ঘরের এবং বাইরের আলো জ্বালাতে হাত বাড়ালাম। বারান্দা থেকে পোড়োবাড়ির শব্দটা এখন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি, যেন পৃথিবীর সমস্ত শব্দ হঠাৎ থেমে গিয়ে কেবল এই পোড়োবাড়িটাই যেন রয়ে গেছে। দরজা খুলতেই শব্দটা আচমকা আমাকে বিদ্ধ করল। আমি দেখলাম, বৃষ্টি, বাতাস আর শীতের হাতে অসহায় ছেলেটা প্রাণপণে নিজেকে রক্ষা করবার জন্য এমনভাবে দেয়াল ঘেঁষে শুয়ে আছে যা দেখে সহজে বিশ্বাস করা মুস্কিল ওটা মানুষ না অন্যকিছু।

বারান্দার আলো জ্বালতেই ছেলেটা বুঝি মাথা তুলে দেখবার চেষ্টা করল। আমি ছেলেটিকে ভেতরে ডাকলাম। কিন্তু মনে হল আমার কথা সে বিশ্বাস করতে পারল না, যেমন ছিল, তেমনই পড়ে রইল। আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল সুনন্দা, এবার ও এদিকে এসে ডাকতেই ছেলেটা উঠে বসল এবং দ্বিতীয়বার ডাকবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘরে এল ছেলেটি। সুনন্দা অবাক চোখে দেখছিল, আমি নিঃশব্দে আবার গিয়ে লেপের তলায় ঢুকলাম। সুনন্দা আমাকেই উদ্দেশ্য করে বলল, ওকে সিঁড়ির নিচে শুতে দি, কি বল।

আমার নির্বিকার কণ্ঠ 'যা তোমার খুশি।'

আমি শুয়ে পড়লেও ঘুমোলাম না। জেগে জেগে অনেক রাত অব্দি সুনন্দার ব্যস্ততা আর তোড়জোড়ের আওয়াজ পেলাম। কেন জানি না আমার মনটা একদম খারাপ হয়ে গিয়েছিল। এক রাত্তির একটা ছেলে কিংবা সুনন্দা যেই হোক আমার সমুখের সুখ হরণ করছিল। মানুষ যেমন করে হাত বাড়িয়ে ফুটন্ত ফুলের বোঁটা ছেঁড়ে পট পট করে, তেমনি কেউ বুঝি আমার বুকের মধ্যে হাত চালিয়ে দিয়ে কিছু একটা ছিঁড়ে নিয়ে গেছে। আমার রক্তে পাক দিচ্ছিল একটা অস্বস্তি। মনের এ অবস্থাটাকে কী বলা হয় আমি জানি না। কিন্তু সব মিলিয়ে আমার মধ্যে একটা অপরাধ অপরাধ ভাব জাগছিল। আমি ঘুমের ভাণ করে বালিশে মুখ গুঁজে ছিলাম যাতে সুনন্দা এলে আমি কথা বলার দায় একান্তে পারি।

সুদামা নামের ঐ ছেলেটি অবশেষে আমাদের বাড়িতেই থেকে গেল। ওর কোথাও যাবার জায়গা ছিলনা আর আমাদেরও একটি চাকর দরকার ছিল, যে ফাইফরমাজ খাটতে পারে। দু'দিন যেতে না যেতেই দেখলাম, সুদামা গোটা বাড়ির হালচাল দখল করে বসেছে। ছেলেমানুষের মতো বেখেয়ালে মাঝে মাঝে ও বেশ মুরুব্বির মতো কথা বলে, সুনন্দাকে এটা-ওটা পরামর্শ দেয় আবার যখন ছেলেমানুষী করে তখন একেবারেই ছেলেমানুষ। ওর গাঁয়ের কথা সুদামা ভালো মনে করতে পারেনা। বহুদিন আগে ও নিজের গ্রাম ছেড়েছে, তারপর একা একা হাঁটতে শিখেই ও ঘুরছে পথে পথে। ওদের গাঁয়ে বড় বড় পাকুড় গাছ, বনতুলসী আর কাশফুল ছিল এবং গ্রামের শেষ সীমানা দিয়ে বয়ে যেত একটা নদী, যার নামও সুদামার মনে পড়েনা। গ্রামের কথা বলতে গিয়া কাঁচে প্রতিবিম্বিত হওয়ার মতো অস্পষ্ট কিছু দৃশ্য তার চোখের তারায় খেলে যায়। খুব দূরের কোন দৃশ্যের মতো মনে পড়ে সবুজ সবুজ স্মৃতি, একমাঠ জলা ভেঙে হাতে হ্যারিকেন ঝুলিয়ে সার বেঁধে কেউ যেন মাঠ পেরুচ্ছে। অন্ধকারে ঠাক পাচ্ছে বড়োরা, হেই সামাল, সামা···ল, বাঁধ ভাঙতি পারে···। ব্যাস্ গ্রামের কথা বলতে এইটুকুই ওর মনে আছে। আর এই একই গল্প রোজ একবার করে ও সুনন্দাকে শোনাবেই।

সেদিন বিকেলে সুদামা আমাদের চা করে দিতে গেল। সুনন্দা বলল, তোর চা কোথায় রে সুদামা?

সুদামা বলল, আছে।

আমাদের সামনে সুদামা চা খায় না। বারান্দায় পেছন ফিরে বসে ফুঁ দিয়ে দিয়ে চা টা শেষ করে ও এসে বসল সুনন্দার পায়ের কাছে। দেখতে শুনতে মিষ্টি ছেলেটি। অমন গভীর টানাটানা চোখ হামেশা দেখা যায় না। ওর চোখ যেন বটের ছায়া ধরে রেখেছে এমনই স্নিগ্ধ। সুনন্দা ওকে জিজ্ঞেস করে, হ্যাঁরে সুদামা, ছোটবেলা থেকে পথে পথে ঘুরছিস কেন? মা-বাবার কাছে থাকতে পারিস না?

সুদামার চোখের তারা স্থির হয়ে রইল। যেন দিগন্ত ছাড়িয়ে আরো দূরের কোন কিছুর দিকে ওর দৃষ্টি নিবদ্ধ। ও খুব আস্তে আস্তে বলল, মা আকালের সময় মরে গেছে বিষ খেয়ে। বিষ ছাড়া গোটা গাঁয়ে আর কিছু খাবার ছিল না তখন।

সুনন্দা হাতের কাজ ফেলে হাঁ হয়ে শোনে সুদামার কথা। সুদামা বলে যায়, ঐ বছরই তো আমরা গাঁ ছেড়ে পালালুম, আর কখনো যাইনি।

'তোর বাবা?'

সুদামা যেন পোড় খাওয়া অভিজ্ঞ মানুষের মতো দীর্ঘশ্বাস ফেলে, মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, তারে খুঁজতেই তো শহরে এলাম।

সুদামার কথায় আমি অবাক হই। চায়ের পেয়ালা নামিয়ে রাখতে রাখতে বলি, শহরে কোথায় থাকে সে?

'তা জানি নে বাবু, লোকে বলে বাবা নাকি এখন শহরে আছে। আমি ঠিক তারে খুঁজে বার করব।'

'তুই চিনতে পারবি তোর বাবাকে?'

সুনন্দার কথায় সুদামা মাথা নাড়ে, না, জন্মে অব্দি তারে আমি দেখিনি। মার মুখে শুনেছি ইস্তা জোয়ান ছিল আমার বাবা। রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে পায়ের চাপে মাটি কাঁপত থরথরিয়ে! তারে চোখে না দেখলেও মা'র মুখে শুনে শুনে আমার চেনা হয়ে গেছে।

আমি জিজ্ঞেস করি সুদামাকে, তা তোর বাবা গাঁয়ে থাকত না কেন?

চোখ বড় বড় করে সুদামা আমার ভুল শুধরে দেয়, গাঁয়ে থাকবে না কেন, গাঁয়েই তো থাকত। সেই যেবার প্রথম আকাল হল, সেইবার বাবাই তো একা গাঁয়ে মাটি কামড়ে পড়ে ছিল। আমাদের গাঁয়েও একটা দত্যি থাকত, তাদের দোতালা বাড়ি, অনেকগুলো গোলা আর চারটে বন্দুক। গাঁয়ের মেয়েরা ওদের বাড়িতে কাজ করতে যেতনা ভয়ে।

'কেন?' সুনন্দার কণ্ঠে কৌতূহল।

সুদামা ঠাকুরমার কুলির গল্প বলে যাওয়ার মতো বলে, ওটা দত্যির বাড়ি যে, ওখানে গেলে কেউ ফেরে না। দত্যিগুলো নাকি চুমুক দিয়ে মেয়েগুলোর রক্ত খায়। ওদের তো পেটজোড়া কেবল খিদে।

সুদামার চোখ আড়াল করে সুনন্দা আমার হাতে চিমটি কাটল। আমি

বললাম, তাতে তোর বাবা নির্দোষ হবে কেন?

আমরা দু'জনে যেন সুদামার দুই বোকা ছাত্র এমনই ভাব করে সুদামা বলল, আরে সেদিন না মজার কথা। একবার নবান্নের দিনে, আকালে মানুষগুলোকে নিয়ে আমার বাবা ঐ দত্তিার বাড়ি চড়াও হল। কিন্তু দত্তিার সঙ্গে মানুষ পারবে কেন। বন্দুকের আওয়াজ শুনেই সবাই দুই মারল। কেবল বাবাকেই ধরে নিয়ে পেটাল দত্তিার দল।

'তারপর?' আমরা চোখ বড় বড় করে কৌতূহল মেটাবার ভাণ করলাম।

সুদামার গলা ভারী হয়ে এল। থেমে থেমে বলল, মা'র কাছে শুনেছি বাবা সেই রাত্রেই গাঁ থেকে উধাও হয়েছে। যাবার বেলা মাকে বলে গেছে, উঃ বড্ড ঠাণ্ডা গো, এই শীতে তোমার খোকা অন্ধারে কেমন করে, দাঁড়াও আমি আগুন জ্বালার ব্যবস্থা করি। আমার মা তখন শুয়ে, আর পেটের মধ্যে আমি। আমার জন্যে আগুন আনতে বাবা সেই যে গেলেন আর এলেন না।

সুদামার গলার স্বর ভেজা ভেজা। কিন্তু ওর চোখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম সেখানে জলের কোন চিহ্ন নেই, বরং মরুভূমির মতো সেই চোখ যেন জ্বলছে। সুনন্দা সহানুভূতির সঙ্গে এই বাপ-মা হারানো অনাথ ছেলেটার দিকে তাকাল। আমি সিগারেটের প্যাকেট খুঁজতে খুঁজতে শুনতে পেলাম সুনন্দা বলছে, মা, উনুনে আঁচ উঠেছে কিন্তু দেখে আয়।

সুদামা বেরিয়ে যেতে সুনন্দা যেন স্বগতোক্তি করল, আহা বেচারা।

এই হল আমাদের সুদামা।

কাজে-কর্মে ওর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ ছিল না। হেন কাজ নেই যা ওকে দিয়ে করানো যেত না। একদিন অফিস থেকে এসে দেখি সুনন্দা দু'পায়ে আলতা লাগিয়ে বসে আছে। বিয়ের পর প্রথম প্রথম ওকে পায়ে আলতা দিতে দু' চারবার জোরাজুরি, কিন্তু গত কয়েক বছর ও ব্যাপারটা বাদই ছিল। আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করি, ব্যাপার কি?

সুনন্দা সলজ্জ হাসতে হাসতে কণ্ঠে কৃত্রিম অভিযোগ ফোটায়, আর বল কেন, ঐ সুদামার বায়না। ওর মা নাকি পরত। তাই আমাকেও পরতে হবে। যত বলি না, ওত ওর বায়না যেন বেড়ে যায়। এবার হুকুম হয়েছে ওর মার মতো লালপেড়ে শাড়ী পরতে হবে।

আমি টাইয়ের নট আলগা করতে করতে বলি, ভালই তো, এবার একদিন হুকুম হবে ওর মেসে যাবার সেদিন ওর হাত ধরে চলে যাবে।

'গেলে মন্দ কী!'

'মন্দ তো বলছি না, তবে ওর বাপ কোনদিন যদি ফিরে এসে জমির দখল নেবার মতো তোমার দখলও নিতে চায় তাহলে—

সুনন্দা আমার মুখে হাত চাপা দিয়ে দৃঢ় ধমক দিল, তোমার মুখে কিন্তু আটকায় না, দিন দিন ভীষণ অসভ্য হচ্ছো তুমি।

মাস দেড়েকের মধ্যেই সুদামা আমাদের ভুলিয়ে ছাড়ল যে, সে বাইরের লোক। যেন জন্মসূত্রে সে একটা অধিকার পেয়েই এ বাড়িতে এসেছে আর সুনন্দা যেন ওর গর্ভধারিণী মা, ওর কথা, ওর আব্দার ওকে শুনতে হবেই। ব্যাপারটা কখনো কখনো আমার বাড়াবাড়ি মনে হতো, কখনো বা ভীষণ ভালো লাগত। ঘরে ছিইয়ে রাখা মাদুরে সুকুরে ছেড়ে দিলে যেমন হয়, আমাদের এখানে এসে সুদামার অবস্থাও তেমনি। সুদামা ছুটির দিনে নতুন নতুন জলখাবার করে দিতো, কখনো বা সুনন্দা ওকে রান্না শেখাতো। এরই মধ্যে একদিন বাড়ি ফিরে দেখলুম সুনন্দা ওকে ইংরাজী এ, বি, সি, ডি, শেখাচ্ছে, আর ও, অনুগত ছাত্র ঠিক নয়, যেন সুনন্দার ছেলের মতোই ওর সামনে বসে পড়া লিখে নিচ্ছে।

তবুও এই সুদামাই একদিন পালাল। আমরা সিনেমা থেকে ফিরে এসে দেখলাম সে নেই। প্রথমটায় সে পালিয়েছে ভাবি নি, কিন্তু আস্তে আস্তে নানা জায়গায় সন্ধান নিয়ে জানলাম যে সে পালিয়েছে। জীবনে বহু মর্মান্তিক আঘাতের মতো এটাও আমাকে তীব্রভাবে বিদ্ধ করল। অনেকক্ষণ আচ্ছন্নের মতো বসে থাকতে থাকতে আমার সমস্ত রাগটা গিয়ে পড়ল সুনন্দার ওপর। সুনন্দা গম্ভীর মুখে আয়নার সামনে বসে চুল বাঁধছিল, আমি এখান থেকে ওর চোখ দেখতে পাচ্ছিলাম। ওর নাকের পাটা ঘন ঘন ফুলে উঠছে দেখে বুঝতে পারলাম, ওর ভেতরে একটা উত্তেজনা খেলা করছে। বাধ্য হয়ে আমাকে থেমে থাকতে হল। সুনন্দা চুল বাঁধা শেষ করে যেন আপন মনেই উত্তেজনার নিওটা নাড়াচাড়া করতে করতে বলল, আসলে তো জাতে ছোটলোক, তাই পারল না বলে করে চলে যেতে। তবু ভাল বলতে হবে যে, যাবার সময় কিছু হাতিয়ে নিয়ে যায়নি। নতুন চাদর কিনে দিয়েছিলুম, হতভাগা সেটাও ফেলে গেছে। যা এবার পথে পথে ঘুরে খা।

সুনন্দার অবস্থা দেখে আমার হেসে ফেলল। আসলে ওর আর আমার মধ্যেও ঠিক এমনি ব্যাপার ঘটছিল। আমি সুদামার অকৃতজ্ঞতায় আহত হলেও মুখে কিন্তু বলছিলাম না। ফলে আমার ভেতরে রাগটা বাড়ছিল। আর সুনন্দা ভেতরের দুঃখটাকে বাইরের রাগ দিয়ে আড়াল করছিল। আমি কিছু না বলে সোফায় চোখ বুজে বসে অন্য কিছু ভাববার চেষ্টা করছিলাম।

অফিস···দুপুরে সমীরের সঙ্গে বীয়ার খাওয়া···ইন্দ্যুরেন্সের প্রিমিয়াম মটা ভরে দিতে হবে···সুনন্দাকে ডাঃ নন্দীর চেম্বারে নিয়ে যাওয়া দরকার···পাশের বাড়ির রেডিওতে মায়া বনবিহারিণী, 'শ্যামা'র গান, একা-তেমি ফ্লস-এ সুনন্দা শ্যামা নেচে প্রাইজ পেয়েছিল, পারলে কালই ডাঃ নন্দীর কাছে সুনন্দাকে···কেন তারে ধরিবারে করি পণ; আহ্, ভাবনাগুলো যেন কবিতা হয়ে যাচ্ছে। কবিতার মত সরীর। সুনন্দার মায়া আর ইন্দ্যুরেন্সের প্রিমিয়াম ভাবনার মাঝপথে দুকুং করে ঢুকে পড়ছে শ্যামার গান, মানে মগজে একটি ককটেল তৈরি হচ্ছে আর কি।

—'এই শুনছো।'

সুনন্দার ডাকে চমকে উঠি আমি। আমাকে চোখ মেলে তাকাতে দেখেই

সুনন্দা বলে, আমার বালিশের তলায় সুদামা চিঠি রেখে গেছে।

'চিঠি! সুদামার লেখা? কি লিখেছে।

সুনন্দা থেমে থেমে পড়ে যায়,—'শ্রীচরণেষু মা, আমি আমার বাবার খোঁজে চলিয়া যাইতেছি। আমি শুনিয়াছি বাবা এই সহরেই কোথাও আছে। আমাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন, আমি আপনাদের প্রণাম করিয়া যাইতে পারি নাই, তাই এখন আমার প্রণাম নিবেন। আমি যাহার সঙ্গে যাইতেছি সে আমার চেনা লোক, তিনিই আমাকে বাবার সন্ধান করিয়া দিবেন। শত কোটি প্রণাম অন্তে আপনাদের সুদামা।'

যে সন্দেহটা প্রথম থেকেই আমার মনের মধ্যে উঁকি দিচ্ছিল এবার তা আরো দৃঢ় হল। আমি বললাম, চিঠিটা ওর হাতের লেখা হলেও ভাষাটা অন্য কারো। সুদামা নির্ঘাত কারো খপ্পরে পড়েছে। এখান থেকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে অন্য কোথাও কাজে লাগাবে।

'কী কাজে লাগাবে ওকে?' সুনন্দার ঈষৎ ভয় পাওয়া গলা।

—'হয়তো কেউ দু'সন্ধে নিয়ে নিজের বাড়িতে কাজ করাবে নাহয় চায়ের দোকানের বয় বানাবে। কলকাতা সহরে এরকম চাকর পাওয়াও তো এখন দুর্লভ।'

সুনন্দা কিছু না বলে অন্যদিকে মুখ ফেরাল। ওর মুখের ছায়া দেওয়ালে, সেই মুখ আহত অভিমানে জ্বলছিল। বুকের খাঁচায় নাম না জানা একটা কষ্ট নিয়ে সেই রাতে; আমি অনেকক্ষণ জেগে থেকে সুনন্দাকে আদর করলাম।

সুদামা নামের ছেলেটিকে নিয়ে আমাদের যাবতীয় ভাবনা চিন্তার এইখানেই ইতি হয়ে গেল। সময়ের সাথে সাথে আমরা সুদামার স্মৃতিটাকে জয় করতে লাগলাম। এরপর সুদামাকে নিয়ে আর এক লাইনও লেখবার ছিলনা যদি না আবার সে ফিরে আসতো।

হ্যাঁ, সুদামা ফিরে এল। ফিরে এল তেমনি এক দুর্জাত শীতের রাতে। সহরের মুখে তখন কুয়াশার মুখোস, গাছের পাতা চুঁইয়ে গভীর দুঃখের মতো ঝরে পড়ছে কুয়াশার ফোঁটা। মৃতব্যক্তির অচল দুঃখ-পিণ্ডের মতো সহর তার যাবতীয় দুশ্চিন্তা নিয়ে স্থির। সুদামাকে আমিই প্রথম আবিষ্কার করলাম। বাইরের সিঁড়ির ঠিক নিচে মাটিতে মুখ গুঁজে ও কাঁদছিল। যেন কী ভীষণ এক যন্ত্রণায় ও কষ্ট পাচ্ছে। আমি ওকে বারান্দায় তুলে আনলাম। সুদামা চিৎকার করে আমার বার বার নিষেধ করল, বলল, আমায় ছোঁবেন না বাবু, আমায় একদম ছোঁবেন না। আমার সারা গায়ে কি সব যা বেরিয়েছে, তার জ্বলুনীতে আমার সারা গা পুড়ে যাচ্ছে।

'কি করে হ'ল এসব তোর?' সুনন্দা প্রশ্ন করল। আমি লক্ষ্য করলাম খুব সতর্কতার সঙ্গে সুনন্দা তার পুরণ বজায় রেখে দাঁড়িয়েছে।

সুদামা জবাব দিল থেমে থেমে, প্রচণ্ড যন্ত্রণায় সে হাঁপাচ্ছে, আমার বাবাকে খুঁজে দেবে বলে যারা আমাকে নিয়ে এসেছিল ব্যবসা করল এই রোগ তাদেরই দেওয়া। বাবু, আপনি আমাকে আর কটা দিন বাঁচিয়ে রাখুন। আমি জানি আমার বাবা মিথ্যে বলেনি। সে আসবেই।

বুঝতে পারছিলাম বিকারের ঘোরে সুদামা কেবল বকছে। ওর গায়ে হাত দিয়েই জ্বর টের পেয়েছিলাম আমি। কিন্তু এই রাতে ওর জন্যে কি ব্যবস্থা করব ভেবে পেলাম না। সুনন্দার দিকে তাকাতে দেখলাম ওরও চোখমুখ অসহায়। আমি সুদামার দিকে চোখ ফেরালাম। সুদামা দু'হাতে বুকের মাঝখানটা আড়াল করে রেখেছিল। যেন যন্ত্রণার উৎসটা ওখান থেকেই। আমি বললাম, তোর বুকে খুব যন্ত্রণা হচ্ছে?

সুদামা ঘাড় নাড়ল, না।

'তবে বুক আগলে রেখেছিস কেন। কি হচ্ছে ওখানে?' সুদামা বলল, আমার গায়ের যা গুলো বুকের কাছে উঠে আসছে বাবু, আমি দেখতে পাচ্ছি সব, ওরা আমার শেষ সম্বলটাকেও নষ্ট করে দিতে চায়।

আমি অবাক করা গলায় বললাম, কি তোর শেষ সম্বল।

সুদামা জোরার লাগা গলায় বলল, যা দিয়ে আমি বাবাকে চিনে নিতে পারব।

কথা শেষ করেই সুদামা আবার কাতরাতে লাগল। আমার বুকের মধ্যে একটা কৌতূহল যেন বাঘনখে আঁচড়াচ্ছিল। আমি বলাম, দেখি হাত তোল।

সুদামা ঘাড় নেড়ে জানাল, না।

আমার মধ্যে একটা বিশ্রি সন্দেহ হঠাৎ থাবা বাগিয়ে আমার গলার দিকে উঠে এল। আমি আদেশের গলা করলাম, হাত তোল সুদামা।

সুদামা অনুনয় করল, বাবু আপনি শুধু আমার বুকের এই জায়গাটুকু বাঁচিয়ে রাখুন। ঠিক এইটুকু জায়গা। যা গুলো ক্রমশ গিলে খাবার জন্য হামাগুড়ি দিয়ে উঠে আসছে। আপনি আমায় বাঁচান। আমি নিচু হয়ে বসে ওর কব্জিতে হাত রাখলাম। ও জোর করে নিজের বুকের একটা অংশ আড়াল করতে চাইছিল। আমি ক্ষুরহাতে এক ঝটকায় ওর হাত টেনে তুলতেই সুদামা অসহায়ের মতো হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল।

আহত বিস্ময়ে আমি কিছুক্ষণ অবাক হয়ে ওর খোলা বুকের দিকে তাকিয়ে রইলাম। সম্ভবতঃ ওরই নখের আঁচড় লেগে একটা রক্তের ফোটা গড়াচ্ছিল। এবং সেই এক ফোটাতেই সুদামার বুকে উল্কিকাটা ঈশ্বর রক্তাক্ত হয়ে গেল। আমি যেন অনেক দূর থেকে, যেন নদীর অন্য পার থেকে ভেসে আসা সুদামার গলা শুনতে পেলাম, আমার বাবার বুকেও এই উল্কি ছিল। আমি এই দিয়েই চিনে নেবো আমার বাবাকে—যে আমার জন্যে আগুন আনতে গিয়ে আর ফেরেনি।

সুদামার গলার স্বর আমার হৃদপিণ্ডে প্রতিধ্বনিত হল। তখন ওর বুকের দিকে তাকিয়ে সহসা অরণ্যে অগ্নিকাণ্ড দেখলাম যেন। সেই রাতে আমরা দুটি বিপন্ন মানুষ আর আমাদের সামনে যন্ত্রনায় কুঁকড়ে যাওয়া আর একটা মানুষ, যেন ক্যানভাসে আঁকা স্থির একটি দৃশ্যের মতো এই পৃথিবীর অন্ধকারে জেগে রইল। আর বিরাট এক অগ্নিবলয়ের মধ্যে সুদামার গলা মন্দিরের ঘন্টার মতো বেজে চলল, আমায় বাঁচান বাবু, ওগুলো ক্রমশ গিলে খাবার জন্য হামাগুড়ি দিয়ে উঠে আসছে.....

আমি জানি না, সুদামার ডিলিরিয়াম হয়েছিল কিনা।

নির্মলের চোখের সামনে এখন এক দৃশ্য : কয়েক শ টাকার নোট গোনা হচ্ছে, যেন পারস্যের শাহ নিজে গুনছেন, আর সেই সময়ে নির্মলের কানে বাজছে কলেজের গেটের বাইরে আসা একদল মেয়ের শাড়ির খস খস শব্দ, যেন দূর থেকে দেখা যায় বা শোনা যায়, কিন্তু কাছে গেলেই বিপদ। এবং নির্মল জানে এই কয়েক হাজার টাকাও দূর থেকে সে দেখতে পাচ্ছে, গোনার শব্দ মনোহর হয়ে কানে বাজছে খস্ খস্, গোনা শেষ হলে টাকাগুলো তার হাত দিয়েই পৌঁছবে অন্য এক জায়গায়। নির্মল শুধু বহন করে নিয়ে যাবে। পারস্যের শাহের হাতে হীরের আংটি ঝলমল, সাধারণ সুতীর জামা গায়েও অসাধারণ মনে হচ্ছে। কৌচ কেদারায় সাজানো ড্রইং রুমে বসে নির্মল এক সম্রাটকে প্রত্যক্ষ করছিল। সম্রাট অর্থাৎ পারস্যের শাহ্ অর্থাৎ মিঃ দত্ত—এই ভাবেই মনে মনে মিলিয়ে নেয় নির্মল, ঠিক বীজগণিতের—এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার—ইজ ইকুয়েল টু···ইত্যাদি।

'তা হলে তুমি এক্ষুনি চলে যাও, কৃপানাথকে আটটার মধ্যেই ধরতে হবে।' সোনার ভারী চকচকে ঘড়িটার কাঁটা দেখলেন, তারপর টেলীফোনের দিকে হাত বাড়ালেন শ্রী শাহ্। নির্মল উঠে দাঁড়াল, 'আর শোন, ফিরে এসে আমাকে বলে যাবে কি হল না হল।'

সকালে খাওয়া ডাল আলুসেদ্ধর এসার্জির মেয়াদ বড়জোর তিনঘণ্টা, এখন দশঘণ্টা পার হয়ে যাচ্ছে, ঘাড়ের ওপরে মাথাটা আর মাথা মনে হচ্ছে না নির্মলের, কাঠপড়ার চেপে ধরা বলির পাঁঠার মতো, সে শুধু ঘাড় নেড়ে টাকাগুলো ভেতরের পকেটে সযত্নে অনুভব করে শাহ্র বাড়ি থেকে নিচে নামল। তখন মুষলধারে বৃষ্টি। বৃষ্টি হোক্, আর বন্যায় ভেসে যাক্, তবুও আটটার মধ্যে পৌঁছতে হবে নইলে শাহ্ ক্ষেপে যাবেন, চাকরিটি যাবে। চাকরি যেতে পারে এই আশঙ্কা সত্ত্বেও নির্মল দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখতে লাগল, হাজার হাজার পারদার তালার শব্দ বৃষ্টিপাতের শব্দ, হাজার হাজির

মধ্যে পৌঁছল পারদার সংখ্যা, নির্মল একাগ্র হয়ে দেখতে লাগল। আর দু মিনিট বড়জোর দাঁড়াতে পারে সে, তারপরই এই বৃষ্টি মাথায় করে পথে নেমে যেতে হবে। শাহর আদেশে এক্ষুনি তাকে নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছতে হবে পাঁচ হাজারকে সাত হাজার করার জন্য। অথবা আরও বেশী। শ্রী শাহ্ এখন তার নীলাভ আরাম ঘরে টাকার মানসাঙ্ক নিয়ে শুভঙ্করের চাইতেও কয়েক ধাপ এগিয়ে গেছেন, অথবা বার্ধক্য হেতু সেক্রেটারীর নরম শরীরে কোথাও শিভ্ শভ্ বলের মত অদৃশ্য কিছু ডাক করছেন।

সহসা নির্মল দেখল, এই বৃষ্টির মধ্যেও নরম পায়ে কে এক মেয়ে যেন এসে কাছে দাঁড়াল। বৃষ্টির জন্যে মাথায় ঘোমটা ছিল, ঘোমটা সরাতেই চমকে উঠল নির্মল। বনশ্রী! কে জানে ওকে দেখেই এসেছে কিনা, কিংবা না দেখেই বৃষ্টি থেকে মাথা বাঁচাতে এসে দাঁড়িয়েছে। সুন্দর এক মধুর ভঙ্গি। ছোট রুমালের আলতো ছোঁয়ায় একটু একটু করে গাল, গলার দিক থেকে ঘাড় পর্যন্ত মুছে নিল, শাড়িটা ঠিকমত গুছিয়ে যখন চোখ তুলল, ইতিমধ্যে নির্মল মনে মনে অনেকখানি প্রস্তুত হয়ে নিয়েছে। হয়ত এক্ষুনি রুদ্ধ এক নাগিনীর মত এই বৃষ্টির মধ্যেই এখান থেকে সরে গিয়ে অন্য কোথাও দাঁড়াবে। অন্য কোনও অশোভন কথা না বলে এটাই হবে ওর এক রকমের প্রতিশোধ। কিন্তু বনশ্রীর ঠোঁটে হাসি দেখে কেমন যেন অস্থিরতা বাড়ল নির্মলের মনে। একটু এগিয়ে এসে দাঁড়াল বনশ্রী, 'এখানে?

নির্মল হাসল, 'বৃষ্টির জন্যে'. মনে তবুও সংশয়, এর পরবর্তী প্রশ্ন ভয়ানক কিছু. 'তোমাকে অনেকদিন পরে দেখলাম, কোথেকে আসছ?'

'চাকরি থেকে। আপনি?' বনশ্রী আঁচল দিয়ে ছোট ব্যাগটা মুছতে মুছতে তাকাল। বনশ্রী 'চাকরি' বলল কেন 'অফিস' না বলে?

'আমারও চাকরি।' নির্মলের মনে অহঙ্কার কিন্তু তোলপাড়। যদি সেই প্রসঙ্গ উঠে? আপনি আমার সর্বনাশ করে এমন করে কেন পালিয়েছিলেন? আসলে 'সর্বনাশ' কথাটা এর আগেও বলেছিল বনশ্রী। কিন্তু 'সর্বনাশ' করবার মতো কিছুই করেনি সে! মাত্র চারমাসে যার দুটি টেলীফোন সংলাপ, দুবার সিনেমা এবং এক বর্ষার দুপুরে ওর মেজদির ফাঁকা, ফ্ল্যাটে একটু পরস্পরের দেহ ব্যবহার, তাও মনু শাসিত সমাজের ধর্ম বাঁচিয়ে। বনশ্রীই ওকে সেই টিপ টিপ বর্ষার দিনে তিনবার টেলীফোন করে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। এবং ফ্ল্যাটের বেল বাজাতেই নিজে দরজা খুলে দিয়েছিল। কেমন সিনেমা-সিনেমা মনে হচ্ছিল বলে নির্মল এই প্রথমবার সাহস পেয়ে ওর কাঁধে হাত দিয়েছিল, হাতটা বনশ্রী মুঠি করে চেপে রেখেছিল নিজের ঘাড়ের মহার্ঘ মাংসে, তারপর একটু ঘুরে দরজা থেকে সরে নির্মলকে ভেতরে আসার ইঙ্গিত করে দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছিল।

নির্মল জানে না কেন এত সাহস হয়ে গিয়েছিল সেদিন, দরজাটা বন্ধ করতেই

ওর লাল পাতলা ঠোঁটের দিকে তাকিয়ে কেমন মনে হচ্ছিল ওর ঠোঁটটা বড়ো বেশী লাল আর কেমন যেন টুসটুসে, ফুলছে। ফলের বাগানে পাখি এলে, চারদিকে অনেক পাকা ফল, ইচ্ছে করলেই ঠুকরে খেতে পারো। বাঁধা দেবার কেউ নেই। একটুনি কিছু রস ঠোঁটে করে চুষে নাও, এই রকম এক চিন্তায় বড় বেসামাল নির্মল, আরও মনে হল, এই বর্ষার দিনে তিনবার ওকে ফোন করে প্রায় পীড়াপীড়ি করে কেন ডেকে আনা, সম্ভবত নির্মলকে ওর ভয়ানক দরকার এবং দরকারটা যেন এই রকম: আমার বাগানে অনেক ফল এখন পাকছে, তুমি এই নিরালায় এসে একা কিছু খেয়ে নাও।

ঘরে ঢুকে পড়ার আগেই নির্মল ওকে দুহাতে বুকের কাছে এনে ঠোঁটের ওপরে ঝুঁকে পড়ল। কিন্তু কোনও রকম বাধা না দেয়ে, শুধু একটু সরে যাবার সামান্য চেষ্টা করে, শরীর আরও নরম ভঙ্গিতে এলিয়ে বনশ্রী শুধু বলল, এই! ঠাকুর রয়েছে রান্না ঘরে। অর্থাৎ ঠাকুর আছে বলেই এই ব্যাপারটা চলতে পারে না তা না হলে চলতে বাধা নেই, এই রকমই ইচ্ছা বনশ্রীর। আর একটাও জানা গেল, বাড়ির ঠাকুর ছাড়া কেউ নেই বলেই বনশ্রী এমন ব্যাকুল হয়ে ডেকে এনেছে। নির্মল বনশ্রীকে ছেড়ে দিতেই একটু বাধ-ভাঙা করে এবং মুচকি হেসে, আঁচলটা বুক থেকে উঠিয়ে আবার ঠিক করে নিল, এতক্ষণ ডান বুক দেখা যাচ্ছিল, এবারে দুইবুকের ধারুণ শোভা দেখে নির্মলের বুকে হাহু হাহু শুরু হয়ে গেল। হায়। সামনে এমন ফলের সম্ভার, অথচ আমি শুধু দর্শক। বনশ্রী কেমন এক উজ্জ্বল রঙের চওড়া বর্ডার ব্লাউজ পরেছিল, চাঁপা ফুলের মত ওর পেট পিঠের রং কেমন যেন মনে হয়েছিল, ও, ঈশ্বর নুর জাহানের মত, ওর শরীরে অনন্ত ঐশ্বর্য অসাধারণ লাবণ্য। এই শরীরে ঐ সব জামা কাপড় ওকে রাজরানীর মত করে দিয়েছে। মুখের চামড়ায় একটাও দাগ নেই রণ নেই। চোখের কোলে কালি নেই, চোখ এত স্বচ্ছ যে তাতে সামনের সব কিছুর ছায়া পড়ে। একটু ঝুঁকে নির্মল নিজের একটা ছোট্ট আকার ওর চোখের তারায় ভাসতে দেখল। খুব অদ্ভুত মনে হল নির্মলের! নির্মল এখন ওর চোখের তারায়। ও মুচকি হাসছে, 'বসুন, আমি দেখে আসি কিছুর কি করছে।' রান্না ঘরে বনশ্রীর গলা পাওয়া গেল,- কিছুরকে ডিম-টিম দিয়ে কি সব তৈরী করার এক লম্বা ফিরিস্তি বলছে। ঘরের মধ্যে নির্মল একা। বৃষ্টির জন্যে ঘরের মধ্যে চার পাঁচটা ডিঙ্গে শাড়ি আড়া-আড়ি মেলে দেওয়া, পাখাটা ফুল স্পীডে ঘুরছে। মাথার উপর ঝুলন্ত শাড়ির নিচে মাথা নুইয়ে ঘরের একেবারে শেষ প্রান্তে হেঁটে এল নির্মল। এখন ওকে দরজা থেকে দেখা যাচ্ছে না। বনশ্রী এসে অবাক হয়ে যাবে, হয়ত এদিক ওদিক তাকিয়ে সহসা নিচু হয়ে দেখতে পাবে, তারপরে কেমন এক খেলার মজায় পেয়ে বসবে ওকে। বলবে, 'এখানে দাঁড়িয়ে কি করছেন।' তখন নির্মল কি বলবে ঠিক করতে পারছিল না। কারণ, তখন অনেক কথা মেয়েদেরই মুখে ঠিক ফুটিয়ে যায়। হোক আজে বাজে তবুও শুনতে খারাপ লাগেনা। কিন্তু নির্মল নিজেকে দিয়ে বুঝতে পারছে, অন্যান্য পুরুষরাও কখনো কখনো তার মতই কেমন এক বিহ্বল প্রস্তরীভূত হয়ে যায়। নির্মল ঘরের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা হলে কথা ছিল না। কিন্তু ওর ভেতরের ঈশ্বর এতক্ষণে শয়তান হয়ে গেছে। কেমন এক দারুণ অকম্প হাত অদৃশ্যভাবে ওর বুক থেকে সরে সরে নিচের দিকে নিমে যাচ্ছে। আসন্ন কি এক মুহূর্তের জন্য পেশীগুলোকে শক্ত করে দিচ্ছে যেন বস্ত্রপাতির সব প্যাঁচ কষে, পেরেক লাগিয়ে পুরোপুরি কিছু বানিয়ে তুলছে। অন্ধকার ঘরটার এক কোনে দাঁড়িয়ে প্রায় কাঁপতে কাঁপতে 'হায় ঈশ্বর হায় ঈশ্বর' মনে মনে উচ্চারণ করেও পুরোপুরি শয়তানের কবলে চলে এল নির্মল। সেই একবার এক বুড়ো মাস্টার মশাই সকালের পীড়ায় কাতর হয়ে কেমন বাঁশপাতার মতো কাঁপছিল। কাপড় চোপড় নষ্ট হয়ে যাবার অবস্থা, ওদিকে আর একজন মনের সুখে দরজা বন্ধ করে সম্ভবত সিগারেট ফুঁকছে আর সকালের ক্রিয়া সারছে। বুড়ো মাস্টার মশাই, 'দুর্গা, লজ্জা বুঝি দিলা, হায় দুর্গা। লজ্জা বুঝি দিলা' বিড়বিড় করছিল, মুখ চোখে খিল এঁটে যাচ্ছিল। নির্মলের এখন সেই বুড়োর কথা মনে পড়ছে, এখন এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত কিন্তু তবুও চলে যাওয়া অসম্ভব। বনশ্রীর ফলের বাগানের পাকা ফলের গন্ধ ঘরে ম-ম, ওর চুলে কোন সুগন্ধি তেল অঙ্গে কোন বিশেষ প্রসাধন এই সব যেন মনের মধ্যে কে জাগিয়ে তুলছিল। নির্মল বুঝতে পারছিল না, কেন ঈশ্বর এখন ওকে এই মুহূর্তে শয়তানের জিম্মায় রেখে সরে পড়ল, আর রান্নাঘরে, বনশ্রীর গলা পাওয়া যাচ্ছিল, যেন শয়-তানের অভ্যর্থনার জন্য ও আমিষ ও নিরামিষ দুই রকমের খাদ্য প্রস্তুতে মন দিয়েছে। নির্মলের মনের মধ্যে চীৎকার উঠল, হায় বনশ্রী, আর তেরী করলে বিপর্যয় ঘটবে, কারিগরটা তলপেট থেকে ক্রমশ নিচের দিকে নিপুন হাতে কলকব্জা ছুড়ছে, বনশ্রী সাবধান, এখন আমি শয়তান কারিগরের আওতায়। কিন্তু বনশ্রীর মনে সম্ভবত কোন ভয় ছিল না। কারণ ওর দিদি নির্মলের বাবা বড়দা সকলের সঙ্গেই মোটামুটি কথা বলে রেখেছে, হয়ত নির্মলের সঙ্গেই ওর বিয়ে হবে। বনশ্রীর মনে এই ভাবনাই ছিল। কিন্তু নির্মলের মনে ছিল, সামান্য চাকরির এই জীবনে এমন একটি মেয়েকে ঘরে আনার পরিণাম ভবিষ্যতে একটি আস্ত মেয়ের ভার বহনের দুঃখ। কাজেই এমন দুঃখকে বেচে জীবনে ডেকে আনার উৎসাহ বোধ করেনি। কিন্তু সরাসরি এটা জানিয়ে দেওয়াতেও ওর বেশ সঙ্কোচ। যা কিছু আলোচনা দিদির সঙ্গে হয়েছে, বাড়ির বড়দের সঙ্গে কোনও কথা হয়নি, অতএব একটা আলোচনা চলছে, যেন কিছু কানে আসছে, কিছু বা আসছে না। ওরা কোন একটা ব্যাপারে এগিয়ে যাচ্ছে, সেটা নির্মলকে নিয়ে, অথচ নির্মলকে স্পষ্টতঃ বলতেও পারছেন না, কিন্তু একদিন হয়ত বলবেনই। বনশ্রীর অবশ্য এ-বিষয়েখোলাখুলি কিছু কথা জানা আছে।

ওদের বাড়ির সকলেরই জানা। এবং সম্ভবত ওর মাসি, কারণ ওর মা কলকাতায় থাকত না, দেলে, হাওড়া না হুগলির কোন গাঁয়ে ওর বাবা জমিদার সেখানে থাকত, এখানে মাসিই ছিল ওর অভি-ভাবিকা, একদিন মাসিকে নিয়েই সিনেমা দেখল নির্মলের সঙ্গে বসে। নির্মল আর মাসির মাঝখানে বসেছিল বনশ্রী এবং আশ্চর্য,দুচারবার কেমন একরকমের মেয়েলি অস্থিরতা, আঁচল টানল, চুল টুল ঠিক ঠাক করার অছিলায় হাত ওঠানো নামানো, আয়েস করে গুছিয়ে বসার জন্য বারবার নড়াচড়া, শরীর সামান্য হালকা করে একটু উঠে আবার বসে বনশ্রী। ওর শরীরের যা পাশ, কোমরের নরম মাংসের কেমন এক মধুর উষ্ণতা, পুরুষ্টু উরুর মাংস সমা ভরাল, নির্মল প্রথমে একটু আড়ষ্ট হয়ে বসে। সহসা কখন এক সময়ে নির্মল অনুভব করল, কোলের ওপরে বনশ্রীর হাত এসে পড়েছে এবং হাতটায় যেন শীতের সকালের রোদ্দুর একটু একটু তাপ, উরুসন্ধি স্পর্শ করছে, হাতটা আনমনা এসে পড়েছে কি না ভাবতে ভাবতে বুঝতে পারল যেন শরীরের একটু ভার রাখল বনশ্রী ওর ওপর। নির্মলের খুব ভাল লাগল, কিন্তু ওদিকে মাসি বসে আছে, একটু আধটু বুঝতে পারছে কি না কে জানে, হয়ত বা মেয়েদের বয়সের প্রাচীর গুলো খুবই স্বচ্ছ বলে পরস্পরের অলক্ষ্য কিছু রাখেনা ওরা। নইলে এই সিনেমা আসাটা, মাসির সঙ্গে আসা, সবই প্রতি-বেশীদের চোখ-ধাঁচামো ব্যাপার। আর একটি ঘটনার কথাও মনে পড়ছে নির্মলের। বনশ্রীদের নিচের তলার ভট্টাচার্যদের সেজ মেয়ের সঙ্গে নির্মলের জেঠতুত দাদার বিয়ের দিনে প্রচুর খাটুনি, রাত্রে প্রায় ঘুমই হয়নি, পরদিন সকালে ঘুমে চোখ ঢুলে আসছে, তখন বনশ্রীর মাসি নেমে এসে নির্মলকে অনেক বলে কয়ে উপরে একটু ঘুমিয়ে নেবার জন্য নিয়ে গেল। নির্মল গিয়ে দেখল ঘরে শুধু মেয়েরা, বনশ্রীর যুক্তযুক্ত বোন দিদি আর মাসি। একটু হাসি ঠাট্টার পরে মাসি দিদি আর যুক্তযুক্ত বোন চলে গেল চা-টা করার অছিলায় তারপর ঘরে শুধু বনশ্রী। এতক্ষণ বসেছিল বনশ্রী, এবারে হেলানের মত খানিক পা মুচড়ে জোড় বালিশে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল, যেন খেলা ঘরের এক সঙ্গীর দিকে কেমন এক কৌতুকের চোখে তাকাল, ঠোঁটে টিপটিপ হাসি। সেই এক নিমেষ শুদ্ধি যা দেখে মেয়েদের কচি যৌবন চোখে স্পষ্ট হয়। হাত দুটো মাথার পেছনে যেন খোঁপার কিছু তৈরী করছে, ওর শায়িত দেহ যেন এক ধরিত্রী, পাহাড়ের দুই শিখর উঁচায় আলোয় সোনালি, ক্রমশ সমতালে আবার ঢিবি, বুক নাভি তলপেট এবং নিতম্বের চওড়া বিস্তারে চোখ রেখে নির্মল ঢেউ গুণতে গুণতে সমুদ্রের দিকে এক পা এক পা করে অতলের দিকে যেন এগিয়ে যাচ্ছিল, নরম বালির সৈকতভূমি পার হয়ে একেবারে জলের কিনারে, তখন আকাশে আবার সোনার চাঁদ, অসংখ্য হীরের তারা ঝেউয়ের মাথায় আলো ফেলছিল, যেন আয়নার রোদ ঠিকরে কারও চোখ ধাঁধানোর এক ছেলেখেলা, নির্মল স্থির দাঁড়িয়ে কাঁপছিল।

হঠাৎ জলের তলায় তিন্ন ঝিনুকে হোঁচট খাওয়ার মত নির্মল শুনতে পেল হাসি ঝলকে ওঠা জলের মত, 'কি হল, বসুন।' কথা নয় যেন বনশ্রীর হাতটাই নির্মলকে টানছিল।

'কতদিন পরে বলোত তোমার সঙ্গে দেখা হল।' নির্মলের পকেটে স্ত্রীপাহার টাকা। কোথাও এক জরুরি কাজে আটটায় পৌঁছতে হবে, এখন সাতটা বেজে পঞ্চাশ। নির্মল হিসেব করে দেখল, ট্যাকসি পেয়ে গেলে এখনও সে পৌঁছতে পারে। কিন্তু এখানে বনশ্রী, মেজদির ফ্ল্যাটে সেই নিরালা বর্ষার দুপুরের বনশ্রী। আশ্চর্য যাদুকরের আঙুলের মত নিমেষে নিমেষে ভেসে উঠছিল একমুখ। ঘরের এক-কোণে এক শিকারীর মত হয়ে ওঠা ওর হাত, চোখ এবং শরীরের ভঙ্গি। ঈশ্বরের সেই কারিগর অথবা ঠিকাদারটি খুব নিপুণ বিন্যাসভাষ শরীরের প্রত্যঙ্গে এক পূর্ণ যৌবন, সম্পূর্ণ পুরুষ গড়ে তুলছে, আর ঠিক তখনই এক মধুর অভিলাষ সারা গায়ে মেখে নম্র খুশির পায়ে, যেন যা এক লুকো পাচরার মতো বনশ্রী এগিয়ে আসছিল। 'একী' কোথায় গেল! তুমি এইখানে দাঁড়িয়ে কি করছেন, এক কোণে চোরের মত!' চোখে কেমন এক প্রশ্ন মেয়েরাই শুধু পারে, এবং তখন ও ছিল কাপড়ের প্রান্ত উঠিয়ে একেবারে নির্মলের বুকের কাছে, নির্মল দেখল, হাত বাড়ালে এক আশ্চর্য পৃথিবী পাওয়া যায়। হল আঙুলে কী এক দারুণ তারনা, দুপাশ কোপে বসা পাখির ডানার দিকে হাত বাড়ানোর মতো।

'ব সু-উ-উ ন'।

কেমন এক টানা কণ্ঠস্বর তুমল নির্মল। কিন্তু বসা নয়। নির্মল ভয়ানক ব্যগ্র দুইবাহু বাড়িয়ে 'বনশ্রী আম্—' নিচের অতল খাদ দেখার সময়ে যেন মাথা ঘুরে গেল, নির্মল বনশ্রীর ওপরে পড়ে গেল, দুই পায়ে উলছে সে, বনশ্রীকে ধরে রাখা যায় না। অবশেষে শয্যায় মিয়ে পড়ল নির্মল। কিন্তু তখন 'না, এই না' বেকায়দায় চাপ পড়া হাত দুটো টেনে এনে বনশ্রী কোমরে খানিক অসুরং করে আরও ফেপিয়ে তুলল নির্মলকে, 'এই ছাঃ! না।' এইসব শব্দ শুনতে শুনতে যখন রাতের মত লেজে ঘন ঘন জাপটা তখনই দৈববাণীর মতো কণ্ঠস্বর, 'এই! না, যদি কিছু হয়েটয়ে যায়?' নির্মল সহসা যেন সমুদ্রে তলিয়ে যাবার সময় আকস্মিকতা মহাপাপ নরকে গমন' গোছের বাণী শুনে ঘরকে পড়ল। নির্মলের মনে হল ঈশ্বর ফিরে আসায় শয়তানটা অবশ্য ঠিকাদারি করতে গেছে। এখন আপাততঃ ঈশ্বর নির্মলের কাছে। শক্তিবে একপাশে সরে গিয়ে নির্মল দেখল, বনশ্রীর খোলা চুলের খোঁপার ওপরে দুখটা ফিরে গুনের সময় জলে ভাসন্ত প্রতিমার মত। কয়েক পলক তাকিয়ে থেকেই কলের সময় মাটিতে পড়া পাখির মত ঝটপটিয়ে উঠে পড়ল বনশ্রী। 'দাঁড়ান, পালাবেন না, চা খাবার নিয়ে আসছি।'

'বৃষ্টি যোধহয় সহজে থামবে না।' বনশ্রীর কণ্ঠস্বরে যাদুকরের আলোটা চমকে উঠল, ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব সে আয়নায় যেন. শয়তানের মত; বৃষ্টির ধারাপাত যেন সমস্ত উপবনের পাতা ঝরার মত, ক্রমে বৃক্ষ লতা

নিস্তব্ধ কুরূপ হয়ে উঠল। স্পষ্ট দেখল নির্মল, আশ্বিন পার হয়ে অঘ্রাণ এবং মাঘ চলে গেল। বনশ্রীদের বাড়ি থেকে ঘনঘন যাতায়াত তাদাদা বন্ধ হল এবং সকালে টেলীফোনে বনশ্রীর কোঁপানো কান্না, 'তাহ'লে আগে কেন বলোনি' ধিক্কার বার

ধ্বনি

গ্রাহকদের চাঁদার হার

বার্ষিক (সডাক) ১৫'০০
ষান্মাসিক (সডাক) ৮'৫০
ত্রৈমাসিক (সডাক) ... ৪'২৫

যে কোন সংখ্যা থেকেই গ্রাহক হওয়া চলে। মনিঅর্ডারে চাঁদা পাঠিয়ে দিলে গ্রাহক করে নেওয়া হয়।

এজেন্সি নিয়মাবলী

১০ কপির কম এজেন্সি দেওয়া হয় না। অবিক্রিত কপি ফেরত নেওয়া হয় না।

এজেন্সি নিতে হলে অগ্রিম ১৫'০০ টাকা জমা রাখতে হবে।

ভি. পি-তে কাগজ পাঠানো হয়।

ভি. পি কোনমতেই ফেরত দেওয়া চলে না।

চিঠিপত্র, টাকাকড়ি, চেক নিচের ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

সার্কুলেসন ম্যানেজার

৬০।২, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

॥ নতুন এজেন্টরা যোগাযোগ করুন ॥

ছাত্রদের জন্য বিশেষ সুযোগ

৪০টি সংখ্যা মাত্র ১৬'০০

আজই এ সুযোগ গ্রহণ করুন

বার তাকে কেমন পাকা শয়তানের মত ঈশ্বরের বাণী উচ্চারণ করল নির্মল—'তোমার মতো আমি ভাবতেই পারিনি।'

ওদিকে কান্নায় ঘর ক্রমশ ভিজে, 'কী ভাবতে পারোনি?'

'অর্থাৎ এই যে, আমরা এত তাড়াতাড়িই ...' নির্মল কেমন তোতলাতে থাকল, 'থাক, থাক, আর বলতে হবেনা, বুঝেছি। আচ্ছা রাখছি' বলে শেষ পর্যন্ত যথেষ্ট ভোতনভাবে ফোন ছেড়ে দিয়েছিল বনশ্রী। তারপরে দীর্ঘকাল পার হয়ে গেল। দীর্ঘ যন্ত্রণাভোগের পরেও সে আর বনশ্রীর কাছে ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর পৌঁছে দিতে পারেনি।

'কি ভাবছেন?' বনশ্রী যেন বৃষ্টি ভেজা বনানী, রাস্তার জলে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছিল। কপালে চুলের উড়ো গুচ্ছে জলের ছাট কেমন চূর্ণচীরার মত। বনশ্রী আবার এমন করে কথা বলবে ভাবতেই পারেনি নির্মল কুণ্ঠাহীন কেমন সহজ গলায় কথা বলছে বনশ্রী। শ্রীসাহ-র সম্রাটের মতো আদেশ, পকেটে পাঁচহাজার টাকা, আটটার সেই নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে যাওয়া, এসব ব্যাপার ক্রমশঃ কেমন অপ্রয়োজনীয় মনে হল নির্মলের। একটা ট্যাকসি ধীরে ধীরে চলছিল, নির্মল সেটার দিকে আঙুল ঘুরিয়ে দিল, যেন এক যাদুকরের নির্দেশে ট্যাকসি ঘুরে এসে দাঁড়াল সামনে। 'বনশ্রী তোমাকে, পৌঁছে দেব, অবশ্য যদি তুমি অনুমতি করো তবেই, এই যু.....' নির্মলের কথা শেষ হবার আগেই বনশ্রীর ঠোঁটে এক অদ্ভুত হাসি, 'আমরা মেয়েরা এক আশ্চর্য সৃষ্টি, আমাদের সবকিছু সইতে হয়। আর তুমি.....।'

'এসো ওঠো।' নির্মল দরজা খুলে ধরল, আর ঠিক নববধূর মতো নিঃশব্দ লজ্জায় রাস্তা হতে হতে ট্যাকসিতে উঠে বসল বনশ্রী। ঝপাং করে ট্যাকসির পাল্লা বন্ধ করে নির্মল যখন বসল, তখন সেই শ্রীসাহ্ সম্রাটটার টাকার কিয়দংশে শয়তানের বিধানে নির্মলের কাছে অন্যরকম মনে হল। শ্রী সাহ্ সপ্তাহে অন্ততঃ দুবার পাঁচ হাজার টাকাকে সাত হাজার করার খেলায় নামেন। বছরে অন্ততঃ বাহান্ন গুণে একশ চারবারে দু লক্ষ আট হাজার টাকা নীট লাভ করে তোলেন। আর তার অধিকাংশ টাকাই নির্মলকে বহন করে পৌঁছে দিতে হয়। এই ঘটনা বারে বারে ঘটবে, যতদিন নির্মলের চাকরি ততদিন। কিন্তু এখন এই বনশ্রীর সঙ্গে কিয়ৎকাল, এক ট্যাকসির অভ্যন্তরে, বাইরে বৃষ্টি পড়ুন, অজস্র হরিণের খুরের শব্দ এ মুহূর্তে বারে বারে আসবে না।

'এখন শ্রী সাহ্, তোমার টাকা, ব্যবসা ইত্যাদির গোলামীতে খুব নিক্ষেপ করে আমি শ্রীশ্রী সম্রাট, বনশ্রীর সহ রথারোহণে ভূপরাম চলেছি। কল্য তোমার সঙ্গে মোকাবিলা করা যাবে।'

আর কোন দৈববাণী শুনতে পেলনা নির্মল। শুধু স্থির ট্যাকসির পাসিতে চোখ বনশ্রী সম্ভবতঃ কিছু ভাবছে এই রকম মনে হল নির্মলের। আহা, এমন শান্ত সুন্দর একটি মেয়েকে সে যথেষ্ট দুঃখ দিয়েছে এবং নির্মল এই মুহূর্তে আবিষ্কার করল যে মেয়েদের ভাবনাগুলো সম্পূর্ণই ভিন্ন, কিছু আশ্রয় করার অভিলাষে লতার মত সুখে ওরা হাত বাড়ায়, জড়িয়ে ধরে সুখী হতে চায়, কিন্তু পুরুষ চায় শুধু কিছু সুখ খুঁজতে। এখানে ওখানে কুড়িয়ে নিতে এবং সে সুখ নানারকম হলেই ভালো।

'যাঃ ঈশ্বরটা মহা ফেরেববাজ।' এখন এই মুহূর্তেও মনে হচ্ছে, বনশ্রীকে এই বাদলার সন্ধ্যায় কোন এক নিরালা ঘরে নিয়ে খুঁজতো সুখের জন্য ব্যবহার করে ছেড়ে দেয়। পাশে বসা বনশ্রীর শরীর থেকে একটা চমৎকার সুগন্ধ ভাসছে, সেই মাঘের সকালের রোদের মত ওষ্ম ওর শরীরে। একটু নড়ে চড়ে বসল নির্মল, হাত বাড়িয়ে বনশ্রীর নরম বুক ছুঁয়ে ট্যাকসির পাসিটা বন্ধ করল। আর তৎক্ষণাৎ ঈশ্বরটা সরে পড়ল, এবং শয়তানটা ঠিকাদারি নিয়ে নিল। নিপুণভাবে সে নির্মলের শরীরের কলকব্জার অদৃশ্য হাত চালিয়ে তৈরী করতে লাগল একটি পূর্ণাঙ্গ পুরুষ, তাঁর দোসরকে। নির্মল দেখল ঈশ্বরটা ধারে কাছে কোথাও নেই। শয়তানের চার হাত তখন ঈশ্বরের ঠিকাদারি কাজে ব্যস্ত, শ্রী শাহ্র টাকা, মৃগয়ার জন্য প্রস্তুত নির্মল, বনশ্রী এবং চাকরি প্রভৃতি নিয়ে নানারকম মতলবের ধাবা চালছে নিপুণভাবে।

অজয় বসু

হোঁচট খেলেই ডাহা ফেল

চোখে দেখা এবং চুটিয়ে খলাখলি করা। কাজ তো এই। কি সামান্য এবং কি সহজ! কিন্তু হোঁচট খেলে চলবে না। হোঁচট খেলেই, শ্রোতারা বলবেন, হুহো!

তবে হোঁচট খেতে না চাইলেই কি রেহাই মেলে? ধরুন, মাঝ মাঠে দৃষ্টি রেখে বেতার ভাষ্যকার বাক্যের ঠাস-বুনানীতে কথার রথটিকে গড়গড়িয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। হঠাৎ মাইকের সামনে সপ্তসুরে বাঁধা নিজের কণ্ঠটিকে বাড়িয়ে দিয়ে রসিক দর্শক হেঁকে উঠলেন 'দেখরে, নয়ন মেলি···' ওঁকে তখন যে পানে পেয়েছে!

নোটিশ ছিল না। তাই চমকের ধাক্কায় ভাষ্যকারের আত্মারাম তখন খাঁচা ছাড়ার উপক্রম। হোঁচট তাঁকে খেতেই হলো। যতো চমক, ততোই হোঁচট। পরে তিনি কি ভাবে সিচুয়েশন ম্যানেজ করলেন তা পরের কথা। সমগমে গলার কানের পর্দা ফাটানো চীৎকারে তো তাঁকে তখনকার মতো তবকে যেতেই হলো।

অথবা ধরা যাক, ডাকসাইটে এক দলের বাঘা বাঘা সমর্থকদের কথা। সমর্থিত দল সেদিন মাঠের খেলায় হালে পানি পাচ্ছে না। যতো সময় যাচ্ছে রেফারীর প্রতি সমর্থকদের আক্রোশও তাই ততোই বাড়ছে। কিন্তু রেফারী তো দূরের মানুষ। গ্যালারি থেকে ছোঁড়া চোখা চোখা বানগুলি তাঁর গায়ে বেঁধে না। যাঁদের গায়ে ফুল ফোটানো যেতে পারে তাঁরা তো নাগালেই রয়েছেন। অতএব সমর্থক গোষ্ঠী এবার তরঙ্গিম বদলালেন। লক্ষ্য পলিটে মুখ ঘুরিয়ে রেফারীকে ছেড়ে বেচারী ভাষ্যকারকেই তেড়ে ধরে আক্রমণ শানালেন 'কি মশাই বলুন না, রেফারী যে পুকুর চুরি করছে।'

ভাষ্যকার এর জন্যে তৈরী ছিলেন না।

হঠাৎ বাঘনা। জনে হোঁচট খেতেই হলো। আর সে বাঘনা যদি শেষ পর্যন্ত জাঁহাবাজ হুকুমে পরিণত হয় তাহলে তো কথাই নেই—মাইক ছেড়ে সিটটান দিতেই ভাষ্যকারের মনটা তখন আনচান করে।

দূর থেকে যাঁরা কলকাতার খেলার মাঠের কথকদের দেখে তাকেন, ওঁদের কাজটা কি মজার! তাঁরা কিন্তু সমস্ত মজার সন্ধান পান না। পেলে হয়তো দারুণটি সাজোধন করে তাঁরাই বলতেন, কাজ কি বাপু দাব করে কমেন্ট্রেটার সাজা! কমেন্ট্রেটার সাজা তো এক ধরনের সাজা!

তবু এই সাজের চোখ ধাঁধানো খোলসটি গায়ে চড়াতে অনেকেরই কি অসীম আগ্রহ! কপালে দুঃখ আছে জেনেও বেতার-বক্সের আসন জুড়ে বসার উৎসাহে কামাই নেই মিথ্যে বলবো না, একদিন এই আগ্রহ, উৎসাহ আমাতেও ছিল। কিন্তু এক যুগের অভিজ্ঞতা স্মরণে রেখে আজ নিজের মনকেই প্রশ্ন করতে চাইছি যে, সেদিনের উৎসাহ ও আগ্রহ কি আজও তেমনি অটুট রয়েছে? হয়তো। তা থাকতো যদি সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার আশীর্বাদে কলকাতার ভাষ্যকারদের ভাঙা কপালে জোড়া লাগাতে পারতো। কিন্তু তা বুঝি হবার নয়।

কিন্তু থাক সে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ

খেলা ঘিরে বেতারে যাঁরা কথা বলে থাকেন, কথায় কথায় জাল বুনে সেই জালে বেঁধে যাঁরা দূরের ক্রীড়ানুরাগীদের মাঠের মধ্যে টেনে আনেন, তাঁদের কিন্তু এক বিশেষ ভূমিকা আছে। নিজেরা না খেলে তাঁরা অনেককে খেলান। কাউকে আনন্দ যোগান। আবার কাউকে নিরানন্দের অন্ধকারে ডুবিয়ে ছাড়েন।

কি বিচিত্র কাজের দায়িত্ব তাঁদের! চোখের সামনে ফুটে উঠছে যে ছবি, মুখের কথায় তার কাঠামোটি ধরে রাখা, আরও ফুটিয়ে তোলা। কাজ সাধারণিতেই। কিন্তু সেই কাজ ব্যাপ্তিতে ততোখানি! হাজার কান খাড়া রয়েছে। পান থেকে চুন খসলে চলবে না। বলায়, বলায়, লক্ষ চয়নে চুকচাকান হয়েই থাক না কেন, কোনো ভাষ্যকারের পক্ষেই বাস্তব থেকে দূরে সরে দাঁড়ানো চলে না। নিজের সত্তাকে ভুলতে হবে, নিজের মত জানাবার স্বাধীনতাকে করতে হবে অস্বীকার। তবেই তাঁর দায়িত্ব পালনে নিষ্ঠার পরিচয় মিলবে।

বাস্তব ঘটনার মাঠে খেলোয়াড়, ভাষ্যকার নির্দিষ্টের ভাষ্য মাইকের কার্যাবলী ও মূল ভূমিকার যথাযথ বর্ণনা দিয়েই তিনি খালাস। মৌলিক কিছু অবদানের জন্যে তাঁর তত একটা ডাক পড়ে না!

কিন্তু একেবারেই কি পড়ে না।

যখন চোখের সামনের ছবিটি স্তব্ধ, মূক, ঘটনা ঘটছে না, এক খা থেকে আর এক পায়ে বলের হাওয়া আসা থেমেছে, যখন রেফারীর বিদায়ের বাঁশীর সঙ্গে সঙ্গেই কিছু খেমে পড়ার পালা অথবা অতিরিক্ত দুইটিতে ক্রিকেটের আসরে যখন আমন্ত্রণ ওভার ভাঙ্গের ফের, তখন কিন্তু ভাষ্যকারকে কিছু নিজের কথা ভাষ্যকারকে কিছু নিজের কথা শুনিয়ে পরীক্ষায় পাস মার্ক আদায় করতে হয়। সেই পরীক্ষায় পাস করে কেউ যদি ফোঁস্ট আস তাহলেও তাঁরা ফেল। ঘটনাবহিত মুহূর্তগুলিই ভাষ্যকারের হাতে যাচাইয়ের কষ্টি পাথর। তখনই তো শ্রোতৃমণ্ডলীর বিচার বিশ্লেষণ করার অমোঘ অবকাশ।

হোঁচট খাওয়ার অর্থই হলো ভাষ্যকারের পথে অপমৃত্যুকে মেনে নেওয়া। খেলা চলুক বা থেমে থাক, কথায় কামাই পড়লে চলবে না। গড়গড় করে বলে যেতে হবে। বর্ষার জলধারার মতো অবিরল করে পড়তে হবে ভাষ্যকে তবেই কমেন্ট্রারি হবে সার্থক। কমেন্ট্রারির সঙ্গে জলধারার সম্পর্ক নিবিড়। তাই বোধ হয় বাংলায় কমেন্ট্রারিকে বলা হয়, ধারাবিবরণী।

মাঠে যখন তাঁরা ক্রিকেট খেলতে শুরু করেন, ঘটনার ডিটেকটিভ চৌকস থেকেছে, তখন কোন কথায় কথা সাজিয়ে সাজানো কথার মালা শ্রোতাদের উপহার দেওয়া যায়, তা এক সমস্যা বটে। তবে দুরতিক্রম্য নয়।

সেই সমস্যাসঙ্কুল পরিস্থিতি উত্তরণের প্রস্তাবটি আজ ভাস্কর-কারদের কাছে খুবই চেনা! তাঁদের কেউ তখন মুখুর্যু ফোরকার্ডটি পড়ে শোনান বা দিনের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন তাঁরা, দু দলের সেই খেলোয়াড়দের নাম টুকতে থাকেন। একই নাম বা একই ফোরকার্ড সামনে পেয়ে হয়তো শ্রোতাদের বিরক্তি বাড়ে। কিন্তু ফোরকার্ড বা নাম তালিকার গড়েপ্রসমন উচ্চারণের সূত্রে ভাস্কর তো অনেকখানি সময় চিহ্নিয়ে নিতে পারেন।

ফোরকার্ডের শুরুতে সংখ্যাতত্ত্ব বা সকলের পরিচিত খেলোয়াড়দের পুরানো নামের মোহ তাঁদের নেই তাঁরা তখন খেলার মুডিনাটির মধ্যে ঢুকে পড়েন, মানের মূল্যায়নে নিজেদের উপলব্ধির কথা তোপান শ্রোতৃমণ্ডলীকে। এক পলকে দৃষ্টি মেলে নেন পরিপার্শ্বের দিকে, আবহাওয়া কেমন, অনুষ্ঠানকেন্দ্রের আকৃতিটা বা কি, ভীড় কেমন হয়েছে। অথবা স্মৃতি মন্থনে পুরানো কথা পাড়েন, দৈবাৎ মেজাজ থাকলে ভাস্কর যোগ করেও ফুতে দেন। পারস্পরিক আলোচনার কেন্দ্রটিকে করতে পারেন প্রসারিত। সময় কাটাবার নানান পথ আছে এবং সেই সব চেনা সড়কে পা ফেলতে পারলে হোঁচট খাবার আশঙ্কাও নেই তবে শ্রোতৃমণ্ডলীর বিরক্তি উৎপাদনের আশঙ্কা যে একেবারে নেই, তা নয়। এটি নির্ভর করে কথকের ওপর। তাঁর মুন্সীয়ানার তাঁর পরিবেশন রীতিতে।

কিন্তু তবু কলকাতার কথকদের হোঁচট খেতে হয়। কথা বলার পুঁজি ফুরিয়ে না গেলেও, ব্যবস্থাপনার দৈন্যই তাঁদের পুঁজিতে হ্যাঁচকা টান দিয়ে বসে।

ভারতবর্ষের ছোট, বড় আরো কটি শহরের আয়োজনের সঙ্গে কলকাতার অবস্থা মিলিয়ে দেখলেই এই ব্যবধান ধরা পড়বে। অন্তত বেতার-বাক্স গ্যালারি থেকে দূরে হলেও বিচ্ছিন্ন, মাঠের কোলাহল থেকে মুক্ত। কিন্তু কলকাতার মুডিনাল-ব্রকি মাঠের বেতার সাক্ষাৎ কলোলিত দর্শককুলের একেবারেই না-নাগোড়। মাঠের পাটাতন আর দর্শকদের লাইনের মাঝখানে চার ইঞ্চিও ফাঁক আছে কি নেই!

মাঠে মাঠে ঘাওড়ি প্রাণশক্তি উজাড় করে দিতেই মুডিনাল-ক্রাউড গ্যালারিতে ভীড় জমান। খেলার সব মুডিনাটি স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করার অভ্যাসও তাঁদের স্বতঃস্ফূর্ত। তাই উত্তেজনার টানে তাঁরা যদি গ্যালারির পাটাতন ছেড়ে বসবার বেঞ্চির ওপর দাঁড়িয়েই ওঠেন, তাহলেও তাঁদের দোষ দিই কি করে!

কিন্তু ওরা স্টাণ্ড আপ অন দি বেঞ্চ হলেই যে ভাস্কারদের অঙ্ক সাজতে হয় সে কথাটি অনুধাবন করে কে দেখেন? মানুষের শরীর তো আর কাঁচে বা যন্ত্র তন্ত্রতে তৈরী নয় যে সেই শরীর নিরীহ দৃষ্টি দিয়েই চিরে ফালাফালা করা সম্ভব। তবু ভাস্কারদের ধমকে পড়া বা হোঁচট খাওয়া চলে না! হোঁচট খেলেই শ্রোতারা এবং বেতার কর্তৃপক্ষও খোঁচকর খিলখিলিয়ে হেসে উঠবেন।

ছোটখাটো কাজ করতে এসে গুরো ডাকের বদনাম শুনতে কারই বা ভাল লাগে! কিন্তু ব্যবস্থাপনার সুরোরাণী মাঠে এসে যে কলকাতার কথকদের কপালে হাত বুলিয়ে গেলেন, তার রাস্তাও পরিষ্কার হলো কই! দেখতে দেখতে অভিজ্ঞতা পুরানো হয়ে পড়লো, কিন্তু অবস্থার কি কোনো সুরাহা হলো?

অদূরভবিষ্যতে সে হবে, তারও ইসারা নেই। বেতার-বাক্স ঘড়া এবং গ্যালারি সাজানোর ভার তাঁদের হাতে তাঁদের কাউকে মাইকের সামনে বসতে হয় না। ওঁদের কাউকে যদি জোর করে কথকের আসনে টেনে আনা যেতো তাহলেই বোধকরি তিনি মজাটি মালুম পেতেন। চাই কি, এতোদিনে ব্যবস্থাও বদলে যেতো।

তবে এও বুঝি বাকঃ!

বেতার-বাক্সের খোলা জানালার সামনে দর্শকেরা দাঁড়িয়ে পড়ার পরও যা হয় ভাস্কারেরা মুখের কথার খৈ ফোটাতে পারেন, তাঁর হয়তো ফুরোয় কিন্তু দল সমর্থকেরা যখন নিজেদের মতটিকে ভাস্কারদের উপর চাপিয়ে দিতে চান, চোখ রাঙিয়ে হুমকী তোলেন, এটা বলো, ওটা বলো, নইলে মাইক ছেড়ে যাও, তখন সে সমস্যার বোঝা ভাস্কারদের কাঁধে চেপে পড়ে তা থেকে মুক্তি পাবার উপায় কি!

কি করে ওঁদের বোঝাই যে, যে হলুদ-বরণ কাঁচের চশমা চোখে এঁটে দল-সমর্থকেরা খেলা দেখার নাম নিয়ে দলের পায়ে আত্মসমর্পণ করতে মাঠে আসেন, সেই চশমাটি কিন্তু ভাস্কারদের নাকের ডগায় ঝোলে না। তাই ভাস্কারদের দৃষ্টি স্বচ্ছ। নিরপেক্ষ।

কিন্তু বুঝেও যে জন বোঝেন না, জেনেও তিনি ঘুমোবার ভান করেন, ঘুম ভাঙিয়ে বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাঁকে সোজা পথে টেনে আনা দিবেরও অসাধ্য। ভাস্কার তো কোন্ ছার! আর এই জেগে ঘুমাবার লক্ষণটি কলকাতার সারা মাঠেই সংক্রমণের মতো ছড়িয়ে রয়েছে। দলের প্রতি মোহ ভক্তের আলা দুরালা। অতএব ভাস্কারদের মুক্তির রাস্তাও রুদ্ধ।

তাই মুর্তাপাটা যেনে নিয়েই কলকাতার কথকেরা নিজেদের বিবেকের কাছে সনিষ্ঠ থাকতে চাইছেন। তাতে সর্বসম্মত স্তুতি হয়তো মিলছে না, একযোগে বিচারকদের রায়ও তাঁদের পানে এসে ধরত হোগাচ্ছে না। তবে সান্ত্বনা পাওয়া যাচ্ছে এই ভেবে যে অন্তত নিজের বিবেকের সঙ্গে চুলোচুলি করতে হচ্ছে না। এই সান্ত্বনার মূলাটি যা কম কিসে?

ক্রিকেটের ঘরোয়া আসর ঘিরে এখনও কলকাতায় বেতার বিবরণীর ব্যবস্থা চালু হয়নি। তাই রক্ষে। তাই ক্রিকেট কথকেরা এখনও দল সমর্থকদের আপ্যায়নের মুখোমুখি পড়েন নি। তবে তাঁদের জন্যেও স্বতন্ত্র ধরণের এক পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে।

শীতের দিনে খোলা-মেলা মেজাজে অনেকক্ষণ ইডেনে কাটাবার সংকল্প তাঁরা জানেন তাঁদের সবাই ব্যবস্থাপকদের নির্দেশ মানতে চান না। তাই সঙ্গে থাকে ছোট্ট সেট ট্রানজিসটার। উদ্দেশ্য, চোখ চেয়ে খেলা দেখা এবং কান খাড়া রেখে

কথকতা শোনা ও শুনে শুনে চক্ষু কর্ণের বিবাদ মেটানো। রথ দেখা এবং কলা বেচা, এক সঙ্গেই দুটি কাজ সেরে তোলার মতলব।

ফুটবলের উগ্র দর্শকদের মতো এঁরা বাক্যোদ্ভবাদ্যা নন। নিজের মতটিকে ভাস্কারদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করেন না বটে। পারেনও না। যেহেতু ক্রিকেট মাঠের গ্যালারি আর বেতার—বাক্যের ব্যবধান অনেক। কিন্তু কথকতার ক্ষমা ভুলচুক ঘটে গেলে ক্ষমা নেই। ভুল হলেই চোখের দৃষ্টি আর ট্রানজিসটারের আর্তনাদ তা ধরিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে ভুঁড়ো হাসির হিল্লোল ওঠে, নয়তো সোজার ঠিটকিরি। শুনে ভাস্কারের মনে হয়, ধরণী দ্বিধা হও!

লজ্জা পাই। তবুও ক্রিকেট মাঠের এ পরীক্ষাকে স্বাগত জানাতে পেরেপাও হবার কারণ দেখি না। আমরা ভুল বলে যাবো, আর ওঁরা তা ক্ষমার চোখে দেখবেন, এমন কল্পনাও ভিক্ষে করতে চাই না। তাই ট্রানজিসটার হাতে ক্রিকেট মাঠের দর্শকদের অস্তিত্ব ঘিরে ব্যবস্থা-পকদের মাথাব্যথা যতই থাক্ না কেন, আমি কিন্তু ওঁদের ভূমিকাকে সুনজরেই দেখি। ওঁরা আছেন সমালোচকের তীক্ষ্ণ মেজাজ উঁচিয়ে তাই আমাদের হুঁশও বাড়ছে। এই সমাজের উষ্ণ নিঃশ্বাস ভাস্কারদের ঘাড়ে যতোই বাতাস বোলাবে ততোই তাঁদের কথকতার মান বাড়বে, দায়িত্বহীনতা কমবে। ভুলচুকের স্বস্তির ঘাক মুখে মিলিয়ে। এক হিসেবে, কোলের ওপর ট্রানজিসটার রেখে যাঁরা মাঝ মাঠে দৃষ্টি ছড়িয়ে রাখেন তাঁরা কিন্তু ওঠার বেতার ভাস্কারদের আরও উপযুক্ত হয়ে সংশিক্ষা দিচ্ছেন প্রেরণাও যোগাচ্ছেন।

কিন্তু ফুটবলের দল—সমর্থকেরা এবং বেতার তরঙ্গে তাঁদের উচ্চারণ ভেসে যেতে পারে এ কথা জেনেও যাঁরা চড়াগলায় অশোভন ও অশ্লীল উক্তি ছুঁড়ে দিচ্ছেন, তা শুনে হয়তো একত্রে ঘটনা পাকানো ভাই-বোন, পিতা-পুত্রের কান লাল হয়ে উঠেছে বা লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছে তাঁরা যে কোন্ মহৎ কর্তব্য সংসাধন করছেন তা ভাববার বিষয়।

একদলের ভূমিকায় কলকাতার খোলার মাঠের আবহাওয়া উঠেছে বিষিয়ে। অমঙ্গলের কাণ্ড কারখানায় সামাজিক মূল্যবোধ বিপন্নবোধ করছে। দুপক্ষের কেউ দুষ্ট, স্বাভাবিক নন। অথচ সেই ঘোর সাবাসার কোন দাওয়াই আজ পর্যন্ত আবিষ্কার করা গেল না। ফলে বেতার ভাস্কারদের ভোগান্তি যেমন বাড়লো তেমনি বাংলাদেশের ক্রীড়ামহল এবং সেই সঙ্গে বৃহত্তর সমাজও ভাঁকিতে পড়ে গেল। সামাজিক দায়িত্ব পালনের নমুনা যে খেলে এই রকম, সেই খেলে অতি নগণ্য বেতার কথকদের ভাবের রকম ফেরাও যে সইতে হবে, তা আর বিচিত্র কি!

আমাদের কলকাতার খোলা ব্যবস্থা-পনার আসলে সত্যিই কিছুই বিচিত্র নয়। মাঠ, কথকের ছোঁচট খাওয়ার নজীরটিও নয়। ভাস্কারদের ছোঁচট খাওয়াতে মাঠে মাঠে অনেকেই কোমর বেঁধে তৈরী হয়ে থাকেন। এবং তাঁরা যে শুধু সাধারণ শ্রেণীর দর্শক, তাও নয়। ওঁদের দলে আসার সময় বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরও ভীড় জমে যায়। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ রেখে আমি আজকের কথা শেষ করছি।

সেদিন রবীন্দ্র সরোবরের স্টেডিয়ামে প্রাক্ অলিম্পিক বাছাই পর্বে ভারত বনাম ইরাকের ফুটবল খেলা।

সাজানো পরিবেশ, ব্যবস্থাপনাও সুষ্ঠু। চাপাচাপি ভীড় জমলেও বিশৃঙ্খলা নেই। প্যাভিলিয়নের দোতলার বারান্দায় ভি আই পিদের আসনের ঝাকঝকানিটিতে, সামনের সারি চেয়ারে বেতার ভাস্কারদের জায়গা হয়েছে। আশেপাশে, পেছনে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি—শিল্পপতি ক্রীড়া কর্ণধার, রাজনীতিক নেতা এবং আরও কতো কে!

খেলা চলছে। সেই সঙ্গে আমাদের বক্তব্যকানিও। হঠাৎ আমাদের কণ্ঠ ডুবিয়ে পেছন থেকে এক বাজখাঁই গলায় কে যেন আমাদের পাশেই বসা এক ভদ্র-লোকের সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিলেন। আচমকা বাজ। পেছন ফিরে তাকিয়েই দেখি, ওই রাজখাঁই কণ্ঠের অধিকারী হলেন এক অতি পরিচিত ও বিশিষ্ট জননায়ক। সেদিন তিনি শুধু এক রাজনীতিক দলের তাপবিধাতা নন, কলকাতার ঢাকঢাইটে ক্রীড়াসংস্থার মাথাও বটে।

রাজনীতির আকাশে সেদিন তাঁর অবস্থান মধ্যাহ্ন সূর্যের মতো ঝলমলে। সবাই তাঁর সামনে যে, যে করতেই ব্যস্ত। খাঁটাবার সাহস কারুর নেই, ক্ষমতা তাঁর বাকি অপরিমেয়।

হঠাৎ হাঁকডাকে ছোঁচট খেয়ে আমি পিছনে পানে তাকিয়েছিলাম চোখে মুখে হয়তো জিজ্ঞাসার প্রশ্ন ফুটে উঠেছিল। মহামান্য জননেতা চলমার ফাঁক দিয়ে আমার মুখের জিজ্ঞাসা যেই পড়ে ফেলেন অমনি তাঁর বিরক্ত বাড়লো ক্ষোভে, রোষে ফেটে পড়তে চেয়েই যেন আলাপের গলা দিলেন আরও চড়িয়ে। ভাবখানা এই রকম আরকি, আমি যেন লোক কথা বলছি, আর কোথাকার কে এক অর্বাচীন কথক কি না ভ্রূকুটি করবে! স্পর্ধা তো কম নয়!

অতএব সেই উচ্চগ্রামে গলাবাজীর আস্ফালন শ্রোতৃমণ্ডলকে যেন বিহ্বলতায় আচ্ছন্ন করতে লাগলো। তারপর তিনি যখন হাঁফিয়ে দম নিতে লাগলেন তখনই শ্রোতাদের মুক্তি তথা আমাদের কথকতা আবার সোচ্চার।

ওই কণ্ঠস্বর ও প্রলাপ কার? অনেক শ্রোতাই তা আমায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন। নামটি বলতে পারিনি। রুচিতে বেধেছিল। আজ আরো বাধছে, যেহেতু রাজনীতিক মানুষ আজ ফুটো হয়ে গেছে। ফুটো মানুষকে আজ ফাঁসে লটকে দেওয়ার কোন বাহাদুরী নেই।

তবু ঘটনাটিকে স্মরণ করলাম এই কারণে যে নিজের পক্ষেই সে আত্মোদ্ভিত সে অন্য ফুলের গুন-ও পক্ষের আস্বাদ পাবে কি করে? শুধু নিজেদের নিয়েই যাঁরা নিজেদের জগতটিকে গড়তে চেয়েছেন তাঁরা কি করে বুঝবেন অন্যের ব্যথা কোথায়? অন্যের গলায় কেন কাঁটা বিঁধলো, বলতে বলতে ভাস্কার ছোঁচট খেলেন কেন, সবাই যদি ধৈর্য দিয়ে তা বুঝতে চাইতেন তাহলে কথকতার পালা কি সহজ, সরলই না হয়ে পড়তো!

কিন্তু তা কি হবার জো আছে।

বন্যা ব্যবহার অভিশাপ তাই না ভুগিয়ে ছাড়বে না। মুক্তির কারণে বেতার কথকদের কপালে দুঃখ কি ছাই আছে!

সোবার্স 'সর্বাধিক গুণান্বিত' শ্রেষ্ঠ নন্

কালাকেতু

গ্যারফিল্ড-সোবার্স কি সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ক্রিকেটার ?

প্রশ্নটি যতই সুলভ কিন্তু বিতর্ক ও স্মৃতি চঞ্চলকর। নিজের পেশার বা নিজের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠরা নিশ্চিত ভাবেই তাদের পরিবেশ ও সময় থেকেই উদ্ভূত, লালিত ও বিকশিত হয়ে থাকেন কাজেই 'সর্বকাল' কথাটি সাবধানে ও বিবেচনা সহকারে ব্যবহার করা দরকার।

উনবিংশ শতাব্দীর ক্রিকেটারদের প্রসঙ্গ উঠলেই সে সময়ের পীচের অবস্থা, খেলার আইন বৈচিত্র্য প্রভৃতি মনে রেখে তবেই একালের খেলোয়াড়দের সঙ্গে তুলনা করা উচিত। ডবলু জি গ্রেস তাঁর জীবনে ৫৪,৮৯৬ রান করেন, গড় ৩৯'৫৫। উইকেট পেয়েছিলেন ২,৮৭৬; গড় ১৭'৯২ রানে প্রায় চল্লিশ বছর খেলেছিলেন। শুধু অসাধারণ ক্রিকেটারই নন তাঁর আমলে (১৮৬৫-১৯০৮)। শুধু ডবলু জি, বললেই ইংল্যাণ্ডের লোক তাকে চিনত। কাউন্টি ক্রিকেটের অর্থনৈতিক বনিয়াদ তিনিই গড়ে তুলেছিলেন। গ্রেসের সময় উইকেট অনাচ্ছাদিত থাকত। পীচের অবস্থা ছিল প্রায় চষা জমির মত। আর ভয়ঙ্কর কাস্ট বোলারেরও অভাব ছিল না। বল কদাচিৎ ওল্ড ব্যবহার করত।

দীর্ঘকাল ধরে যে সব সাফল্য ঘটেছে তার একটির সঙ্গে আর একটির পরিমাপ-কালে আমাদের তুলনাত্মক-বোধ যাতে সঠিক কাজ করে সেই জন্যই গ্রেসের নাম প্রথমে উল্লেখ করলাম। ১৯৮৭ উইসডেনে, স্যার নেভিলকার্ডাস বলেছেন, ব্রাডম্যানের মধ্যাহ্নের দীপ্ত খ্যাতির পর সবচেয়ে খ্যাতিমান হয়েছেন সোবার্স, এমন কি ব্রাডম্যানের থেকেও তিনি বেশি বিখ্যাত কারণ খেলার সর্ব-বিভাগেই তার দক্ষতা এবং সব রকম অবস্থা ও আবহাওয়াতে সোবার্স তার প্রতিভার ক্ষমতা দেখিয়েছেন—দক্ষিণ আফ্রিকা বাদে সব দেশেই টেস্ট খেলায়, ল্যাঙ্কাশায়ার লীগ বা কাউন্টি চ্যাম্পিয়ান-শিপে এবং সেক্সিড পীচে ক্রিকেট। আমরা নিশ্চিতে একমত হয়ে বলতে পারি, সোবার্সের মত এত পরিষ্কার ভাবে আর কোন খেলোয়াড় তার দক্ষতার বৈচিত্র্য প্রমাণ করতে পারেন নি।

স্যারনেভিলের কথাগুলির মধ্যে কোন অত্যুক্তি নেই। কিন্তু লক্ষ্য করেছি; কোন সময় কোন প্রবন্ধেই তিনি সোবার্স সম্পর্কে 'শ্রেষ্ঠ' বিশেষণটি ব্যবহার করেন নি। 'ওপরান' বা 'বেশি বিখ্যাত' ধরণের শব্দই প্রয়োগ করেছেন। একথা ঠিকই, এখন এমন কোন ক্রিকেটার নেই যিনি সোবার্সের অতুলনীয় গুণগুলি অস্বীকার করার জন্য পর্যন্ত দেখতে পারেন, তারা তো দূরের কথা। ৭৬ টেস্টে সোবার্সের এখন রান, ৬৭৭৬; উইকেট ১৯৩; ক্যাচ ১৬ রানে এবং উইকেটে এমন 'ডবল' আর কারুর পক্ষে করা সম্ভব হয়নি।

তিনটি টেস্ট সিরিজে সোবার্স ৩০০-র বেশি রান ও ২৫টি উইকেট নিয়েছেন। কিন্তু মিলার দুবার পেয়েছেন। ১৯৬২-৬৩ অস্ট্রেলীয় মরশুমে সোবার্স ১০০৬ রান ও ৫১ উইকেট পান, যা আর কেউ কখনো পাইনি। পরের বছরও সোবার্স এর পুনরাবৃত্তি করেন। তিনি একটানা পর পর টেস্ট খেলেছেন ৭৪টি।

ব্যাটসম্যান হিসাবে সোবার্সের সাফল্য ধারাবাহিক, ফিল্ডসম্যান হিসাবে চকিত-গতি ও নিরাপদ, যাঁহাতে তিন ভাবে বলও করতে পারেন—নতুন বলে দ্রুত 'সীমার' পুরনো বলে প্রথানুযায়ী স্পিন ও তাড়ু মুচড়ে স্পিন।

তর্ক উঠতে পারে তিনরকম ভাবে বল করে সোবার্স যত উইকেট পেয়েছেন, তার থেকেও বেশি উইকেট পেয়েছেন অনেক বোলার একভাবে বল করেই। সুতরাং সোবার্সের দক্ষতা বাড়িয়ে দেখার কোন দরকার আছে কি? ১৯০৬ মরশুমে 'জর্জ হার্স্ট' ২৫৫০ রান করেন ও ২০৮ উইকেট নেন। সোবার্সের মত হার্স্টও বাঁ হাতে দ্রুত 'সোজারত' (তখন 'ফাস্ট মুইং'-এর এই নামই ছিল) বল করতেন এরা তখন একটি বলেই ৪০০-৫০০ রাণের একটি ইনিংসে খেলা হত। আমার বলতে দ্বিধা হচ্ছে, এক ধরণের বোলার হিসাবে হার্স্টের উপর সোবার্সকে স্থান দেওয়া যায় কি না।

ওয়াসি ব্রাডমণ্ডের নাম মনে পড়ছে। ব্রাডমণ্ড তাঁর হাতে নতুন বল যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গেই ব্যবহার করতেন এবং তাতে বিশেষজ্ঞ হবার চেষ্টা না করেও টেস্টে ৮৩টি উইকেট পেয়েছেন। স্লিপ ফিল্ডসম্যান হিসেবে ব্রাডমণ্ডের মত সতর্ক, করায়ত্ত পটু একমাত্র ববি সিম্পসন ও কলিন কাউড্রে ছাড়া আর কাউকে দেখা যায়নি। ৮৩টি টেস্টে ১১০টি ক্যাচ নিয়েছেন আর রান করেছেন ৭,২৪১; গড় ৫৮'৪৫; সেঞ্চুরী ২২টি।

ব্রাড উলী জীবনে (১৯০৬-১৯৮৮) করেছেন ৫৮,৩৬১ রান, পেয়েছেন ২,০৬৮ উইকেট। টেস্টে ৩,২৮৩ রান ও ৮৩ উইকেট। ১৯২১ ও ১৯২২ মরশুমে উলী শুধু দুই হাজারের বেশি রানই করেন নি যথাক্রমে ১৬৭ ও ১৬০ উইকেটও নিয়েছিলেন। ১৯১২ ওভাল টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে বাঁ হাতের স্পিনে তিনি, প্রথম ইনিংসে ৯'৪-৩-২৯-৫ ও দ্বিতীয়

ইনিংসে ৭৮-১-২০-৫ বোলিং হিসাব দেখিয়েছিলেন। ১৯২১ লর্ডসে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে গ্রিমেট ও ম্যাকডোনাল্ডের মত ভয়ঙ্কর ফাস্ট বোলারের সম্মুখীন হয়ে ১৩ ও ১৩ রান করেন। পাঁচ দিন ব্যাপী ম্যাচ, তৃতীয় দিন লাঞ্চের আগেই খেলাটি শেষ হয়ে যায়।

'সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ক্রিকেটার' খেতাব পাওয়ার ব্যাপারে 'উইলফ্রেড' রোডসের প্রতিদ্বন্দ্বী কজন আছেন? ত্রিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে তিনি তাঁর সর্বাঙ্গীন দক্ষতা (১৮৯৮—১৯৩০) দেখিয়েছেন। অক্টোবরে রোডস এখনো জীবিত, ২৯শে অক্টোবর ৯০-তে পদার্পণ করবেন। রোডসের রান-সংখ্যা ৩১, ৮৩২ ও উইকেট সংখ্যা ৪, ১৮৭। ৩৮ টেস্টে ২, ৩২৫ রান ও ১২৭ উইকেট। যে ভাবেও যে ধারায় তিনি তাঁর ব্যাটিং ও বোলিং নৈপুণ্যকে প্রদায়িত করেন, তা অনন্য। টেস্টে ১১ নম্বর ব্যাটসম্যান ছিলেন। ১৯০৩-এর সিডনী টেস্টে দশম উইকেটে ১৩০ রানের রেকর্ডে অংশ নেন। এ বিশ্ব রেকর্ড আজও অক্ষত। আট বছর পর মেলবোর্ণ টেস্টে প্রথম উইকেটে ৩২৩ রানের পার্টনারশিপেও অংশ নেন। বলা-বাহুল্য শেষেরটি অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে আজও রেকর্ড হয়ে আছে।

অস্ট্রেলিয়ার 'রুবি' নোবল ৪২ টেস্টে ১, ৯৯৭ রান ও ১২১ উইকেট সংগ্রহ করেছেন, উপরন্তু হিসাব নিকাশের জন্য রয়েছে তার অতুলনীয় চিন্তাগর্ভ অধিনায়কত্ব। ৩৩ টেস্টে কিথ মিলারের ২, ৯০৮ রান ও ১৭০ উইকেট + অপ্রতিরোধ্য ব্যক্তিত্ব; রিচি বেনোর ৬০ টেস্টে ২, ২০১ রান ও ২৪৮ উইকেট + অসম্ভিত্ত ধৈর্য, মনে পড়ার অলরাউণ্ডার হিসাবে তাদের দক্ষতাকে। বিল্ল মানকড়ের ৪৪ টেস্টে ২, ১০৯ রান ও ১৬২ উইকেটই বা কম কিসে!

আসলে ক্রিকেটকে গৌরবান্বিত করতে দু-একজন নয়, বেশ কয়েকজন প্রতিভাধর অলরাউণ্ডার আবির্ভূত হয়েছেন। আজকের দিনে রেকর্ড ভাঙা সহজ হয়ে পড়েছে 'টেস্ট' ক্রিকেট এখন প্রচুর খেলা হচ্ছে এবং প্রায়শই এমন দলের মধ্যে যা বিরুদ্ধে যাদের ক্ষমতা দৈনন্দিন কাগজটি পর্যায়ের উপর নয় টেস্ট উইকেটকে প্রকৃতির কাছে উন্মুক্ত রেখে হিত্র ভয়ঙ্কর করে তোলা সর্বত্রই বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে এখনকার ব্যাটসম্যানরা লাফিয়ে বোবল্ড্ যারা বা প্যাচানো স্পিন বলের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন কদাচিৎ হন। "যে বল ঘুরছে তাকে দমানো কঠিন নয়" বলেছেন চার্লস ব্রাই, "প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে বল মাটিতে পড়ে ঘুরবে এমন আশা করতেই হয়। কিন্তু বল যখন আচমকা ঘুরে এমন এক এ্যাঙ্গেল থেকে এমনভাবে লাফিয়ে লাফিয়ে ওঠে যেটা তার লেখে থেকে বোঝার উপায় ছিল না, চুপকিল তখনই শুরু হয়।"

আমার মনে হয়না, সোবার্স তার ১৬।১৭ বছরের খেলোয়াড় জীবনে এমন উইকেটের সম্মুখীন হয়ে কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছেন এজন্য অবশ্যই তিনি পাকা নন। আজকের ক্রিকেটাররা রেকর্ড বই মোটা করার জন্য অজস্র টেস্ট খেলার ও আইন কানুনের ধারা, যত সুযোগ পান বহু উৎকৃষ্ট অল রাউণ্ডার তা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন এখন পরিসংখ্যানগত প্রমাণ দাখিল করে 'শ্রেষ্ঠ' নির্বাচন করা হয়। যা মোটেই হওয়া উচিত নয়।

ব্র্যাডম্যান কি হবস বা বার্নেস কি ফ্রিচার্ডসনের মত একদুখী বিরল প্রতিভা কখনো কখনো সর্বগ্রাসী প্রভুত্ব স্থাপন করে এবং অন্তমুখী হওয়ার প্রয়োজনই বোধ করে না। রবিনসনকে মেডারের মত করে বেহালা বা মেডারকেই হিনটি বিভিন্ন কায়দায় বাজাতে হবে এমন কোন কথা নেই। সোবার্সকে 'শ্রেষ্ঠ' বলায় আমার আপত্তি আছে। বরং 'সর্বাধিক গুণান্বিত' বললেই ঠিক বলা হয়

ওভালে পঞ্চম টেস্ট (১৯৬৬)। ইংল্যাণ্ড বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলার মাঝে অধিনায়ক ব্রায়ান ক্লোজ ও গ্যারি সোবার্স

খেলার স্পিরিট

অরুণ বাগচী

"আপনি কাউন্টি ক্রিকেট খেলেছেন নাকি ?"—আচমকা প্রশ্নটা করে ফেলে আমি বৃদ্ধ সাটনকে রীতিমত চটিয়ে দিয়েছিলাম।

ছয় ইংরেজ চটলেও তো আর ইহুদি-জাদুক বলতে পারে না। তাই প্রসঙ্গটা মাঝের টপাস্থ নামিয়ে তার বহু বহু ঘাইরহা চোখের এক মোক্ষম চাউনি ছুঁড়ল। তারপর খুব ঠাণ্ডা গলায় বললে, "হ্যাঁ, খেলতাম সেই কথাটাই তোমাকে বলছিলাম, যখন তুমি অমন রুক্ষভাবে বাধা দিলে। বলছিলাম যে, আমরা যখন কাউন্টি ক্রিকেট খেলতাম, তখন খেলাটা আসল ছিল, যেন তেন প্রকারেন জেতাটাই নয়। যদিও ঠিক স্পিরিটে খেললে খেলায় হারজিত কেন হবে না, তা বুঝিনে। আগে দু হত কম। হলে বুঝতাম দারুণ প্রতিযোগিতামূলক খেলা হয়েছে। তাই অমন অসম্পূর্ণ ফলাফল। এখন তু মানে হচ্ছে কেউ প্রাণ দিয়ে খেলেনি, পা-বাঁচানো খেলাই খেলেছে। অর্থাৎ একদম জাল্। দর্শকরা কেন পয়সা দিয়ে এই বজ্জাতি দেখতে আসবে ?"

আমি ব্যস্ত হয়ে সম্মতি জানালাম। সাটনকে শান্ত করা প্রয়োজন ছিল। বৃদ্ধের সঙ্গেই জীবনে প্রথম ক্রিকেটতীর্থ লর্ডস মাঠে পা ফেলেছি, সেজন্য কৃতজ্ঞতা। তা ছাড়া আমার রুমমেট। বোর্ডিং হাউসে বাস করে রুমমেটের সঙ্গে বিবাদ করা, বিশেষত বিদেশে, বুদ্ধিমানের কাজ নয়। সাটন লোকটা অবশ্য একটু ছিটিয়াল। তোর পাঁচটায়—লণ্ডনের শীতকালে সেটা মধ্যরাত্রির তুল্য—উঠে টাইপ করতে বসে যেত মাঝে মাঝে। আবার রাত বারটার পর আমার বিছানার পাশে বাতি জ্বলত বলে সে বিলক্ষণ বিরক্তি প্রকাশও করত। একদিন বলেই ফেলেছিল যে রাতে বাতি জ্বালালে ভূতেরা নাকি রাগ করে। "তবে তুমি রাগ কর কেন ? তুমি তো জ্যান্ত-মানুষ !"—বলতে চুপ মেরে গিয়েছিল। চোরবাতে টাইপ করে ও আমায় জাগিয়ে দিতে চাইত, বোধকরি সে-ও ভূতের ভয়ে। হাইহোক, লোকটার মন ভাল ছিল।

ওর কাউন্টি ক্রিকেট খেলাও মোটেই গালগল্প নয়। পুরোনো রেকর্ড বই, মরলাধরা ছোরকার্ডও দেখেছি। রেজিনাল্ড সাটন ছোটখাট অল রাউন্ডার ছিল ব্যাম্পশায়ার দলে। গুটি পঞ্চাশ রান আর গোটা দুই উইকেট অনেকবার বাগিয়েছে। তবে ডিপ-ফিল্ডিংয়ের জন্যই নাকি তার ছিল আসল আদর। সাটনের কথায় "আমি পঞ্চাশ রান তুললেই দলী খেলুড়েরা ক্র্যাপ দিত। কী না, আমি সেঞ্চুরি করলাম। পঞ্চাশ তুলেছি দলের হয়ে। আর বিপক্ষের পঞ্চাশ তো ফিল্ড করে বাঁচাবই।"

১৯৫৬-৫৭ সালে ইংল্যান্ডে সবাই আশা থাকাজিলেন কী ভাবে মাঠে দর্শক টানা যায়। খেলার পর খেলা হয়ে যাচ্ছে, মাঠ ফাঁকা। কাউন্টি টিমগুলোর কোষাধ্যক্ষরা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছেন। সেই প্রসঙ্গেই সাটন সাহেব বলছিলেন যে যাতে খেলা দেখতে কেন দর্শক আসবে।

"তোমাকে বলি শোন," সাটন সাহেব পাইপ ধরাবার চেষ্টা করতে করতে বললেন, "ভাল খেলা হলে ভূতেরা পর্যন্ত দেখতে আসে। সে আমার বয়স তখন কুড়ি, অর্থাৎ সবে রাজা এডোয়ার্ডের মারা গেছেন। আমি দলের রিজার্ভে আছি। হঠাৎ শিকে ছিঁড়ে দু-একটা খেলবার সুযোগ আসে দল খেলতে যাচ্ছে একটা ফ্রেন্ডলি ম্যাচ, আমাদের ম্যানেজার 'বাচ্চা'-ফিল্ডহলের শ্বশুরবাড়ির দেশ ডারবিশায়ারে। বাড়িরের খেলা।

"দিনটা যাচ্ছেতাই। দিন পাঁচেক দমাদম বৃষ্টি হয়ে থেমেছে। কিন্তু আকাশ থমথমে। মাঠে পৌঁছে দেখি গুটি বিশেক প্রাণী ফিল্ডহলকে খুশি করবার জন্যই অমন দিনে হাজির হয়েছে। আর অবস্থাটা বারটা খেলুড়ে। আমার উপর হুকুম হল খেলতে হবে। টসে জিতে প্যাচপেচে মাঠে দল খেলতে গেল।

"অথাত্ত গ্রামা দল কিন্তু মাঠের জন্যই না কি, ভটাভট আমাদের দু-জনকে আউট করে দিল। রান সাকুল্যে চল্লিশও নয়। একদিকে টিঁকে ছিলেন জিম ব্রাউন, আমাদের সে বছরের সেরা খেলোয়াড়। এম-সি-সি দলেও খেলবার চান্স আসত যদিনা হঠাৎ নিউমোনিয়ায় মারা যেতেন তিনি।

আমি নামতেই জিম এগিয়ে এসে আমায় অভয় দিলেন। যাবড়িও না দুটো বল কোনোরকমে ঠেকাও। তারপর আমি আছি।

দুটো কেন। অনেক বলই ঠেকালাম। কিন্তু স্রেফ আন্দাজে আর বরাত জোরে। একটা গাঁইয়া বোলার আমাদের যম করছিল, তার দু'টা বল দু'রকমের যেন। কিন্তু সাবাস জিম্। বাঘের মত খেলে গেলেন। ভাবা যায়না ও মাঠে ও রকম খেলা।

সেঞ্চুরি রান হতে আমরা ছেড়ে দিলাম। বিপক্ষ দল এল ব্যাট করতে। তাদেরও জনা চারেক তাড়াতাড়ি আউট হয়ে যাবার পর আবার খেলা জমে গেল। ব্যাটে বলে দারুণ লড়াই। অবাক হয়ে বার বার ভাবলাম, এই লোকগুলো এত ভাল খেলে, তবে তারবিশায়ার টিমে সুযোগ পায় না কেন ? ফিল্ডহলে এদের গোটা চারেক খেলুড়েকে তাদিয়ে দেয় না কেন।

মাঠের অবস্থা বুঝে উইকেটের কাছাকাছিই ফিল্ড করাজিলেন ক্যাপটেন। এর মধ্যেই হঠাৎ লক্ষ্য করলাম ফাঁকা মাঠ কখন অসংখ্য দর্শকে ভরে গেছে।

আশ্চর্য, এতগুলি লোক কখন কোথা থেকে এল। একটুও টের পাইনি। একা আমি নই। সবাই দেখলাম ব্যাপারটা খয়াল করে কিছু বিস্মিত। তবু, তখন দিনে অতগুলি দর্শক জোটায় খেলুড়েরা আরও উৎসাহ নিয়ে খেলতে লাগল। খেলা আরও জমে গেল।

একটা মজা দেখছিলাম, দর্শকরা ভয়ানক নীরব। বাউন্ডারি সীমানা পেরিয়ে তারা সার সার দাঁড়িয়ে আছে ক্লাবের তাঁবুর উলটো দিকে। হাসিমাখা মুখগুলো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু কথা কেউ বলছেনা হাততালিও দিচ্ছে না। ভাল বল পড়লে বা মার হলে ভদ্রজনেরা মাথার টুপি একটু তুলে হর্ষপ্রকাশ করছেন মাত্র।

এর মধ্যে টুং করে একজন বল খেয়েছেন। বাউন্ডারির দিকে আমি আগ্রাণ দৌড়ুচ্ছি। যদি ক্যাচ ধরতে পারি বা অন্তত বাউন্ডারি বাঁচাতে পারি কিন্তু না, বলটা টুং হয়ে যেতে যেতে বাউন্ডারি পেরুল। এবং, আমার চোখের সামনেই একটা চ্যাঙা ছোকরার শরীরের মধ্যে দিয়ে রেস্ত গলে গেল

আমিও না থেমে দৌড়তে লাগলাম। দর্শকরা পথ করে দিল। বল সংগ্রহ করে মাঠের মধ্যে ফিরে গেলাম। আর কাউকে কিছু না বলে ভাবতে লাগলাম, কাণ্ডটা হল কী!

এরপর খবর সুবিধের নয়। অন্যমনস্ক হয়ে পর পর তিনটে ভলি ক্যাচ মিস্ করলাম। আরও কেলেংকারী বাহাত্তায়। ভাগ্যক্রমে আলো খুব খারাপ হয়ে যাওয়ায় খেলা চট্টাং শেষ হয়ে গেল। আমরা তাঁবুর দিকে পা বাড়ালাম।

কয়েক পা ফিরে একবার মুখে দাঁড়ালাম না ভেবেছি তাই? দর্শকরা যেমন চাচয়ক এসেছিল, তেমনি অকস্মাৎ উধাও হয়ে গেছে। কানে এল ফিনচলে বলছে—এই দিনে এত দর্শক জোটালে কী করে? উত্তরে কে বলল—ওরা আমাদের গাঁয়ের লোক না। কাউকেই তো চিনিনা মনে হল। কোথা থেকে এসেছিল কে জানে।

আমি এক ফিল ঘাড় কাউকে ব্যাপারটা বলিনি। আমার আজও অবাক লাগে ভেবে যে ওখানে আর একটা লোকও সেদিন সঠিক বুঝতে পারেনি কারা খেলা দেখতে এসেছিল। সবাই এত মন দিয়ে খেলছিল বা খেলা দেখছিল যে খেয়ালই করেনি একদঙ্গল ভূত এসে তাদের কী কমপ্লিমেন্টই না দিয়ে গেল! একেই বলে ক্রিকেট খেলা, বুঝলে?

যুদ্ধিত রকেট বা ৬১ মাসে জাত বিশ্ববিখ্যাত, প্রতুত ফুল-ফ্লেজের ব্যাভার বাহ ছিল ২৬নি কর্ত লেভার ৬১ এবার উইম্বলডনের শুরুতেই ৬১ বছর বয়স সম্মুখীন হন। এই বয় বাহ ছিলেন আমেরিকা চার্লস রোজ। বয় লেভারের চেয়ে সাত বছরের ছুনিয়র এই শুরুপটি এবার সিঙ্গলসের শুরুতে ছয়টি ম্যাচের চারটিতে টেনিস বাজাকে হারিয়ে দেন লেভার রোজকে হারান অষ্ট্রেলীয় চ্যাম্পিয়নশিপের সেমিফাইনালে এবং 'ফিলাডেলফিয়া ওপেন'-এ। রোজ বিজয়ী হন মিট সাউথ ওয়েলস, মিউজিল্যাণ্ড ওপেন এবং মিয়ামি ও প্রকল্যাণ্ড (ক্যালিফোর্নিয়া) পেশাদার ট্রুর্নামেন্টে।

রোজে সেদিন ইটালীয় চ্যাম্পিয়নশিপের খেলা। মুষলধারায় বিরাম। খেলার আগে ১। লেভার রোজকে জিজ্ঞাসা করা হয়—বয় লেভার সম্পর্কে কী ভাবছেন? মানুষ এবং খেলোয়াড়রূপে তিনি কেমন? স্টেনিস কোর্টে তিনি বিশেষ শ্রেণীভুক্ত কিন্তু বাইরে তিনি আর দশজনের মত আদর্শবান অষ্ট্রেলিয়ান—দুঘণ্টা কিসোরকে নিয়ে একসঙ্গে বসে বীয়ার খান তবে আমি তাঁকে ভালভাবে জানি গত বছর। বেশ মনে আছে আমি যখন ছুনিয়র ছিলাম তখন থেকে এখন—বিশ্বচ্যাম্পিয়ান হওয়া সত্ত্বেও মানুষের কোন পরিবর্তন হয়নি।"

রোজকে প্রশ্ন: খেলতে খেলতে কখন মনে হয়েছে ৬১ লেভার কা লাগিয়ে খেলছেন না?

উত্তর: তিনি যেমনভাবে খেললেও ওর কাছের জয়ের প্রশ্নই থাকে না, তা তিনি যত বয় খেলোয়াড়ই কোন কারণ বয় লেভারের শটগুলো এত দ্রুত ও মারাত্মক যে বিপক্ষের খেলোয়াড় বিশেষজ্ঞ হয়ে পড়েন। সারা কোর্টে বিচরণ করেন। ফোরহ্যাণ্ড ও ব্যাকহ্যাণ্ড—দুটোতেই তিনি প্রতিপক্ষের কাছে ভয়ঙ্কর। বেশির ভাগ খেলোয়াড়ের কি হয়—যদি ফোরহ্যাণ্ডে ভাল হন তবে তো ব্যাকহ্যাণ্ডকে আক্রমণ করা যায়। কিন্তু লেভারের এমন কোন দুর্বল নেই যেখানে তাঁর দুর্বলতা আছে।

হিপিদের মত লম্বা চুলওলা দক্ষিণ আফ্রিকার যে যুবককে জিজ্ঞাসা করা হয়। বয় লেভার-রোজের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে তাঁর

রকেট লক্ষ্যে পৌঁছেছে

চিরঞ্জীব

রকেটকে ভয়ঙ্কর মেরে খেলুন, সেও সজোরে ফেরৎ পাঠাবে—এই-ই যেন ওর পছন্দ। টেনির সঙ্গে ওর যেন ভয়ে। রকেট মেটে ওলে টেনি আস্তে টপ মারে ওর কোয়ার্টার্ডলিতে। হ্যাঁ, এই মার রকেট কিন্তু খুব বেশী আশা করে না। ওর পছন্দসই নয়। সম্পূর্ণ খোলোয়াড়ের প্রতিমূর্তি লিউ হোড। টেনিসে এমন কিছু নেই, যার দক্ষতা লিউয়ের নেই। ওর একমাত্র দুর্বলতা একটু অলস প্রকৃতির।"

লেভার সম্পর্কে টেনিসের মার্কিন রাইটার বলেছেন, "মানুষ ও খেলোয়াড় লেভারে অনেক পার্থক্য; বিশেষত: কোর্টে তাঁর স্পীড। তিনি কখনও এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকেন না, সব সময় দেখবেন এদিক ওদিক ঘুরছেন আর ঘুরছেন। মনে হবে না এই সেই ব্যক্তি যিনি বিশ্বচ্যাম্পিয়ন। ওঁর সম্পর্কে কেউ আশা করেন হাতভাবে তা পারেন না, যেমনটি আশে পাশে গজালেস বা লিউ হোডের মতো, কোর্টের বাইরে লেভারকে ভীষণ লাজুক লাজুক মনে হয়, মনে হয় রকেট ক্লান্ত, শ্রান্ত। টেনিসের বুধ বা অনুরূপ কোথাও তাঁর কিছুটা পরিবর্তিত রূপ দেখা যায়। কোর্টে লেভার মারমুখী, ভয়ঙ্কর। সবচেয়ে আকৃষ্ট করে তাঁর ক্ষিপ্র গতি। আমি উইম্বলডন ও লস এঞ্জেলসে তাঁর সঙ্গে খেলেছি এবং নিশ্চয়ত সেটা ছিল আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ খেলা। প্রত্যেকটি গেমে আমাকে রীতিমত সংগ্রাম করতে হয়েছে তাঁর স্পীডের জন্যই। ছুটে ছুটে তিনি অভাবনীয় সট মেরেছেন। লেভারের এমন স্পীড যে তিনি যে কোন খেলোয়াড়কে নাস্তানাবুদ করে দেন ও এই স্পীডেই সকলকে সহজে খেলেন। রোজওয়েলকে হারাতে আরও দ্রুত খেলতে হবে। স্পীডই তাঁকে বিপদ থেকে মুক্ত করে দেয়।

আমি প্রায়ই তনতাম তিনি সবচেয়ে ভয়াবহ, যখন তিনি কোর্টে পরাজয়ের সম্মুখীন হন। পরে দেখি একথা সর্বৈব সত্য। লেভারের সঙ্গে খেলে এই অভিজ্ঞতা হয়েছে একজন খেলোয়াড় কীভাবে একই রকম শক্তির সামঞ্জস্য রাখতে পারেন। এই জন্যই তিনি সবার উপরে। তিনি সব কিছুর সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। সত্যিই বিস্ময়কর লেভারের নির্ভুল হিটগুলো। টেনিস কোর্টে অনেক ভাল ভাল খেলোয়াড় আছেন। তবে এ ধরণের অদ্ভুত প্রতিভাবান আমার চোখে পড়েনি।

লেভারের মুকুট ছিনিয়ে নেবার তিনজন দাবিদার আছেন বলে আমি মনে করি। তাঁরা জন নিউকম্বে, রোজ 'ফ্লাইং ডাচম্যান' টম ওকার এবং গালে আর্থার অ্যাশ।

রোজ, নিউকম্বে ও ওকার ফাস্ট ও স্লো উভয় কোর্টে নিজেদের কৃতিত্বের প্রমাণ দিয়েছেন। রোজ ইটালীয় চ্যাম্পিয়নশিপে বিজয়ী এবং দুবার ফরাসী চ্যাম্পিয়নশিপে রানার আপ ও উইম্বলডনে রানার আপেরও কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। নিউকম্বে বিজয়ী হয়েছেন উইম্বলডন, যুক্তরাষ্ট্র, ইটালী ও জার্মান চ্যাম্পিয়নশিপে। যুক্তরাষ্ট্র চ্যাম্পিয়নের আগে হন রানার আপ। ওকার ইটালী ও দঃ আফ্রিকা

চ্যাম্পিয়ন এবং যুক্তরাষ্ট্র ও দঃ আফ্রিকার রাণার আপ। অ্যাশ 'ক্লে' কোর্টে এখনও শিক্ষানবীশ। তবুও যুক্তরাষ্ট্র চ্যাম্পিয়ন এবং অষ্ট্রেলিয়ার দুবার রাণার আপ।

কিন্তু আপাততঃ রকেট সবার উপরে। তাঁকে অতিক্রম করতে বা চারাতে গেলে কিংবা লেভারকে হারাবার স্বপ্ন সফল করতে গেলে অনেক পথ অতিক্রম হতে হবে। কেননা লেভার তিনবার অষ্ট্রেলিয়া ও চারবার উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন, দুবার জার্মান চ্যাম্পিয়ন, দুবার যুক্তরাষ্ট্র চ্যাম্পিয়ন, একবার করে ইটালী ও ফ্রান্স চ্যাম্পিয়ন—শেষের অনেকটি ১৯৬২ সালের মধ্যে জিতে নেন। আজ পর্যন্ত এই ধরণের কৃতিত্ব কারুর নেই। ১৯৬৮ সালে ডন বাজ 'গ্রাণ্ড স্লাম' হয়েছিলেন—লেভার এখন শুধু তার সমকক্ষ নন। (সিঙ্গলস বিজয়ী—অষ্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র ও উইম্বলডনে), তাঁরও উপরে। ছয়টি বড় টুর্ণামেন্ট জিতেছেন একই বছরে। বিশ্বে প্রথম ১০ জনের মধ্যে আর কেবলমাত্র কেন রোজওয়েল এবং নিউকম্বের উভয় কোর্টে বড় ম্যাচ জেতার কৃতিত্ব আছে। এই একটি মাত্র কারণও আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় সঙ্গত কারণেই এখনকার টেনিসে রড লেভারের সুবর্ণমুগ। দুবার 'গ্রাণ্ড স্লাম' হওয়ার কৃতিত্ব আর কারও নেই।

তা হলে তিনি কি সর্বকালের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়? বিভিন্ন কালের খেলোয়াড়দের সঙ্গে তুলনামূলক বিচার সম্ভব নয়। তাই চ্যাম্পিয়নশিপসের খতিয়ান দেখলে লেভারের পক্ষে সমর্থন বেশিই হবে। সমসাময়িকদের সকলের সেরা হওয়াকেই শ্রেষ্ঠত্ব বলা হয় বরং দুবার 'গ্রাণ্ড স্লাম' হয়ে লেভার নিঃসন্দেহে সেই শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন। রোজওয়েল হোড এবং রিকার্ডো গঞ্জালেসের সঙ্গে তিনি খেলেন নি। এদের তিনজনের মধ্যে কেবলমাত্র হোড উইম্বলডন বিজয়ী।

লেভার উইম্বলডন জিতেছেন চারবার। উপর্যুপরি পাঁচবার ফাইনালে উঠেছেন। ১৯৬০-র শুরুতে যখন পেশাদার হলেন, তখন ভাবা যায়নি পেশাদারীরাই তাঁকে এত উঁচুতে পৌঁছে দেবে। টাইম মেশিন থাকলে বোজা যেত যুদ্ধের পর দুই উইম্বলডন বিজয়ী অ্যাসক্রামার ও রড লেভারের মধ্যে খেলা হলে কেমন লড়াই হত।

রড লেভার দ্বিতীয়বার 'গ্রাণ্ড স্লাম' হলেন।

অপেশাদার থাকাকালে লেভারের মনে হত তিনি হতখানি না মাথা খাটিয়ে খেলেন, তার চেয়ে বেশি কাজে লাগান হৃদয়কে। তাঁর এই গুণই আজ তাঁকে এতবড় করেছে এবং বড় বড় ম্যাচে তিনি পয়েন্ট ছিনিয়ে নিয়েছেন। এখনও দেখা যায় প্রতিপক্ষের টিপগুলো যখন মাটি লাগোয়া তখনও লেভার সেগুলো হঠাৎ কোন্ যাদুবলে ফেরৎ পাঠিয়ে দিচ্ছেন। এ সব দেখে ভাবি, মানুষের পক্ষে এও কী সম্ভব?

সংকটের সময় প্রত্যেক চ্যাম্পিয়নই খেলার মোড় ঘুরিয়ে দেন এবং সংকট থেকে মুক্ত হওয়ার এই ধরণের সবচেয়ে জলন্ত দৃষ্টান্ত লেভার ছাড়া আর কারও নেই। বিভিন্ন সময়ে খেলার গতিধারা পরিবর্তন করে বা মোড় ফিরিয়ে দর্শক আকৃষ্ট করার ক্ষমতাও তার প্রবল। রড লেভারের মধ্যে একই ধরণের কোন ক্রীড়াকৌশল দেখতে পাবেন না। এখানেই অন্য খেলোয়াড়ের সঙ্গে তার তফাৎ। রড লেভারকে টেনিস কোর্টে রাখুন (এবং কয়েক বছর আগে যদি স্যার স্ট্যানলি মাথুজকে ফুটবল মাঠে পাওয়ার কথা ভাবুন দুজনই যুবকে শান্ত মানুষ, তারপর উভয়ে যেন হঠাৎ শিল্পী। টেনিসে ও ফুটবলে উভয় খেলোয়াড়ের মধ্যে বেশির ভাগ সময় যা দেখা যায় তা হল ওদের বৃষ্টি। যেমন মাথুজের, তেমনি লেভারের— উভয়ের মধ্যে ক্ষীপ্রতা বিদ্যমান, রয়েছে বৈশিষ্ট্য।

বয়স একত্রিশ। উচ্চতায় ৬ ফুট সাড়ে ৮ ইঞ্চি। লাল মাথা, মুখময় ফুট ফুট দাগ। কিন্তু রকেটের লেফট হোর আরম ওক গাছের মত। যুক্ত টেনিসের প্রথম সিজনে তিনি আবার উইম্বলডন বিজয়ী হয়েছেন। 'তিনি এমনভাবে দুবার শ্বাস প্রশ্বাস নিলেন ও ছাড়লেন' যে রোজ তারপর বলেন, ওই দৃশ্য 'আমরা বিশ্বাস করতেই পারছিলাম না।' ওয়েম্বলির স্মরণীয় খেলায় তখন ফ্রেড স্টোলে ডেসিংরুমে ফিরে আসার মুখে বলেছেন, 'রকেটের, তোমার মস্ত ভাগ্য। দ্বিতীয় সেটে সট মারতে পারোনি।' যুক্ত টেনিসের প্রথম এক বছরে লেভার প্রথম দুটো বড় টুর্ণামেন্টই (অষ্ট্রেলিয়ার ও দঃ আফ্রিকার) জেতেন, কিন্তু তারপরই দুঃসংবাদ আসতে থাকে—কনুই বেশ দিচ্ছে।

নিঃশব্দ নায়ক লেসলি

তপন ঘোষ

সন্ধিৎ পেয়ে; ফিরে আসার তোড়জোড়ে মোচড় দিয়ে ফেলেছি, অনুরোধ পেলাম—কাল বাড়িতে এলে ভাল হয়।

এই ছবি বাক্তিত্বই লেসলি ওয়াল্টার প্রতিভাস।

কলকাতা মর্গকর্তা মহকে প্রতিষ্ঠিত হয়ে দলের মাতামহি প্রবর্দি স্টির নিয়ে মাঠে নামতে দেখেছে। সে চতুরনই মাঠে থেকেছে চতুরনই

শারদীয়া স্বস্তি,

বিপক্ষ ফরোয়ার্ডরা বোধা হয়ে আক্রমণের পথ খুঁজেছে। ক্লডিয়াসের দলের ফরোয়ার্ডরা সব সময়ই ভেবেছে নিরাপদে আছে কারণ ক্লডিয়াস যখন পিছনে তখন ভোক্তা বল পাওয়া আশ্চর্য নয়। খেলা শেষে ক্লাব বাইরে এসেছে দর্শকরা বলাবলি করছে—ক্লডিয়াসের জোড়া খেলা তার।

যখন সময়ে ম্যাকলিয়ড স্ট্রীটের ক্লাবে যেতেই কালকের কয়েকটি সেকেণ্ডের জন্য বাজে পোড়া চেহারা ক্লডিয়াসকে আর পেলাম না। এখন ক্লডিয়াসের দারুণ সহজিয়া ভাব। কথোপকথনে একটু এগোতেই বুঝলাম, কোন মঙ্গল খোলস নেই, কত গভীর প্রশ্ন এখিয়ে দেব ভাবলাম, সব চাপা পড়ল।

প্রথম কথা শুনেই একপশলা বিস্ময় করল—আরম্ভ করেছিলাম ফুটবলারের জার্সি পরে শেষে হকি প্লেয়ার।

হেচলিসে খড়গপুরের মাঠে বি, এই, আর টীমের বেটন কাপে টীম তৈরীর জন্য এ'ও'বি' দলের খেলা চলছিল, সেই অতীত মুহূর্তে ক্লডিয়াস ফিরে গেল। এর আগে বি, এন, আরের হাফ ক্লডিয়াস কলকাতায় এসেছিল আই, এফ, এ শীল্ডে খেলতে। তারও আগে স্কুলের মাঠে এক আধবার হকি টীম নিয়ে ট্রুকটাক করেছিল।

আলোচনার গড়গড়ানিতে ছেদ পড়ল। অত্যন্ত ধীরে বলল, ডিকি কারের কথা মনে পড়েতো। উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না করেই বলল—ডিকি আমার মধ্যে কি দেখল জানিনা।

প্র্যাকটিস ম্যাচ সুরু করার আগে অনুরোধ করল—লেগ, দেখতেই পাচ্ছ লাম্বি ডেভিড আসেনি, অতএব এবার পুরতে স্টিক নিয়ে নেমে পড়।

খোঁজাখুঁজিতে স্টিক জোগাড় হল। লেসলি খেলল রক্ষণভাগের মধ্যমণি সেন্টার হাফে। বিপক্ষে যারা খেলেছিল তাদের নাম তাকের ঘর কম ছিলনা। সেই থেকেই ক্লড কারের চোখে পড়েছে, এত ভাল খেলেছে যে কারের হুকুমে রোজকার সেন্টার হাফ লাম্বির পদাবনতি ঘটল ফুল-ব্যাকে।

ভাবলাম, ক্লডিয়াস এবার তার এক যুগের হকি কাহিনীর পাতা উল্টে যাবে। ধারণা ঠিক হলনা, সে ফিরে এল ফুটবলার ক্লডিয়াসের কথায়।

দিনগুলো খড়গপুরে যাওয়ার বহু আগে বিলাসপুরের রেলকলোনীর সবুজ পাতা-ঝাড়ি। অফোরাত্রের ফুটবল পাগলামিতে লেসলি জড়িয়ে পড়েছে। স্কুল টীমে খেলবার দুর্ভূমিও বাদ ছিলনা। কার হাতে ক্ষুরসত আছে, ক্লডিয়াস তা ভালোভাবেই জানতে। সময় পেলে, তাদের নিয়ে বল পেটাপেটি করেছে। দুপুর বেলা বাড়ির আর সবাই বিশ্রাম নিলেও লেসলি পাতা-পাধারাদার বিভিন্ন বাড়ির চাকরদের ডেকে তাদের সঙ্গে লেগে যেত বল পেটাপিটিতে। এইরকম ফুটবল পাগলামিতে বাড়ির লোকেরা অতিষ্ঠ বোধ করেছে। দেখতে দেখতে ক্লডিয়াস এত অপরিহার্য ফুটবলার হয়ে উঠেছে যে বি, এন, আর ফুটবল টীম তাকে টীমে রাখতে বাধ্য হয়েছে। ফুটবল ছাড়াও লেসলি পরিবারের আর এক ঐতিহ্য ব্যাডমিন্টনেও ক্লডিয়াসের হাত এত ভাল ছিল যে, কেশব দত্ত, মনোজ গুহ, সুনীল বোসের মত প্রখ্যাত খেলোয়াড়রাও ওর সঙ্গে খেলতে অনীহা দেখায়নি।

খেলার জগতে দুটি বিপরীত ঢেওকে ভুলেই ক্লডিয়াস আবার হকির বৃত্তে ফিরল—হেচলিস হতে একবছর ওখানে কাটিয়ে খেলা দেখিয়ে চাকরি জুটেছে পোর্ট টীমে। দল পাল্টানোর বড় কারণ, বি, এন, আর এর কার ও ট্যাপসেলকে ছেড়ে ক্লডিয়াসের জন্য জায়গা খালি হওয়া সম্ভব ছিলনা।

পোর্টে খেলার সময় ওলিম্পিক জার্সি পরার সুযোগ এসেছে, সুযোগ পাওয়ার তপ্ত আতিশয্যে ক্লডিয়াস নিজেকে নিখুঁত করে পরিবেশনে চেষ্টা করেছে? সে সময় হকি সমঝদাররা একটা মতের আওতায় ওকে ফেলে বলেছে—এর আগে দুর্গা ছাড়া বোম্বাইয়ের ময়দানে এহেন দক্ষতা কেউ দেখায়নি। আরও বলেছে—সেন্টার হাফ ক্লডিয়াস মাঠে রাজার বিক্রমে চলাফেরা করেছে, বল দেওয়া নেওয়ার খুল-সূক্ষ্ম সব দায়িত্বেই ক্লড নিটোল অভিনেতা। পিছতে গিয়ে রক্ষণ প্রাচীর গড়েছে। প্রয়োজনে বিপক্ষের অঙ্গনে ঢুকে গিয়ে ষষ্ঠ ফরোয়ার্ডের কাজকারবারে ভাঁজি দেয়নি। এই চড়াই, উৎরাই খেলার পদ্ধতিতে ঘিরে গিয়ে ক্লডিয়াস একটি স্মরণীয় গোল করে ফেলেছিল। হু হু করে দুই দলকে পেরিয়ে ক্লডিয়াস আজ যেমনি শিখর ছিতে তাকাল এবং ওই ঘটনার কথা জড়িয়ে বলল। "আমি জর্জ সার্জেন্টকে একটা বল পুল, করলাম, সার্জেন্ট ফেলিক্সে (জেনসন) দেওয়ার মতলব করতেই জেনসন চেঁচিয়ে উঠল, ক্লডিয়াস পিছনে রয়েছে ওকে ঠেল। সে বল ঠেলল অবার্থ ঠিক ওর মাথায়, সময় না দিয়েই লাফ করে স্টিক চালাতেই গোল।"

হেচলিসের প্রথম বেটন অভিজ্ঞতার আগে মাত্র তেরদিনের কসরতে ফুটবলার ক্লডিয়াসের খোলস খসে পড়েছে। হয়ে গেল হকি প্লেয়ার। কলকাতার বেটন কাপে খেলতে এসে দেখে এখানে ছাত্রর টীমে ছাড়ছড়া বড় বেশি। স্টিক ধরে মাঠের মধ্যে প্রত্যেক খেলোয়াড় তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে ছেড়ে কথা বলতে রাজি হবে না। পরার্থে একটুকরো জমিও কেউ তুলে দেবে না—সমস্তই লড়ে নেওয়ার শিক্ষানবিশি।

ওই সংসারের নিয়ে ক্লডিয়াস টীমের সেদিন বোঝা হয়ে ওঠেনি। টীমের অন্যান্য-দের মত স্টিক পায়ে বলে হকির গতির সবটুক উজার করে ক্লডিয়াস খেলেছে, বি, এন, আর দেখার ফাইনালে উঠেছে। কিন্তু ফাইনালে বি, এন, আর পোর্টের কাছে হার মানায় দ্বিতীয় তকমা পাওয়া হয়ে উঠল না। বেটন ফাইনালে চ্যাম্পি-য়নের পদক না পাওয়ার কলঙ্কনাম চারটি ওলিম্পিকের ফুরসতেও ক্লডিয়াস ফেরে ফেলতে পারেনি। প্রতিযোগিতার প্রান্তে চলে পড়ার ঠিক আগে ক্লডিয়াস সাধ পূরিয়েছে '৬৫ ফাইনালে। মোহনবাগানের সঙ্গে ফাইনাল যুদ্ধ বিজয়ী হয়েছে, সোজাসুজি বখরা এখানেও আধাআধি।

হেচলিসের ফাইনালের শেষে ক্লডিয়াস অস্থিরতায় পড়ে, ভাবে ফুটবল না হকি, মোহ ইস্টবেঙ্গল ক্লাবও ক্লডিয়াসকে তাদের দুর্জয় একাদশ দলের লেফট উইং ফরোয়ার্ড হিসাবে টানতে চেয়েছে। দোনামন ভাববেশ কাটিয়ে ক্লডিয়াস ঠিক করেছে—সে হকির গণ্ডিতে নিজেকে বেঁধে রাখবে।

বাইকে তাকিয়ে নিলাম দুটি কথা তিন আলমারির দিকে। ট্রফি কাপ মেডেলের ঝলমলানি। এরই মধ্যে অলিভ পাতার মধ্যে গাঁথা চারটি সোনার মেডেল। বললাম, মেডেলগুলো একবার দেখতে চাই। আরো কি যেন খোঁজ করব ভাবছিলাম, আমার মনের ইপ্সাটি যে ওর মুখ থেকে বেরিয়ে এল আপনি বাইরে নিয়ে যেতেও পারেন, কিন্তু ক্ষতি নেই। একটা খাঁটি নিরাসক্ত ভাব। অ্যান্টওয়ার্পের ওলিম্পিকে পাওয়া সোনার মেডেলের পাশে কাঁচা হলদে রঙ, এখনো হচ্ছে, বাহারের ও ছাপ্পান্নোর দুটি মেডেলই বেশ কালচে তবে লেখেরটি তুলনায় এবং মানকমাক। প্রথম তিনটি আমার হাতে তুলে দিতে ওর চোখে কোন দ্বিধা দেখলাম না, দেখলাম শেষেরটির জন্যে হোক ফোঁপানি।

ছাপ্পান্নো ও ষাটের অ্যান্টওয়ার্পের বৃত্তান্ত দিয়েই ক্রডিয়াস শুরু করল: ওখানে ভাল খেলে টুরেগে স্পিরিট নিয়ে ক্রড কলকাতাতে ফিরেছে। পোর্টটিম কলকাতার হকি লীগও পেল। সব কিছুই ভাল চলেছে। হঠাৎ পড়ল বেটন সেহিজাইনালে। ট্রায়ালের সঙ্গে খেলতে গিয়ে ডান হাতের আঙুলে চোট পেল। একাস্ত উচ্চাশা, ওলিম্পিকে যাওয়ার বুঝি বাধা পড়ে। জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য বাংলা দলে প্রথম নামের মধ্যে ক্রডিয়াসের নাম উঠল না। নাম উঠল অতিরিক্তের দলে। এসময় পরম উপকারে এগিয়ে এলেন পোর্টের কর্নেল ভট্টর। আশ্বাসন। ক্রডিয়াসের আঙুল ভাল করার ভার তিনি নেবের সঙ্গে বললেন—কয়েকদিনেই আঙুল ঠিক হয়ে যাবে। এত করেও কিন্তু ক্রডিয়াসের বরাতের ফাটল এক হবার নয়। বাংলা প্রথম রাউণ্ডে হেরে গেল। তবু ওরই মধ্যে ক্ষীণ আশা ওলিম্পিক টিম ট্রায়ালে ক্রডিয়াস হাওয়ানি পেল। যে করে হোক ভাল খেলতে হবে—এই ছিল ক্রডিয়াসের তখনকার মানসিক অবস্থা। আবার অঙ্গুলি বিড়ম্বনা ফলে তিনটি ট্রায়াল ম্যাচেই বর্মক হয়ে লাইন লাইনের ধারে ঘাস ছিঁড়তে হয়েছে। চতুর্থ ট্রায়াল ম্যাচ—সেলসিকে জানানো হয়—যদি সে ওই চূড়ান্ত ট্রায়ালে না খেলে তবে তাকে টিমে রাখার বিবেচনায় রাখা হবেনা। ক্রডিয়াস পরাজয়ের ডাবাবেগে আঙুলের প্লাস্টার ছিঁড়ে ফেলল। অসহ্য যন্ত্রণা তবু ক্রডিয়াস চুপ করে মন দিয়ে খেলে চলেছে। ট্রেডজনার জানায় ক্রডিয়াস খেলল কিন্তু আঙুল জানান দিচ্ছে, অগত্যা খেলা ছেড়ে বাইরে যেতে সে বাধ্য হল। মোট খেলেছে মাত্র পনের মিনিট। মোটামুটি উঁচুদরের নজুনা ওইটুকু সময়ের অবসরে রাখতে পেরেছে। অথচ পনের মিনিটের উপর ক্রডিয়াস মন বাঁধতে পারেনি। লন্ডন ওলিম্পিকসে যোগদানের তালিকা সম্পন্ন করতে নির্বাচকরা ওই দামি কিছুক্ষণকে দাম দিয়েছে ক্রডিয়াস টিমে জায়গা পেল। যদিও একটি ম্যাচ খেলতে হয়েছিল তবু পরের তিন ওলিম্পিকে বিশ্ব বিজয়ী জাতীয় হকিদলে স্থান পেতে ক্রডিয়াসকে আর কষ্ট করতে হয়নি।

বাহারোর হেলসিঙ্কি ওলিম্পিকে ভারতীয় হকি টিম যে সর্বশেষ গুণসম্পন্ন খেলোয়াড় দল একথা ক্রড মেনে নেয়। হেলসিঙ্কির ভারতীয় হকি-হাফ লাইন ওর কাছে চলচ্ছিত্রের সমীহ পায়। ক্রড—কেলব ও পেরেড্রুসের খেলার ভঙ্গিমা বর্ণনায় নিজেকে গুটিয়ে রেখে বলল—পেরেড্রুস এক মস্ত হাফব্যাক। সে বাওতি করোয়ার্ডের কাজেও কিছু কমতি ছিলনা। তার বল ধরা ও ছেওয়ার কায়দায় হুবহু ব্যাকরণ বর্ণনা চলে যেত। এছাড়া দলের করোয়ার্ড লাইনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত রক্ত সম্পর্কের সহজ যোগাযোগে। আমাদের তিনজনের মাঝে কেলবকে আমি সর্বদাই চোখে চোখে নজর রেখে নকল করার চেষ্টা করতাম। ড্রিবল চ্যাম্প—ড্রিবল আণ্ড পুশ ওর দক্ষতা কতটা নিজের মধ্যে আনতে পারি সেটাই ছিল চেষ্টা।" সিঁড়িয়ে এল, চার বছর এবারে লণ্ডন করোয়ার্ড ব্রিগেডের বর্ণনায়। কিচেললাল, বাবু, রডরিগজ, বলবীর, জেনসেন ও ফার্নান্ডেজ প্রমুখ এই ছটি ধুরন্ধর যখনই পেরেছে বিপক্ষকে তছনছ করেছে।" ক্রডিয়াসের দুঃখ—"হাল আমলে চাবন, চার্লস ভোলা ও রথবীরলালের মত বিপক্ষের আক্রমণকে এঁতোঁত ওঁতোঁত করার মত উইংম্যান নেই বললেই চলে। ওরা বল ধরেই শুনেঃ এদিকে বিপক্ষের অস্তিত্বে মুহূর্মুহু ত্রাস আনতো যাকে ঠেকানো কোন দলেরই পক্ষে সম্ভব ছিলনা।"

এখনো পর্যন্ত যত খোলকীপার দেখেছে, তার ক্লাসিসকে পুরোপুরি খোলকীপার হিসাবে ধরতে ক্রডিয়াস রাজি। জেনে রাখুন দক্ষিনী রাজা গোপালের ঠিক চতুরালি ক্রডিয়াসের কাছে কে. ডি. সিং 'বাবু'র চেয়েও তীক্ষ্ণ মনে হয়।

পরের সম্বন্ধে এত প্রশংসা আঁকার পরে ক্রডিয়াসের মাঠে—ঠিক—বল—শরীর সম্বন্ধে নিজের অনুভূতি বলতে অনুরোধ রাখলে সহজ ভাবে বুঝিয়ে দিল ব্যাপারটা এই। সে খেলাকে মন দিয়ে ভালবেসেছে, খেলা ভালমন্দ বুঝতে চেষ্টা করেছে নানাভাবে, এর সঙ্গে বাড়িতে, অবসর সময়ে হকি-চিন্তায় বহু সময় খরচ করেছে। সে সাধনায় তার পাশে সঙ্গী বলতে কেউ থাকে নি। এই রকম উদ্যমের আগাগোড়া জিনিসটি হল সজাগ মনে ও সতর্ক চোখে যে কোন খেলা দেখে তার উপর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আলো ফেলার দরকার আছে। সেগুলোকে ঠিকে বলে মেপে মেপে ব্যবহার করার নিরালায় নিরলস অভ্যাসও প্রয়োজন। বড় কথা এত আকাশ-পাতাল মন্থনের মাঝে আসল বস্তু, দেহটিকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। তবে হকি খেলোয়াড়রূপে অনেকদিন বাঁচতে হলে 'পুশ' কে আয়ত্ত করতে হবে, যে যত তাড়াতাড়ি ভালবাবে পারে সেই রাজা।

বার বছর ধরে ভারতীয় হকির জার্সি পরার কৃতিত্ব কাহিনীর অন্যতম সেরা অধ্যায় মেলবোর্নকে নিয়ে ক্রডিয়াস বাড়াবাড়ি করতে চাইল না। যতদূর জানি, মেলবোর্নেও অসাধারণ ভাল খেলেছিল। আপন গর্ব আলেখ্য এড়িয়ে এসে ষাট সালের রোম ওলিম্পিকার্স পালা খুলল। প্রথম কথা আমি নিজেকে মনে করি একজন দুর্ভাগা নায়ক' ক্রডিয়াস সেবার ক্যাপ্টেনশিপ পেয়েছিল কিন্তু ভারতীয় দল রোমে কাইস্তাল খেলায় পাকিস্তানের কাছে হেরে গেল। নেমেই খেলার প্রথম দিকে গোল খাওয়ায় ভারতীয় টিম দিশেহারা হয়েছে। পরে সুযোগ পেলেও সদ্ব্যবহার হয়নি। স্বপক্ষ সমর্থনে ক্রডিয়াসের যুক্তি: আমরা কোন মতে বকেয়া গোলের তফাৎটা শোধ করতে পারলে

নিশ্চয়ই ম্যাচ জিতত্তাম। এই রকম খেলায় একবার গোল খেয়ে গোল শোধ করলেই জেতার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

আশ্চর্য, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নিজে কেমন খেলেছে সে কথা একবারও মুখে আনল না। ফুটবলার বলরাম ছিল, ভারতীয় ওই হকির প্রস্থান পর্বের দর্শক। সে বলেছে, ক্রডিয়াস কদিন তার জীবনের সেরা গোল খেলেছে। তার চেষ্টায় এতটুকু খাদ পাওয়া যায়নি কোথাও।

না থাকারই কথা, কারণ ক্রডিয়াসের প্রত্যেকটি খেলাই তার সমর্থন করে ফুল-পাথর টেন্সারামেন্টের এমন কাঠামো ভারতীয় হকি মাঠে কতদিন আদবে না সেটাই কথা। আত্তয়ান ও খেলোয়াড়ের চাল-চলন চট করে বদে নেওয়ার প্রবণতা এত বেশি ছিল যা সব সময় আসে না। ইচ্ছে করে খেলোয়াড়কে বাড়তে দিয়েই ঠিক তেনে আনত আপন বুদ্ধির পরিধিতে। ছুটিয়ে বলকে মৃতবৎ চুপ করিয়ে দেওয়ার ওর জুড়ি মেলা কঠিন। তান দিকে তাকে পাশ কাটানো। সে ছিল সমস্যার সমস্যা।

আলোচনাতে আবার ঝুঁকে পড়ে বলতে লাগল সময় সময় ভাবি হকি খেলা দেশ থেকে উঠে যাবে নাতো, স্কুল কলেজ হকি নিয়ে তেমন হৈ চৈ আর দেখি না। সব চলেছে চলতি চালে। যার জন্যে এতক্ষণ অপেক্ষা। মেক্সিকোর ভবিষ্যৎ বাণী করতে আজ্ঞার অবস্থান বুঝিয়ে দিল 'আমরা হকি নিয়ে সত্যিকারের ঘষা মাজা না করে শুধু অতীত ঐতিহ্যে কাল কাটাচ্ছি। এখন যা বলব তাতে নিরাশ হওয়াই স্বাভাবিক। তবে বছর কুড়ি আগে হলে এই জিজ্ঞাসা নিয়ে আপনিও নিশ্চয়ই আমার কাছে আসতেন না।'

অতঃপর যা ঘটল, তা হল ভারত অষ্ট্রেলিয়ার হাতে (১-২) গোলে হার মানল। দলের সহ-অধিনায়ক গুরুবাস সে ফল হল চোখে চারিদিক কাপসা দেখছে, গোটা টিমটাই প্রয়োজন ছাড়া খেলার এলো-মেলোর পান গেয়েছে। বলতে পারা যায়, এই বদ এশিয়ান গেমসে (৬৮) সোনার মেডেল পাওয়ার পর থেকেই নেমেছে। কারণ গুলো দাঁড়িয়েছে সারি সারি। যথা টিমে আহতের সংখ্যা ছিল অত্যধিক, চাতে কম সময় থেকে এলিমিনেটরের আসরে নামার অযৌক্তিকতা, পায়ে ক্যানভাস জুতোর বদলে স্টাড লাগানো জুতোর ব্যবহার খাপ খাওয়াতে পারেনি, ধর্মের দোহাইয়ে কোন খেলো-য়াড়কে সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়, লাক লাইনের তুচ্ছ ভূমিকা, খেলার সময় অতিরিক্ত 'স্টিক' করার বদ অভ্যাস, 'মার ও দৌড়ও' পদ্ধতির সঙ্গে পেরে না ওঠার দায়, দর্শকদের অনুকম্পা থেকে বঞ্চিত হওয়া, মাত্র এক গোলের এগার ওয়ারে থাকা অবস্থায় রক্ষণভাগের উপর অহেতুক চাপ পরা এবং করোওয়ার্ডরাও যখন তখন ফুলের ঝাঁপে জড়িয়ে পড়ে সব আশাই নির্মূল করেছে।

কারণের ওই পাহাড় থাকা সত্ত্বেও লেসলির কাছে আবার গিয়েছি। সঙ্গত-ভাবে বিক্ষোভের আশা করেছিলাম কিন্তু এক বিবর্ণ চেহারা দেখলাম। যে কটি কথা বলেছে তার লাইনে লাইনে আক্ষেপ সব জড়িয়ে বুঝলাম ভারতীয় টিম হেরে ওর বুকে শেল বিঁধিয়েছে।

ক্রডিয়াস প্রাণ খেলোয়াড়টিকে দেখার ও নানা বিষয় জানার জন্য এর মধ্যে অনেকবার ওরবাড়িতে গিয়েছি। তিলিয়ানি ফুয়েলের শ্রীমতীর আবেদনের পাশে চার সন্তান নিয়ে নিঃসঙ্গতাকে ক্রডিয়াস বারবার বাধা দিচ্ছে, সপ্তাহের ছদিন ব্যাঙ্কমসের কাজে ব্যস্ত থাকে। ছুটির দিনে বাড়িতে লেসলি পাচক, বাদক ও নায়ক। নিজের ছেলেদেরকে হকির প্লেয়ার হিসাবে গড়ে তোলায় ওর নজর আছে। সে তবে যে আগ্রহের স্রোতে মাঝে মধ্যে ভাঁটা পড়ে। এখন পোড়া তুবড়ির খোল হলেও কাউকে হকি জ্ঞান দাতব্য করতে ক্রডিয়াসের অনীহা নেই। হকির আসরে নিজেকে মাখামাখি রাখতে সব সময়েই আগ্রহী। ভারত সরকার বোধ হয় জানে দেশে এমন ভালমানুষ খেলোয়াড় আছে। স্পোর্টস রসিকরাও জানে যে সরকার তার দিকে কোন নজর দেয়নি। সেজন্য লেসলি খুশীতির মোহে ভোগেনা। তাহলেও এত খনিষ্ঠতায় বার বার যে কথাটা ভেসে ওঠে তা হল রোমের পাওয়া কলোর মেডেলটা ক্রডিয়াসের সামনে পড়েই আছে, সে তার প্রত্যেকটি কারুকার্যের খাঁজ মুখস্থ করেছে।

আপনি কি কাজ চান ?

বেকার সমস্যা আজ সমগ্র সমাজ জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলছে। কর্ম-সংস্থানের সমস্যা আজ শুধু সমস্যার মধ্যেই আর সীমাবদ্ধ নেই সেটি আজ একটি জলন্ত জিজ্ঞাসা রূপেই চিহ্নিত।

বেকার সমস্যার হাত থেকে দেশের কয়েক লক্ষ বেকার যুবককে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেওয়ার ক্ষমতা সরকারী উদ্যোগের পক্ষেও সম্ভব কিনা সন্দেহ আছে। তবে 'জনি' এ ব্যাপারে তার সীমিত ক্ষমতার মধ্যে একটি সুযোগ করে দিতে পেরে খুশি। সে সুযোগ হচ্ছে 'জনি'র সাকুলেশন বিভাগে আবেদন করে নিজের কর্মদক্ষতা প্রমাণের সুযোগ গ্রহণ করা। শিক্ষার অবসরেও উপার্জনের এই সুযোগটি স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করা যায়।

আনন্দের কথা এই যে ইতিমধ্যে প্রায় তিনশতাধিক ছাত্রছাত্রী এই সুযোগ গ্রহণ করে বেকার জীবনের হতাশায় ভেঙে পড়া অবস্থা থেকে আজ মেরুদণ্ড সোজা করে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াবার নিরলস প্রচেষ্টায় সফল।

যাঁরা এ সুযোগ গ্রহণ করতে চান তাঁরা নির্দিধায় 'জনি'র সাকুলেশন বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করে সুযোগ সুবিধার বিষয়গুলি জেনে নিয়ে কাজ শুরু করতে পারেন।

বিজ্ঞানের জগতে
নীহার বসুঠাকুর চাকী/হাতের সান

হাত এবং হাতের সম্পর্কে মানুষের কৌতূহলের আর শেষ নেই। এর মধ্যে মানুষ খুঁজে বেড়ায় তার অজানা ভবিষ্যৎ। অবশ্য হাত বা হাতের রেখা বিচারকে বিজ্ঞানীরা এতদিন অবজ্ঞার চোখে দেখতেন, তবে বর্তমানে তাঁদের এ মনোভাব ধীরে ধীরে দূরীভূত হচ্ছে।

বিগত অর্দ্ধ শতাব্দী যাবৎ প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী এবং নৃতত্ত্ববিদগণই হাত এবং হাতের বিভিন্ন রেখার সম্পর্কে যে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন তা যেমন বিস্ময়কর তেমনি যুগান্তকারী। এ সমস্ত গবেষকদের মধ্যে পার্লোটি উলফ, স্টিভেনসন, নোয়েল জাকুইন, কার্ল গুস্তাভ, জুলিয়াস সিলর প্রভৃতির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। এ ব্যাপারে বিশ্ব বিশ্রুত মনোবিজ্ঞানী সি, জি, য়ুং এর অবদানও অস্বীকার্য্য।

দীর্ঘকাল ব্যাপী পরীক্ষা নিরীক্ষার পর প্রমানিত হয়েছে যে হাতের বিভিন্ন রং এবং আকৃতি মানুষের জীবনের অনেক গোপন তথ্য প্রকাশ করে। স্নেহের বিভিন্ন গ্রন্থীর রস নিঃসরন প্রক্রিয়ার হ্রাস বৃদ্ধিও জানা যায় হাত থেকে। কাঠির মত লম্বা আঙ্গুল এবং গোলাকৃতি নখ নির্দেশ করে অস্বাভাবিক রক্ত সঞ্চালন এবং সঞ্চালন এবং ফুসফুসের ব্যাধি।

জার্মানীর প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ক্রেচমার বিভিন্ন প্রকার মানসিক বৃত্তি অনুযায়ী হাতের শ্রেণী-বিভাগ করেছেন এবং এই বিশেষ ক্ষেত্রে তাঁর সুদীর্ঘ গবেষণার ফলাফল সম্পূর্ণ রূপে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

হাতের সঙ্গে মনোজগতের ঘনিষ্ঠতা সম্পর্কে গবেষণার ক্ষেত্রে কার্ল গুস্তাভ কেরোসকে পথিকৃত বলা যায়। তিনি লক্ষ্য করেন যে বিবর্তনের মাধ্যমে নর বানর থেকে আজকের সভ্য মানবের রূপান্তরের ক্ষেত্রে হাত এবং হাতের আঙ্গুলের পরিবর্তন সর্ব্বাধিক উল্লেখযোগ্য। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় বানর জাতির মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত হিংস্র এবং বুদ্ধিহীন তাদের তালুর তুলনায় আঙ্গুলগুলি অত্যন্ত-দীর্ঘ। অথচ এই বানর জাতির মধ্যে যারা সর্বাধিক বুদ্ধিমান, বুদ্ধির জগতে মানুষের পরেই যাদের স্থান, সেই

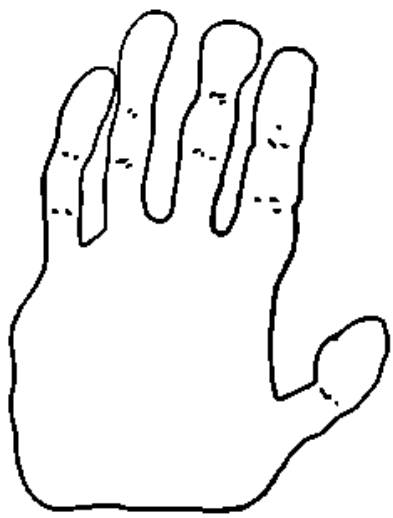

'কাপুচিন' জাতীয় বানরের হাতের তালু এবং আঙ্গুল প্রায় মানুষের মত। এরূপ ক্ষেত্রে হাতের তালু এবং আঙ্গুলের দৈর্ঘ্য প্রায় সমান।

চেতনার রাজ্যে হাতের অবদান সীমাহীন। এ সম্পর্কে রিচার্ড সিল বলেছেন, মনোজগতে ভক্তিং পণ্ডিতে চেতনা সৃষ্টির ক্ষেত্রে হাত হচ্ছে সদা সক্রিয় যন্ত্র। যদিও এক্ষেত্রে চক্ষুর অবদান সর্ব্বাধিক তবুও অন্ধকারে মানুষ যখন কিছু দেখতে পায় না তখন হাত চোখেরও কাজ করে। হাতের স্পর্শ আমাদের চিনিয়ে দেয় অদেখা বস্তুকে। এই জন্যই শিশু শিক্ষার জগতে বিশ্ববিখ্যাতা মাডাম মন্টেসরীও কাঠ নির্মিত অক্ষর স্পর্শ দ্বারা অক্ষর জ্ঞান দান পদ্ধতিও প্রবর্তন করেন।

বিবর্ণ হাত দুঃখ ভারাক্রান্ত মনের লক্ষণ। সেই রূপ সিক্ত হাত যৌবনো-ন্মেষের পথে বাধা প্রাপ্তির কথা ঘোষণা করে এবং চাঁপা হাত ভীতিগ্রস্ত মনের লক্ষণ। অনায়াসেই বলা যায় যে হাত হচ্ছে মনের গোপন অনুভূতি নির্দেশক যন্ত্র।

প্রখ্যাত জার্মান নৃতত্ত্ববিদ ক্রডলফ মার্টিন লক্ষ্য করে দেখেছেন যে মাতৃগর্ভে অবস্থিত নিগ্রো শিশুর তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলীর দৈর্ঘ্য সমকালে জাত এবং মাতৃগর্ভে অবস্থিত ইউরোপীয় শিশুর তর্জনী এবং বৃদ্ধাঙ্গুলী অপেক্ষা ক্ষুদ্র। এজন্য পরিণত বয়স্ক একজন ইউরোপীয়র ঐ দু'টি বিশেষ অঙ্গুলী একজন পরিণত বয়স্ক নিগ্রোর ঐ দু'টি বিশেষ অঙ্গুলী অপেক্ষা বৃহৎ। এই বিভিন্নতা নির্দেশ করে মানসিক বৃত্তির উন্মেষ এবং মানসিক স্থিরতার জগতে উন্নত দেশ জাতদের মধ্যে পার্থক্য।

ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের একটি স্ত্রী-চিকিৎসা কেন্দ্রেও কয়েকশত রোগীনীর কনিষ্ঠাঙ্গুলী পরীক্ষা করে পার্লাটি উলফ দেখেছেন যে এই অঙ্গুলিটির এক বিশেষ আকৃতি জরায়ুর গোপন ব্যাধি নির্দেশ করে। পরবর্তী কালে ডাক্তারী পরীক্ষায় এই সমস্ত ব্যাধির প্রমাণও লক্ষণ পাওয়া গিয়েছে।

ফ্রান্সের বিভিন্ন মানসিক ব্যাধির চিকিৎসা কেন্দ্রে শত শত রোগী পরীক্ষা করে উলফ দেখেছেন যে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এবং ঈষৎ বিকৃত কনিষ্ঠাঙ্গুলী মানসিক অপরিণতি এবং যৌন চেতনার অভাব নির্দেশ করে হাতের। আকৃতি

থেকে মনোবিজ্ঞানীগণ জানতে পারেন মানুষের দেহের বিভিন্ন প্রকার গোপন ব্যাধি এবং সেই সঙ্গে মনের গোপন তত্ত্ব।

একটি বংশোদ্ভূত বিভিন্ন ব্যক্তির হাত পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে তাদের কনিষ্ঠাঙ্গুলী, বিশেষ ভাবে বৃদ্ধাঙ্গুলীর মধ্যে কিছুটা মিল আছে এক্ষেত্রে প্রসঙ্গত নৃবিজ্ঞানী ফ্রডলক মার্টিন এবং ফরাসী মনোবিজ্ঞানী পিয়েরী আব্রাহামের সুদীর্ঘ গবেষনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পরবর্তী অধ্যায়ে বৃহত্তর ক্ষেত্রে গবেষনা চালিয়ে দেখা গিয়েছে যে একটি পিতা মাতা থেকে জাত সন্তানদের হাতের কয়েকটি রেখার সঙ্গে পিতার হাতের কয়েকটি রেখার মিল প্রায়ই দেখা যায়।

এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য এই যে মঙ্গোলীয়ানদের মধ্যে এরূপ মিল এত

বেশী। গোলাকার মুখাবয়ব বিশিষ্ট পীতকায় মানুষদের মঙ্গোলীয় বলা হয়। এরা চীন, জাপান এবং দক্ষিন-পূর্ব এশিয়ার প্রজন্মের চন্দোনেশীয়া প্রভৃতি দেশের অধিবাসী।

পরজগতে চিত্রে গোরিলার আঙ্গীক গঠনের সঙ্গে মানুষের আঙ্গীক গঠন ভঙ্গীমার মিল সর্বাধিক। খুনী এবং দুর্দান্ত প্রকৃতির মানুষের হাতের আঙ্গুলের বিশেষ ভাবে বৃদ্ধাঙ্গুলীর সঙ্গে গোরিলার হাতের আঙ্গুলের আশ্চর্য জনক মিল দেখা যায়। উভয়ের হিংস্র মানসিকতা—এর কারণ।

হাতের বিভিন্ন প্রকার গঠন ভঙ্গীমা এবং রেখা সম্পর্কে বিগত অর্দ্ধ শতাব্দী-ব্যাপী—পাশ্চাত্য দেশ সমূহে যে ব্যাপক গবেষনা—চলছে তাতে শীঘ্রই এমন দিন আসবে যে দিন ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত মানুষের জীবনের অজানা রহস্য সমূহ বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে উজ্জল আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে।

ধ্বনির পাঠক পাঠিকা এবং যে কোন কর্ম প্রার্থী তিন লাইনের মধ্যে কি ধরণের কাজ চান এবং যোগ্যতা জানিয়ে চিঠি দিলে ধ্বনির পাতায় তা বিনা ব্যয়ে প্রকাশের ব্যবস্থা আছে।

যে কোন শিল্পসংস্থা বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানও জানাতে পারেন তাঁরা কোন কাজের জন্য কর্মী চান। এর জন্য তাঁদের কোন ব্যয়ভার বহন করতে হবে না।

মণিপুরী নৃত্য

শ্রীমতী বন্দনা সেন

শ্রীমতী বন্দনা সেন

প্রাচীন সংস্কৃতির লীলাভূমি ভারতের মার্গ নৃত্যের ইতিহাসে মণিপুরী নৃত্য এক উজ্জ্বল গৌরবময় প্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত। ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে পর্বত বেষ্টিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ ক্ষুদ্র মণিপুর রাজ্যে মণিপুরী নৃত্যের সৃষ্টি বিকাশ এবং পরে ভারতের অন্যান্যের অন্যান্য প্রদেশে ও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রচলিত ও প্রচারিত হয়। ভারতের অন্যান্য মার্গ নৃত্যগুলির ন্যায় মণিপুরী নৃত্যও প্রাচীন কিম্বদন্তী পুরাণ ও রূপক কাহিনীর উপর প্রতিষ্ঠিত।

কথিত আছে পার্বতী কোনোও এক সময়ে শ্রীকৃষ্ণ-রাধার 'রাসলীলা' দেখিবার পর শিবের সহিত স্বয়ং এক নৃত্যে অংশ গ্রহণ করিবেন এইরূপ এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া তাঁহারা হিমালয়ের পাদদেশে এই পর্বত বেষ্টিত অঞ্চলটি মনোনীত করেন। নাগদেবতা অনন্ত নাগ এই স্থানটি তাঁহার উজ্জ্বল মণির দ্বারা আলোকিত করেন. এই জন্য এই রাজ্যটির নাম মণিপুর রাজ্য।

মণিপুর রাজ্যের জনগণের মধ্যে প্রবল জাতিকতাবোধ, তাঁহাদের মধ্যে সঙ্গীতের স্বাভাবিক প্রবণতা সৌন্দর্যবোধ, সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা, তাঁহাদের আত্ম-সচেতনতা ও রক্ষণশীলতার জন্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক বিশেষত্ব আনয়ন করিয়াছে। ডাঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে ইহারা মিশ্রিত শ্রেণী জাতীয় মানুষ। তাঁহার মতে তোটচরণ শাখার অন্তর্গত কুকি-চীন কোন এক প্রশাখা এই মণিপুরী জাতি।

মণিপুরী সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি মণিপুরী নৃত্য। সংস্কৃত ভাষায় ইহাকে 'মণিপুরী নর্তন' বলে। মণিপুরে ইহাকে জগোই বলা হয়। চত্ + কই = চকোই চকোই হইতে জগোই নামের উদ্ভব হইয়াছে। মণিপুরী ভাষায় চত্পা মানে হাওয়া, চলা। কোইবা মানে যোরা। জগোই এর দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক আলোচনায় সৌরজগতে সূর্যকে কেন্দ্র করিয়া ৯টি গ্রহ আপন মেরুরেখায় পশ্চিম হইতে পূর্বে একবার ঘুরিয়া আসিতেছে, পুনরায় সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। 'জগোই' এ সেইরূপ মুদ্রার ব্যবহারে ও সঙ্গীতের সহিত সেই ভাব প্রকাশ করা হয়।

সকল মণিপুরী নৃত্যের পরিক্রমণ গতির কাঁটার বিপরীত দিকে।

প্রাচীন কাল হইতে এই রাজ্যের অধিবাসীগণ শৈব। দেবদাসী কর্তৃক মন্দির প্রাঙ্গনে দেব অর্চনার অধুষ্ঠান হইত এবং অনুষ্ঠিত হইত অত্যন্ত শুদ্ধ ও সংযমের মধ্যে এই নৃত্য। মণিপুর জাতি রক্ষণশীল হইলেও ইহারা শুধুমাত্র নিজেদের প্রাচীন সংস্কৃতি লইয়া একই স্থানে আবদ্ধ রহিলেন না। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধর্ম-শিক্ষা-শিল্প সমন্বিত সংস্কৃতির সহিত মিলিত হইয়া তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। ফলে ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির সংযোগে তাঁহাদের সংস্কৃতি আরও সমৃদ্ধ হইয়াছে। চীন প্রভৃতি দেশের সংস্কৃতির সহিত এই ক্ষুদ্র মণিপুর রাজ্যটি প্রভাবিত হইয়াছিল।

মণিপুরী নৃত্যের ইতিহাসের প্রাচীন ধারাবাহিক বিবরণী বিশেষ পাওয়া যায় না। তবে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের একটি প্রাচীন ফলকে তৎকালীন রাজা 'কোয়াই থম্বল-কে' নৃত্য ও সঙ্গীতের একজন বিশেষ পৃষ্ঠপোষক বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অনেকের মতে ১০৭৪ খৃষ্টাব্দে রাজা লয়ারা, 'খাম্বাথৈবীর' করুণ কাহিনীর উপর প্রথম লাইহারাউবা খুম্বার রসাত্মক নৃত্যের প্রচলন করেন। দেখা যায় অষ্টাদশ শতাব্দী হইতেই মণিপুরী সঙ্গীত নৃত্যের বিকাশ। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মণিপুর রাজ্যের রাজা পামহেবা স্বয়ং বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেন এবং তাঁহার অনুরাগে মণিপুরী সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বৈষ্ণব ধর্ম বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। তাঁহার পৌত্র ভাগ্যচন্দ্র মহারাজ শ্রীচৈতন্যদেব প্রবর্তিত গৌড়ীয় ধর্ম গ্রহণ করেন এবং উক্ত ধর্ম মণিপুর রাজ্যে বিশেষভাবে প্রচার করেন। কৃষ্ণভক্ত মহারাজ ভাগ্যচন্দ্র জয়সিংহ সুদক্ষ নৃত্য ও সঙ্গীতশিল্পী ছিলেন। কথিত আছে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে স্বপ্নাবেশে নৃত্য শিক্ষা দান করিয়া উহা প্রচারের জন্য নির্দেশ দেন। মহারাজা জয়সিংহ পরে উহা নিজ কন্যাকে শিক্ষা দিয়া কৃষ্ণ মূর্তির পার্শ্বে আপন কন্যাকে রাখা সাজে সজ্জিত করিয়া রাস নৃত্যের প্রচার করেন। এই রাসনৃত্য তিনি মণিপুর, বাংলা, আসাম প্রভৃতি প্রদেশের লোক-নৃত্য সঙ্গীতের সংযোজনায় এক নবরূপ দান করলেন। মহারাজা ভাগ্যচন্দ্র 'গোবিন্দ সঙ্গীত লীলা বিলাস' গ্রন্থ প্রণয়ন করে উক্ত গ্রন্থে নৃত্য-গুরু রসানন্দ ও স্বরূপানন্দের সহায়তায় মণিপুরী রাসনৃত্যের নিয়মাবলী, সঙ্গীত বাদ্য যন্ত্র পোষাক-পরিচ্ছদ সাজ-সরঞ্জামাদি স্থির করে দেন। মহারাজ ভাগ্যচন্দ্রের রাজত্ব-কাল (১৭৬৯-১৭৯৯ খৃঃ) মণিপুরী নৃত্যের ইতিহাসে স্বর্ণযুগ বলা চলে।

ভাগ্যচন্দ্র মহারাজের পৌত্র চন্দ্রকীর্তি সিংহ পরবর্তীকালে প্রাচীন লাইহারাউবা নৃত্যের পুনরুদ্ধার করেন এবং বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা করেন এই রাসনৃত্য প্রচারে।

মহাকবি হিজম আঙঙ্গাল সিংহ খাম্বা-থৈবীর উপর এক প্রেম-করুনরসাত্মক-কাহিনীকে অবলম্বন করে মহাকাব্য রচনা করেন। ইহার কাহিনী লাইহারাউবা নৃত্যের অনুষ্ঠান বিশেষ ভাবে প্রচলিত। কথিত আছে খাম্বা মৈরাঙ নামক একগ্রামের অপূর্ব সুন্দর সাহসী বীর দরিদ্র সন্তান এবং থৈবী মৈরাঙ রাজকন্যা। তাঁহারা উভয়ে উভয়ের প্রতি প্রেমাসক্ত হন এবং বহু প্রতি-কূল অবস্থা অতিক্রম করিয়া একদা পরস্পর মিলিত হন। কিন্তু ইহার পর খাম্বার আকস্মিক মৃত্যু হয় এবং এই মৃত্যুর জন্য থৈবীকেই পরোক্ষভাবে দায়ী হতে হয়। থৈবীর সেই বিরহ বেদনা মর্মান্তিক রূপ ধারণ করে। বিরহিনী থৈবী স্বেচ্ছায় মৃত্যু-বরণ করেন। এই কাহিনীর নায়ক নায়িকা-কে শিব পার্বতীর অংশরূপে মণিপুর জাতি বিশ্বাস করেন।

লাইহারাউবা নৃত্য অত্যন্ত প্রাচীন নৃত্যের বিন্যাস। পূর্বে এই নৃত্য শিব-পার্বতীর মহিমা প্রচার করত। কিন্তু পরবর্তীকালে বৈষ্ণবধর্মের-প্রভাবে পড়া ইহা-রাসনৃত্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে পড়ে। এই নৃত্যে তাণ্ডব-লাস্য উভয়-ভাব ও অঙ্গ বিদ্যমান। পূর্বে লাইহারাউবা নৃত্য সাধারণতঃ মৈবা-মৈবী অর্থাৎ দেবদাস-দেবদাসী কর্তৃক অনুষ্ঠিত হইত। এই নৃত্য মণিপুরী জাতীর জাতীয় নৃত্য। প্রকৃতভাবে ইহা একটি নৃত্যনাট্য, ইহার বিষয়বস্তু, ভারত-নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত। ইন্দ্রধ্বজ উদ্দন উৎসবের ন্যায়। লাইহারাউবা নৃত্য কয়েকটি, চাকপা, মেরাঙ্ তিনটি ধারায় বিভক্ত। আজকাল মহরা লাইহারাউবা এবং উমা লাইহারাউবা নামক দুই শ্রেণীর নৃত্যের প্রচলন অধিক দেখতে পাওয়া যায়। প্রতি বৎসর চৈত্রের শেষ হইতে বৈশাখের প্রথমার্ধ পর্য্যন্ত মোট ১৫ দিন ব্যাপী এক বিরাট উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, মণিপুর রাজ্যে এই নৃত্যের মাধ্যমে।

প্রাচীনকাল থেকেই মণিপুরী নৃত্যের মধ্যে খাবলচোংবী নৃত্যের প্রচলন আছে। ইহা প্রধানতঃ অভিনয়-ধর্ম এবং বসন্ত পূর্ণিমা উৎসব। 'থুবচেনো' নামক নৃত্য সাধারণতঃ আষাঢ় মাসে অনুষ্ঠিত হয়। থাংহাইবা নামক বীররসাত্মক নৃত্যের প্রচলনও দেখা যায়। নৃত্যগুরুগণ অনুমান করেন যে চালি নৃত্য পদ্ধতিই মণিপুরী নৃত্যের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং প্রধানতম অঙ্গ। মণিপুরী নৃত্যে চালি অর্থে চলন। অনুদ্বিত নাট্য-শাস্ত্রে চালিকে "চারি" নামে অভিহিত করা হয়েছে। সঙ্গীত-রত্নাকর প্রভৃতিতে অতি অর্থে ব্যবহার করেছেন। [illegible] চারি-প্রকার। নাট্যশাস্ত্রে [illegible] কুমারচারি, ১৯টি আকাশীচারি। মণিপুরী চালির সাধারণ সংখ্যা ৪টি। চালি নৃত্যের উৎপত্তি ভঙ্গিপারেড হইতে। মহারাজা ভাগ্যচন্দ্র জয়সিংহ যে ভঙ্গি পারেডটি শ্রীকৃষ্ণের চরণে নিবেদন করিয়া স্বয়ং নট-বরের ত্রিভঙ্গ মূর্তিকে অভিনয় করিয়াছিলেন তাহাতে চালি ব্যবহৃত হয়েছিল। গোপী-গণের দর্প চূর্ণ করবার জন্য এবং রাধিকার মানভঞ্জনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ রাধিকাকে নিয়ে অন্তর্ধান করলেন। কৃষ্ণ বিরহে আত্মহারা হইয়া গোপীগণ "আত্মা বিচেষ্টো জগদুত্ত লাস্তিকাঃ" ভাবে বিভোর হয়ে কৃষ্ণভঙ্গিতে নৃত্য করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের বিরহে গোপীগণ কৃষ্ণ ভাবে ভাবিত হয়ে "আমি কৃষ্ণ" বলে চীৎকার করার সঙ্গে পদ্ম-সাগরে সঙ্গীতরা রাজহংসীগণের চীৎকারের তুলনা করিয়া মহারাজা চালি নৃত্যকে অভি-নয় করে দেখান। গোপীগণের প্রেমের জয় হওয়ার জন্য পতাকাহস্ত রাজহংসীগণের ভাব-প্রকাশের জন্য হংসাস্য এবং পদ্মকোষ মুদ্রা ব্যবহার করলেন, সরোবরের পদ্মের রূপ বর্ণনার জন্য।

চালি নৃত্য—পতাকা হংসাস্য পদ্মকোষ ও অর্দ্ধ-পতাকার এই চারিটি মুদ্রার ও ৪টি পদ ভঙ্গিকার দ্বারা সুনিবদ্ধ, রথযাত্রা উৎসবে এই নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। সকল বয়সের ও শ্রেণীর লোক এই নৃত্যের অংশ—গ্রহণ করতে পারে।

চালির—উৎপত্তি ভঙ্গি পারেড হতে নাট্য-শাস্ত্রে সমভঙ্গ-অভঙ্গ-ত্রিভঙ্গ এবং অতিভঙ্গ এই চারিটি ভঙ্গের বর্ণনা আছে। গোবিন্দ সঙ্গীত লীলাবিলাসে। ইহার সহিত মহারাজা ভাগ্যচন্দ্র আরুবা ভঙ্গি পারেড বর্ণনা করে যুক্ত করেছেন। ভঙ্গি পারেডের ২৩, ২৬, ২৭নং অধ্যায় চালি নৃত্যের অংশ। এইজন্য নৃত্যগুরু গণ এই অধ্যায় তিনটিকে চালি নৃত্যের প্রধান ও প্রাচীন অংশ বলে মনে করেন। চালি নৃত্যের অযোগ্যতাকে ইহারা অপমান-জনক বলিয়া মনে করেন।

রাসনৃত্য মণিপুরী নৃত্যের অন্যতম আকর্ষণ। প্রাচীনকাল হতেই মণিপুরের

এই রাসনৃত্যের প্রচলন ছিল, এবং তখন উহা প্রধানতঃ শৈব ধর্মের উপরই অধিক প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে মহারাজা ভাগ্যচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতায় রাসনৃত্যের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্মের সুললিত কাব্য ছন্দ ও সঙ্গীত প্রযুক্ত হয়। এই সময় হইতেই তিনি 'রাসকে' নৃত্য নাট্য আখ্যা দেন। অর্থাৎ ইহাতে অভিনয় ও আঙ্গিকের পূর্ণ প্রয়োগ। এই রাসনৃত্য অধিকাংশে বৈষ্ণব পদাবলীর উপর প্রতিষ্ঠিত। শ্রীচৈতন্য, জয়দেব চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদের পদাবলী সঙ্গীত মণিপুরী সংস্কৃতি বিশেষ ভাবে গ্রহণ করিয়া নৃত্যরূপ দিয়াছে।

রাসনৃত্য শুরু হইবার পূর্বে নিশাপালা নামক পুরুষের নৃত্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সঙ্গীত ও বিভিন্ন তাল সহযোগে এই নৃত্যের পরিসমাপ্তি হইলে রাসনৃত্য আরম্ভ হয়। রাসনৃত্য সাধারণতঃ মহারাস, বসন্ত রাস, বৃন্দা রাস, কুঞ্জ রাস, গোপ রাস, দিবা রাস, প্রভৃতি বিভিন্ন রাস, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ রাধার মিলন বিরহ গোপিনীদিগের মান অভিমান প্রভৃতি রসের উপর রূপায়িত হইয়াছে। রাসনৃত্য যদিও নবরসের দ্বারা সুনিবদ্ধ তথাপি লক্ষণীয় 'শৃঙ্গার' রসের প্রভাবাধিক্য।

নিত্যরাস—যে কোন অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হইতে পারে।

কুঞ্জরাস—শ্রীরাধা গোপিনীদিগের শ্রীকৃষ্ণের সহিত অভিসার ইত্যাদি অনুষ্ঠান সময় কার্ত্তিক মাস।

বসন্ত রাস—শ্রীরাধা, ক্রোধ, মানভঞ্জন, গোপীদিগের নৃত্য, হোলী ফাগ উৎসব ইত্যাদি অনুষ্ঠান সময় চৈত্র মাস।

দিবারাস—দ্বিপ্রহরে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রাসনৃত্যের মধ্য দিয়া কৃষ্ণরাধার অভিসারের প্রেম মধুর সুন্দর রূপ দেখিতে পাওয়া যায় বিশেষ প্রচলিত সঙ্গীতের মাধ্যমে।

কৃষ্ণ অভিসার :

সুখদ রজনী নব নাগর আজে।
বৃন্দাবিপি নিমু পথে আজে আজে।
মোহন বাঁশী বায় করে।
যাকে হেরে মোহন চূড়া কি শোভা পাদির
পাখা খো—ইত্যাদি।

অপর একটি বর্ণনায় :

এ রজনী নগরারাজ নিন্দসেল জাগি
সখা হইতে উঠি যায়ে

ভাম ভারে বায় বিনোদিনী ইত্যাদি—

শ্রীরাধার অভিসার :

ঠুমকি ঠুমকি চলে রাই
মনি মন্দিরে কনু কনু কনু কুনু বাজে রে
কঙ্কন-কিঙ্কিনী হার বলিনী
নিঠে পাঁর বেশী দোলে না—ইত্যাদি।

হোলী উৎসবে রাসনৃত্যের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণ ও সখীদিগের মধ্যে ফাগ খেলা :

রসিক নাগর কালা বদন পানে চাই
পুন পুন দেখি বদনে
অঞ্জলি ভরিয়া সন্তানে চায়, বদন পানে
মারে ফাগু সইতে নারি অমরা সখীগণে
দুখ কিদি চাই বদন পানে। ইত্যাদি।

মণিপুরী নৃত্যের ছন্দোময় ও সাবলীল গতি তাহার সুসামঞ্জস্য অঙ্গ-বিন্যাস, সুমধুর সঙ্গীত দ্বারা পরিবেষ্টিত ধীরে ধীরে এক রহস্যময় পরিস্থিতির সূচনা করে এবং দর্শক-মণ্ডলীকে ভক্তিরসে প্লাবিত করিয়া এক চিন্ময়লোকের সংস্পর্শে লইয়া যায়। মণিপুরী নৃত্যছন্দে মিলিত হইয়াছে, প্রেমভক্তিরস। নৃত্যকলা ও অভিনয়ের মাধ্যমে যখন ভাবের পূর্ণ জাগরণ হয় ও তাহার প্রকাশমাধুর্যে দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে সেই ভাব সঞ্চারিত হয় তখনই হয় নাট্যরস সৃষ্টি। বৈষ্ণব সাহিত্যের মণিপুরী সংস্কৃতির যে সমন্বয় ঘটিয়াছে -তাহাতে যে রসতত্ত্বের আলোচনা করা যায় তাহা প্রধানতঃ ধর্ম সাধনার উপর। হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বৈষ্ণব সাহিত্যের 'রস' এর আলোচনায় চৈতন্যচরিতামৃতের বিস্তারিত বর্ণনায় উল্লেখ করিয়াছেন 'তাঁহার সাধনা ও সংস্কৃতি' গ্রন্থের ভাব ও রস অধ্যায়.....

'শান্ত সখ্য বাৎসল্য শৃঙ্গার চারি রস।
চারি ভাবের ভক্ত-যত-কৃষ্ণ তার বশ।'

অর্থাৎ ভগবান ও ভক্তের সম্বন্ধ শুধু মাত্র ভক্তি ও বাৎসল্যের মধ্যে আবদ্ধ নহে, বৈষ্ণব সাহিত্যে শান্ত রসে, ভগবান। প্রভুর ন্যায়, বাৎসল্যরসে পিতা, সখ্যরসে বন্ধু ও শৃঙ্গার রসে প্রেমিকের ন্যায় আচরণ করেন।

মণিপুরী নৃত্য অত্যন্ত সংযম এবং পরিশ্রমের। এই নৃত্যকে 'দেবনৃত্য' এবং দেব-দেবী ইহার নায়ক-নায়িকা বলিয়া বর্ণনা করা হয়। দেব-অর্চনার সঙ্গেও মণিপুরী সঙ্গীত-নৃত্য, তাই দেব-উদ্দেশ্যকৃত এই নৃত্যের অনুষ্ঠানে অত্যন্ত পবিত্রভাবে অংশ গ্রহণ করিতে হয়।

অনেক ক্ষেত্রে নৃত্যশিল্পী স্বয়ং বাদকের ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করেন। যেমন নৃত্যের 'খোল' হস্তে লইয়া বাদনরত অবস্থায় মঞ্চে নৃত্য করা, তাহার মুখে বোল্—এইরূপ নৃত্যকে 'পুঙচোলম' বলে। ইহা ছাড়া 'মন্দিরা পালা' 'করতাল চোলম'—মন্দিরা ও করতাল লইয়া নৃত্য করা মণিপুরী নৃত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট। ইহা গ্রীবা-রেচক ভঙ্গি বর্জিত নৃত্য। মণিপুরী নৃত্যছন্দে মিলিত হইয়াছে প্রেম-ভক্তি এবং ধর্মকে এই নৃত্যে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। নৃত্ত-নৃত্য, মধুর, উদ্ধত, তাণ্ডব-লাস্য এই দুই ধারার বিপরীত রূপ ও ভাবের একত্র মিলনে মণিপুরী নৃত্যকে করিয়াছে সুকুমার মনোমুগ্ধ ললিত।

মণিপুরী নৃত্যের পোষাক বহুল বর্ণ-বৈচিত্র সম্ভারে শোভিত। নয় প্রকার-ভক্তির মাধ্যমে ইহা দ্বিতীয় ভক্তি কীর্তনের দ্বারা-অনুষ্ঠিত হয়। শান্ত সমত বেশভূষায় সজ্জিত হইতে হয়, নর্তক-নর্তকী ললাটে পুণ্ডরী তিলক, শ্বেতচন্দন অঙ্কন করেন, নর্তকগণ দেহের বিভিন্ন দ্বাদশ স্থানে শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন অঙ্কন করেন, পৈতাব-ব্যবহার হয়/ সকল নর্তক ও নর্তকীগণ ত্রিকচ্ছ ভঙ্গিতে বেশ পরিধান করেন। মণিপুরী নৃত্যের জানে ও কুমিন এই দুই শ্রেণীর পোশাক পরিধান করা হয়। 'জানেক' প্রাগৈতিহাসিক যুগের নক্সার অনুকরণে রূপায়িত করা হয়। ভাগ্যচন্দ্র মহারাজ 'কুমিন' এর প্রবর্তন করেন। দেবদেবীর অনুকরণে মস্তকের উপরে চূড়া বাঁধিবার নিয়ম প্রচলিত আছে এবং মুক্ত ওড়না দেওয়ার রীতি আছে। ষোড়শীলীলা এবং কালীয়দমনে মুখোশ ব্যবহার করা হয়।

মণিপুরী নৃত্যের বাদ্যযন্ত্র—পুং, পুংজাও

(১৮০ পৃষ্ঠায় দেখুন)

যাত্রাগানের আদিকাণ্ড

সূত্রধার

পূর্ববঙ্গের যাত্রাগানের প্রকৃতি ছিল ভিন্ন ধরনের। সেখানে পালাগানের প্রচলন বেশ। পূর্ববঙ্গে আর্য সংস্কৃতি ও আদিম সংস্কৃতির মিশ্রণের ফলে এক নতুন সংস্কৃতির সৃষ্টি হয়েছিল। নাথ সম্প্রদায়ের প্রভাবে নাথ-সাহিত্য পূর্ববঙ্গে বিশেষভাবে বিস্তার লাভ করেছিল। চর্যার যুগে পূর্ববঙ্গের নগরে নগরে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে নিম্ন জাতির গায়ক বা নাটুয়ারা লাউ বাকলের সঙ্গে বাঁশের তাই লাগিয়ে তার সঙ্গে তন্ত্রীযোগে একরূপ বীণা জাতীয় যন্ত্র প্রস্তুত করে তার সাহায্যে নাচগান ও অভিনয় করতো।

পূর্ববঙ্গে দল যাত্রার বিশেষ প্রচলন ছিল। ছেলে ও মেয়ে নিয়ে দল গঠনের সৃষ্টি। দলের কর্ত্রী মহিলা। এরা শ্রীকৃষ্ণের লীলা অভিনয় করতো। পশ্চিম বঙ্গেও দল যাত্রা হয়ে থাকে। অনেক সময় দল যাত্রার মেয়ে শিল্পীকে অধিকার করা নিয়ে জমিদারদের মধ্যে রেষারেষি চলতো। যেমন চলে কুমুর মেয়েদের নিয়ে।

ময়মনসিং জেলা পূর্ববঙ্গের কলা, সাহিত্য ও সংগীতের পীঠস্থান। আজ থেকে তিনশো বছর পূর্বে পূর্ব ময়মনসিং-এর দ্বিজ কানাই নামে জনৈক কবি যাত্রার ঢং-এ মহুয়া পালা রচনা করেছিলেন। মহুয়া পালা দীর্ঘদিন তাঁর দলে অভিনয় হয়েছে।

ময়মনসিং-এর গীতিকাগুলিও প্রসিদ্ধ। নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় গীতিকাকে অবলম্বন করে নানান পালা রচনা করে অভিনয় করতেন। জঙ্গলবাড়ির ভূঁইয়া ছিলেন ঈশা খাঁ। ঈশা খাঁর বংশের দেওয়ান মোবারক দাদ খাঁ এক যাত্রার দল গঠন করেছিলেন। তিনিই প্রথম বাদ্যানীর গান (মহুয়া) ও কোড়া শিকারীর গানের (মনুয়া) প্রবর্তন করেছিলেন। বিপুল অর্থব্যয়ের ফলে দাদ খাঁ সর্বস্বান্ত হন। পরে তিনি দল তুলে দেন।

দাদ খাঁর দলে কাঙ্গালী সেখ বালক গায়ক ছিলেন। পরে কাঙ্গালী নিজে দল করেছিলেন। মহুয়া বা বাদ্যানীর গান মুসলমানরাই করতো। কাঙ্গালীর দলে কিন্তু হিন্দু ছিলেন। তারিণী সে তাদের মধ্যে অন্যতম। এছাড়া সেখ জহর আলি, মনীর সেখ ছিলেন।

১২৯৯-৯২ সালে পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য মাসোয়া গ্রামে প্রথম বাদ্যানীর গান (মহুয়া) শোনেন। তিনিই এই গান সম্পর্কে প্রথম আলোকপাত করেন। এই পালা গানে খরচ কম। আনন্দ বেশী। অভিনয়ের সাজ-সরঞ্জাম বলতে একটা ধনু, লাঠি, বর্শা ও ছাতিয়ার। পোশাক পরিচ্ছদের মধ্যে মাথায় রঙিন ছোট পাগড়ী, পরনে মালকোঁচা মারা ধুতি। বাদ্যযন্ত্র বলতে ঢোল বা ঢোলক, মন্দিরা, বাঁশের বাঁশি, বেহালা। সাজ-পোশাকের জন্য মেয়েদের চুল, মোটা ছাপা শাড়ি, কাসা ও পিতলের অলঙ্কার। এছাড়া বাঁশ, দড়ি ও মশাল প্রয়োজন হত।

পালায় বাঁধা-ধরা সংলাপ নেই। শিল্পীরা মন গড়া সংলাপ কাহিনীর সঙ্গে তাল রেখে মুখে মুখে রচনা করে আবৃত্তি করতো। গানের ভাষা একই ছন্দে রচিত হলেও সুরের মধ্যে বৈচিত্র্য ছিল। পালার প্রধান চরিত্র নদ্যার চন্দার ঠাকুর মেওয়া সুন্দরী (মহুয়া,) উদ্দার বান্দা (হুমরা দর্দার)। আচার্য সেন বলেন, উত্তর-পূর্ব বঙ্গের এই পালাগানের রীতি পঃ বঙ্গের নেটোর মতই ছিল। বাদ্যানীর গানকে তিনি নদ্যার চান্দের (মদের চাঁদ) গাঁথা বলেছেন।

ঘাটু যাত্রা পূর্ববঙ্গের নিজস্ব সম্পদ। যাত্রা দলের মত ঘাটুর দল ছিল। অশ্লীল নৃত্যগীতের মাধ্যমে শ্রোতাদের মন জয় করাই ছিল ঘাটু যাত্রার মূল লক্ষ্য। ঘাটু বালকরা ছিল সেকালের প্রধান আকর্ষণ। মেয়েদের মত খোঁপা বাঁধত। হাবভাব, চাল-চলন সব মেয়েলি। অভিনয় চলাকালীন ঘাটু বালকদের দেহ স্পর্শ করার জন্য দর্শকদের মধ্যে দারুন হুড়োহুড়ি পড়ে যেত। যারা ঘুরে থাকতেন, তাঁরা বাঁশের চোঙা ঘাটু বালকের রক্তিম গালে স্পর্শ করে হাতের মুখে চুম্বন করে সুখের স্বাদ ঘোলে মেটাতে। ঘাটু গানের কোন বাঁধা-ধরা সুর ছিল না। রচয়িতারা বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের অনুকরণে গান রচনা করতেন। সে গান বেদনার গান, প্রেমের শিথিল করা গান। উদাস করা গান।

বরিশাল, ফরিদপুর, খুলনা, যশোর, রাজ-শাহী ও পাবনা অঞ্চলে গুনাই বিবির যাত্রার ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। ময়মনসিং-এর মুসলমান সমাজে মাধব মালঞ্চ যাত্রাগান করে থাকে। কুমিল্লার দলের নিমাই যাত্রা বিখ্যাত ছিল। চট্টগ্রাম অঞ্চলে সারিদিন খাঁয়ের বিদ্যাসুন্দর পালা সেকালে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এই সব পালারশিল্পীরা ছিলেন মুসলমান।

রামযাত্রা পূর্ববঙ্গে যথেষ্ট জনপ্রিয়। পঃ বঙ্গে পাতাইহাটের প্রেমচাঁদ আনন্দ ও জয়চাঁদ রামযাত্রায় প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। কলিকাতা কুষ্টির বড় সাহেব হলওয়েল রামযাত্রার খুব ভক্ত ছিলেন। রামায়ণ গান বাংলা দেশে বহু প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। রাম-কাহিনী সূত্র ও বাস সহযোগে গীত হত। সেকালে বহু কবি রামায়ণ রচনা করেছিলেন। উত্তরবঙ্গে বড় নিত্যানন্দ রামায়ণ গান করে খ্যাতি অর্জন করেন। বর্তমানে কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে এক শ্রেণীর দল রামযাত্রা করেন। বলা হয় উনদার দল। তাঁরা কৃত্তিবাসী রামায়ণ, অদ্ভুত রামায়ণ, চন্দ্রাবতী রামায়ণকে অবলম্বন করে গান করেন। পূর্ববঙ্গের রামযাত্রায় বিভিন্ন রূপ বা ঢং পরিদৃষ্ট হয়। অনেকে চামর দুলিয়ে পয়ার ছন্দে বা বিচিত্র কবিতার ছন্দে একটি সংলাপ গেয়ে যেতেন এবং সেই অনুযায়ী অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তুলতেন। দোহাররা ঘুরে ঘুরে গাইতেন। মূল গায়েন সুর পালটে বিভিন্ন চরিত্রের সংলাপ বক্তৃতা করতেন, আবার অনেকে সেজে আসরে আসতেন রামবিষয়ক

আখ্যানভিত্তিক অভিনয় করে থাকেন। মূল গায়েন বাদ্যযন্ত্রের রূপসজ্জা নিয়ে দুজনের মত প্রয়োজন মত গান গাইতেন। দলের অধিকারী ও অভিনেতারা অনুন্নত সম্প্রদায়ের নিম্ন-শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের মধ্য থেকেও অনেকে দলের অধিকারী হতেন। তারা ছিলেন সমাজের পতিত।

মনসাযাত্রাও যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল। ভাদ্র মাসে মনসা পূজাপার্বণে মনসা যাত্রা-গান সাধারণত অনুষ্ঠিত হত। রামায়ণ গানের মত মূল গায়েন লোহারদের সাহায্যে চামর দুলিয়ে মনসা মাহাত্ম্য প্রচার করতেন। চাঁদসদাগর ও বেহুলা লক্ষীন্দরের পালাগান হত। শিল্পীর বিভিন্ন চরিত্রের রূপসজ্জা নিয়ে বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে দিয়ে সমগ্র পালাটি অভিনয় করতেন।

মনসা যাত্রার প্রথমোক্ত রূপ মনসা গান বা রয়ানী নামে পরিচিত ছিল। মনসা-যাত্রা বা ভাসানগানে পূর্ববঙ্গের নিজস্ব সম্পদ। রয়ানীযাত্রায় অনেক অধিকারী পুতুলবাজীর সাহায্যে পালা গান গেয়ে যেতেন। আসরে মনসাদেবীর মূর্তি থাকে। মূল গায়েন চামর বাজন করতে করতে বিভিন্ন সুরে গান করেন।

ত্রিপদালেই রয়ানি গানের উৎপত্তি। জানা গেছে এই সংগীতরূপ অনার্যদেরও প্রচলিত ছিল। আর্যরা আসার আগে মানুষ সূর্য জল ও সাপের পূজা করত। এগুলি রচিত বন্দনা গানকে বলা হত রয়ানি তথা মনসার গান। ক্রমে রয়ানি একটা আলে কথার প্রাধান্য বর্ধিত হয়ে নাটোর রূপ নিতে থাকে। সংগীত সমৃদ্ধ পালা—কিন্তু সবটা সংগীত নয়। এই আয়োজন পূজাস্থান থেকে মিছিল করে নদীর তীরে গিয়ে শেষ হত। যখন অভিনয়ের প্রাধান্য বাড়ল তখনও মিছিলের প্রচলন ছিল। সুপ্রাচীন এই শিল্পধারা নিয়ে গ্রামে গ্রামে দল বাঁধা হত। জানা গেছে ১২৭২ সালে বৈকুণ্ঠ নট্টর পিতৃব্য একপ একটি দল করেন। দলটির নামকরণ করা হয়েছিল আচরণ সংগীত সমাজ। এঁরা মনসাযাত্রা গাইতেন। বহুকাল পরে, বরিশালের নাগ-সিংহ কোম্পানী ও ঠাকুর কোম্পানীর অবলুপ্তির পর এই দলটি পেশাদারী দলে পরিণত হয়।

পূর্ববঙ্গে বয়াতী গানের যথেষ্ট প্রচলন রয়েছে। দলের গায়করা মাথায় বাবরি চুল রাখে, চুমকুড়ি বাজিয়ে কিংবদন্তী ও ইতিহাসের অংশবিশেষ গানের মাধ্যমে প্রকাশ করে। মুসলমান ও মুসলমানরাই বয়াতী দলের শিল্পী। কিংবদন্তী ছাড়াসমসাময়িক কোন চমকপ্রদ ঘটনাকে অবলম্বন করে গান বেঁধে গান করে। ভাওয়াল সন্ন্যাসীর কাহিনীকে কেন্দ্র করে বহু পালা রচিত হয়েছিল।

পশ্চিমবঙ্গের মত পূর্ববঙ্গেও চণ্ডীযাত্রার যথেষ্ট প্রচলন ছিল। চণ্ডীযাত্রার কালকেতু ব্যাধের কাহিনীই সর্বাধিক প্রচলিত। মুকুন্দ-রামের চণ্ডী কথাই ছিল সেকালের প্রধান পালা। গ্রামীণ কবিরা চণ্ডীকথাকে অবলম্বন করেই পালা রচনা করতেন।

পালা গানে উত্তরবঙ্গের দান অনস্বীকার্য। আলকাপ যাত্রা, কুশানে, রূপবান যাত্রা দেকালে যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল। দুয়ার্স অঞ্চলের চরঞ্চী পালা মালদহের আল-কাপের সমগোত্রীয়। নানা সামাজিক সমস্যা নিয়ে পালাগুলি রচিত। ব্যঙ্গাত্মক পালা হিসাবে পালাগুলি চিহ্নিত। ব্যঙ্গ ও প্রহসন পালা হিসাবে 'রসিয়া' দুয়ার্সের নানা অঞ্চলে বেশ খ্যাতি লাভ করেছে। চরিত্রের সংখ্যা খুবই অল্প। গানে নানা সমস্যা উপস্থাপিত করা হয়। অধ্যাত্ম কবির দল বছরে বছরে নতুন পালা রচনা করছে। গান বাঁধছে। প্রয়োজনে আসরে দাঁড়িয়ে দলের শিল্পীরা শ্রোতাদের করযাস মত পালা বেঁধে গান করে সেজেগুজে আবৃত্তি করে।

দিনাজপুর, রংপুর অঞ্চলে রূপবান যাত্রা ও ময়নামতী যাত্রার প্রচলন রয়েছে। পূর্ব-বঙ্গে 'রূপবান কন্যাযাত্রা' বহুল প্রচলিত। পালাটির অপর নাম রহিম বাদশা ও রূপবান কন্যা। দিনাজপুরের রূপধন কন্যার সম-গোত্রীয়। অনেকে মনে করেন, রূপবান কন্যা যাত্রা পালা রূপধন কন্যার পূর্ববঙ্গীয় ভাষার সংস্করণ। রূপধন কন্যা পালার প্রধান চরিত্র রহিম ও রূপধন ও মালিনী। আড়াই দিনের রহিমের সঙ্গে মন্ত্রী কন্যা রূপধনের সাদী হয়। নিত্য স্বামীকে নিয়ে আশ্রয় নেয় মালিনী মাসীর বাড়ীতে।

রাজকুমার রহিম মালিনীর আশ্রয়ে বড় হয়ে ওঠে। পাঠশালার গুরুমশাই একদিন রহিমকে পাঁঠার রূপান্তরিত করেন, সংবাদ পেয়ে রূপধন মন্ত্র বলে রহিমকে আবার মানুষ করে তুলল। কিশোর স্বামীকে নিয়ে যুবতী স্ত্রী রূপধন গুরুর আশ্রম ত্যাগ করে অজানার পথে পাড়ি দিল। পথে ডাকাত-দের কবলে পড়ে। রূপধনের কাতর প্রার্থনায় কৈলাসে হর-পার্বতীর মন টলে ওঠে পার্বতীর অনুরোধে মহাদেব মৃত রহিমের দেহে প্রাণ সঞ্চার করেন। আবার গুরুমশাই যাদুবলে রহিমকে পাঁঠায় রূপান্তরিত করেন। রূপধনকে বিয়ের প্রস্তাব করেন গুরুমশাই। চতুরা রূপধন যাদু পাথরের গুণে স্বামীকে আবার মানুষ করে তোলে। স্বামী-স্ত্রীতে মিলন হয়।

পূর্ববঙ্গের রূপবান যাত্রার কাহিনী হুবহু এক। তবে, এই যাত্রায় হর-পার্বতী অনুপস্থিত। মহম্মদ ইয়াসিন নামে জনৈক মুসলমান গায়ক এই পালা পূর্ব পাকিস্তানে এখনও গাইছেন।

বুড়িযাত্রা, বাওনা যাত্রা, কালীকাচ, নিমাই এ সব পূর্ব বাঙলার পুরনো যাত্রা প্রকরণ। এখন প্রচলিত রয়েছে 'গোনাই বিবির যাত্রা'।

উত্তরবঙ্গের রূপধন কন্যা যাত্রা ও পূর্ব-বঙ্গের রূপবান যাত্রা বা রহিম বাদশা ও রূপবান কন্যা যাত্রার রচয়িতারা মুসলমান। শিল্পীরাও মুসলমান ও নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত। অথচ হিন্দু দেব-দেবীর ভজনা করেছে, এতে মনে হয় হিন্দুদের পরোক্ষ হাত ছিল। রূপবান যাত্রায় তা পাওয়া যায় না। পালায় উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন সুর ধ্বনিত হয়। রূপবান যাত্রার গানে ভাটিয়ালির ছোঁয়াচ আছে, কথা ও গান সমান সমান। সংলাপের সারমর্ম সংগীতের মাধ্যমে হৃদয়গ্রাহী করার উদ্দেশ্যে গীত হত।

বাংলা দেশে বিভিন্ন ধরনের যত্ন যাত্রা রয়েছে। তার মধ্যে ৮১ ধরণের গায়ন পদ্ধতির নজির খুঁজে পাওয়া যায়। যা আজ বিস্মৃতির অতল তলে তলিয়ে যাচ্ছে। উদ্ধার করা আর সম্ভব নয়। গ্রামীণ লোকনাট্যের পরিচয় বের করা আজ প্রয়োজন।

ছবি দেখার কথা

ঋত্বিককুমার ঘটক

একবার আমার সমস্ত ছবি একনাগাড়ে দেখে একজন অতি বিখ্যাত বিদেশী সমালোচক প্রশ্ন করেছিলেন—"তোমার বেশীর ভাগ ছবিতেই বঙ্গবিভাগকে পটভূমি করেছ। এটা তোমার বাংলাদেশের বাইরের লোক বুঝতেই পারবে না। তোমার কাজকর্ম তাই বাইরে ঠিকভাবে যাচাই হবার সম্ভবনা খুবই কম। এ রকমভাবে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখ কেন? জাননা, মিস হচ্ছে একটা আন্তর্জাতিক শিল্প?"

প্রশ্নটা আমাকে খোড়ায় অবাক করে দিয়েছিল। তারপর তাঁকে আমি কিছু প্রশ্নের মাধ্যমে উত্তর দিয়েছিলাম। বলেছিলাম—আমার এই পর্যায়ের ছবিগুলি ১৯৪৯ থেকে ১৯৬১ সালের মধ্যে তৈরী। অর্থাৎ আমাদের দেশবিভাগের বারো থেকে পনেরো বছরের মধ্যে। এবং আমাদের দেশ আজও এর ধাক্কা সামলে উঠতে পারেনি। আজও আমাদের সামাজিক অর্থনৈতিক সমগ্র কাঠামোটা এই একটী ব্যাপারের দ্বারা প্রভাবিত।

আর তোমাদের দেশে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ লেগেছিল আজ থেকে তিরিশ বছর আগে, আজো সে নিয়ে তোমাদের হা-হুতাশ গেল না। তোমরা যে সব ভালো ছবি পাঠাও তার সত্তরভাগের পটভূমি ঐ যুদ্ধ, যার সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ পরিচয় নেই বললেই চলে, যদিও তার বক্র প্রভাব আমাদের মধ্যেও চূড়ান্ত দুর্গতির সৃষ্টি করেছিল।

তোমাদের এইসব ছবি-করিয়েদের মনে হয়, তাঁরা নিজেরা যে অপরিসীম দুঃখের মধ্যে দিয়ে পথ চিরে এসেছেন, সেটা স্বতঃসিদ্ধভাবেই আমরা ধরে নেব। অর্থাৎ তাঁদের ব্যথার সমব্যথী হব।

তাতে তাঁদের আন্তর্জাতিকতার আটকায় আমাদের বেলা, যদিও দেশভাগ বাংলাদেশটাকে যা করে ছেড়ে দিয়েছে, সেটা এদেশের ইতিহাসের পক্ষে কোনক্রমে মহাযুদ্ধের থেকে সুদূরপ্রসারী কম নয়।

তবে হ্যাঁ, সাহেবরা সারা পৃথিবী জুড়ে লাগাতে যুদ্ধে বেড়িয়েছিল বেশ কয়েক বছর। তাঁদের তাঁবে অন্য বহু দেশের মত আমরাও বেশ কিছুকাল ছিলাম, ফলে তাদের মুখাপেক্ষী বহুদিক থেকেই হয়েছি, আর এই ছবি ব্যাপারটাও তো তাদের কাছ থেকেই শেখা—ইত্যাদি ইত্যাদি যুক্তি দেওয়া যায়। যুক্তিগুলো ছবির জগতের 'আন্তর্জাতিকতা' বোঝায় না, বোঝায় শিল্পের ক্ষেত্রে প্রচ্ছন্ন ঔপনিবেশিক মনোভাব।

আমরা যদি কষ্ট করে ইতালী, ফ্রান্স, জার্মানী, পোলাণ্ড, রাশিয়ার যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণাম দেখবার জন্য ন্যূনতম খোঁজ খবর নিয়ে তারপর দেখে থাকি, তাহলে ওরাই বা কোন অধিকারে আশা করবে ওদের বোঝবার জন্য দেশের আত্মার তীব্র আর্তনাদ বর্জন করে ওদের ধারণামত বাংলাদেশকে দেখিয়ে যাব?

একথাটা বিশেষভাবেই আলোচনার অপেক্ষা রাখে। যেখানেই বাঙ্গালী তথা ভারতীয়, যাঁরা অর্থে কিছু করার চেষ্টা হয়, সেখানেই এই দুর্লঙ্ঘ্য বাধা সামনে এসে দাঁড়ায়। সত্যজিত বাবুর 'অপরাজিত' ভেনিসে মহাসম্মান লাভ করেছে সত্য, কিন্তু 'কালপুরুষ' শব্দটা যখন অপু একা অন্ধকার রাতে জলের প্রতিবিম্বের সঙ্গে বলল, তখন সেখানে 'Orion' শব্দ ব্যবহার করাতে ওরা কী কিছুই বুঝতে পারল? আমাদের ঐতিহ্যে আছে, যে পুরুষকে কালপুরুষ ভর করবে সে চিরদিন বাউণ্ডুলে, ভবঘুরে থাকবে। তার কোনদিন কোন ঠিকানা হবে না।

এই যে মহৎ একটি শব্দে সত্যজিতবাবু (এবং বিভূতিভূষণ) যে সোচ্চনা এনেছেন। তা মাঠে মারা গেল 'Orion' শব্দের ব্যবহারে।

এটা হয়তো একটু বেশী আশা করা হয়ে গেল। হয়তো বড্ড সূক্ষ্ম অনুভূতি প্রত্যাশা করা হয়ে গেল বিদেশীর কাছ থেকে। কিন্তু এর থেকে অনেক মোটা-দাগের অনেক বক্তব্যই ওদের কাছে পৌঁছায় না। এর কী সমাধান আমি জানিনা, কিন্তু থেকে থেকে নিগড়ে আবদ্ধ হয়ে পড়ার মত দম্ আটকে আসে। চলচ্চিত্র আন্তর্জাতিক ভাষা, কিন্তু জাতীয় Culture Complex

অরুণতী [illegible] দ্বিতীয় ছবি 'মেঘ ও রৌদ্র'-তে [illegible] চট্টোপাধ্যায়

সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট না থাকলে পরিপূর্ণ আন্তর্জাতিকতা অর্জন করতে পারে না। এটা ঘোড়ার থেকে জাপানীরা বুঝেছিল, তাই OZU-র ছবি কাটছাঁট না দিয়ে কুরোসোয়া-এর ছবিগুলো রপ্তানী করেই বিশ্বের দরবারে নিজের জায়গা করে নিয়েছিল।

তাই বলছিলাম, যে কোন ছবি মোটামুটি উপলব্ধি করতে হলে, যে দেশের ছবি, সেই দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং সাংস্কৃতিক গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে একটু প্রাথমিক জ্ঞান নিয়ে গেলে উপভোগটা বেশী করা যায়, যাচাইও করা যায়।

দু-চারটে উদাহরণ দিলে হয়তো কথাটা আরো একটু পরিষ্কার হবে। ধরুন,—মধ্যযুগীয় জাপানের পটভূমি। Shogunate Period সম্বন্ধে কিছু খোঁজ খবর নিয়ে সামন্ত অধিপতি এবং তাদের Samurai-দের ব্যাপার-স্যাপার সম্বন্ধে একটা সাধারণ ধারণা করে নিয়ে গেলে তবেই কুরোসোয়ার Seven Samurai বা Rashomon Throne of Blood জাতীয় ছবি এবং Noh আর Kabuki theatre-এর আচার-প্রকরণ তার সঙ্গে যোগ করে Mozoguchi-এর ugitsu monogatari জাতীয় ছবির মর্ম, তার দেশের গভীরে প্রবেশ করে সেই ঐতিহ্যকে বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতের সোতনায় বর্ণবতী করে যে উত্তুঙ্গ শিখরে উঠেছে, তা কিছুটা আমাদের আয়ত্তে আসে।

খৃষ্টদেব পশ্চিম ইয়োরোপের এমন একটি দেশ, যেখানে খ্রীষ্টধর্ম অনেক পরে প্রচারিত হয় আপেক্ষিকভাবে। ও দেশে Teutonic-Viking-দের Valhalla (স্বর্গ) এবং Wotan ODIN (দেবশ্রেষ্ঠ) এইসবকে কেন্দ্র করে যে সব Pagan saga-সমূহ প্রচলিত ছিল, তাকে ঠেলে Roman Catholic ধর্মকে ঢুকতে হয়েছিল। সেই নতুন ধর্মপ্রচারের পটভূমি মনে না রাখলে Virgin Spring বা Seventh Seal-কে বোঝা যাবে না। সেই সঙ্গে মধ্যযুগীয় Strolling players বা village fair, maypole উৎসব, Self-Slogeuation for atonement,—এইসব সংস্কারগুলি ধরা দরকার। ইংমার বেরগমানের সব ছবিতেই প্রায় এই ধরণের দাবী পেশ করা থাকে দর্শকের কাছে।

বুনুয়েলের 'নাজারিন' আপনারা অনেকেই দেখেছেন। সেখানে Primitive Christianity-এর Pristive Fervour-এর সঙ্গে Established Roman Catholic Church (যাদের পুজো আর্চা সাধু সন্তদের জীবনে রিচিবিহা জাতীয় ব্যাপার একটা প্রধান স্থান অধিকার করে আছে।) এর যে সংঘর্ষ একজন Intineratit Priest-এর মাধ্যমে ফুটে উঠেছে। যে শেষে গিয়ে খ্রীষ্টের নিজের সঙ্গে মিশে যাবার ইঙ্গিতে পর্যবসিত'—সেকথা বুঝতে গেলে Roman Catholic Culture Complex-কে বুঝতে হয়।

এই একই কথা Fellini-র "La Dolce Vita সম্বন্ধে বলা চলে। মুমূর্ষ পশ্চিমী সভ্যতাকে যা চাবুক তিনি মেরেছেন, আর Dr. Stiener-এর নিজের সন্তান হত্যা ও আত্মহত্যার পেছনে যে পক্ষপুটের ছায়া তিনি মেলে ধরেছেন, তা' যে U. S. এর Stratigic air command-এর অস্তাবহ উপস্থিতির দ্যোতক, একথা ভাল করে ভাবলে Fellini-এর গভীরতা উপলব্ধি করা যাবে। যখন ভাবা যায় ঐ S.A.C.-এর বিরাট বোমারু বিমান গুলো সারা পৃথিবীটা টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে, পেটের তলায় বাঁধা রয়েছে কত মেগাটনের হাইড্রোজেন বোমা কে জানে, বাচ্চা ২০।২১ বছর বয়সের ছেলেরা সেগুলো উড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে সর্বদা হাতুর ওপর চাপ বহন করে,—তখন ঐ Dr Stiener-এর মানসিক বিপাই আমরা প্রাপ্ত হই। ঐ ছেলেদের মধ্যে যে কোন একজন অমিত্রা এবং দুর্বল হাতুর চাপে পরে একটি সামান্য বোতাম টিপলে পৃথিবী ধ্বংস অনিবার্য, ওদের হাতে সমস্ত মানবজাতির বাঁচা-মরা নির্ভর করছে, ভাবলেও শিউরে উঠতে হয়।

এগুলোর ইঙ্গিত পেলে ছবিটা কী বেশী বোধগম্য হয় না?

গত যুদ্ধের ঠিক শেষের দিকে পোলাণ্ডের রাজনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত জটিল হয়ে উঠেছিল। গ্রেট ব্রিটেনে চার্চিলের আশীর্বাদপুষ্ট একটী নির্বাসিত পোলিশ সরকার, মস্কোতে অপর একটী, এবং জার্মানদের সঙ্গে হাত মেলানো কুইস্‌লিং এর দল,—এদের নিজের কর্তৃত্বে সব ছবিটা ঘোরালো হয়ে উঠেছিল। তার দাম পোলাণ্ডকেকে কড়ায় গণ্ডায় শুধতে হয়েছে প্রায় গৃহযুদ্ধের মতো দিয়ে।

আঁদ্রে ভাইদা-এর ashes and Diamonds-এর তিন-চতুর্থাংশই অবোধ্য থেকে যাবে এ পটভূমি মনে না রাখলে। ও ছবির শেষের দিকে সারারাত্রিময় স্বাধীনতা অফিসাররা যে মদের পাত্র নিয়ে মেতে গেল, এবং "ঘরেন" সঙ্গীত গাইল, এবং তা সত্ত্বেও সকাল হল, এ সংকেত আমরা কী বুঝব যদি পটভূমিটা একটু জানা না থাকে? অথবা নায়ক-নায়িকা গীর্জার ভগ্নস্তূপের মধ্যে 'ছাইএর মধ্যে হীরের' কবিতাটি প্রস্তর ফলকে পড়ছে। পেছনে বেদীর ওপর থেকে যুদ্ধে পা-তোলা, মাথা মাটীরদিকে ঝোলানো যীশুর মূর্তি যা অর্থ বহন করছে পোলাণ্ডের মত ধর্মভীরু (ওদের কার্ডিনাল আছে একটী শক্তিশালী ব্যক্তি দেশের) ঐতিহাসিক পট পরিবর্তনে, এসব একটু মনে রাখা দরকার বৈকি!

হাজারটা উদাহরণ দেওয়া যায়, দিয়ে লাভ কী?

তা হলে কী মনার ছবি দেখতে হলে এতদূর ছুটে দেখতে যেতে হবে ?

এমন দাবী করা আকাশকুসুম রচনা করারই সামিল।

কিন্তু এইখানে আমার বিশেষ কয়েকটি গোষ্ঠীর কথা বলার আছে। বিশেষত কয়েকটি গোষ্ঠী, যাঁদের কাছে ছবি শুধু অবসর বিনোদন বা টনটেলেকচুয়েল লাভার সোপান হিসাবেই ব্যবহৃত হয় না।

এঁরা হচ্ছেন,—ছবি করিয়েরা, কিন্তু সোসাইটির চিন্তাশীল সভ্যেরা এবং ছবির সমালোচকরা। এঁদের কোন ক্ষমা নেই। এঁদের নিজেদের তাগিদেই মাল-মসলা সংগ্রহ করে একটি ছবি ভাল লাগলে বারবার দেখা উচিত এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা উচিত। নেহাতই লায়সারা গোছের মনোভাব প্রকাশের এঁদের কোন অবকাশ নেই। এঁদের ভাল বা খারাপ বলার উপর ওজন দেবার প্রশ্ন তখনই একমাত্র উঠতে পারে।

আর, পক্ষপাত পূর্ণতা, দামরিক স্রোতে গা ভাসানো,যখন যে নামটা Fashionable, সেইটে নিয়ে মাতামাতি করা, সর্বোপরি নিত্য-নতুন Cultural cult (উদ্ভটনাম সমেত),—এ সব থেকে শত হস্তেন দূরে সরে থাকা উচিত। সব জিনিষকেই থিতিয়ে দেখা উচিত, সময় দেওয়া উচিত স্থির হবার জন্য। কথায় কথায় একটা করে Issue সাংস্কৃতিক জগতকে দিশেহারা করে দিচ্ছে। বিশেষ করে ফরাসীদের এ বদভ্যাস আছেই, তা' ছবি আঁকার ইতিহাস (গত একশো বছরের) ঘাঁটলেই বোঝা যাবে। একটা কী দুটা ছবি আঁকা হয়ে বুলভারের রেলিং-এ মোহ্যমান অবস্থায় কোন মার্কিনী পরিব্রাজকের ডলার ধরে করে ফেলেছে কী না ফেলেছে,—একটা manifesto বেরিয়ে গেল। দল পাকানো চালু হল। বুদ্বুদের মত কদিন পরেই তা মিলিয়ে গেল।

ইতালীয়ানগুলো এই রোগে পড়েছে। Visconti-এর La Notte Bianch (The White Nights) দেখে নাকি Neo-realism থেকে Neo Romanticism-এ উত্তীর্ণ হওয়া গেছে। কী জানি মশাই, মাথা গুলোতে থাকে, এবং অসার গুজ্জনিনাদ বলে মনে হয়।

এর মধ্যে সংকোচ নেই তা বলছি না। বলছি না একথাও যে ওদের কোনই অবদান নেই। বলছি শুধু বাড়াবাড়িটা একটু বেশী হয়ে যাচ্ছে আর এই সব নামাকরণের নামাবলী না পরিয়েও মহৎ শিল্পকে চেনাতে কষ্ট হয় না।

এই সুবাদে সমালোচকদের কথাটা একটু বেশী করে এসে পড়ে।

আমি ভাল করেই বুঝি, পেশাদার সমালোচকরা বিশেষ করে, কী অবস্থার মধ্যে কাজ করেন। প্রথমতঃ, সর্বপ্রকারের ছবি ছায়েলাই তাঁদের দেখতে হচ্ছে, বেশীর ভাগ ছবিই এসেলে এমন আসে, যেগুলো মাথা গোলমাল করে ফেলার পক্ষে যথেষ্ট। তার ওপর হপ্তার দলটা অমন ছবি দেখা, মাসে এবং বছরের কটা জানিনা,—মানুষ যে ঊর্ধ্বাহু হয়ে—"গৌর নিতাই বল" বলে হাওয়া হয়ে যায় না, এ পৃথিবীর পরমাশ্চর্যের মধ্যে একটি।

তার ওপর রয়েছে সময়ের বাধা একটু থিতিয়ে বসে দেখার সময় এঁরা বড় একটা পান না। এক নির্দিষ্ট তারিখের সীমারেখার মধ্যে এঁদের লিখতে হয়।

দ্বিতীয়তঃ, ব্যবসাগত চিন্তা। আমার কাগজে ওর বিরুদ্ধে লিখলে ও অত টাকার বিজ্ঞাপনের প্রশ্ন জড়িত হয়ে পড়ছে। ঐ গোষ্ঠীকে খারাপ বললে পরে মালিকের কাছ থেকে ভবিষ্যতে সদয় ব্যবহার পাওয়া মুস্কিল। আবার ভুলক্রমেও কাউকে যদি বললে পরে যদি সাহেবরা হাততালি মারে, তখন নিজে বোকা প্রতিপন্ন হবার সম্ভাবনা, এমন অনেক ভাব-ভুবন ভোরা পাহাড়ের দল সমালোচনা সমুদ্রকে বিপদসংকুল করে রেখেছে বলেই আমার ধারনা। জানিনা, কতটা সত্যিই এসব ঘটে।

কিন্তু ছবির বাইরের কিছু ব্যাপার সম্বন্ধে সর্বদা অবহিত এবং সচেতন থেকে যে এঁদের কাজ করতে হয় এবং তার দ্বারা সমালোচনা দুষ্ট হয়ে পড়ে, এসম্বন্ধে আমার মনে কোন দ্বিধা নেই।

অথচ সমালোচকের কাজটা মারাত্মক কাজ, দেশুবন্ধনের কাজ। ভাল কাজ দেখলে উজ্জ্বসিত-হয়ে ওঠা চাই শিশুর মত,

'প্রথম প্রথম ভুল' ছবির নায়িকা
সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

না অমনি মুগত ভর্জ পাইন বা লিনসে এণ্ডারসনের-এর মধ্যে দেখেছি। যে কোন ভাল কাজের ছোঁয়া পেলেই তখন এটা ওঁদের নিজস্ব দায়িত্ব করে তুলতে দেখেছি তাঁরা তখন হয়ে ওঠেন ছবিটির তত্ত্বাবধায়ক তার গুণের ভাঙ্কার এটা ওঁদের ধর্মে পরিণত হয়। যতক্ষণ না অন্যের গলা দিয়ে নামাচ্ছেন, ততক্ষণ কিছুতে ওঁদের শান্তি নেই।

এই সমালোচকরা এই ব্যাপারে অতি গোঁড়া ধার্মিক।

এমনটা আমরা হতে পারিনা ? সব কিছুকে তুচ্ছ করে যেটুকু ভাল লাগল, তার তাক কি আমরা আরো পেটাতে পারি না ? এখন যে কিছুই হয় না একথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু আরো—আরো হয় না কেন ?

সত্যজিৎ রায়ের 'অরণ্যের দিন রাত্রি' ছবিতে কাবেরী বসু ও উত্তমকুমার চট্টোপাধ্যায়।

খারাপ ছবি দেখতে হয় প্রায়ই ? সে তো আছেই। ঢুঁটিয়ে গাল দেবারও, কিন্তু আংশিক মনোভাব নিয়ে নয়, গঠনাত্মক মন নিয়ে। এসব ছবি করিয়েদের প্রথমতঃ করুণা করে নাই দেবার মত পাপ আর নেই। অর্থাৎ আমি বলতে চাচ্ছি, একটা মাপকাঠি দিয়ে মাপা হোক, তাতে যা ধরা পড়ে, তাই প্রকাশ করা হোক। ও ছবির করতে জানে না, ও ছবি করে পয়সার জন্যে, ও বেচারা প্রযোজকের চাপে পড়ে করতে বাধ্য হয়, কাজেই একটু ' ক্ষেমা-ঘেন্না করে নিয়ে যেটুকু ভাল বলা যায়, তাই বলে বাকীটা চেপে যাওয়াই যাক—এই ধরণের মনোবৃত্তি দায়িত্বহীন সমালোচকদের দিক থেকে পাপের সামিল। এমনোবৃত্তি দিয়ে কারো লাভ হয় না,—ছবিকরিয়ের না, সমালোচকের না দেশের মানুষের তো নয়ই।

ঐ যে সেতুবন্ধনের কথা তুলেছিলাম, সেটাকে আর একটু পরিষ্কার করা যাক।

সাধারণ দর্শক যায় ছবি দেখতে, তার মানসিক প্রস্তুতি করে দেবার দায়িত্ব সমালোচকদের। সমস্ত কিছু নাড়াঘাটা করে ছবিটির ওজন লোকের সামনে তুলে ধরাই হচ্ছে কর্তব্য।

এখানে সমস্ত হতাশ সমালোচক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠবেন,—"সমালোচনা দেখে লোকে ছবি দেখতে যায় না মশাই, Box office-এর ওপরে মোটেই নির্ভর করে না।"

কথাটা মিথ্যে বা অর্ধ মিথ্যে।—সেটা আরো মারাত্মক। এমন অবস্থা কিছুকাল আগে ছিল, আজ হাওয়া অনেক বদলেছে। মানুষের একাংশ এখন বুদ্ধিমান সমালোচনা দেখে পথের নির্দেশ পাবার মত রুচি আহরণ করেছে, উত্তরোত্তর আরো করবে তার চিহ্ন সুস্পষ্ট।

এটা আজও চালানো হচ্ছে, কারণ ব্যবসাদারদের এতে ভারী সুবিধে, তারা যা ছবি করে, সেগুলো যে ভদ্রলোকের পাতে দেওয়া যায় না, সেটা তাদের থেকে বেশী কেউ জানে না। তাই সমালোচকদেরকে মনমরা করে দেওয়ায় তাদের লাভ বেশী। সমালোচকরাও নিজেদের অভিজ্ঞতায় এ রকম চরম হতাশাব্যঞ্জক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন প্রায়শই, তাই তাঁদেরও মন এতে সায় দেয়।

কিন্তু ১৯৫৭ যে ১৯৫০ নয়, বা ১৯৭০ যে ১৯৬১ নয়, এ কথাটা আমরা ভুলব কেন ? খুব দ্রুত এখন পথ পরিবর্তন হচ্ছে, সামনের যাঁকেই হয়তো কিছু অপেক্ষা করে আছে। এ আমার দৃঢ় আশা। এই দ্রুত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে Film Societyগুলি এবং Little magazine-গুলির অবদান অতীব মূল্যবান এবং অবিস্মরণীয়,—বহুজনের বুলি কপচানীর ব্যাপার থাকা সত্ত্বেই কথাটা অনস্বীকার্য। ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে ওঠা উঠতি গুণ্ডাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবহিত থেকেও কথা অনস্বীকার্য। এই সংগ্রামের অগ্রণীযোদ্ধাদের একদল এই সমালোচকেরা, তাঁদের মুখতে পড়লে চলবে কেন ? কাহিনী দু 'সিনেমা কাগজটা ক্লাসে কী কাণ্ডই না বাধাল কলমে এবং হাতে কলমে করে দেখিয়ে। বাংলা দেশকী এখন প্রায় সেই রকম ভাবেই চঞ্চল নয় ?

আর একটা কথা বলেই শেষ করব। সেতু বন্ধনের সেটাও একটা দিক।

একজন ছবি করিয়ে ছবির পর ছবি করে যান। বক্ষ্যমান ছবিটি তার নিরানব্বইটির অনুসৃত নয়,—তার একটা পূর্ব-পশ্চাৎ পরম্পরা আছে, সেই পরিপ্রেক্ষিতে ফেলে যদি ছবিটির সমালোচনা করা হয়, তা হলে ছবি-করিয়ে বুঝতে পারবেন তিনি এগোচ্ছেন কী পেছোচ্ছেন, সমালোচকের কাছে শিল্পীসত্তার গতি-প্রকৃতি প্রকট হয়ে উঠবে, আর সাধারণ দর্শক শুধু শিল্প কৃতিটির নয়, শিল্পীর সম্বন্ধেও পূর্বাপর ধারণা নিয়ে এগোতে পারবেন।

তাই, সমালোচকের কাজটি সমালোচনাই নয়, ভাল কিছু দেখলে তার দূত হয়ে নাকাড়া পিটিয়ে বেড়ানো, খারাপ দেখলে, যুক্তি সহ ওজন করা, দুর্বোধ্য হলে তাকে বোধগম্য করা সাধারণো, এক কথায়, মানুষকে শিক্ষিত করা এবং ছবি করিয়েদের বিবেকস্বরূপ বিরাজ করা।

এ ছাড়া সমালোচকের আর কোন কর্তব্য নেই।

বিশেষজ্ঞ চিত্রব্যবসায়ীদের মধ্য থেকে বাছাইকরা বিচারকমণ্ডলী দেওয়া হচ্ছে

উত্তমকুমার, মাধবী মুখার্জী, বসন্ত চৌধুরী, বিশ্বা রায়, শ্যামলা চৌধুরী, অনুপকুমার, শর্মিলা, তুলসী চক্রবর্তী, অনিল চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যারাণী সান্যাল, অসিত গাঙ্গুলী, শ্রোমী চৌধুরী, বরীন মজুমদার, তনুজা, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, গীতালী রায়, পমিত হত, তরুণকুমার, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, সুচিত্রা সেন, বাসু চ্যাটার্জী, সুব্রতেন্দু চট্টোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, অপর্ণা সেন, বিমলীন রায়, সবুজ দত্ত, নন্দিনী মালিয়া, মিতা মুখার্জী, লিলি চক্রবর্তী, পার্থ মুখার্জী।

প্রতিযোগিতার শর্তাবলী

এই প্রতিযোগিতায় কোন প্রবেশ মূল্য নাই।

সাদাকালো কুপন পূরণ করে আগামী ২৫শে ডিসেম্বরের মধ্যে পাঠাতে হবে।

মুদ্রিত অংশটুকু দেখে এঁদের নাম বলুন

মোট পুরস্কার ৮০০ টাকা

২৫শে ডিসেম্বরের পরে যাকে ফেলা হয়েছে এমন কুপন প্রতিযোগিতায় গৃহীত হবে না।

প্রত্যেক প্রতিযোগীকে এই কুপনটি কেটে নিজে নিতে হবে

প্রতিযোগীর পূর্ণ ঠিকানা এই কুপনের সঙ্গে অবশ্য দিতে হবে।

যদিনি পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এমন কোন ব্যক্তি বা তাঁদের পরিবারের কেউ এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবেন না।

এই কুপনটি কেটে পাঠান

প্রতিযোগীর নাম :

বয়স :

পেশা :

পেশার ঠিকানা :

বাসস্থানের ঠিকানা :

সঠিকসংখ্যক শিল্পীদের নাম :

১।

২।

৩।

৪।

৫।

৬।

৭।

৮।

৯।

১০।

১১।

১২।

হিন্দী ছবির স্বপক্ষে

জ্যোতির্ময় বসুরায়

ওয়াহিদা রহমান

হিন্দী ফিল্মের বদনাম কিন্তু আজ নতুন নয়। এটাই চলে আসছে বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে। বিশেষতঃ আমাদের বিদগ্ধজনের কাছে। বন্ধু-বান্ধব, পরিচিত মহলের মুখে হিন্দী ছবির প্রশংসা কখনও শুনতে পাবেন না। বরঞ্চ তার বদলে হিন্দী ফিল্মকে নাকে হয় নাক সিঁটকানো, নয়তো দু-একটি চলতি ঠাট্টা করে আমাদের সরগরম করবেন। কেউ বা হয়তো বিদ্রূপ করে পরামর্শও দেবেন আমাদের মতন : "হিন্দী ছবি ছেড়ে কী হবে, বলুন তো। দিনের পর দিন লোকে এই আবর্জনাকুণ্ড নরমেধ সহ্য করে? বাংলা ছবির সঙ্গে ওই বস্তুর কোনও তুলনা হয়।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

মজা এই, হিন্দী ছবি সত্যিই চলে। লোকে দেখে। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত এই হিন্দুস্তানের সর্ব অঞ্চলের দর্শক দেখে। পাকিস্তানের লোকেও দেখত এই সেদিন পর্যন্ত, অর্থাৎ যত দিন পর্যন্ত ওই পশ্চিমবঙ্গী রাজ্য আমাদের চলচ্চিত্রের প্রবেশ পথে বাধা ছিল না। তারতের বাইরে নানা রাজ্যে এখনও হিন্দী ছবির প্রচুর চাহিদা। চাহিদা কেন? লোকে দেখে আমোদ পায় বলেই তো। দেখি আমরাও, মনে বাঙালীরাও। না যদি দেখতাম, তবে কলকাতা অঞ্চে বাংলা দেশের মফস্বল অঞ্চল হিন্দী সিনেমার একটা বড় ব্যবসায়-কেন্দ্র বলে চিহ্নিত হত না। বাংলা ছবির আর্থিক সমস্যা নিয়ে আন্দোলন, দুই-চই ইত্যাদিও না। যাঁরা মনে করেন, কলকাতায় হিন্দী ছবি চলে পশ্চিমাগত অবাঙালী অধিবাসীদের জন্যে তাঁদের ধারণা ভ্রান্ত। অনস্বীকার্য নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু কেবলমাত্র তার দ্বারা টিকিট ঘরের সাফল্য নির্ধারিত হতে পারে না। নিম্ন-বিত্ত, মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্ত বাঙালী পরিবারের ছেলে মেয়ে, যুবক-যুবতী, এমন কী বয়স্ক স্ত্রী-পুরুষেরাও কম বেশী হিন্দী ছবির পরিচিত আসক্ত। তবে কেউ কেউ পাঁচ জনের সামনে এই দুর্বলতার কথা স্বীকার করতে অস্বস্তি বোধ করেন, এই যা। পক্ষের অনুচ্ছেদে কথিত এক ধরণের মুখে চলিত একটি সংলাপ বাঁসরেছি: ঘোঁত নিয়ে দেখবেন, এই রকম ভদ্রলোকেরাও বোম্বাই ফিল্মের জন্য রক্ত-জলে করা কতটা পয়সা খরচ করে ফেলেন—এই ধরুন, হাফ-কাপড়ে কিংবা বৈয়রুন্তীমালার "মইরের" প্রথা। অভিজ্ঞতা না থাকলে জানবেন কী করে, ওগুলো "আনমিকসড্ নবসেন্স"।

অতএব ঠকীবাজ করে নেওয়া ভাল, এই বাংলা দেশেও হিন্দী ছবির আসর চমৎকার। বাংলা ছবির বিশেষগুণ নিয়ে আমরা যতই গর্বিত বোধ করি না কেন, ওর গর্বিত যতই মনোরোগ থাকুক, হিন্দী ছবি আমাদের অনেককেই টানে।

তার মানে এই নয় যে, হিন্দী ফিল্মের সম্পর্কে যে নিন্দাবাক্য শোনা যায় সেটা একেবারে ভিত্তিহীন, অথবা তার সবটাই অতিরঞ্জিত। বস্তুতঃ, তার বিরূপ সমালোচনা শুধু এই অঞ্চলেই হয় না, দেশের সর্বত্র সে পচুর নিন্দা ছড়িয়ে থাকে। উত্তর প্রদেশ, দিল্লি, বোম্বাই এবং মাদ্রাজের পত্র-পত্রিকায় তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। অবাঙালী বিদগ্ধ জনেদের কাছে সত্যজিৎ রায়, তপন সিংহ পরিচালিত পরিচালকের তৈরী বাংলা ছবির সমাদর যেমন, সেই তুলনায় নাচওয়ালীওয়ালা হিন্দী ছবির আদর সামান্যই। বিদেশ থেকে যে সব চলচ্চিত্র-চলচ্চিত্র এবং সমালোচক এ দেশে আসেন, হিন্দী ছবি দেখে তাঁরা আদৌ সন্তোষবোধ করেন না। অনেকেই তাঁদের বিরক্তি গোপন করেন নি। বাংলা ছবির প্রশংসা করে কেউ কেউ (যেমন, এক পোলিশ সমালোচক) বাদরায় এবং বোম্বাইয়ের তৈরী হিন্দী ছবির অবাস্তবতায় কাগজটা সোজা-সুজি ভরে দিয়েছেন। জীবনকে এঁরা (অর্থাৎ বোম্বাই ও মাদ্রাজের চিত্র নির্মাতারা) ছবির পরদায় দেখতে ভয় পান কেন—এই প্রশ্নেও তুলেছেন।

কথাটা তাহলে এই, রসিক সমাজে হিন্দী সিনেমার গুণগত স্বীকৃতি পত্রে সেই কলঙ্কই চলে, কিন্তু জন-আদালতে নালিশ

হয়ে ওঠে পক্ষে। কাজে-কারবারে হিন্দী ছবি নিশ্চিন্ত, কিন্তু সে প্রদর্শনে।

এখন, এই নিন্দা আর প্রদর্শনক্ষেত্রের কারণ কী? এ বিষয়ে এক কথায় বলা যায়, যে কারণে সে উপহসিত, কষ্টটা তা-ই তার প্রদর্শনক্ষেত্রে মূলে।

ভারতীয় চলচ্চিত্রের শিল্পের আমি বা মধ্য পর্যের কথা থাক, বর্তমানে এই শিল্পের ব্যবসায়িক চেহারাটাই পরখান। বিশেষ করে যেখানে হিন্দী সিনেমা তৈরী হয়, সেই বোম্বাইয়ের কথাই বলা যাক। যারা সেখানে ছবির জন্য অর্থ বিনিয়োগ করেন, অভিনয়ের টাকার বিটারনের অঙ্কটাই তাঁদের কাছে বড়। অর্থ লগ্নির আসলটা নিরাপদ ভবে পয়সার বিনিময়ে যোগাতার উপর। অর্থাৎ যত বেশী দর্শক টিকিট কিনবেন, ছবির ব্যবসায়িক সাফল্যের সম্ভাবনাও তত। ফলে, সকল শ্রেণীর দর্শকের মনোরঞ্জন হয়ে চিত্র নির্মাতার লক্ষ্য। মুখ্য লক্ষ্য। দর্শকদের রুচির স্তর ভেদ থাকে, এটা সকলেই জানেন। নানা রুচির দর্শকদের (তাঁদের মধ্যে আছেন শিক্ষিত, এবং শিক্ষিত বা অল্প শিক্ষিত, নিরক্ষর; মনস্তাত্ত্বিকে তাঁরা আবার বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত) চাহিদাও নানা রকম। সেই চাহিদার ছোট-খাট পারমুটেশন কম্বিনেশন করে মিলে তাই চিত্র নির্মাতারা কাজ করে থাকেন। হিন্দী ছবির ব্যবসায়িক সাফল্যের বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই মিনিমাম স্পষ্ট হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের কিছু পরে "চন্দ্রলেখা" নামে ছবিতে অনন্যা দর্শককে খুশী করবার একটা উল্লেখযোগ্য চেষ্টা দেখা যায়। ততকথা সেই ফরমুলাই পরোক্ষন মত পরিবর্তন-সহ আরও ব্যবহার করা হয়।

মুক্তিপ্রাপ্ত 'কমললতা' ছবির নায়িকা মুচিত্রা।

এই ফরমুলার মোড়ার কথা হল দর্শকদের ইচ্ছা পূরণের ব্যবস্থা। বাস্তব জীবনে যে-বাসনা পূর্ণ হবার নয়, অবচেতন শ্রেণীমানসে নায়ক-নায়িকার সঙ্গে একাত্ম হয়ে অনেকেই সেই ইচ্ছা মনে মনে মিটিয়ে নিতে চান—এই সার কথাটা চিত্র-পরিচালকরা সহজেই বুঝে নিয়েছেন। ইচ্ছা পূরণের অনেক দিক। সহজেদে ব্যাপারটি স্পষ্ট দেখার সঙ্গে তুলনীয়। আর কিছুদিন আগে কলকাতায় "সপনো-কা সওদাগর" নামে একটি ছবি দেখানো হয়। সেই ছবির নায়ক (রাজকাপুর) সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে স্বপ্ন বিক্রি করে বেড়ায়, অর্থাৎ যার যা অন্তরের বাসনা তা-ই পূর্ণ করে। ফাউকে বিক্রয় করে না। হিন্দী ছবির পরিচালকরা ঠিক ওই সওদাগরেরই মত। তাঁরা দর্শকদের তিন ঘণ্টার জন্য প্রেমিক থেকে পলায়নের একটা সুযোগ করে দেন; এরপর এক জনের মনোদুঃখ করে যেন তাঁদের।

এরই সঙ্গে চাই নানা রস, বিবিধ পরোক্ষ-উপকরণ এবং আড়ম্বর। নানা রস বলতে নানা ভাবরসের। পরোক্ষ অবশ্যের ব্যাপারটি হল অবশ্যই স্পেস। সেখানে বড়-লোকের ছেলের সঙ্গে গরিবের মেয়ের ভালবাসা অথবা উল্টোটা দেখতে হবে। অধিকাংশ হিন্দী ছবির প্লটের মূল সূত্র তা-ই। এই সঙ্গে প্রসাদে পারে প্রণয়। সেই বা বাসনা। প্রসাধিত ঘটনাসংঘাত। পেটের পরিপথে বাধা আঁ-থোর্ন। সেই বাধা সৃষ্টি করতে খলনায়ক। আর খলনায়কের অভিপ্রায় মনেই পরখে নানা চক্রান্ত, পরিণামে সংঘর্ষ। ভয়ানক প্রেমের উদ্দীপন তার কাজ। শেষে যখন তার পতন হবে, তখন নায়ক-নায়িকার মিলনের পথ পরিষ্কার হো হবেই সেই সঙ্গে অন্যায়ের-পরাজয়-নায়কের-গ্রহ বরনের বার্তাও হবে পরিস্ফুটিত। এই সেনটিমেন্টের ব্যবস্থাও চাই। আরও একটি কথা যে কোন হিন্দী ছবির পক্ষে অপরিহার্য। সেটি হল কৌতুক।

পরোক্ষ-উপকরণের মধ্যে পরখান নাচ-গান। দেশী, বিলাতী, না-দেশী-না-বিলাতী—সব রকম নাচেরই আয়োজন থাকতে পারে। গানের সংখ্যা যত বেশী সম্ভব ততই ভাল। এছাড়া কখনও সারোয়াল, কখনও ঐতিহ্যিক, কখনও মোটর রেস, কখনও বা কুস্তি-বক্সিং ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকে। সব শেষে আড়ম্বরের কথা। প্রাকতরুণ যে শো-বিজনেসের একটি বড় শর্ত সেটি হিন্দী চিত্রের পরোক্ষকরা কখনও ভুলে থাকেন নি, তখনযায়ী কর্মপন্থা নির্বাচনে কার্পণ্য করেও না। আড়ম্বর বলা যায় ছবির প্রচারণার অর্থাৎ সেট-সৌষ্ঠব, পরিপাটীর বেশভূষায়, প্রাণ-বান্ধ-পরে ইত্যাদির। দর্শকের চোখে সোনা লাগানোটাই উদ্দেশ্য। এ ব্যাপারে বৈচিত্র্যও দরকার। তাই নায়ক কিংবা নায়িকার অথবা দুজনেরই পরিধেয়ের বাহুল্য অবশ্যই অন্তত দেখানোই অনেক দিন থেকে আর অঙ্গেই নয়। চিত্র-পরিচালকদের তাই বিদেশী ক্যামেরাম্যানের ইউনিট নিয়ে কিছু দিনের জন্য যেতে হয় শ্রীনগরে কিংবা সুইজারল্যান্ডে, কিংবা উটকামুন্ডে অথবা কোথাও সৈন্য-বহরে। তাতেও হয় না, কারণ বাজারে কালচারীর চোখে দর্শকেরা চোখে ধোঁয়া দেবার লাগাতে চায় না। ফলে নিরুপায় পরিচ্ছদ দিতে হয়। লাক্সন, প্যারিস, মেক্সিকো, রোম, হৌকিও। এসবও যখন পুরনো হয়ে যায়, তখন হয়তো মানসিকতার কথা ভাবা হবে, কিংবা আফ্রিকায়। ব্রাকেজনত বা আড়ম্বরের মনাই ভঙের আড়ম্বানি। গত এগার বছরে রঙিন হিন্দী ছবির সংখ্যা আশ্চর্যে রকম বেড়ে গিয়েছে। এখন গড়পড়তা ৬৫ কিংবা ৭০ টি হিন্দী ছবিই সম্পূর্ণ রঙিন। ৭০ মিলি-

'নান্হা ফরিস্তা' ছবির একটি দৃশ্য।

ছিটার পর্যায়ভুক্তে এখনও এমনে ছবি তোলা হয় না। হয়তো অদূর ভবিষ্যতে কোনোই ওরাও ব্যবস্থা করবে।

নানা কারণে (তার একটি হল স্টার সিস্টেম) দিন দিন ছবি নির্মাণমূল্য বেড়ে-চলেছে (এখন একটি রঙিন হিন্দী ছবির খরচ ধরা যেতে পারে ৬০ কিংবা ৭০ লক্ষ টাকা); সেই হিন্দী ছবির পরিচালকদের কিন্তু শিল্পচিন্তার উৎকর্ষ হবার অবকাশ কোথায়? শহুরেদের চিত্তবিনোদন যেখানে প্রধান-লক্ষ্য, সেখানে দূর বাস্তব কিংবা জীবনের সত্য ফুটিয়ে তোলার কথা তারা হবে কেমন করে? তাইতো ছবির পরদায় জীবনকে দেখতে তারা ভয় পান। তাই সাহিত্য মূল্য-বঞ্চিত অভিজ্ঞতের গল্প নিয়ে তাঁরা ফুপরেখা তৈরি করেন; দর্শক-দের স্বপ্ন দেখান; হাসান, নাচা তাদের চমকিত, পুলকোদিত করেন; মানসিক উত্তে-জনার ভরসে ওরেন বিনোদন। কিন্তু, যে-উদ্দেশ্যে তাঁরা ছবি করছেন, তা কি বিফল হয়? সে কথা তো বলা যায় না। লক্ষ লক্ষ লোক তো মিথ্যাই আনন্দ পেয়ে যাচ্ছেন। আর তা-ই যখন ব্যাপার, তখন বোম্বাই চলচ্চিত্রকারদের কাছে—চূড়ান্তভাবে, বিফল বলে বা সমালোচকরা যা-ই বলুন—একটি ছিয়ে অন্তত সার্থক।

শিল্পমূল্য যত কমই হোক, হিন্দী ছবির কলাকৌশলগত উৎকর্ষের কথাটা কিন্তু অবশ্যই স্বীকার্য। প্রায় প্রতি হিন্দী ছবিতেই নির্দ্বিধায় সাধিপাত্যের বিষয়টা লক্ষ্য করবার মত। ফোটোগ্রাফিক, শব্দ গ্রহণ, সম্পাদনা —বস্তুত টেকনিকাল বিভাগের প্রতিভক্তের কাজে কলা-কুশলীদের দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। সেই সঙ্গে সুশৃঙ্খল কর্মপদ্ধতিরও। যে-কোনও হিন্দী ছবিতে এমন কিছু দৃশ্য পাওয়া যাবে যা দেখে বিস্ময়ে অবাক হতে হয়। যেমন ধরা যাক, জলতরঙ্গ দৃশ্য, কিংবা উৎসব সংক্রান্ত-দৃশ্য ইত্যাদি। এইসব দৃশ্যসংগঠনে একটা অদ্ভুত ভাইটালিটি থাকে, যাকে আনন্দময় গতিবেগ। একক অথবা দ্বৈত নৃত্য দৃশ্যের সফলতাও লক্ষণীয়। নৃত্যমূল্য পরিচালন বিরাট সেটে তোলা হয়—এক-একটি দৃশ্যসংগঠনের পৈছে আনুমানিক হাজার ফুট। দৃশ্য গ্রহণের সময় এসব ক্ষেত্রে খুবই ব্রাটিল; ব্যাহত, পদে-পদে সাবধানে পদক্ষেপ। অংশে অংশে ক্যামেরাপজিশন বদল করে ক্যামেরাম্যান কাজ করেন। দৃশ্য রচনার বৈচিত্র্য তো আছেই, সেই সঙ্গে সম্পাদনার গুণও এই ধরনের দৃশ্যসংগঠনে তাৎপর্য করবার মত। কিছুকাল আগে দেখা 'হকেচারী' নামে একটি ছবিতে পরপর দুটি নাচের দৃশ্য আজও মনে আছে। অসাধারণ সুকৌশলসম্মত একটি ছবি দেখতে দেখতে দৈবত ভাওয়া নাচের এক দৃশ্যেও মোহাবিষ্ট হয়েছি। এই রকম অনেক ছবিরই উল্লেখ করা যায়; এখানে তালিকা আর বাড়ালাম না।

কাজারে, টুইস্ট এই জাতীয় এবং না-দেশী-না-বিদেশী নাচ ছাড়াও এখন নৃত্যদৃশ্যও বিভিন্ন ছবিতে স্থান পায় যেখানে ভারতীয় নৃত্যকলার আঙ্গিক অনু-সৃত। কথক, ভরতনাট্যম, কথাকলি এবং বিবিধ লোকনৃত্য আজ যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, তার মূলে হিন্দী সিনেমার কিছু দান অবশ্যই আছে। নৃত্যের ক্ষেত্রে হিন্দী ছবি যে-টুকু পরিমাণ ছবি করতে পারে, তার অনেকগুণ বেশী পারে সঙ্গীতের সাম্রাজ্যে। হিন্দী সিনেমার সংগীত 'ফিল্ম মিউজিক' কতখানি সে আলোচনা অন্য পরিসরে। সংগীতের ব্যবহার কতটুকু শিল্প-সম্মত হয়, সে-পরিমাণও তুলতে চাই না। এখানে আমি বলতে চাইছি, হিন্দী ছবির গান, গান হিসাবে সাধারণভাবে উৎকৃষ্ট। বোম্বাইয়ের অধিকাংশ সুরকারের সংগীত সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন জ্ঞান আছে, আছে পরিমিত সুরবোধও। রাগভিত্তিক গান হিন্দী ছবিতে আগেও বিরল নয়। ঠুংরি-অঙ্গের গান, ভজন, কাওয়ালী ইত্যাদি তো পরিচয় শোনা যায়। তাছাড়া সুর নিয়ে নানা পরীক্ষার নিদর্শনও পাই। পাশ্চাত্য সুরের আবহ নিয়ে রীতিত

শুধু হিন্দী এই সমস্যের উপলব্ধিতেই।
মোট কথা, হিন্দী ছবির গান শুনতে ভাল
লাগে, সেটা মন-মজানোর সুরের
জন্যে, সঙ্গীত
হচ্ছে। হিন্দী
ছবির গেয়ে গেয়ে
হলে যায়।

বাংলা ছবির ক্ষেত্রে
প্রথমেই মনের দুটি দিক:
কলাকৌশলের উৎকর্ষের
সন্ধানের ক্ষেত্রে। সঙ্গীতের প্রধান
দুটিতের নিজস্ব জগৎ হিসাবে ধরি
বলাই বাহুল্য। আর তাছাড়া সত্যজিৎ
তপন সিংহ মৃণাল সেন ঋত্বিক
ঘটকের ছবি ছাড়া অন্যান্য
বাংলা ছবিতের তো সংখ্যা
অত গানের জন্যই গান ব্যবহৃত হয়।
ক্ষেত্রে এমনকি চলচ্চিত্রে সঙ্গীতের ব্য-
বহার চেয়ে হিন্দী ছবির গান অনেক বেশী
সুযোগ্য। (রবীন্দ্রসঙ্গীত, কিংবা অতুল-
প্রসাদের গান, অথবা অজন ইত্যাদির কথা

প্রথম আমাদের
বা এইদের
বিষয়ে সমস্যা

এমন
আছে যেটা
পড়ে ওঠেনি
উপকরণযোগ্য
ধরনে
বিষয়ের
নিয়ে আসবে।

শারদীয় আকর্ষণ

চন্দন আশীষ
পরিকল্পনের

নিত্যানন্দ দত্ত
প্রযোজিত

মহিষাসুর মর্দিনী

প্রধান উপদেষ্টা ॥ পীযূষ কান্তি মুখোপাধ্যায়
গীত রচনা ও সংগীত যোজনা ॥ সংলাপ ॥ বিজল ভট্টাচার্য
অনিল চট্টোপাধ্যায় ডঃ বিভূতি মুখোপাধ্যায়
সম্পাদনা ॥ রমেশ যোশী
বিশ্ব পরিবেশনায় ॥ নিত্য ফিল্মসার্ভিস • ৬/৩, ম্যাডান স্ট্রীট

তিনজন

প্রথম পরিচালক
প্রথম নায়ক
প্রথম নায়িকা

তপন সিংহ

আজকের বাংলা ছবির বাণিজ্যের সাফল্যের সূত্রপাতের নাম তপন সিংহ। তপনবাবুর ছবি মাত্রই ব্যবসা সফল হিট। পঞ্চাশ দশকের ছবির চলমান সাফল্যের পর শ্রীসিংহের এই জনপ্রিয়তার তপস্যা স্থির, বিশ্বাসে বিশ্বকর্মার অনেক দেরি এখন। নতুন পরিবেশকরাও ছবি কিনছেন তাঁকে দিয়ে। ব্যবসায়িক দিক থেকে এটা ভরসার কথা সেখানে অভিনেতা বা মুখোশ পরিচালকের পরিবর্তে কাজ তাঁদের কাছে অনেক সহজ, এমন কি অভিনেতা-অভিনেত্রী নির্বাচনে সাফল্যের সাবলম্বন নয়। তপন সিংহের এই নির্ভরতার সাফল্যের প্রতিষ্ঠা অবশ্য হঠাৎ আসে নি। প্রায় তপনবাবু, জানেই আর্থিক সিদ্ধান্তিনী।

এমনটি কিন্তু চিরদিন ছিল না। যদি তাই হত, বলা যায় না হয়তো তখন সিংহকে আমরা এভাবে পেতাম না। 'অঙ্কুশ' 'উপহার' ছবির পরিচালক তখন সিংহ আর প্রযোজক 'সাগিনা মাহাতো'র পরিচালক তখন সিংহের সঙ্গে ফারাক অনেকটা। তফাৎ শুধু চিন্তায় নয়, দেখার ভঙ্গিতেও। এটাই নিয়ে আলো। তবে একটা ব্রিটিশ লক্ষ্য করার মত যে, নতুন পুরোনোর দ্বন্দ্বকে তিনি প্রায় সব ছবিতেই ফেলে নেন। 'প্রতিশ্রুতি', 'হাসুলী বাঁকের উপকথা', 'কাবুলিওয়ালা', 'ঝিন্নুমুন্নু', আরোহী, হাটে-বাজারে পরিচিত ছবিতে এক কনফ্লিক্টকে কথা বলে এসেছেন। জানি না, তপনবাবু নতুনকে কি-ভাবে গ্রহণ করেন বা পুরোনোকে বর্জন করেন কি মন নিয়ে, তবে তাঁর পরিচয় ছবিতে এ সূত্রে স্পষ্ট যে নতুনের পরিচয় আবেদন পুরোনোর দাবী ছাড়া অতিরিক্ত কিছু নয়।

তাঁর পরের ছবি 'অঙ্কুশ' নিয়ে কথা বলবার সময় এখন। এ ছবিতেও সেই মূল সূত্রে একই গান বেঁধেছিলেন তিনি। ছবির নাম ছিল এক রাজা। এক গ্রামের-লিত রাজা এলাকাটিতে কথা থেকে কিছুটা দূরত্বে আলায় একটা রাজা ছেলে। সবার সঙ্গে মেলার সে রাজার শিক্ষা চলে। রাজার অসুরে এক টিলার ওপর একজন সাঁওতাল এসে বাসা বাঁধে। রাজা ওদের মনোমত দেন সেখানে থাকার। অন্যদিকে রাজার একমাত্র ছেলে-বৌ নিয়ে পরবাসে। সে আবার সত্যাতত্ত্বের ছাত্র। বাবার রাজা রাজত্ব করে একটা পছন্দ নয় তার। আধুনিক যুগের রাজত্ব মানুষ সে। তাই তার পছন্দ বেশী। ছুটিতে একদিন এক ঘোড়সওয়ার পিছু থেকে পড়ে গিয়ে হাসপাতালে মারা যান। ছেলে শুধু খোকা ফিরে আসে। নতুন করে সাজাতে চায় সে রাজত্বটাকে। বাবার স্মৃতির প্রতিই সে রাজাটাকে বিক্রয় করতে পারে না কিন্তু তার জন্য বাড়ি পরিচয় খরচ করতেও নারাজ। সারা দিন বেচারী ওই বাঁধা খদ্দের রাজার সামনে। সেও এখন একা। রানীকে মতো তাকে যদি আঘাত করে গভীরভাবে। কিন্তু, বোবা ভাষাহীন সে। পুরোনো নিষ্পলক চাহনি ছাড়া সম্বল কিছু নেই তার।

রাজার ছেলে এদিকে সাঁওতালদের ছিনি ছেলে তার পরিবেশটিকে মন কিসের সন্ধানে যেন ছেলে ওঠে। কেননা ঐতি-হাসিক সূত্রের সন্ধানের প্রশ্ন সাঁওতালদের সে রাজত্ব ছেড়ে দিতে বলে। কিন্তু তারা নারাজ। তাদের জন্যতম 'তোমার যারা আমাদের এ রাজত্ব দিয়ে গেছেন। আমরা নড়ব না।' এ নিয়ে সংগ্রাম অনিবার্য হয়ে ওঠে এবং একদিন তা পরেল আকার ধারণও করে। কিন্তু, সাঁওতালরা ভেঙে বিচলিত হয় না।

সেক্রেটারী রাজাসাহেবকে পরামর্শ দেয় রাজাটাইকে কিনিয়ে উপোস করিয়ে রেখে তারপর তাকে সাঁওতাল পাড়ায় ছেড়ে দিতে। এক দিনে দুই পাখী মারার মতলব আঁটে সে। কথামত কাজ হয়। ক্ষুধার্ত পাগল উন্মাদ রাজা ছেলে তখনও ওকে মেরে তাদের দলপতি। সেক্রেটারীর মতলব সফল হয়, সাঁওতালদের তীরের আঘাতে মারা পড়ে রাজাটা। আর সাঁওতালরাও চলে যায় অন্যত্র ছেড়ে।

ছবির এ সমাপ্তি পুরোনোর আত্ম-হত্যাকে মেনে নিতে পারেন করার তপনবাবু, বলেছিলেন 'পুরোনোর এই আত্মসমর্পণে আমি তখন অন্ততঃ সে মন নিতে পারি নি। নতুনের প্রশ্নও ছিল, পাওয়া হয় নি অবশ্য।'

ছবি করার পেছনের কাহিনী সম্পর্কে তিনি বলেছেন—'বিলেত থেকে এসেই লাল আলো ছিল একটা কিছু করবার কোঁক তো ছিলই। একদিন স্টেটসম্যান পত্রিকায় নারায়ণ গাঙ্গুলীর এ গল্পটা (তখন নাম ছিল 'সৈনিক') পড়ে মাথায় এল ছবি করার কথা। চিঠিটা করে ফেললাম তাড়াতাড়ি। কিন্তু, টাকা দেবে কে?

'শেষ অব্দি আমরা কয়েক বন্ধু মিলে শুরু করলাম ছবির কাজ। শেষও হল একদিন।'

কিন্তু ছবির মুক্তির ব্যাপার নিয়ে বেশ কিছু দিন ঘোলার পর কর্তাদের মন ভুলল, দর্শক নিল না ছবিটাকে। অবশ্য দর্শকদেরও ঠিক দোষ দেওয়া যেতে পারে না। কারণ এক সপ্তাহ পরে খবরের কাগজে পরেশবাবুর সমালোচনা বেরোবার পর দর্শকদের কাছ থেকে সাড়া পাওয়া গিয়ে-ছিল। কিন্তু অর্থপ্রেমী ব্যবসায়ীদের মাঝিল চকমেলা পড়ে যাওয়ার মাথায় ছবিটাকে তুলে নেওয়া হোল। শুনেছি সে ডিস্ট্রিবিউটর টের এখনও পেয়ে নি। মামলা চলছে।

ব্যবসায়িক সাফল্যের কথা থাক। ব্যাটেলেরের ছবি তোলা তখন খুব একটা হোজ না। মূল ও'হিনের ইনডোরের কাজ ছাড়া বাকি সবটাই তিনি করেছিলেন কাঞ্চনজঙ্ঘা, ঘাটশিলা, বহরমপুর আর ডিপ্রুগড় মহারাজাদের বাড়ীতে। আশে-পাশের অঞ্চলে এক্সটেরর আউটডোর লোকেশনে কাজ তখন হতোই না প্রায়। (সত্যজিৎবাবু অবশ্য এ সময় 'পথের পাঁচালী' করেছিলেন) সে ব্যাপারে 'অঙ্কুশ' নতুনত্বের দাবী অবশ্যই করতে পারে।

পঞ্চম ছবি পরিচালনার অভিজ্ঞতার কথা জিজ্ঞেস করায় প্রথম ছবি করার। স্বাভাবিকভাবেই উত্তেজনা ছিল কিছু। তবে তেমন কিছু নয়। কাজ করতে গিয়ে নতুন হলেই টেকনিক্যাল দিকে কোঁক ছিল বেশী। আর আর সেদিকে কোঁক নেই। বক্তব্যটাই আজ আমার প্রধান চিন্তা।'

'অরুণ' করার সময় বন্ধুত্বের দিকে বন্ধুর যদি কিছুমাত্রও ঝোঁক ছিল তিনি তা দিয়েও থাকেন তবে তাঁদের মনে সুরে তিনটি ছিল, পরিবর্তন যেটা কিছু হয় নি। আমেরিকা চিত্র ব্যবসায়ী যা ঠেঁচেছে তা হলো তপনবাবুকে অন্য ছবি করার সোনেমা নাম করতে হবে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ, কিন্তু তবুও তিনি তাঁর করতে পেরেছিলেন। করেছিলেন 'উপহার'। নিশ্চয়ই তাঁরই তপনবাবুর কপালে আর্থিক সাফল্যের সর্বোচ্চতা লিখিয়ে দিয়েছিল। সেই থেকে শুরু। 'অরুণে'র আগে তিনি 'উপহার' দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন বলা যায়।

সৌমিত্র

ছবি দেখেই সত্যজিৎবাবুর মনে 'অপুর সংসার' করবার ইচ্ছে হয়। আদৌ ভাবেন নি এ ছবি করার কথা।' —কথা ক'টা বলছিলেন সৌমিত্র চ্যাটার্জি। আজকের ঝালো চিত্র প্রযোজকের অনাতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী। ('শ্রেষ্ঠ' কথাটি ব্যবহারে আমার তীব্র আপত্তি আছে) অভিনয় যে শুধুমাত্র কতগুলো বিশেষ ভঙ্গী আর বিশেষ স্বর-ক্ষেপণের কাজ নয়, আরও গভীরে কিছু তা সৌমিত্র চ্যাটার্জিই প্রমাণ করে দিয়েছেন পুরস্কার ছবি 'অপুর সংসারে'। অন্য কোন ছবির কথা যাক দিচ্ছি, শুধুমাত্র 'অপুর সংসার' নিয়েই আলোচনা করছি। অভিনয়কে আবহমান, অভি নাটকীয়তা সম্বল করে যে সকল অভিনেতা তখন সম্ভা চলচ্চিত্রের একেবারে চূড়োয় তারা দেখলেন 'অভিনয়' বস্তুটা কি। বাস্তব আর অভিনয় এর মধ্যে ফারাক যত কমানো যায় অভিনয় তত 'অভিনয়' হয়ে ওঠে। স্বরক্ষেপণ বা বিশেষ ভঙ্গী দিয়ে চোখ ভোলানো হয়ত যায় না। তাই সৌমিত্র চ্যাটার্জি' পরদায় ছবিতেই মন কেড়ে নিয়েছিলেন অনেকের।

রেডিওতে যেকেরের কাজ করেন তখন সৌমিত্রবাবু। হঠাৎ একদিন ও'র এক পরিচিত (সত্যজিৎ রায়ের সহকারী ছিলেন তখন) ও'কে নিয়ে গেলেন সত্যজিৎবাবুর বাড়িতে 'অপরাজিত'র অপুর জন্য। কিন্তু বয়সে বড় হওয়ায় ও'কে তিনি নিলেন না কথা তবে 'অপুর সংসার' করার কথা ভাবতে শুরু করলেন সত্যজিৎবাবু। 'অপরাজিত'র পর কাজ শুরু হলো ছবির। রেডিওর কাজ ছেড়ে দিয়ে কাজ শুরু করলেন সিনেমায়। সেই থেকেই যাত্রাপথের শুরু। শেষ কতদূরে তাঁর যাত্র সামনে আসে না এখনও।

অবিনের পথের ছবি সত্যজিৎবাবুর হাতে পড়ার ভবিষ্যতের পাথেয় যে কতখানি সম্বল হয়ে গেছে ও'র তা উনি বার বার স্বীকার করেন। শিল্পী জীবনের কাজে হাতে খড়ি আর প্রায়শঃই সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে কাজ। কোনো অসুবিধেই হয় নি। বরং উনি বরেই নিয়েছিলেন সিনেমার কাজ সাধারণভাবে সত্যজিৎবাবু যেভাবে, সে ভাবেই করেন সেরকমই।

কিন্তু সবে অন্য পরিচালকদের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে বুঝেছেন, সত্যজিৎবাবুর সঙ্গে তাদের তফাৎ কতদূরে ও কত-টুকু। বারবার বাইরে। মাঝে মাঝে মনে হয়, সত্যজিৎবাবুর এত ছবিতে কাজ করার ফলে ছবি তথা সম্পর্কে আমার যা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়েছে তা অন্যান্য অনেকের চাইতে কম নয়। কথা ক'টা বলে হেসে উঠলেন সৌমিত্রবাবু। শিবনাথ শাস্ত্রী রামমোহনের চরিত্র সম্পর্কে এক জায়গায় উল্লেখ করে-ছেন যে, রামমোহন অন্যান্যদের তুলনায় এত উঁচুতে যে তাঁকে অভিকরে করতো মুস্কিল কথা, তাঁরও সাধ্য নেই যে তাঁকে স্পর্শ করে। সৌমিত্রবাবুর কথা শুনে সত্যজিৎ রায় সম্পর্কে সে কথা বলতে ইচ্ছে করে।

যাই হোক, অপুর চরিত্র কেমন লেগে-ছিল পর্দায় করার ঔঁর প্রথম বিশ্লেষ-'নির্লিপ্তভাবে বলব খু-উব ভালো লেগেছে তবে একটা ব্যাপারে হোল, চরিত্রের সঙ্গে কোন দিন আমি একাত্ম হয়ে যাই না, বরং বলতে পারি ইনটারপিটে করি। যতটুকু সম্ভব সাধারণ পর্যায় আনতে চেষ্টা করি, পরে দিতে হয়। 'অপু'র চরিত্রের ঐ মেয়ার ও ছিপ্রা আমার ভালো লেগেছিল যার জন্য 'অপু'কে আমি নিজের করে নিতে পেরেছিলাম, বুঝতে পেরেছিলাম। অবশ্য ভবিষ্যতে আবার আমাকে ঐ চরিত্র করতে দেওয়া হয়, হয়তো নতুন করে আরো চরিত্রটিকে।'

অভিনয়ের জন্যে যে পটভূমি তৈরী নিয়ে আলা লেগে কখনই কোনোদিনকে হয় না, যা হয় তা অভিজ্ঞতার সুখের সঞ্চয়-ভোগ মাত্র। তবে, সে ছোক্কা থাকেই বা কতক্ষণ? মুহূর্তের উলসাস্তি মুহূর্তেই শেষ হয়ে যায়, স্মৃতিপটে থাকে না কিছুই। কিন্তু মনে করে দেখুন, অপুর সংসারে, মেধী, সন্ধ্যাস্ত, অতিথান, চারুলতা, কাপুরুষ কোনো ছবিই সৌমিত্রকে ভোলা যায়ে কি কোনো দিন?

'অপুর সংসার' সৌমিত্র মুক্তি পায় তখন বিশেষ কোনো পরিস্থিতিতে হয় নি মনে। সিনেমায় অভিনয় করেন বলে যে 'হিরো' বনে গেছেন উনি তেমন কোনো চিন্তা সৌমিত্রবাবুর মনে আসে নি। উনি বললেন,—বরং 'দেবী' রিলিজের আগে একটু কৌতূহল হয়েছিল যে প্রথমের ছবির না পুনরাবৃত্তি করে ফেলি। কিন্তু ছবি দেখে বুঝলাম—হয় নি।

এক-একটা ছবি করার পর যে তিনি কতবার বদলে দিয়েছেন তার অন্ত নেই। বিশেষ একটা দৃশ্যের (যেখে ইন্দিরার পাশ দিয়ে যখন ট্রেনের লোকেরা কবিতা আবৃত্তি করতে করতে ফিরছেন।) কথা সম্পর্কে জানালেন—'ঐ দৃশ্যটা আমাকে কম করেও পনেরোবার বদলে দিতে হয়েছে শুধুমাত্র পরিবেশন আমার মনে। এখন আর অবশ্য তত বদলার প্রয়োজন নেই। প্রতি-শ্রুতির কুয়াশে সত্যজিৎ রায়ের স্মৃতি কম নয়, ঐ সম্বল পাথেয় করে শুরু শিল্পির জীবনের সফর নিয়ে ছেড়ে চলেছেন তিনি নিজের পথে। সত্যজিৎবাবু, যেমন অপুকে অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিয়েছিলেন ছবিতে, তেমনি তাঁকেও তাঁর অনির্দিষ্ট পথে নির্দিষ্ট গন্তব্যে যাত্রা করেছেন তিনি। সৌমিত্রর দিনা তা পরের কথা, কিন্তু এখনো পূর্ণচ্ছেদ বসাতে আপত্তি কোথায়?

মাধবী

নিরীক্ষিৎ

বাংলির 'চারুলতা' ছবির পরবর্তীর পর বিভাগকদের কেউ কেউ চারুকেই দেখেন

'তালাশ' ছবির একটি দৃশ্যে রাজেন্দ্রকুমার ও শর্মিলা।

অভিনেত্রীর পুরস্কার দিতে মনস্থ করেছিলেন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত তা হয় নি। না হোক্, মাধবী চক্রবর্তীর (তখন মুখার্জি ছিলেন) এর ইতর বিশেষ হয়ে যায় নি এখনো তাঁদের মনে। 'রহস্যময়ে'র আরতি আর 'চারুলতা'র চারু মিলে ছিলে এক অপরূপ শান্ত সৌম্য সন্ন্যাসিনী যেন যেন। 'সুবর্ণরেখা'র সীতার আরাধ্য প্রতিরূপ।

সত্যজিৎ যখন এই অপরূপাকে এনেছিলেন তখন এতটা ছিল না সবলা। 'নায়িকা' তিনি এক কিশোরী বলা যেতে পারে। যেকে এল মৃণাল সেনের 'আইন পরমেশ' ছবিতে। প্রথম নায়িকা হলেন মাধবী। পেয়ার এসেছেন অনেক চড়াই-উৎরাই অনেক পথ। কিন্তু এখনও ভুলতে পারেন নি আইনে পরমেশের সেই বর্ষণমুখর রাতকে। থেকে থেকে মনে পড়ে যায় সত্যের নায়িকা হবার কথা।

'আমি ছবির নায়িকা'—তাতেই যেন যেমন উত্তেজনা এসেছিল মাধবীর। ছবিতে প্রেমেটাকটি পাবার আনন্দ তো ছিলই —তার ওপর আবার মৃণাল সেনের সঙ্গেই উপহার, কাজ করানোর ভঙ্গী তাঁকে এতটাই মাতাও কেনো সাজটের মুখে ফেলে নি। নায়িকা চরিত্র যোগাতা তাঁর কতটুকু, ছিল সে ব্যাপারে নিজের মাধ্যে মাধবীর সন্দেহও সামান্য ছিল, কিন্তু ছবি তৈরী হবার পরে পর্দায় নিজেকে দেখে খুব খারাপ লাগে নি। মৃণালবাবুর এ ছবিও তো বিশ্বসেরা ছবির দিক থেকে নতুনত্বের দাবী করতে পারে। ছবির কপালে আর্থিক সাফল্য তাই ছিল না। বেশী দিন চলে নি ছবিটা। সেই অল্প সময়ের মধ্যেও যাঁরা ছবিটি দেখেছিলেন তাঁরা পরিষ্কারভাবে স্বীকার করেন তখনকার 'সেরা' সব অভিনেত্রীদের পাশে এক নতুন মূর্তি নিয়ে হাজির হয়েছিলেন তিনি। এক নতুন প্রতিভার জন্ম দিয়েছিল 'আইন পরমেশ'।

'সৌসিল' বা 'আইনে পরমেশ'র জন্মে প্রচুর পড়ার অভিনয়ে ও অভিনেতাদের মধ্যে নাটক করার অভিজ্ঞতা কিছু সম্বল ছিল। তাই নিয়ে চরিত্রে ফিল্মে এসে পরমের পরমের অসুবিধেই হয়েছিল। তারপর পরে গেছে সব। চিত্রজগতের হৈচৈয়ের সঙ্গে তিনি নিজেকে কোনো দিনই খাপ খাওয়াতে পারেন নি। 'সুবর্ণরেখা'র সীতার চরিত্রটি তাঁর জীবনে বহু সুখের বয়ে এনেছে। তিনি তা মনে করেন নিজের ইচ্ছা শক্তির জোরে। মনের থেকে যে পবিত্রতা তাঁর সর্বা ওকে নিয়েই তিনি বেড়িয়েছিলেন জীবনের পথে, এখনও চলছেন। 'রহস্যময়' 'চারুলতা' তাঁকে পথের নিশানা দেখিয়ে দিয়েছে, কিন্তু তবুও ভুল হয়ে যায়, মাঝে মাঝে—পথহারা হয়ে যান। এটা সত্য, এ অপরাধ নিজেরই। নিজের পথ ধরে চলতে চলতে অতর্কিতে ছিটকে বেরিয়ে পড়তে হয় নিতান্তই নিজের পথকে ঠিক রাখার জন্য।

তাই জীবনের সহজাত চরিত্র তার সীতা বা চারুলতা হলেও 'আইনে পরমেশ' সুনন্দর কম নয়। জীবনের সরলতা তার চেয়ে মুখে, সারা দেহে এক নির্লিপ্ত পেশেমের ইশারা। তাই মাধবী চক্রবর্তী যেন প্রাবর্বাদাতার মতই দিন দিন কেরিয়ার কক্ষ বাড়াচ্ছেন যেই জীবনে ধরে ওপরে উঠে ছেড়েছিলেন। পরশে বেসেনভোলিয়ার পড়ে ছিল মনমত হয়ে।

সত্যজিৎ ছবির আর বলার কিই বা আছে।

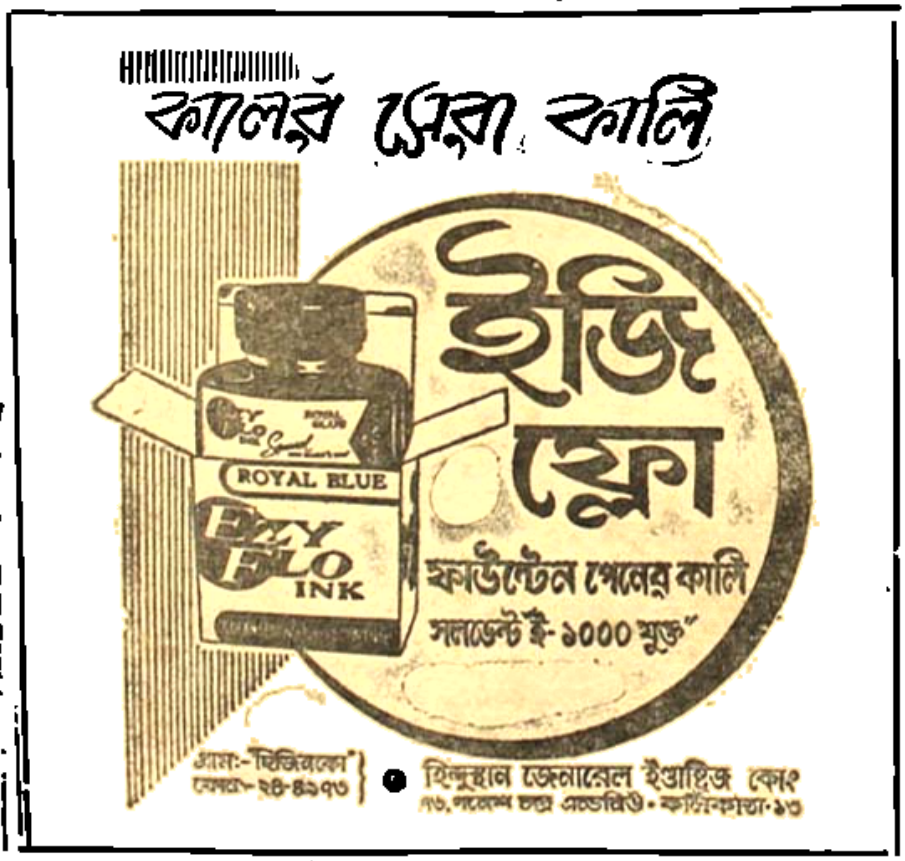

'ভুবন সোমের'-এর চিত্রনাট্য

ভেনিসে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে সম্মানিত ছবি মৃণাল সেনের 'ভুবন সোম।' বনফুলের এই কাহিনী অবলম্বনে ছবিটির চিত্রনাট্য রচনা করেন পরিচালক শ্রীসেন নিজেই। মূল চিত্রনাট্য বাংলায় লেখা হলেও ছবিটি তোলা হয় হিন্দীতে। বলা বাহুল্য হিন্দী ছবির জগতে সাম্প্রতিক কালে 'ভুবন সোম' একটি দুরন্ত গতিবেগের সূচনা করেছে। বর্তমান সংখ্যায় আমরা শ্রীসেন নির্বাচিত 'ভুবন সোম' চিত্র নাট্যের অংশ বিশেষ মুদ্রিত করলাম। শুধু চিত্রকল্পতাই নয়, চিত্রনাট্যের এই অংশের নিটোল কাব্যময়তা পাঠকদের কাছে প্রধান আকর্ষণ বলে বিবেচিত হবে।

মৃণাল সেন

ভুবন সোম রেলওয়ের এক ডাক সাহেব। অফিসার, ২৯শে কি খেয়াল হোলো, চলে এলেন পশ্চিম ভারতে শিকারের অন্বেষণে পাখী শিকার করতে। এতকাল ভদ্রলোক শুধু চিনেছেন তাঁর অফিস-টাকেই, অফিসের নিয়ম-কানুন নিয়েই মাথা ঘামিয়ে রাতদিন কাটিয়েছেন চাকরি বেঁচে থাকার তাগিদে। কিন্তু সহসা ফাইল পত্তরের ভেতর ডুবে থেকেছেন সমস্ত সময় আর মনে মনে ভাবা ডুলেই চেয়ারের সামনে সবকেই দেখেছেন বেঁচেছেন, পরক্ষণেই ডুবে গেছেন কঠোর অফিসের নিয়মকানুনের মধ্যে। এক সময়ে নিজের এক-ঘেয়ে চাকরী থেকে, অফিস, অফিসের কঠোর অসহ্য বন্ধনের। এবার আর সোমসাহেব তাকিয়ে দেখেন তিন ওঁচা চেয়ারের দেওয়াল আর সামনে ফাইলের পাহাড়। এ-হেন ভুবন সোমের মুখের ওপর হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই কি খেয়াল একদিন বেরিয়ে পড়লেন পাখী শিকারে, ওরা!!!

একদিনের এই একক অভিযান-ই 'ভুবন সোম' ছবির বিষয়বস্তু।

সারা দিনে নানা ঘটনা ঘটার পরে এক সময়ে একটি মেয়ের সঙ্গে সোমসাহেবের দেখা হোলো। প্রথম দর্শনেই সোমসাহেব বুঝলেন, এ যে-সে মেয়ে নয়, একে বলে 'মহিষমর্দিনী'।

...শেষ পর্যন্ত মেয়েটির গল্পে ভুবন সোম-কে তাঁর সাহেবী খোলস ছাড়তে হোলো, কারণ সত্যিই যদি তাঁর শিকার করতে ইচ্ছে হয় তো বিলকুল 'লাচ্চেন' বলতে হবে ...তাঁকে।....এবং 'লাচ্চেন' বললেন শেষ পর্যন্ত। বলতে

ছেলেরা কখন একমাত্র তারপরেই সহরের ডাকসাইটে পুরুষ ভুবন সোম পাখীর জন্য-বাঁধ ভেঙে পড়বেন। এ অঞ্চলের পাখীরা নাকি খেয়াড় চালান।]

উঁচু নীচু পথ, ক্ষেত, গাছের ওপর দিয়ে কালেরা গিয়ে পৌঁছল বালির চরে। ভুবন সোম লাঠি হাতে এগিয়ে চলেন। আর ওঁদিকে

সোম-বধূরা মেয়ের বেরুর দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে চলেছে মোহা।

ভুবন সোম মনে মনে ভাবেন, নিজের মনে মোহার কাছ থেকে, আর চলেন—যেমন সবাই চলে—সহজে, লুকিয়ে চুরিয়ে নয়—মন-মরা পাখী মেরে খাব আকণ্ঠে, তারপর বাসেপদলে।

এক সময়ে—মোহা একটু এগিয়ে যায়—বালির ওপরে পাহাড়ের কাছে আসে—সোমসাহেবকে অনুসরণ করতে ইঙ্গিত করে।

ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখেন ভুবন সোম।

মোহা মনের ওজনটা মেপে।

কাপড়টাকে পিঠে বাঁধছে।

তারপর,

ঘুঁটি মেরে মেয়ে বালির টিলার ওপর ওঠে।

[সোমসাহেব সতর্ক থাকেন, তাই বন্দুকটা মেয়েটির হাতে দেওয়ার আগে 'সেফ' করে নিয়েছিলেন।]

সামনে বালির পাহাড় ও ঘুরে আকাশ।

টিলার ওপরে আসে পাখী।

মোহা গড়িয়ে নেমে পড়ে।

হাততালি দিয়ে ডাকে সোমসাহেবকে।

ভুবন সোম এগিয়ে যান।

ভুবন সোম ও মোহা।

মোহা। আসুন। বুকে ভর দিয়ে ওপরে উঠুন। আমার ছোরা।

ওঠেন। বন্দুক।

মোহা ইশারা করে, ঠিক আছে, উঠুন তো।

শুকনো বুকে ভর দিয়ে উঠতে থাকে।

মোহা : টিলার ঠিক নীচেই অনেক।

ভুবন : কী?

মোহা : গুলাবাই খোপ, আরো নরম থাকেন না।

বুকে ভর দিয়ে উঠতে থাকে।

মোহা : বন্দুক নেও দেও করে ফেলবেন না যেন। ঠিক সময় মতো আপনাকে দেবো। বুঝেছেন।

সোমসাহেব মাথা নাড়েন—বুঝেছেন।

টিলার ওপরে ওঠেন। সোমসাহেব ও মোহা। সোমসাহেব মাথা বাড়িয়ে দেখেন।

অনেক পাখী।

আনন্দে আত্মহারা।

মোহার দিকে তাকান।

মনে হচ্ছে, এখুনি সোমসাহেব চীৎকার করবেন।

মোহা টু-শব্দ না করতে ইশারা করে।

ভীষণ কাছে এসে পড়েছে ওরা।

মোহা পিঠের বাঁধন খোলে

ধীরে ধীরে।

বন্দুকটা হাতে নেয়—এগিয়ে দেয় বাঁধে, ধীরে।

মোহা মাথা নামায়।

অন্ধকার গভীর নিশুতি ঘিরেছে মোহা।

ভুবন সোম উত্তেজিত।

কাঁপছে হাতে, ঠিক করেন।

গুলিটা ছোঁড়েন। মোহা লক্ষ্য করে তা।

ঠোঁট মনে হয়, গুলিটা মোহাকে নি ভুবন সোম।

'মেঘলোক' ছবির একটি দৃশ্যে মালতী দেবী ও সুচিত্রা সেন

সোমনাথের : তাহা হইলে। কাল সেরেস্তায় যাবে।
তখনি ঠিক করেন।
অনেকক্ষণ।
উত্তেজনা গৌরীরও কম নয়।
হঠাৎ—
পিঞ্জরে খরে ওঠে কলকে।
পাখীগুলো চীৎকার করে ওঠে।
উড়ে যায়।
আকাশ ভর্তি পাখী।
গৌরী তাড়াতাড়ি ঘোড়ে নীচে নেমে যেতে।
একটাও ধরে নি।
একটাও পড়ে নি।
গৌরী ওপর দিকে তাকিয়ে থাকে। দেখে, পাখীগুলো কেমন উড়ে কোথায় চলে গেল।

ভুবন সোম ফেরে উবুরো উবুরো হয়ে যায়।
গৌরীর দিকে তাকাতে পারেন না।
গৌরীরও একই অবস্থা।
চুপচাপ।

খানিক পরে।
দুটো মানুষ—গৌরী ও সোমনাথের।
চারদিক নিস্তব্ধ, নিঝুম।
মানুষ দুটোও।
খালি—আকাশ—মানুষ।
ভুবন বসে আছে চুপচাপ।
গৌরী এক সময়ে নিজের মনেই বলে ওঠে।
গৌরী : পাখী আবার আসবে।

ভুবন সোম শোনেন।
গৌরী উঠে দাঁড়ায়।
এগিয়ে আসে।
সোমনাথের মুখ ভোলেন।
পরস্পরের দিকে তাকান ওরা।
গৌরীর মাথায় কি বুদ্ধি খেলে।
গৌরী আপনি গরু মারতে পারবেন?
ভাইনারি?
ভুবন সোম বুঝতে পারেন না।
গৌরী। না হলে বাচ্চুলগাছ
ভুবন : গরু? মারতে?

কিছু ঠাহর করতে পারেন না।
গৌরী। আপনি একটু অপেক্ষা করুন। আমি আসছি।
বলেই ছুট—অদৃশ্য।

খানিক চুপ একা ভুবন সোম।
ভুবন সোম একা।।।

দূরে থেকে দেখা যায়।
গৌরী আসছে।
এক বোঝা গাছের ডাল টানতে টানতে গৌরী আসছে।
দাঁড়ও রয়েছে খানিকটা।
হাঁপাচ্ছে।

আড়ালে।
পাখী দেখা যায়।
একটা।
দুটো
তিনটে।

ডালগুলো টানতে টানতে খানিক চিলার কাছে এসে পৌঁছোয় গৌরী।
ফের পড়ে—হাঁপায়।
ভুবন সোম অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন।
গৌরী : দাঁড়ান, একটু জিরিয়ে নিই।
ভুবন : কি হবে এসব দিয়ে?
ভুবন সোম বাক্যি নিয়ে নাড়াচাড়া করেন।
গৌরী। আপনি গাছ মারবেন। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হবে কিন্তু। ওরা ভাববে, আপনি সত্যি বুঝি একটা গাছ। ঐ দেখুন। একঝাঁক সবুজ ঘোষাল।

পাখী পাখী পাখী।
আকাশভরা পাখী।
সন্ধ্যের বেলা।
রঙ-বেরঙের পাখী।

ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী। আকাশ ভরা পাখী।

সবশেষে ডাল বেঁধে দাঁড়িয়ে আছেন ভুবন সোম।
শেষ ডালটাও বেঁধে দেয় গৌরী।
তাকায় ভদ্রলোকটা বাঁড়িয়ে যেন।
গৌরী : নিন, ধরুন। এই ডালটার ভেতর ঢোকান করে রাখুন।
ভুবন সোম তাই করেন।
চোখের সামনে থেকে একটা পাতা ছিঁড়ে ফেলেন, যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন না।
গৌরী : ঠিক আছে?
ভুবন : হ্যাঁ।
গৌরী : ঠাণ্ডা লাগছে? কষ্ট হচ্ছে?
ভুবন। না।
গৌরী : দেখবেন, এই গাদলো জলে। ঐ টিলাটার দেখবে মানুষে এবার। কষ্ট যাবে।

সারা সময়ে হাতঘড়ি দেখেন সোম সাহেব। মৌটুসীও উঁকি দেখে।
মৌটুসী : ও, টাইম আছে। অনেক সময়।
পাখীগুলো ডাকতে শুরু করেছে।

মৌটুসী : ও গায়ত্রীদি ভুবন সোম।
মৌটুসী : এবার থেকে শুরু করুন। একটু একটু অমনি আবার দাঁড়াবেন যেন বুঝতে না পারে ওরা।
ভুবন সোম মৌটুসীর নির্দেশ এখান
একটু দাঁড়িয়ে।
একটু চলে।

মৌটুসী ছেলের মতো মাটিতে পড়ে শুয়ে ভুবন সোমকে অনুসরণ করে এবং পুরোপুরি মতো নির্দেশ দেয় গায়ত্রীদি ভুবন সোমকে।
ভুবন ভ্যালেন্টাইনকে।
গায়।
পাখী।
মৌটুসী।

মৌটুসী ইশারা করে, থামুন।
ধনুক গুটাতে গিয়ে বাধা পান ভুবন সোম। পিঠের একটা তারে আটকায়। এবং—

সমস্ত বাধা ডিঙিয়ে
শেষ পর্যন্ত
আবার
পরে ওঠে ধনুক।
পাখীর চীৎকার।

হঠাৎ গর্জন করে ওঠে ভুবন সোমের বন্দুক।

টলষ্টয়ের অমরীয় উপন্যাস 'আনাকারেনিনা'র একটি দৃশ্যে দুই সোভিয়েত শিল্পী।

শারদীয়া ধ্বনি, ১৩৭৬

অন্তর্ধান।
মৌটুসী ও 'পাখী' খরগোসের মতো পালিয়ে।
হঠাৎ
চীৎকার করে ওঠে মৌটুসী।
মৌটুসী। পেয়েছে। পেয়েছে। একটা পেয়েছো।।
বিষাক্তভাবে ঘুরে যায় মৌটুসী।
পাখীপক্ষী ফিরে যেতেন ভুবন সোম।
আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে মুখচোখ।

নীচে
ঘুরে গিয়ে ঝপ্ করে পাখীটাকে ধরে ফেলে মৌটুসী।
মৌটুসী : ধরা।
ধরাটা ম্লান।
মৌটুসী ঘুরে তাকে।
ভুবন সোম দাঁড়িয়ে।
মৌটুসী : এই নিন।
ভুবন সোম অন্যমনস্ক।
মৌটুসী।
মৌটুসী : শক্ত করে ধরুন, পালিয়ে যাবে।
ভুবন : উঁ?
মৌটুসী : ক্লান্ত হো। খুব সাজানো হোয়েছে। তাও পরের ফরটাব। তবেই পড়ে গেছে।
চমকে ওঠেন ভুবন সোম।

ওম।।।

পরক্ষণ ঈগলটার মতো কথাটা ঘোরায়।
কিতাব বানায়াড়ি।
আর মৌটুসী ও ভুবন সোম—
ফাট্

মণিপুরী নৃত্য

(১৬২ পৃষ্ঠার পর)

সনন্দা বাশি, নন্দিতা সেন; করতালা; কাল্ মাঙ্গং সৈবং ইত্যাদি বর্তমানে আধুনিক বাদ্যও ব্যবহার হয়।

রঙ্গপ্রিয় মণিপুর জাতি যেমন সকলের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া তাহাতে নিজের ছাপ দিয়া মণিপুর সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন, অপর পক্ষে তাঁহারা নিজস্বতা বিসর্জন দেন নাই বা হারায় নাই। তাঁহারা যতদূর সম্ভব নিজ ঐতিহ্য বজায় রাখিতে সক্ষম হইয়াছেন। বর্তমানকালে কিন্তু এই নৃত্যের মধ্যেও কিছু কিছু পরিবর্তন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। জনসাধারণের চাহিদার জন্যে অনেক ক্ষেত্রে নৃত্যের বিষয়বস্তু স্থির রাখিয়া তাহার আঙ্গিকের কিছু পরিবর্তন লক্ষ হইতেছে।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে মণিপুরী নৃত্যের সাবলীল নৃত্য ভঙ্গিমা মুগ্ধ করিয়াছিল। ভারতের বিভিন্ন নৃত্যধারার সহিত কবিগুরু পরিচিত ছিলেন। মণিপুরী নৃত্যের সহিত কবির পরিচয় ঘটিয়াছিল তদ্গুরু বলিদ্বীপ ও জাপানের নৃত্যরূপ তাঁহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করে। তাহাতে তখন রাধিকা লীলায়িত দেহের ছন্দোময় প্রকাশের দ্বারা নৃত্যরূপ দান করিবেন তাঁহার রচিত সঙ্গীতের মাধ্যমে—ইহাই কবির ইচ্ছা। কবি অনুমান করিয়াছিলেন তাঁহার সঙ্গীতের প্রয়োগে সার্থক হইবে এই মণিপুরী নৃত্য। সঙ্গীতের সহিত মণিপুরী নৃত্যের সাবলীল অঙ্গবিন্যাস কবির বিভিন্ন নৃত্যরীতির অভিজ্ঞতা, নিজস্ব ভাব দ্বারা চিন্তা ও রুচির সংযোজনায় এক নূতন নৃত্যরূপ ধারণ করিল, এবং ধীরে ধীরে ইহাই রবীন্দ্র নৃত্যধারা নামে প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ হইল।

পূর্বে 'গুরুবাড়ী' ছিল নৃত্য শিক্ষার একমাত্র মন্দির প্রাঙ্গন এবং নৃত্যাভ্যাসীদের বাদ্যযন্ত্র শিক্ষা-গ্রহণ করিবার

নন্দিতা

উত্তম

উপযুক্ত পরিবেশ ছিল। বর্তমানে মণিপুর State Academy গোবিন্দমন্ডপালয়, বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। এই নৃত্যের প্রসার ও প্রচারের জন্য ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বহু শিক্ষালয় স্থাপন করা হইয়াছে সরকার এবং সঙ্গীতানুরাগীগণ যাহার পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছেন।

মণিপুরী নৃত্যের উন্নতি ও গবেষণা কর্মে বর্তমানে প্রাচীনগুরু আতম্বাসিং আমুবাসিং ও আমুদলশর্মার দান অপরিমিত। গুরু নবীনসিং, ব্রজবাসীসিং, বিপিনসিং, চন্দ্রজয়সিং, প্রিয়গোপালসিং, বসন্তসিং প্রভৃতি শিল্পীগণ এই নৃত্যের বিশেষ প্রসার ও প্রচারে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। •

•এই প্রবন্ধের জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার : শ্রীপ্রহলাদ দাস, গুরু চন্দ্রজয়সিং, শ্রীমতি ইভাসিং মার্গ, প্রবীর দে।

'কিং' কোহ্ন হলিউড মোগলের বিচিত্র জীবন

চিত্রশ্রীব

বিখ্যাত কলাম্বিয়া ফিল্মসের প্রতিষ্ঠাতা হ্যারী কোহ্ন অবশ্য উদ্যম ও পরিশ্রমের ফলে সামান্য হোটেলের মালিক থেকে শুরু করে কলাম্বিয়া ফিল্মসের ও কোটি কোটি ডলারের মালিক হয়েছিলেন তা-ই নয়, তাঁর প্রতিষ্ঠানের হলিউডের অন্যতম তালা-বিহারা হলেরও পরিচিত হয়েছিলেন। ক্লার্ক গাবল্‌স, ক্লার্ক টেবল, ক্যারল লম্বার্ড, রিটা হেওয়ার্থ, জিন সেবার্গ, ফ্রাঙ্ক সিনাট্রা প্রমুখ সিনেমা জগতের বহু খ্যাতনামা ব্যক্তিত্বই তাঁর পক্ষ-পুটে পথে হয়েছেন। তাঁর সাদামা অনুসারী হেনেনে যশ, পয়সাপ্রাপ্ত, নির্দেশক ও তারকার ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয়েছে। কলাম্বিয়া ফিল্মসকে হেলিউডের শিখরে উন্নীত করার পথে কোহ্নকে বাধা দানেন নি, বিষয়ে বা নীতিতে পাশ কাটেন নি। কিন্তু, এই অসাধারণ কর্মী 'মিস্টার' মানুষটির যাহা দুষ্কৃতার অন্তরালে যে নিরলস, দুঃসাহসী ও সৃষ্টিধর্মী মানুষটি লুকিয়ে ছিল তার সন্ধান অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তি ছাড়া কেউ জানতো না। তাঁদের কাছে ফোন নিত সেই বাঁধাদ ইহুদী পরিবারের সন্তান, একদিনের ফেরিওয়ালা হ্যারী। রবীন্দ্রনাথ এবং টমাস আলভা এডিসন বলেছেন, 'কে এই হ্যারী কোহ্ন? তিনি হয়তো মানুষের ভাবে হারাবার জন্মেছে পড়বে।'

লেখকতা

হলিউড ছিলমের গান কালো ছেড়ে লক্ষ্য। ১৯২৯ থেকে শুরু হয়েছে আকাশের কালো। তারই মধ্যে হারানের হাজারো, ব্যবসায়ের ব্যবসায়ে, লোকসানীরা উদ্বিগ্নিত হয়েছেন। কলাম্বিয়া ফিল্মসের নব-নির্মিত ১২ ও ১৩ নং স্টেটের সামনে হাজার সমুদ্র আলোকিত হচ্ছে পরিকল্পনা-বিকল্পের মাধ্যমিতে। ফিল্মস জগতের বিখ্যাত ব্যক্তিদের ছিলের আসনে নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং সেল বিশেষীয়দের তথা-কথিত ব্যাজনার বিতরণের উদ্দেশ্যে মোতায়েন আছেন কলাম্বিয়ার সেল ডেভেলপার।

সৃষ্টিও বৃটি বিষয়ে পরিচালন সম্পন্ন হয়েছে। হলিউড তার অনাতম শ্রেষ্ঠ সন্তানের অন্তর্ধানীকিত্বার 'মেট' সারিয়েছে পরিচয় ঐশ্বর্যে'। বিশাল স্টেটের দেহকাঠামো উঁচু স্টেজ, তার উপর রক্ষিত হয়েছে পরাধার, দূর অবস্থিতের স্তম্ভে সম্পূর্ণ ঢাকা। সুনির্দিষ্ট সময় নির্দিষ্ট ১৫ ফুট উঁচু একটি পরচীর ঘারমান হলো করেছে দর্শক বৃন্দ ও অভিনেতার মধ্যে। পরিচিতি পরীক্ষার পরীক্ষা করে দেওয়া হয়েছিল স্টুডিও মোটো —'রাত্রা' শুরু-এর পরাধারে যেন একটিও বাজী ফুল না থাকে। স্টেজের পর থেকে বিরো স্টুডিও চত্বর মেতেছে মাতি, তাতে উপস্থিত হয়েছেন হলিউডের খাতনামা পরিচালক, নির্দেশক ও তারকাবৃন্দ। অনুষ্ঠান শুরু হয়। ঐশ্বরের আশীর্বাদ আবাহন করলেন কোকিলকণ্ঠী এক সুন্দরী যুবতী, শুভাশী-এর 'আজে মরিয়া' সঙ্গীতের মাধ্যমে। সিনেমা জগতে এই তার প্রথম এবং শেষ আবির্ভাব। ('ওয়ান মরিয়া থর লাভে' ছিলে পুনরাবৃত্তির ফলে অনেকে-ধরা তাকে চলের পর যান, যন্ত্রের পর যন্ত্র, পড়ছে অর্ঘ যার করে সংগীত শিল্পী কিছু যাচ্ছিল, কিন্তু 'কিং' কোহ্ন-এর মতোই পর সে কিছুতেও নির্ধিত হল না, যুবতীও মিলিয়ে গেলেন অন্তরালে মানুষের ভীড়ে)। তারপর শোভাযাত্রা-ধ্যান, তার সঙ্গের-মঙ্গল হলেন কৃতি বিখ্যাত অভিনেতারা-তারকা কে এবং তারকা টমাস। সবাধারে বক্তৃতা করা হল নিকটস্থ হলিউড মেমোরিয়ালে, স্টুডিও থেকে মন-সমুদ্রে অনুসরণ করলো সবাধারটিতে। পরমে বর্ষণ ও বিদ্যুতের চমকের মধ্যে সমাধিস্থ হল হ্যারী কোহ্ন।

তাঁর লেখকতার শোক নিতে হলি-উডের মানুষ ভেঙে পড়েছিল, যার অন্তরের কাঁদছিলেনাতার 'কেউ হয়েছিল বন্ধু, কেউ পেয়েছিল উচ্চ অনেক'—যে ছিলেন সেই মানুষটি। কী তাঁর জীবনেতিহাস।

পূর্বের জীবন :

হ্যারীর পিতা সোলোম [illegible]-এর আদি দেশ ছিল জার্মানী, যা বেলা-র শুরু হয় সালিয়ার একটি গ্রামে। সুন্দরের পরি-বারই অন্যান্যিকার-ভলাসেবেদের উপজেলা চলে আসেন। সেখানে এঁদের সুন্দরের পরি-চয়, পেশে ও পরে বিবাহ হয়। চার ছেলে, এক মেয়ে, এবং তাদের নিয়ে ও মাকুনাকে নিয়ে ছয়-ছয়পতি। একটি ছয় সামান্য আয়ের ওপরে-সুখে দিন কাটতেন। ন্যু-ইয়র্কের ৮৮নং ছাস্টার্ড ছিল ছেলেদের বর্ণিত ছোকান, ক্যাপ-বাস্টার্ড ছিল তারই ঠিকে ছিকে। ছেলের ছেলেই হ্যারীর আলো ছুটোছিল সবোধারী পরিবারের ওপর দুঃখ-দুর্ভোগ। পরিবারের আত্মীয় মানুষই এক পাত্র থেকে লপসিস ধরনের পদার্থ খেয়ে জীবন ধারণ করতেন। কোটিপতি হওয়ার পর হ্যারীকে একবার পরিচয় করা হয়, কেন তিনি স্টুডিও-মালিক হয়েও এত পরিশ্রম করেন। হ্যারী বলেছিলেন, 'ঘরে আমার ছেলেদের মধ্যে যত টাকাকড়ি ছিলানার ঘুমাতে না হয় তার ব্যবস্থা করছি।'

অন্যান্য ইহুদী অভিভাবকের মত মেয়ে ছেলেরাও ছেলেবেলায় যে ওপর ছেলেরা লেখা-পড়া শিখে চাকরী-বাকরী করুক। চার ভাইয়ের মধ্যে একমাত্র বড় ভাই মাকসই হাইস্কুল পর্যন্ত পড়তে পেরেছিলেন। কিন্তু এরপরই নিরতির পরিহাসে যে সব ভাইয়েদের মধ্যে একমাত্র মাকসই সব থেকে কম বোঝাবার ক্ষমতা।

মেয়ে ভাই মাকস ছাড়া ছোট্ট ছবার ঘরের স্কুল ভাগ করে কাজে লেগে গিয়েছিলেন। হ্যারীরও পড়ায় মোটেই মন লাগতো না, মায়ের মুখোশ্ত অনুসরণ করে টাকা রোজগারের নানা ফন্দি-ফিকির তার

কাপরার হিট ছবি 'হট স্প্রেলেন্ড ওয়ান নাইট'-এ ক্লার্ক গেবল ও ক্লডেং কলবার্ট।

মাথায় সর্বক্ষণ ঘুরতো। ফলে স্কুলের পরীক্ষায় ফল হত শোচনীয়। একদিন স্কুলের রিপোর্ট কার্ড হাতে পেয়ে হ্যারী মনস্থির করলো মা সরস্বতীর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করার সময় এসেছে। খারাপ রিপোর্টটি বাবাকে দেখাল কিন্তু একটা হ্যারী চললো চাকরীর সন্ধানে। তার পরিষ্কার সুরেলা গলার জোরে হ্যারী এক থিয়েটারে গান গেয়ে বেড়াতো। বাড়ীতে কথায় কিন্তেই ঘরের মুখোমুখি। বাবা চাইলেন স্কুলের রিপোর্ট। হ্যারী চাপা স্বরে বলল, 'কেউ আমি ফেল করেছি। কিন্তু ঘিন্দ, তুমি আমার মাথাকে খারাপ বলতে পারবে না বলছি। আমি একটা চাকরীও পেয়ে গেছি।'

সেদিন থেকে হ্যারীর কর্মজীবনের সুরু। ডোরাই ফোন-এর সেলসম্যান, সেপারের চাকা ও সেলস ফেলোডের ডিলার লাভেরেটরীর কর্মচারী থেকে একেই স্বাধীন পরোয়ানা। কলকাতা অধিবাসী সর্বদা পৌঁছতে হ্যারী কোম্পানিকে যে কথার পরম পরিকল্পনা করতে হয়েছিল তার ইতিহাসের একটি স্থান সংকলনে এই সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের মধ্যে হওয়া সম্ভব নয়। বারবারের হয়রানিকর ভবে 'ঘুনি'র পরিচয়ের যে ইতিহাস উপহার দেবার ইচ্ছা রইল।

জন্মবারের সুরু

হ্যারী কোম্পানি এবার সি, বি, সি ডিলার হলেন কোম্পানীর পার্টনার। অন্য দুটি পার্টনার হলেন ফ্রেড ভাই ফ্রাঙ্ক ও ফ্রাঙ্ক ম্যাক ম্যাসন্ত। আলিফর্নিয়ার পরোয়ানার ভার হয়েছে হ্যারীর, 'মা ইজ' অফিস সামলাচ্ছেন অন্য দুজন। লস এঞ্জেলেসের 'পরার্থি ফ্রো' বা বরিফ, পরদীপে হত গোরীর পুটিং বরফের সাজের নয় পরচার। তবে পরের ফেরেই হ্যারীর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল সীমিখানে। তখনকার দিনের চলচ্চিত্র মহাজনদের হ্যারী দূর থেকে দেখতেন আর ভাবতেন, 'একদিন আমি ওদের সমকক্ষ হব। ফ্রাঙ্ক সেনেট, টমাস ইনস, সিসিল বি ডি মিল, চার্লি চ্যাপলিন, সামুয়েল গোলডুইন (এস, জি, এম) এরা বিরাট বিরাট গোকের চালিত গাড়ী চড়ে আসতেন ও তখনে হ্যারী লক্ষ্য নিতেন, 'আমিও একদিন এত চড়ীতে যাবো, আমারও এক দিন আসবে। ইতিমধ্যে তিনি ছবির কাগজ নিয়ে নতুন ফার্মী ফিল্মের খের করে সি, বি, সি-র উচ্চপদের প্রীতিনিধি করতে লাগলেন। তখনকার দিনে সব সীমানি পরসা এক পাশে আঁকা থাকতো, অপর পাশ থাকতো ফাঁকা। ফ্রেডকে ভাবলেন, 'এক পাশ নষ্ট হয় কেন, দু-বারেই সীল মারলে অনেক ঝামেলা বাঁচে।' সেদিন থেকে দু ধারে আঁকা সীল চালু হল। এরপর সকলের দৃষ্টিকে হিরোইন এসটের টেলরের মেক-আপের অনেক সময় চলে যাচ্ছে, এর হিসেব করলেন পরিচালক মিলস্ তাঁর ফর ভলার নষ্ট হচ্ছে। ইহার যে-আপমানকে হুকুম দিলেন, 'মুখের এক পাশে মেক-আপ আগে করো, আমি ঘুইড পরে নেবো, পয়সা বেঁচে যাবে।' কিন্তু অর্থকৃচ্ছতায় আরও কোনও তাঁর আসন ভেলেন নি; তাঁর 'মটো' ছিল—সব চেয়ে অসুবিধাজনক মূলো সময় নেয়া পরিচালনা সাধনে করা। ফলে কলেজ সি, বি, সি, হবে উঠলো 'বাঁচত পরসার পরিচয়' ছোয়।

সি, বি, সি-র নতুন মালিকরা হল কলাম্বিয়া পিকচার্স।

পরের স্টেজ

এতদিনে ফোরুন চেয়ারে এবার বসবার সময় পেলেন এবং এক নজরেই পেয়ে পড়লেন সুন্দরী অভিনেত্রী রোজ হার্কাত-এর সঙ্গে। কিন্তু হ্যারীর অন্যান্য এলিজি ও ইংরেজ নীল ফোর্ড রোজকে আকর্ষণ করলেও অভিনয় সাফল্যের জন্য তাঁর কাছে একটি ছিল, তাই রোজ বিয়ে করলেন ফ্রেড লোল নামক এক প্রতিষ্ঠিত ব্যবহার-জীবিকে।

হ্যারী তাতেও সবরকম ছেলে ছিলেন না। যা তাঁর আকাঙ্ক্ষিত, তা পেতে হবে, যেমন করেই হোক। তাঁর উপরোধ-অনুরোধের বেড়ে স্বামীকে বিদায় করে হাতীর হাতে আলিঙ্গনাবদ্ধ নিমন্ত্রণ জানিয়ে গেলেন। রেজের বাস্তবীর বিলাস-বাসনার কথা পড়ে গেল, রোজ ও ফ্রেড-ওয়েলের ফুল বিবাহ বিচ্ছেদে। ডিভোর্স ডিক্রীর উপর কালি শুখাবার আগেই হ্যারী ও রোজের বিয়ে হয়ে গেল, রোজের সঙ্গে এলো ফ্রেডওয়েল-এর দেওয়া ফোরুনাদের টাকা—আরও লক্ষ ডলার। ফোরুনের ফাঁপা-ফাঁপা কোম্পানীতে নতুন শক্তির সঞ্চার করলো এই দুজন, অভিনেত্রীর হ্যারীর জীবনে এলো পারিবারিক শান্তি। ফ্রেড-ওয়েলও বেহাল অসুখী হলেন না, তিনি বিয়ে করলেন সেই, বিলাসবাসিনী বান্ধবীটিকে।

কাপরা যুগের সুরু।

অস্ট্রিয়ার কাপরা, যা ফ্রাঙ্ক কাপরা কলাম্বিয়াতে যোগ দেওয়ার সঙ্গে হ্যারী ও কলাম্বিয়ার ভাগ্য পরিবর্তনের সূচনা হল।

বিলাসবিহার পরিচালক কাপরার পূর্ব জীবন হ্যারীর চেয়েও বেশী বিচিত্র ছিল। বরিফ ইতালীর অধিবাসীর সন্তান ফ্রাঙ্ক বছরের কাগজ বিক্রী করে, বোতাম-তোরা বানিয়ে, পরোয়ানা করার পরসা জোগাড় করতেন। এই ভাবে ক্যালিফর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি থেকে তিনি রসায়নশাস্ত্রে এঞ্জিনিয়ারিং-এ স্নাতক হলেন ১৯২৮ সালে, সঙ্গে সঙ্গেই ছেলের তাঁকে ভাড়া হলেন সৈনাবাহিনীতে। পরের বিশ্ব যুদ্ধের পর ছেলে এলো ব্যাপক অর্থনৈতিক মন্দা; ফ্রেডিকাল এঞ্জিনিয়ার কাপরা চাকরী না পেয়ে বই ও পেয়ার বিক্রী করে, 'পেয়ার' পেয়ার চলচ্চিত্র হয়ে, ফ্রাঙ্কিক নির্মাণ করতে লাগলেন। সারা আমেরিকা চষে ফেললেন, পরমা উপাদের আশায়। অবশেষে ফ্রাঙ্কের বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাঁর মনে মানবচরিত্র সম্পর্কে যে গভীর জ্ঞান সঞ্চয় করেছিল, পরবর্তী জীবনে ডিরেক্টরের কাপরা তার যথাযোগ্য সদ্ব্যবহার করেছিলেন। ১৯৩৪ কাপরার ফ্রেডরেল হল হ্যারীর পরিচালক-ডেবার। ফ্রেডরোককে পাটিয়ে তিনি এক ছবিতে একখানি ছবি তৈরী করলেন, যার সাফল্যে সে ভুলার যায় যাবে। ছবিটি বিক্রী হল ডবল যাদে, কাপরা পেলেন পঁচিশ ডলার।

আর কাপরাকে পায় কে! জ্যানি-অনিয়ন্ত্রিত ফিরে যেতো স্টুডিওতে কারুর নির্দেশের তোয়াক্কা করে না। এই মনোভাবের জন্যই বিরক্ত হতেন ছবি পরিচালকের কাজ সম্পন্ন করার জন্য। এমনি অবস্থা চলেছে কয়েকদিন ধরে বিস্ফোরণের মতো সাক্ষাৎকারের। পরদিন রোজ মুভিওতে ঢোকার সময়ই ছিল কর্মসূচীকে নস্যাৎ করে দিয়ে তার মন মতো কাজে আসার। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ছবি তার উল্টোটি। কাপরা-বিস্ফোরণ অনুষ্ঠিত হলো নিম্নরূপ :

বিস্ফোরণ (মিঠে রবে করে) : তোমার শেষ ছবিটা তো মাত্র দুহাজার, না?

কাপরা (হেসে) : আমার শেষ ছবিটা তি ছিলো বলো তো?

বিস্ফোরণ (অসহায়ভাবে) : ঐ যে, তুমি তো জানোই, সেই যে ছবিটা তুমি করেছিলে।

কাপরা : কুড়ির বাচ্চা কোথাকার, ছবিটার তুমি নামই শুনো না।

হতভম্ব বিস্ফোরণের মাথের উপর দুম্ করে দরজা বন্ধ করে দিয়ে কাপরা তাঁর মাথা ঠাণ্ডা করলেন। অনেক দিন পর প্রযোজক অনুরোধ করলে ফলে আবার কাপরা-বিস্ফোরণ সাক্ষাৎকার হল :

বিস্ফোরণ : সোজন তোমার কী হয়েছিল?

কাপরা : ও সব ছাড়ো, তুমি কী চাও তাই বলো।

বিস্ফোরণ : তুমি আমাদের একটা ছবির পরিচালনা করো।

কাপরা : ঠিক আছে।

বিস্ফোরণ : কত টাকা চাও বলো।

কাপরা : হাজার ডলার হলে-বলে হয় না।

বিস্ফোরণ : হায়।

'ফল' হারা যোহনের অনুমোদন লাভের পর তিনি তাঁর প্রতিভার মোহে ফেলেন হ্যারী কোহনকে। কয়ে সঙ্গে চোখের ইশারা করেন। বিস্ফোরণ হাসতেও না কাঁদতেও না অবস্থায় হ্যারী 'ও, কে, ও, কে,' বলে হাত নেড়ে দুজনকে ঘর থেকে বের করে দিলেন। এমনি ভাবেই সুরু হল কলাম্বিয়ার সঙ্গে কাপরার সম্পর্ক, যা পরবর্তী ধরে কলাম্বিয়াকে এনে দিল বিশ্বের পর বিশ্ব, অ্যাকাডেমী পুরস্কারের পর অ্যাকাডেমী পুরস্কার। কেমন করে কাপরা ঔপন্যাসিক স্বিধেপুর ও নিরুদ্যোগ অ্যাকাডেমির আনুল পরিবর্তন করে সুপার-হিট ছবি করলেন সে কাহিনী বাণিজ্যের জন্য মূল্যবান বইল। 'আই মারেড ইয়ে', 'সাবোটেজ', 'দ্য হাপেন্ড ওয়ান নাইট' পর পর তিনটি ছবির হিট হলো। শেষ ছবিটির জন্য কাপরা থেকে নিলেন ক্লার্ক গেবল ও ক্লডেট কলবার্টকে, দাঁড়া দুজনেই কাপরার কৃতিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন। যু সংবাদ শুটিং-এর পরেই কিন্তু ক্লার্ক ক্লডেটকে বললেন, 'ডার্লিং, এবার (ইতালিয়ান)-টার ভিতরে কিছু আছে।' ক্লডেটও একমত হলেন।

সেই 'কিছু'টা যে কী, তা সম্ভব হল ছবি রিলিজ হওয়ার পর। কলা আমেরিকা

'লস্ট হরাইজন' ফিল্মে ফ্রাঙ্ক রিনাল্টার-সঙ্গে জোহনের একটি 'প্রেম-প্রতিযোগিতা'—ভিন লোচাক (বামে) ও জুবিলা হেওয়ার্থ দর্শকে

প্রেক্ষাগৃহে সংবর্ধনা জানালো ছবিটিকে—অ্যাকাডেমী সোসাইটি মনোনীত করলেন ১৯৩৭ সালের শ্রেষ্ঠ আমেরিকান ছবি হিসেবে। ছবিতে হবে ওয়েস্ট নং ইকে চলে যাচ্ছিলেন পুরস্কার বিতরণের দিন—তাঁকে টেনে থেকে নামিয়ে, মেটর সাইকেল 'পাইলট' বিয়ে নিয়ে আসা হল ১৯৩৪ সালের শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীর সম্মান দেওয়ার জন্য। ক্লার্ক গেবল হলেন শ্রেষ্ঠ অভিনেতা। ২৪ ঘণ্টাতে ইন ওয়ান নাইট স্বীকৃতি পেল বছরের সেরা ছবি হিসেবে।

কাপরা যুগের শেষ

১৯৩৬ সালে কাপরা দ্বিতীয় অ্যাকাডেমি পুরস্কার পেলেন 'মিস্টার ডীডস গোজ টু টাউন' ছবিতে, এবং এর পর থেকেই কাপরার সঙ্গে কোহন-এর সম্পর্কের অবনতির সুরু হল। একদিন কোহন কাপরাকে সম্পূর্ণ অযোগ্যতা বিদ্রোহিলেন ক্রিপ্টের, প্রতিভেতা ব্যাপারে ও টাকাকড়ি খরচ সম্পর্কে। কিন্তু 'পরাটি' রোড হ্যারী কোহনের যা অনায়াসে পেরেছিলেন, কোটিপতি 'ফ্রাঙ্ক' কোহনের পক্ষে তা সহ্য করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠছিল। 'লস্ট হরাইজন' ছবিটি যখন অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করলো না, তখনই দুজনের মধ্যে তাঁটার হিরোই আকার ধারণ করলো। পাশা ফ্রাঙ্ক ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষ কাপরার পরিচালনার উপর চাপ সৃষ্টি করলেন কাপরার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য। হ্যারী কোহন এই চাপে সাড়া দিলেন বিচিত্রভাবে। কাপরা হৈমন্তি বছরে এক লাখ ডলার করে বেতন পাচ্ছিলেন। 'লস্ট হরাইজন' ছবি শেষ করার পরই সে বছরের বেতন পাওনা হয়েছিল তাঁর। হ্যারী কোহন তাঁকে জানালেন —যেহেতু কাপরা 'লস্ট হরাইজন' ছবিতে অত্যন্ত অতিরিক্ত সময় নষ্ট করেছেন সে কারণে টাকাটা তাঁর পাওনা হবে আরও একখানা ছবি শেষ করার পর, তার আগে নয়।

কাপরা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। কি মর্মান্তিক প্রত্যুত্তরতা! তাঁর জন্যই যে কলাম্বিয়া কোটি কোটি ডলার অর্জন করেছে, তাঁরই জন্য অনাড়ম্বর শ্রেষ্ঠ চিত্র পরিচালকের স্বীকৃতি পেয়েছে, আর তাঁরই পরিণতি কি না এই অবিচার! এটনীকে পরামর্শ করে তিনি কলাম্বিয়ার কন্ট্রাক্ট বাতিল করে দিলেন।

নূতন পরিচালকের যুগ

কাপরাকে বিদায় দিতে কোহন বিচলিত হলেন না। কুছ পরোয়া নেই, তিনি পরীক্ষা করবেন যে কলাম্বিয়ার ভাগ্য একটির 'রিলিজাল্ট' পরিচালকের উপর নির্ভরশীল

নয়। তিনি খুঁজতে লাগলেন নতুন পরিচালকের। নজর পড়লো লিও ম্যাকক্যারীর উপর।

ম্যাকক্যারীর তখন দুর্দিন চলছে। বাংলো-ছাঁচের কয়েকটা কমেডী ছবিতে ওয়ার্ণর পারামাউন্টে তিনি 'মেক ওয়ে ফর টুমরো' নামক একটি ট্রাজিক কমেডী তৈরী করেছিলেন। তাঁর নিজের ছবিটা খুব ভালো লাগলো, পারামাউন্ট-কর্তা প্রোডাক্সনের বেশ লাগলো। কিন্তু দর্শক সাধারণের কোনই পছন্দ হল না, ছবি হল 'ফ্লপ'। একবার বিচলিত হলেন, ম্যাকক্যারীকে ডাকলেন। কোহ্নের সঙ্গে কথা বলতেন যেন স্টুডিওতে কি হচ্ছে, তিনি ডেকে পাঠালেন ম্যাকক্যারীকে। কোহ্ন বললেন, 'শুনতে পাচ্ছি পারামাউন্ট থেকে তোমার ডাকটা এসেছে?' ম্যাকক্যারী অনুমান করলেন, 'ওঁরা বলে নতুনের ছিটে দিয়েই কি তুমি আমায় তাড়াচ্ছো?' 'না, ছবিটা আমার ভাল লেগেছে, আমি ভেবে ভেবে-ছিলাম কেমনে নেবে। কিন্তু তোমার মনে আমি একটা ছবি ঠিক করে রেখেছি, তাকে খুঁজতে হবে।'

কিছুটা কালো মিলিয়ে গেলেন ম্যাকক্যারী ও তাঁর এজেন্ট। ঘণ্টা দুয়েক পরে ফিরে এসে জানালেন, কিছুটা বিশ্বাস পছন্দ-সই না হলেও ছবি করতে রাজী। কোহ্নের এবার এজেন্টকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বেল, ওর তো সব ভালই লাগে, ওর দাবী কত টাকা চাইছো।' এজেন্ট চোখ মিটে বললেন, 'এক লাখ ডলার।' বলা উচিত ছিল কোহ্নের সহৃদয়তা তখনকার মত। তাঁর কথা শুনে, 'তোমাকেই কথাবার্তা বলে।'

ম্যাকক্যারী আবার কথা উঠলেন, এজেন্ট তখনও অনেক নিবেদন করছেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে ফিরে ম্যাকক্যারী হঠাৎ একটা কোকেনে গিয়ানো দেখতে পেলেন সবে সবে বসে কোহ্ন কাজ করছেন। পিয়ানো দেখলেই ম্যাকক্যারী তাঁর একটা অভিজ্ঞতা বিশেষ ছিল।

কোহ্ন অকস্মাৎ হাত তুলে সকলকে এজেন্টকে স্তব্ধ করে দিলেন। ম্যাকক্যারী ও পিয়ানোর কাছে গিয়ে বললেন, 'প্লেজ কেপ্ট বাজাচ্ছো। ওহো ও যে আমারই কম্পোজ।' তারপরেই সুরু হল এক অভূতপূর্ব ঐক্যতান—কোহ্নের গানের সঙ্গে ম্যাক-ক্যারীর পিয়ানো বাদন। কোহ্নে ফিরে গেলেন পিয়ানোতে তার ছেলেবেলাকার সেই যান—যা তিনি ছেলেবেলায় শেখে ঠকা হোক্সার করতেন। এজেন্টের তো বিস্ময়ে মুখ হাঁ হয়ে গেছে। কোহ্ন কোরাস শেষ করে মন্তব্য করলেন, 'যে এমন গান জানো-বাসে সে নিশ্চয়ই কুশলী-শিল্পী। আমি লাখ টাকাই দেবো। আর কোন কথা নয়, করো।'

ম্যাকক্যারী সুরু করলেন 'দি অফ্যুল ট্রুথ' ছবি। তারকার তালিকায় আছেন আইরিন ডান (৬০,০০০ ডলার মূল্যে) ও কেরী গ্রান্ট (৫০,০০০ ডলারের কন্ট্রাক্টে)ও আরও অনেকে। আর একটি নতুন ইতিহাস সুরু হল কলাম্বিয়ার। নতুন ডিরেক্টরের যা আছে ওয়ার্ণার্স ব্রাদার্স—সেলজনিক, না প্রত্যেক সময়ের ঠিক। কোহ্ন রাগে ছাড় কামড়াতে লাগলেন। কিন্তু উপায় কী? ছবি শুরু হয়ে গেলে তারকাদের যে ওভারটাইমের মূল্যটি বেআইনে হিসাবে ধরে দিতে হবে! নতুন ডিরেক্টর রুমে বসে সিগারেট ধরাতে, সেটা বসে হাতেতে লাগছে দেখে ইয়াকি করে, ফিলটে কামড়ে নিজে নতুন সিগারেট নিজে আনে। আর্টিস্ট কলে উঠতে হয়ে যায়, আবার ফলা তেকে ফিরিয়ে আনতে হয়।

স্যুটিংএর ৩৭তম দিবসে সেটে গিয়ে কোহ্নের চক্ষু স্থির। নতুন ডিরেক্টর তাঁর কুশন বেলায় আর্টিস্ট ও ক্যামেরাম্যানের সঙ্গে বসে মদ গিলছে। রাগে ফেটে পড়লেন, কোহ্ন। ম্যাকক্যারী হেসে বললেন, 'ধ্যাৎ, ছেড়ো না। তোমাকে আমরা আদর করে ডেকে। আমাদের ভাগ নেবে।'

ছবী কিছুক্ষণ অভিনয় দেখে হাসি হয়ে গেলেন, তার পরেই এক গাল হেসে বললেন, 'ভাই যদি হয় তো আমার প্রথম এক লাখ ডলার!'

উপরের কারণ ছিল যে কি। বলতে ছিল আট লক্ষ ডলার, ম্যাকক্যারী করেছিলেন মাত্র দু' লক্ষ। ছিটে ছবি 'অফুল ট্রুথ' আর একটি আবোডেনী আওয়ার' ছিতে অমলো কলাম্বিয়ার প্রথম। আনন্দে আত্মহারা কোহ্ন আপনার দিলেন ম্যাক-ক্যারীকে তিনি ছবির লভ্যাংশ থেকে ২৫ পারসেন্ট উপহার দেবেন।

কিন্তু স্বাস্থ্যপানের সময় সব বিগড়ে গেল। কোহ্ন গ্লাস তুলে বলেন, 'আমি স্বাস্থ্যপান করছি লিও ম্যাকক্যারীর, তিনি কলাম্বিয়ায় আরও সাত বছর থাকছেন।'

এ কি রকম কথা। ম্যাকক্যারী বলেন, 'আমার তো মাত্র একটি ছবির কন্ট্রাক্ট!'

পাঁচ বছরের কম কন্ট্রাক্ট না হলে পাঁচিল পারসেন্ট দেওয়া যায় নাকি?

হাসি, খুশির মোলাস মাটিতে ছড়িয়ে ফেলে ম্যাকক্যারী ইলিউশন ভাঙ্গ করে সন্তোষ সহকারে বার বললেন। মনে অন্তর্যামিতে ঘোষকের স্টুডিওর খবর ছিল, 'মিঃ ম্যাক-ক্যারীর রোগও চৌদ্দশো গ্রাহক।' রেডিও কমেডির ফেলেন ম্যাকক্যারী।

'লিও, খুব সুখবর, বেল্ড এর ডিরেক্টরকে মাত্র তিন বছরের কনট্রাক্টে রাজী করিয়েছি।' কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর

'লিও, শুনতে পেলে?'

'হ্যাঁ। তুমি আমার কথা শুনতে পাচ্ছো, হ্যামী?'

'খুব পরিষ্কার ভাবে, পাশের ঘরের থেকে কথা কইলে যেমন শোনা যায়।'

'তবে শোনো।' এর পর কোহ্নের বর্ণকুহরে পরবেশ করলো অতি উচ্চগ্রামের একটি মৃদু শব্দ, তার পর সব চুপচাপ।

১৯৫০ সালে কৌতুকের বাদ্য যন্ত্রের দলে যোগও কলাম্বিয়া ছিটে ছবি তৈরী করলো—মাত্র কয়েক মূল্যে। ছবির নাম 'দি মোর দি মেরিয়ার', পরিচালক ফ্রাঙ্ক ক্যাপ্রিয়েনস। এঁর সঙ্গেও কোহ্ন অনীকরকণ ছিলেন হস্তক্ষেপ করবেন না বলে। সেরা ক্রিপ্টের লেখক গারসন কানিন ছবিটির সিনারিও লিখলেন বিনামূল্যে, কারণ তিনি তখন জানে, যে, ও-র সঙ্গে পরিচালকরূপ ছিলেন। আমাদ আকাডেমী অ্যাওয়ার্ড।

এর পর কিছুদিন বেশ ভদ্রভাবে চলে কলাম্বিয়ার। চৌতুকিলনের পরিচালনায় ও ক্যারবর্ষমান অভিনেতা নায়া সিমোন শিল্প তখন খা খেয়েছে। যা-ও কলাম্বিয়ারই বেশী সোনালিকা বোধ হয়। কোকে বলাবলি করতে লাগলো, 'হলী কোহ্ন তার মাথা খেয়েছে।' এই মুহূর্তে (১৯৫৮) কোহ্ন 'অল দি কিংস মেন' বইটির ফিল্ম-সত্ত্ব কিনলেন আড়াই লক্ষ ডলার মূল্যে, বইয়ের অনুবাদে টেনে নিয়ে এলেন রিয়াড ব্রিকের্টের ডবাট রোসেনকে। সোনের বদ লক্ষ ডলার খরচ করে ছবি শেষ করলেন, সেলেন মাত্র পাঁচশ হাজার। কোহ্ন সেলেন করতে কোটি। ধরবের সেখে ছবি, সেখে অভিনেতা, সেখে পাশর্ব চরিত্রের গোরব অর্জন করলো 'অল দি কিংস মেন।'

সবের ছিটে হল সেই গারসন কানিনের আর একটি গল্প নিয়ে। নাম 'বর্ণ ইয়েস্টার-ডে', থিয়েটরে এই কমেডিটি সবুজ ছিটে করেছিল। এবার কোহ্নকে মূল্য দিতে হল তিনলিয়ন। বহু লক্ষ ডলার। সারা শিল্প জগৎ স্তম্ভিত। এই মন্দার বাজারে এ কী দুঃসাহস। কোহ্ন বললেন, 'এটাই ঠিক সময়, ঠেকে সুখী করার।'

এত টাকা গল্পের মূল্য ধরচ করেও সিনারিওর মূল্যের জন্য ইহুদী সন্তান কোহ্ন তাঁর সনাতন ঘর মোলাই সবুজ করলেন। কানিনকে বললেন, 'এটা তো তোমার ভালোবেসে বিনা পয়সায়ই করে দেওয়া উচিত ছে, না হয় পাঁচাত্তর হাজারই নাও।' কানিন সত্তরের থেকে লক্ষ ডলার নিতেন সিনারিওর জন্য, কমপক্ষে না করলে হয়তো অনেক কমেই রাজী হতেন। কোহ্নের উপর ক্ষেপে গিয়ে তিনি অস্বীকার করলেন সিনারিও লিখতে। কোহ্ন তখন জন্য দুটি ক্রিপ্টের লেখককে নিযুক্ত করে কানিনকে বললেন একটু 'দেখে দিতে'। কানিন রটল। বললেন, 'কত দেবে?' রাগে কোহ্নের পিত্তি জ্বলে গেল, গালাগাল দিয়ে তিনি কানিনের আশা ত্যাগ করলেন। এদিকে ডিরেক্টর গল্প শুনে পড়লেন মহা ফাঁপরে—নতুন স্ক্রীপ্ট তাঁর একেবারেই মনে ধরছে না, অথচ কানিনও গররাজী তা দেখে দিতে। শেষ পর্যন্ত নিজের গল্পের ছাড়িয়ে কানিন আবার বিনামূল্যে স্ক্রিপ্ট লিখতে রাজী হলেন, নাম হল জন্য স্ক্রীপ্ট লেখকের।

ছবিটা মুক্তির ছিটে হওয়ার পর কানিন মহানন্দে বলে বেড়াতে লাগলেন, 'কেমন ঠকিয়েছি হারী কোহ্নকে বিনা পয়সায় স্ক্রিপ্ট লিখে।'

হারীর তখন মিনচেই আপত্তি ছিল না তখন। তিনি এক ঢিলে দুই পাখী মেরে-ছিলেন : কলম্বিয়া-ম্যাকক্যারীর পর কলাম্বিয়ার মুহূর্তে ছিটে, আকাডেমী পুরস্কার এবং সেখে অভিনেতা পদবাচ্য একটি নতুন তারকা—ম্যুর্তি হলিডে।

মুক্তিলাভ

এর পর আবার দুর্দিন এল কলাম্বিয়ায়। জনের মত একনায়কের জনো-দৃষ্টি নিয়ে স্টুডিও পরিচালনা করা কমবেশি অসম্ভব হয়ে উঠলো। অভিনেতাদের সঙ্গে বিবাদ, রিকো হেওয়ার্থের মত শীর্ষস্থানীয় তারকাদের কন্ট্রাক্ট ভঙ্গ, সর্বোপরি, কমিউনিস্ট অপবাদে নিজে বন্ধু ও দেশের পরিচালকদের বিষয় অনুরূপ কলাম্বিয়াকে আদালতের পথ আশ্রয় হলো। ম্যাকার্থী পন্থার ঝড়ো হাওয়ায় তাঁরা পড়লেন পরিচালক লাস্কী সার্জেন্ট, ব্রেখট, নিজে বন্ধু, সিনেমা থেকে। একদা কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য থাকার অপরাধে তাঁরা অভিযুক্ত হলেন, প্রমাণাভাবের কেসে পড়ার আশঙ্কায় পঞ্চাশ অভিযুক্তদেরও তাদের বিরুদ্ধে দিতে বাধ্য হলেন হ্যারী কোহন। তাঁরা দল নিয়ে হ্যারী আবার কলাম্বিয়ার পুনর্জন্মের উদ্যোগ করলেন।

পুনরুজ্জীবন

কলাম্বিয়ার অন্যান্য কর্মকর্তারা এবং সিনেমা বিশেষজ্ঞদের আবার প্রবল করে ছিলেন হ্যারী কোহন। ' ফ্রম হিয়ার টু ইটার্নিটি' বইটির সত্ত্ব কিনলেন বিরাশী হাজার ডলার দিয়ে। কি বোকামী! এ বইয়ের জনপ্রিয় তাঁরা কোনো সেনসরই তো পাস করবে না। তা ছাড়া পার্ল হার্বারের পরাজয়ের পটভূমিকায় রচিত এই গল্পে সৈন্যবাহিনীর প্রতিনিধির নিষ্ঠুরতা ও পক্ষপাতিত্বকে যে ভঙ্গিতে কশাঘাত করা হয়েছে তাতে সমর বিভাগের সাহায্য-তারা তো দূরের কথা, প্রতিবন্ধক সৃষ্টিই করবেই। অথচ তাদের সাহায্য বিনা যুদ্ধবিরতির এই ছবি তোলাই যাবে না। আবার নির্মাতা নিয়ে এল কোহনের সাম্রাজ্যবাদের আরও একটি পরীক্ষাগার মানুষকে। ড্যানিয়েল টারাক্যাস নামক এক লেখক যার এখনো পাতায় যাবে এমন একটি স্ক্রিপ্ট লিখলেন যাতে আপত্তিকর কিছু রইলো না, কিন্তু ট্রাজেডী বজায় রইলো পুরো মাত্রায়। একার ডিরেক্টর ও অভিনেতা নির্বাচনের ভার। অন্যান্য ডিরেক্টরের চেয়ে ডিনেম্যান নির্বাচিত হলেন পরিচালক টারাক্যাসের সুপারিশে। কাঠে কাঠে ঠোকা লাগলো আবার—কোহন ও ডিনেম্যান কেউই কম যান না। কোহনকেই নতি স্বীকার করতে হল ডিনেম্যান নির্বাচন স্বীকার করতে হল। ডিনেম্যান নির্বাচিত ক্যামেরাম্যানকে। ক্যামিওর ভূমিকায় নির্বাচিত হলেন এলি ওয়ালাচ্। ইতিমধ্যে নায়ক ফ্রাঙ্ক সিনাট্রা হইটি পড়ে ক্যামিও চরিত্রে অভিনয় করার জন্য অধীর হয়ে উঠলেন। সিনাট্রা তখন পারিশ্রমিক বৃদ্ধিসোয় ফলে ক্রমবর্ধমান হারিয়েছেন, গলার গলাও ভেঙ্গে। ডৌলিউডের অনেকে, নায়ক ফ্রাঙ্কের কন্ট্রাক্টই ছেলে না। সিনাট্রা ভাবিয়া। 'সিনাট্রার পার্ট করবো, ফলের দুর নিজের পয়সা খরচ করেও।' শেষ মুহূর্তে ওয়ালাচ ডাকে ফেলেন ডিয়েটারের চুক্তিতে, সিনাট্রা ফেলেন পার্ট ফলের ইতিহাসে সকলেরই সুবিদিত। পুরস্কারের পর পুরস্কার। পাঁচটা অকাডেমী অ্যাওয়ার্ড, অটো প্রকার'।

আর কোহনের তাঁর ছেলে রবিক সুখী ছেলে পক্ষের ডিলিয়েই এক কোটি নব্বই লক্ষ ডলার। যে মুহূর্তে' টৌলিভিশনের প্রতিযোগিতা এড়াতে গিয়ে সব স্টুডিওই কোটি কোটি ডলার সাথে চড়া পর্দা, সিনেমাস্কোপ ইত্যাদি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে, সেই ফাঁকে কলাম্বিয়া সাধারণ সাইজের সাদা-কালো ছবি দিয়ে ডিলক্স প্রোডাকে মাত করে দিল। সিনাট্রাকে পেলো নতুন সিনিয়াস তারকা মুখে।

নতুন 'সেক্স গডেস'

হলিউডের পূর্বতন 'সেক্স-গডেস' বা সেক্স-পুতুলরা রিকো হেওয়ার্থ কলাম্বিয়া ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন সিনেমা জগৎ ক'দখল করে। দু বছর পরে আবার ফিরে এলেন কলাম্বিয়ায়। পূর্বে কন্ট্রাক্টই অনুযায়ী আবার সপ্তাহে সহস্র তিন হাজার ডলার তাঁর পাওনা। কিন্তু, ততদিনে বর্ণকের কাছে তাঁর যৌবন-বেসর নিষ্পত্তে হয়ে গেছে, তাঁর ছবি আর ভীড় জমায় না। তিতিবিরক্ত হ্যারী কোহন ঘোষণা করলেন : 'নতুন তারকা সৃষ্টি করবো।'

আবিষ্কৃত হলেন ব্রাকেল—একটি রেফিজারেটর কোম্পানীর 'মিস্ ফ্রীজিডেয়ার' যেমিনি নোভাক। কিন্তু, একে নিয়ে কি করা যায়, এ যে না পারে অভিনয় করতে, না পারে গাইতে নাচতে! ক্যামেরা টিপার্টমেন্টের সম্বন্ধে দেখলেন মেয়েটি সুন্দরী হৌনটের সময় হাত দুটো নিয়ে কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। তিনি পুরুষ করলেন, 'হাত দুটো পেছনে ছড়িয়ে মাথেলপিসে হেলান দিয়ে দাঁড়াও, এতে তোমার সর্বাঙ্গসুন্দর মূল্যবান সম্পত্তি বিশেষিত হবে।' রোবার্ট কন্ট্রাক্টই করা হল মাত্র সপ্তাহে ১২৫ ডলার বেতনে। তারপর কোহন নিয়ে তারকা তৈরীর ভার নিলেন।

নতুন নাম হল কিম্ নোভাক। মাত্র-করণ করেই কোহনের মনে নোভাক-এর ঈর্ষাবাই লেগেছিল, সোনালের ব্যাপারে বিরোধ আরও ঘনীভূত হল। ছেঁড়া ছবি ছেড়ে কোহন ফেলে বললেন 'একে বেলিয়ার পরাও।' কিন্তু কিছুতেই পারবে না, কোহনও মহাভাবনায়। অবশেষে কোহনেরই জয় হল। সেদিন থেকে কিম নোভাক হেলিয়ারে অভ্যস্ত হলেন। কিংবা আহার, বিহার, শোয়া, পরোয়ান সব কিছুর উপরেই কড়া নজর রাখলেন কোহন। অবশেষে তাঁর পরিশ্রমের সুফল মিললো আর একটি ছিট্ ছবিতে। 'পিকনিক' ছবিতেই কিম নোভাক তারকার পর্যায়ে উন্নীতা হলেন।

শেষ বিদায়

১৯৫৬ সালে হ্যারীর বাবা জ্যাক কোহন হার্নিয়া অপারেশনের পর মারা গেলেন। দুঃখে ভেঙ্গে পড়লেন হ্যারী, ভ্রাতৃ-বন্ধু হ্যারীকে ফেলে রেখে, 'আমার জীবনও শেষ হয়ে এল।' মাত্র দু বছরের মধ্যে ভিলেন ক্যান্সার, যারা গেলেন ৬৭ বছর বয়সে। হ্যারী স্তম্ভিত মনে ভিন গুনলেন, তাঁর স্থির বিশ্বাস, তাঁর মৃত্যুতেও এই ভেঙ্গেই অব-ধারিত।

বছর ঘুরে গেল, এলো দ্বিতীয় বছর। স্টুডিওর ডেনারেল মিটিংয়ে অংশী-দারদের সামনে হতাশার ছবি তুলে ধরলেন হ্যারী কোহন। লোকসান, কেবল লোকসান। বহু চিত্রপ্রযোজনার পরিপূরক করার মত অর্থ কলাম্বিয়ার নেই, অথচ নেয়া নাম ছাড়া ছবি ছিট হয় না। কোহনে উৎসবনার সঙ্গে বল-লেন, 'আর যদি হারদন বলেন্তা কেবল ছবির লম্বাদলের অর্ধেক নিয়েও ছবি করতে রাজী হয় তাহলে আমি তাকে চমকিত করে চুক্তি করবো।'

নিউ ইয়র্ক ছেড়ে ক্যালিফর্নিয়ার ফেরার আগে নিজের পক্ষের স্টীমে নিয়ে ঘুরতে লাগলেন সেই পুরনো কোম্পানিগুলোকে যেখানে বাচ্চা হ্যারী তার মুরোপা পলায় পায় ফেরে প্রতিদিন নির্বাহ করতো। সেদিন আর নিজে আসে নাম। আসে যে হ্যারী বড় নিজেম, একলা একলা। নিজের আত্ম-বৌদ্ধকে ধরতে, একলাবস্থেরে প্রণামে, তিনি বন্ধু হারিয়েছেন, বন্ধু লাভ করেন নি। তাই যখন তাঁর পঞ্চম পুত্রের জন্মোৎসবে একদল ঘোষামোদী অভ্যাগত বাচ্চার স্বাস্থ্যপান পত্রের পান পড় উপ-ঢৌকন, 'এ ছেলে যেন ঠিক বাবার মত হয়, 'হ্যারী কোহন এক চড়ে তার পান মাটিতে ফেলে দিয়েছিলেন, বলেছিলেন, 'খবরদার! আমার ছেলের যেন বন্ধুলাভ হয়।'

গালালার ফেব্রুয়ারীর দেখা হল এক-রাশ বন্ধু, শুভেচ্ছাদের সঙ্গে, এক ঘুম ঘরে। নিজে বন্ধুকে বললেন, 'আমার সমাধির জন্য স্থান নির্বাচন করে রেখেছি ক্রসের ঘরে, যেখান থেকে আমি আমার স্টুডিও দেখতে পাবো।'

দুর্বল হৃদযন্ত্র মোটেল দিয়েছে, কিন্তু হতে এলেন ডিনিকস শহরের বিলহুইমের হেমোটেলে। দেখা হল বন্ধু হ্যারী এল-এর সঙ্গে। তার সঙ্গেও ওই একই পরামর্শ। সমাধিস্থল, মনোনয়ন। হেসে বললেন, 'ওদের আমি ডাকছি না। ওখান থেকে স্টুডিওর কারকর্ম সব দেখতে পাবো।' তারপর গম্ভীর ভাবে হেসে বল-লেন, 'হ্যারী, তুমি যদি আমার আরও একটা বছর বাঁচিয়ে রাখতে পারো তাহলে তোমায় দশ লক্ষ ডলার দেবো।' 'কেন?' 'আমার ৬৭ বছর চলছে তাই বড় ভয় করে হ্যারী।' হলিউডের বন্ধু, ভক্ত নিউনী টৌলিফোনে মুহ্যমান ছিলেন যে তাঁর দাদা এল, কে, সিজনি মারা গেলেন। কোহন শতাব্দীর শোকসভায় ঘোষ দিতে ফেলেন বিমান যোগে

পুঁটি

আশা দেবী

কলকাতা নয়—একটু দূরে। ফেলছাড়া ভাগাহীনদের এলাকাতেই। ঘরগুলো উঁচু-নিচুতে।

সন্ধেবেলাতে যখন ঘরে ঘরে হাঁড়ি নামে উনোনের ওপর, সেই আলোআঁধারে সেই আবছা। আলোর ব্যবস্থার এক কেরামতি পুঁটি ঘরে বিসুদে হয়ে পুঁটি ভেবে ভেবে দেখে, কী করে আলো ঘরে ঘরে মানুষ হোলো। উঠোনে অন্ধকার নামলো, ওদের খোলার ঘরের দেয়ালের গায়ে গায়ে এলোমেলো। বাতাসে দুলতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে দুলতে লাগলো বাড়ই-এর বাচ্চাটা। বাঁচি হলে ওরা ছেলে—পুঁটির হাসি পায়। ওর ধারণায় কি হয়ে, ছেলে-মেয়ে ওদের কথাবার্তায় কিছু হয়ে।

ঘরের ছেলেরা ছেলে হলেরে মতো আওয়াজ উঠছে। বাবা দুপাশাদীর ঘরে। আজ সন্ধিন হলো বাবার টোকা খুব বেড়েছে আর ছোড়দি—তার ভালো নাম মীরা—সে এখন ঠাকুরঘরের উইলানিতে গেছে। কখন ফিরবে ঠিক নেই।

কখন ফিরবে সে, তা কোন দিনই ঠিক থাকে না কিন্তু পুঁটি এই ঘরে ভালো। ওরই তার মা বাবা ঘরের সব ছেলেই বাবা ভক্তদের—পাড়ার লোকেই থাকেন। শুধু মাসে একবার করে অনেক কষ্টে খেলনবউ আনেন। তাতেই আবার বিকেলবেলা ঘরে দাদাদের মতো আওয়াজ তুলে ভয়ে পড়ল টোকেন, কখনও কখনও সাজ ঘরে এরিন বলেই বাবা, কাঁসারিদের ঠেক দিয়ে। মীরা অফিসে চাকরী করে সারার চালায়—টিউশানি করে অনেক রাতে বাড়ী ফেরে। তাই বাবা ওকে ঘরে তুলতে দেন না আরো সারা দিন ঘরে ঘরে ঘোরে। ওকে ভাতঘুমি পুঁটি, ডোরা বলে, অনেক জনে ভাতঘুমি। কিন্তু পুঁটির ঘোরে ঘুম আসে না—সে পাড়ার প্রাণালায় বসে বসে থাকে। ভো কাঁদায়। আর ঘুমের একটু ছোঁয়া চোখে এলেই পুঁটি ভাবে—ভো একটা ভালোলাগার ঘুমের আবেশ—চারদিক অন্ধকারে ঘুমন্তি উনুনে ছেলেদের টোমের লাল রঙ, আর আলুর লাল হয়ে লক্-লকে চিত্ত যেন করে অনেক লোকে করে ঘুমে নিয়েছে, এরপর ওইসব ঘুমে যেন। আবার ওর পুঁটি—সে-কিন্তু ভীত চোখ মেলে দেখে—কি যেন হোয়ে। না—কালো-কালো নয়। তবু যেন হাতের মতো লম্বা টানছে। তারপর ঝাঁপিয়ে। ছোড়দি, ওকে ছোড়দি—ওকে ঘরে আলোর চাপায় ওকে চাপালো চলবে না। ওর সর্বাঙ্গ পালাল হয়ে যাবে।

আবছায়া পুঁটিরোই যাবার সময় রাত হামাতে হয় টান দেখা চলে—তাই বর্ষাতেই ওটা হামার যেন বেশী।

মা বেঁচে থাকতে অনেক ঠিকানা হয়েছে। মা ওর কাছে যে অসুখ দেখেছেন যাবতে তা নিয়ে পরীক্ষা করেছেন—তখন ওরও একটু ছিল। মা মারা যাবার পর আর এসব-বিসুখ যান না থাকা—আর ছোড়দিরও আলবার সময় নেই। সে চাকরী করে, টিউশনী করে, বড় ভাতে সে সব সময়।

কিন্তু ছোড়দির সাজ-পোষাকের অন্ত নেই। ও অত সাজ কোথায়—পুঁটি ভাবে। আর ও সঙ্গে ওর সব সময় ওই লোকটাই বা যেবে কেন—যাকে মীরা রোজ-দা বলে। ছোড়দির কি খাওয়াও লাগে না পুঁটে ভবে ছোড়দির লাগে না কোন দিনই—ভারী স্বার্থপর ছোড়দি।

ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ে পুঁটি। ছোড়দিই ডাকে ঠেলে তোলে ওঠ—ওঠ পুঁটি ওঠ বেলা হলো। যা দে।

আজ কিন্তু আমার সাড়ে ন'টার আগে নেই।

: আমি এখন উঠতে পারি না। তুমি নিয়ে যা করে যাও। পুঁটি ঘরের ছোড়ার মতো ঘাড় বাঁকালো।

: তোর পারিস না পুঁটি—তা নেই মোরা নেই—দিন-রাত খাটা করে এনিস। অমনকর কথা না তো কি বলে এসে শুধু আর শুধু করিস আমি?—বি-এ পাস ছোড়দি মুখ ভারী দিলো।

তারপরই তো ভোর করে গায় কাটিয়ে দিলে। এক ঘন্টারের ছেলে আমার স্কুল-ফাইনালটা দেওয়া হলো না। সারা দিন বাড়তে গাধার মতো খাটাও। একটু বিশ্রামে নেই। —একটা ছেড়া হয়-ওটা সারা পরে আর এক বাস ফাটছে—একটা ছোরা পর্যন্ত কিনে পাও না। কিন্তু নিজের সাজের বেলায় তো ঠিক আছো। আমার ওপর ভারা কাজের ওপর কাজ—

: চুপ কর—সাজ চাঁচরে ভেবে দেব। যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা। বাবা থাকতেন, উঠে আসে। তোর মরা দেখাচ্ছি তখন। ফেবারি তখন।

: মরে আর কী দেখাবে। ওদিকে দেখছ না বাইরে তোমার দোসরা না কে—এসে দাঁড়িয়ে আছেন। আমার সঙ্গে কথা বলে আর সময় নষ্ট না করে—

ছিপ্রী মুখ করে যেন অন্যদের আকর্ষণ নিয়ে একটা চড় তুললো মীরা পুঁটির দিকে। কিন্তু হঠাৎ প্রাণালায় দাঁড়িয়ে থাকা তার অফিসের বোসের দিকে চোখ পড়তেই যেন বিদ্যুৎবেগে পট পরিবর্তন হলো। একমুখ হাসি নিয়ে ঘোঁরের এলো মীরা।—হু, চোখ ভরা কৌতুক নিয়ে পুঁটি লক্ষ করতে লাগলো ব্যাপারটা—

: যেয়েটা কে? ভারী টৈরে তো—এতদিন পরে যেন তোমরা পুঁটিকে দেখতে পেলেন।

: আমাদের বাড়ীর ঝি।

আমার মরো দিয়ে বিদ্যুৎ খেলে গেল পুঁটির। কিন্তুর বক্তব্যটা বড় আশ্চর্য লাগে, একটু সকৌতুক মুখটিও। পুঁটির কান লাল হয়ে উঠলো।

ভুরুটা কোঁচকে এসে ভদ্রলোকের সামনে দাঁড়িয়ে বললো : ও আমার নিজের ছোড়দি।—ছোড়দি—এসো চা খেয়ে যাও, আপনিও আসুন না, চা হবেন। বাবা দুপাশাদীর বড়দী তার কেনা সারা রাত জাগতে হবেছে, তাই উঠতে দেরী হয়ে গেল।—আয় ছোড়দি, চা খাবি।

এক মুহূর্তে মীরার মুখখানা কেন রাইবের মত সাদা হয়ে গেল : চলো

—হলো এখান থেকে। ওসব বলার জন্য নিয়ে আসার দরকার নেই। তুমি একটা টাকসি ডেকে আনো, আমি তৈরী হয়ে নিচ্ছি এক্ষুণি।

বাড়ীর মধ্যে ঢুকে মীরা পুরোপুরি সন্ধ্যার জন্যেও পুটিকে। কিন্তু কাঁদল না পুটি। এক্ষুণি বাবার চাকরীর ব্যাপারে কোনো কথা বলতে চাইল না। শুধু ইস্পাতের মতো মাথা শক্ত আর খাড়া করে রইলো। —

সান্ত্বনা দিলো মীরা। তারপর টাকসি এলো।—গাড়ীতে বাবার সময় মীরা জলে গেল : বাবাকে বলিস, অফিসের গাড়ি, ভলভোতায় বেরে নেব, ফিরতে রাত হবে।

আসলে অফিস বুঝি বেলা আটটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত চলে? —বাক্য ঠোঁটেই একটা বিচিত্র হাসি করে জিজ্ঞেস করলো পুটি।—

চোখের দৃষ্টিতে আগুন ঝরিয়ে বেরিয়ে গেল মীরা।

চোখটা ঘরে ঘরির মত ঘুরিয়ে নিলো পুটি। মীরার চেহারা দেখে সে বলবে একটু আগেও সে প্রচণ্ড ঘৃণা ঘৃণা করছিল। এখন সে যেন সিনেমার নায়িকা—ওরা গাড়ীতে উঠলো—হাসতে হাসতে। পুটি নির্নিমেষে বন্ধুর চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলো। এমন বিশ্রী হাসি হাসতে পারে যে ছোড়দি—কে বলবে সে অমন ইতর ভাষায় কথা বলতেও পারে—। কে এখন ছোড়দিকে দেখে বিশ্বাস করবে যে, অসুস্থ বাবার কাছেও সে কখনও যায় না—বোনকে বাড়ীর কাজের সুবিধার জন্য স্কুল ছাড়িয়ে দিয়েছে—যে বিশ্বাস করবে—বাড়ীর সবটুকু ভালো জিনিসের ওপর তারই একমাত্র অধিকার। কারণ সে চাকরী করে সংসার চালায়—সে টিউশনি করে ক্লান্ত হয়ে ফেরে—বাড়ীর সব সুখ-সুবিধাই তো তার জন্যে।

ঘরে ফেরে তাক এলো পুটি—মা আমার—

। যাই বাবা—। পুটি ঘুরে দিয়ে মায়ের গলা জড়িয়ে বুকে মাথা রাখলো এখন কেমন আছ বাবা?

: একটু ভালো রে। তুই আমার লক্ষ্মীমা। তুই না থাকলে আমি কবে মরে যেতাম। এমন পরিপাটি সেবা তুই ছাড়া আর কেউ কোথাও পাবে না। মা, মীরা কইরে—?

এক মুহূর্ত চুপ করে ভাবলো পুটি। রোগে শোকে মানুষ বাবাকে তার আর কষ্ট দিতে ইচ্ছে করে না। তাই ছোড়দির কথা সে কখনও জানায় না বাবাকে। মিথ্যে জানতে যাবা। মিথ্যে কেন খুশী হোক এই অসুস্থ মানুষটা। সংসারের গতির চেহারাটা কী নিষ্ঠুর। সে চেহারা এই নিরীহ, সব মানুষ সহ্য করতে পারবে না।—তার চেয়ে মিথ্যেই থাকুক।—আসুক কিছু মিথ্যে সারা বাড়ীতে ঘাই ঘাড়িয়ে লাভ কি। সংসার চলে তাই তার চলে মিথ্যে, খেলাঘর মিথ্যে হবে যে কি? মিথ্যে ঘরে করে তোমার কি পাওয়ার চেয়ে? মিথ্যে ঘরে করে তোমার চলো মিথ্যে তো সারা মিথ্যে মিথ্যে হয়। বাবা চা খাবে? আমি করে আনি:— পুটি উঠে দাঁড়ালো—বাবার দিকে তাকিয়ে বললো। তুমি মিথ্যে ভোরাদির জন্যে ভেবো না। কুড়ুলের কাজ করবে।
ও অফিসের কাজে বোম্বেতে, ফিরতে দেরী হবে। ওদের বড় কাজের চাপ কিনা।

: হুঁ।—একটা সন্তুষ্টির আওয়াজ শোনা গেল অসুখের গলা দিয়ে।—কিন্তু, একটা চেক দেবে যাবা। পুটি এই পর্যন্তই বলতে পারলো।

বাবা আর সেদিন আসতে দেবে। তেতেই হবে তাকে পুটি সকাল সকাল রেখে দিলো। খাওয়া করে খাওয়ালো—পায়ের হাড়গোড়ে সঙ্গে দিয়ে টাকসি করে পাঠিয়ে দিলো।

তারপর স্নান করতে সে বাড়ীর পাশে পুকুরপাড়ে নেমে পড়লো। এই টুকুই তার মুক্তির সময়—এই টুকুই তার বিলাস। পুটি বাড়ীর পুকুরের পাড়ে বসে জলে পা ডুবিয়ে দিলো।—

একটু আগেই যেন ঝরা বাদল মেঘে গেছে। পুকুরের ভেতর তাদের কলাগুলো খেতে ভাক করে ঘাটেরা এসেছে—। মুখে ঘাসছে ঘরপালার কাক। মাথা তুলে তুলে চলেছে—। তারি সুন্দর লাগছে দেখতে। ছেলে ছিলের ছায়া পড়ছে—কতকে ছায়া পড়ছে আর মিলমিল করছে। পুটির হৃৎ-ঞ্জ বিলাস ভাবাটা—মাথার ছোট ছোট চুল—সবটা মিলে কি ভয়ানক একটা স্নিগ্ধী ঘিরে রেখেছে জলে তার। পুকুরের ওপরে বোধহয় একটা সাপের আর বয়লো একটোমা আতঙ্কের ছেলে আসছে।—

সেদিনের আধ-বাসনে যেন কারা কথা বলছে : ছোড়দির গলা না?—উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগলো পুটি। ছোড়দি ফিরে এসেছে। সেই মোলায়েম সুরে যেন কী কথা বলছে সে। পুটি ঘাটের ধরির এদিকে ফিরে একটা ঘাসের আড়ালে দাঁড়ালো।

। আমার আর ভাল লাগছে না কিন্তু। বুড়ো বাবা, হাসপাতাল ডুবুরী।—কত দিন ধরে ভুগছে—অথো অথো হয়, আবার ভুগছে ওরে। টাইফয়েডে ভুগে ওই তো চেহারা হয়েছে ছেলে বোকাটার। সংসারে ঝোমেলার মধ্যে আমি। বাবা অবশ্য সেদিন পর কিন্তু ওতে তো সংসার চলে না। আমাকে আর ও পাগলকে নিয়েই তো। এদের সারা জীবনই আমায় টানতে হবে।—
সারা জীবনই আমায় টানতে হবে।—

: অসম্ভব। তোমাকে তো বরাবর বলছি পালিয়ে যাই। সেই বাসবদত্তে আমার ভিক্টোরিয়ার চেনা সেন। পাইলট আছে। তো কোনো পথই নেই।

: এত দিন অবহেলায়, এদের কী করে ফেলে যাই। কিন্তু অসহ্য। সারা জীবন ধরে টানব আমি! আপনাকে এবার নিজের সিদ্ধান্তই নিতে হবে।—মীরা ফোঁস ফোঁস করতে লাগলো।

। কাঁদলে তো হবে না। মাথা ঠাণ্ডা রাখো। একটা ব্যবস্থা তো করতে হবে। সারাটা জীবন তুমি তো নার্স হয়ে বুড়োর সেবা করে কাটাতে পারো না। আমরা পরশুই চলে যাব। তুমি যা গয়না-পাটা টাকা-পয়সা আছে সব নিয়ে তৈরি হয়ে থেকো। আমি পরশু রাত দুটোয় তোমার দরজায় টোকা দেব। তুমি টাকা-পয়সা এবং গয়নাগুলো নিয়ে তোমার মালপত্র নিয়ে তৈরি থাকবে। রাজি?—

: রাজি। যাবা এখন একটু সুস্থ। বলতে ঘুমুচ্ছেন আপনাকে। আমি যাব সব গয়না—যাবার সেলফের টাকা; যাবার মাকিন্তু সঞ্চিত—সব দিয়ে তৈরী থাকবো। তুমি আসবে কিন্তু, ভুলবে না তো?

পুটি ধীরে ধীরে সরে পা তিপে তিপে বাড়ীর ভেতর পালিয়ে এলো।

বাবার জন্যে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সে অপেক্ষা করতে লাগলো। দূরে দিনের স্পর্শ আলোয় দেখা গেল দূরে বাবা আসছেন। পুটি সস্নেহে তাঁকিয়ে দেখতে লাগলো যেন নতুন চোখ দিয়ে কত বুড়ো হয়ে গিয়েছে বাবা—নুয়ে পড়েছে সামনের দিকে। হাসপাতাল টানের চাঁপা কলার মা হাতে ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে বাবা।—এই দু'বছরে কত বুড়ো হয়ে গেল। কী ভোগা হয়ে গেছে. আর ছোড়দি—তার দায়-দোষাক, আনন্দ, স্বপ্ন যেন রক্ত হয়ে শোষা সাতটা ইস্কু-বন্ধু। সংসারে ঝোমেলায় ভরে একটা টাকা আনে যে যেন তার রাজ্যে আদুলে। হাসি পেলো পুটির—ছোড়দি আর একদম বাজে লোকের জন্যে তার মূল্যবান জীবন নষ্ট করবে না—না, কিছুতেই জীবন নষ্ট করা তার উচিত নয়।—

: মা, তুই পথে দাঁড়িয়ে?—বাবা গলায় স্নেহ ভরে পড়লো, এই রোদ্দোরে কেন।—বাইরেটা এর সবাই দেখে, কিন্তু আমন ধন ক'জনের জন্যে সংসারে।

সে—মা টাকা কটা তুলে যাব। —সে।

উঠোনের পাশ দিয়ে মীরা এসে ঘরে ঢুকলো : বাবা টাকা পেলে—?

। হাঁ মা পেয়েছি—।তবে আজ বড় কষ্ট হয়েছে। তারী দুর্বল লাগছে।

। শোও গিয়ে বাবা তুমি।—মীরা ঘরে চলে যেতে যেতে বললো। আর তার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলো পুটি।

ও কথা সে কথার পর সিতাংশুকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এল, তোর বাক্সপ্যাটরা তুলিয়ে নেওয়া হয়েছে? বাড়ি যাবি, হাঁ, হাবী।' সিতাংশু নিজে একদৃষ্টে চেয়ে রোগীকে বললেন, 'আমার জন্যও একটা বাক্সের যোগাড় হোক।' সিতাংশু কথাটা হেসেই উড়িয়ে দিলেন।

ডিনিক্সে নিজে তোহুনে হেফেলে পার্টি দিলেন। কবু, মনকে বললেন, 'আমার ঐ চৌদ্দ থেকে একটি, ছোট এনে দেবে? কবু, ঠোঁট উল্টে বললেন, 'কেন নিজে আনতে পারো না?' আমার শরীরটে তেমন ভাল করছে।' কবু, বাইরে যাওয়া হওয়ার নিজে নেবেন, এটা, সারাদিনের পর সুস্থ বোধ করে ডিনারে যোগ দিলেন তোহুন। শ্রী লক্ষ্য করলেন, তোহুন 'সালের বাক্সে বের করে একসঙ্গে ছ'টা নাইট্রোগ্লিসারিন গ্লাস-মুলে ফেলে দিলেন তোহুন। তিনি ফিস্ ফিস করে মনকে বললেন, 'দাঁড়ান, একটু ফিরেন আর চাকা দেওয়া চেয়ারের ব্যবস্থা করো।' 'কেন? হাবী তখনও একটার বেশী গ্লাসমুলে খায় না।

চেয়ার এলো, তোহুন বললেন, 'ওটা একটি নিয়ে যাও।' অস্বীকার করে না তাকে তিনি অসুস্থ। বেশ অনুরোধে তিনি বেসিনের ছেড়ে নিয়ে চেয়ারে বসলেন। তোহুন হাসপাতালে যেতে চাইলেন না। তাঁর ঘরেই নার্স ও ডাক্তার চিকিৎসা করতে লাগলেন। হ্যালিফ্যাক্স থেকে বিমানে ছুটে এলেন কবু, সিতাংশু ও তোহুনের পারিবারিক চিকিৎসক। এয়ারপোর্ট থেকে তাদের নিয়ে যখন তাঁরা ফিরলেন তখনও এম্বুলেন্স এসে পৌঁছে তোহুনকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার জন্য। এম্বুলেন্সে ওঠাবার আগে সিতাংশু একটা নাইট্রোগ্লিসারিন গ্লাসমুল দিলেন জিহ্বার তলায়। খু, খু, করে ফেলে দিলেন তোহুন : 'ওতে কিছু হবে না, সিতাংশু, বাক্সোপোর্টের ব্যবস্থা করো।' ডাক্তারের ঔষধ দিতে দোলেন, তোহুন তাতে বাধা দিলেন। হ্যালিফ্যাক্সের কঠিনতম স্নায়ুর পাথর শেষে শেষ হয়ে বললেন, 'বড় কঠিন, আতঙ্কিত কঠিন।'

২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৮ সালে এম্বুলেন্সের মধ্যেই মারা গেলেন হাবী তোহুন। তখন তাঁর বয়স ৮৭।

নতুন সংস্করণ ॥ নতুন সংস্করণ ॥

ডাঃ ইউ, এম, সামন্ত প্রণীত—

বাইওকেমিক চিকিৎসা-বিধান

দশম সংস্করণ : মূল্য ১৬·০০ টাকা।

বাইওকেমিক মেটিরিয়া মেডিকা

নবম সংস্করণ : মূল্য ৮·০০ টাকা।

পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান :

সামন্ত বাইওকেমিক ফার্মেসী

৩৮৭ বি, টি, রোড, কলিকাতা-২।

ও

সকল সম্ভ্রান্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়ে

পরের দিন ফেল। তারও পরের দিন। আজ আরাধনা থেকে বেরুলো না মীরা। আজ সারা রাত তার প্রচণ্ড ঘুম। কিন্তু ভয়ের ফাঁকে ফোকরে ঘুমটুকু ছিঁড়ে ছোট্ট হয়ে গেলো পাপ্পুটি। আর ফাঁকে ফাঁকে কখন কপালের ঘোড় দিয়ে দেখে চললো কী ঘটছে।

ছোড়দি যাবার বেলা নতুন সুটকেসটায় যাবার যা-কিছু ছিল দামী সব ভরেছে, আর গয়না ভরেছে—এমন কি পেপসনের টাকা নিতেও ভোলে নি। সে একবারও ভাবলো না ওরা ফেল করী যাবে। মেয়েরা বোধ করি এমনই হয়—যখন স্বার্থপর হয়ে ওঠে তখন সব ভাল লোপ পায় ওদের।

ছোড়দি একটা ঘরে এবার শোয়।—আর সে একটু আগেই শেষে নিলো। বাবা আজ ভাঁড়ার ঘুমোন নি। তিনিও সকাল সকাল শেষে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়লেন।

সবুজ চেয়ে রইলো পাপ্পুটি—বিশাল ঘরের মত শোন দুটি ছেলে।—

রাত বাড়ছে। আকাশের তারা দীপাবিতার রাজাপথকে আলোকিত করছে। পাপ্পুটি ভাবছে—কই প্রদীপা তাদের আলোতে কি তার মা চোখ মেলে দেখছে সে. তার মীরা আজ কী করতে চলেছে—। না—ওকে আর আদকারা দেওয়া ঠিক নয়। এখন রাত দেড়টা—রাতের যেন নিশুতিকে বাদুড় পড়লো এক ভীষণ আর সঙ্গে সঙ্গে ঘন-ঘন ঘরে উঠলো বাদুড়ে তাড়াবার চেলা। ঘুম থেকে মীরা প্রদীপার এলো. পাপ্পুটি দেখলো. সে ঘরে পাচ্ছাবী ভরছে।

মীরে ধীরে বাবার টেবিলের তালাটা খুলে সে মীরার ব্যাগে সাজিয়ে দিয়ে চাবিটা ছুড়ে পাশের কোনেতে ফেলে দিলো—

ঘুমের সঙ্গে যুদ্ধের চোখের পর চোখ পড়তে লাগলো আর ঘুমের বল ক্রমেই প্রবীণের মত অল বাড়ে পড়তে লাগলো মীরা

আর ঘরে ঘুমে এসে বাবার বুকের কাছে ছোট মেয়েটির মত পাপ্পুটি তার না সরে মাতা, না আছে দম

রাঙ্গাজবা কেমিক্যাল ঃ

কলিকাতা।

নয়া বুর্জোয়া

শশধর রায় ও সুব্রত ত্রিপাঠী

আপনি কি চান ?
আমি ইনকাম-ট্যাক্স অফিসার আপনার ট্যাক্সটা জমা দিয়ে দিন
বুলিয়ুলো বলে কিনা গাড়ী বাড়ী হচ্ছে কোত্থেকে
তাই নাকি! দাও সব দূর করে
নয়া বুর্জোয়া দুঃখীরাম মাকড়ে নিপাত যাক নিপাত যাক!
দুঃখীরাম মাকড়ে
হ্যালো লাল বাজার ! ওখানি কিছু পুলিস পাঠান। আমি দুঃখীরাম মাকড়ে বলছি
কলিকাতা পৌর নিগম
আমাদের দাবী
ঘুড়ো খাবার
এক কোটি, দু কোটি, কোটি কোটি টাকা.. টাকা-টাকা টাকা....
ওগো শুনছো অনেক বেলা হল উঠছ পড়ো বুবি, কয়লা, গুদ সবাই অগাদা করছে

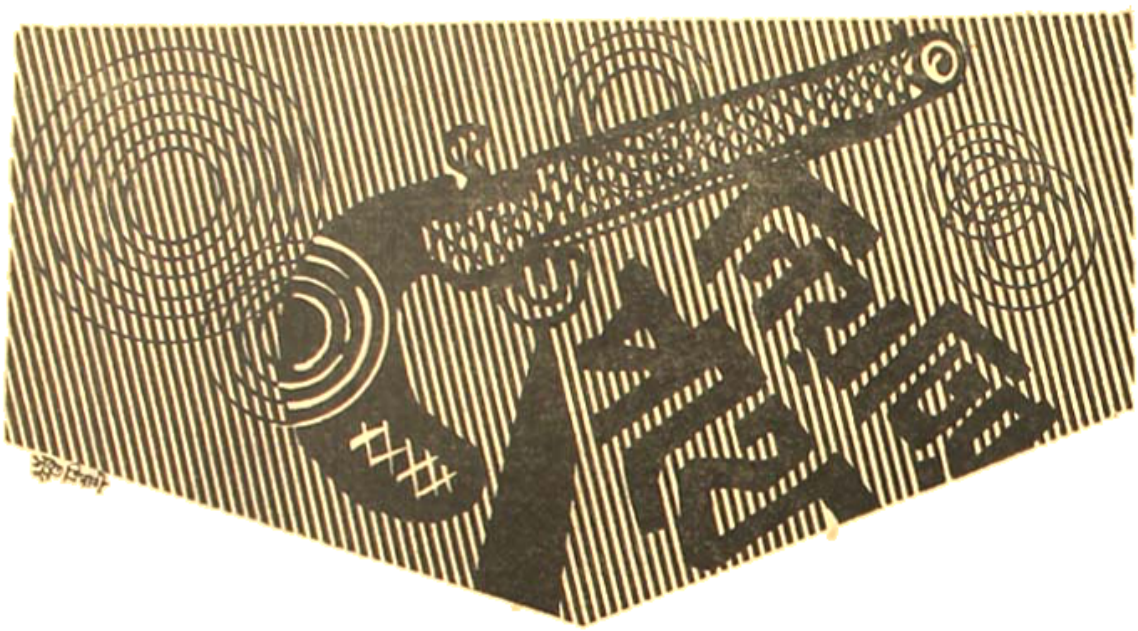

গল্পটি লিখিয়েছেন বলে 'ও হেনরী' একটি স্মরণীয় নাম। ছোট গল্পের ক্ষেত্রে 'টুইস্ট' বা সম্পূর্ণ বিপরীত পরিস্থিতি সৃষ্টি করার কারিগরি তিনিই পৃথিবীর দরবারে হাজির করেন। মাত্র ৬৮ বছর বয়সে অবসরোত্তর জীবনে পড়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন 'ও. হেনরী'।

পুলিৎজার সাহেবের আত্মহত্যার কারণ সেরেব্রাইটিস হলেও তাঁর আট বছর। কিন্তু তিনি এই অল্প সময়ের মধ্যেই ৬০০টি সম্পূর্ণ গল্প উপহার দিয়ে গিয়েছেন সর্বকালের পাঠকদের জন্য।

ও হেনরী'র আসল নাম হল উইলিয়াম সিডনী পোর্টার। জন্ম ১৮৬২ সালে আমেরিকার নর্থ ক্যারোলিনা রাজ্যের গ্রীনসবরো শহরে। বিচিত্র ছিল তাঁর শৈশব এবং সেই বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চিত আছে তাঁর গল্পগুলোতে লেখায়। কৈশোরে ধারণ ডিসপেনসারীর কর্মচারী, তারপর সাপ্তাহিকের সম্পাদক ও সাংবাদিক, অতঃপর ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ার; ব্যাঙ্কের তহবিল তছরুপের দায়ে পড়লেন পোর্টার, পালালেন দেশ ছেড়ে। তাঁর পলায়ন ও তছরুপের রহস্যের অবসান হল কারাগারে। স্ত্রীর মৃত্যুতে অনুশোচনার খবর পেয়ে তাঁকে মুক্তি দেয়া হল। পাঁচ বছরের জেল হয়ে গেল পোর্টারের। জীবনের এই চরম মুহূর্তে পোর্টার আবার কলম ধরলেন, তাঁর সহবাসী চোর, ডাকাত, মুনাফাখোরদের জীবনকথা ফুটে উঠলো তাঁর লেখনী-তলায়। জীবন-সংগ্রামের পরাজিতের দীর্ঘশ্বাস লেগে তাঁর গল্পগুলি। জেলের একটি পাহারাদার নাম ছিল এরিক হেনরী, তার নামটিই তিনি ছদ্মনাম হিসেবে ব্যবহার করলেন।

দু' বছর সাজা খাটার পর মুক্তি পেলেন। এলেন নিউইয়র্কে—পত্র-পত্রিকায় লেখা পাঠাতে সুরু করলেন। বিচিত্র অভিজ্ঞতা, বিচিত্র স্বাদের সব গল্প। এই সময় থেকে তিনি গল্পের নাম

ও হেনরী'র 'রোডস অফ ডেস্টিনী'
অনুবাদ : অধিকাংশ অপেক্ষাকৃত

দিতেন ছিলেন, গল্পলেখকের আসনে বসে কিছু তাঁর মতলব পরখ করে নিতে লাগলেন, পরীক্ষান্তে 'ও হেনরী' তাঁদের দিলেন গল্প, আরও গল্প।

'ও হেনরী' কর্মময় জীবনের সমাপ্তি হল ১৯১০ সালে। মৃত্যুর পূর্বাভাস তিনি পেয়েছিলেন কি না জানি না, তবে জীবন-যাপনের এক বছর আগে লেখা এই গল্পটি Roads of Destiny নিয়তির অমোঘ বিধানের সম্পর্কে তাৎপর্যস্পর্শী ইঙ্গিত দিয়ে গেছে।

গল্পের পটভূমিকা কিংবদন্তীর আদেশ-উপদেশের সমষ্টি ও সারস্ত সম্প্রদায়ের পরেল গল্পটি সবল পত্রে-সাধারণ সরল কলমায়। গ্রামবাসীরা ও সমস্তের পারিবারবর্গের মধ্যে কুসংস্কার অন্ধকার ও চক্রান্তের বিরুদ্ধে পরিবেশ: তারই কুটিল আবর্তে ধরা পড়লো একটি পরাধা, সরল মেষপালক-বধূ।

নিয়তির পথে

'পথে পথে ফিরি নিয়তির খোঁজে
কি যা হোয় পরিণাম
শেষের আলোকে দীপ্ত সুদূর
সন্ধ্যায় হবে কি ভরিবারে মন
বিধাতা দেখায় যায়।'

ভৌজিক জিনোবা অপরূপায়িত কবিতা থেকে।

গান শেষ হল। তারা ভেজিকের, সুরে সুরেলী ও মেয়ে। সরাইখানার ভৌজিকের মাঝখানে বসা শেফার্ডদের মেয়ে হাততালি দিল, আরও একটি তারই তাদের মনের পরদা ছিঁড়েছিল। একমাত্র খদ্দের উকীলসাহেব বসিয়ে পাশিনো গরের তারার পাতি আপাত্তি জানিয়ে একটু রাগা বাড়লেন, অবশ্য তিনি হলেন বই-পড়িয়ে মানুষ, তা ছাড়া অন্যদের মতে তিনি মদ পানও করেন নি।

ভৌজিক সফরের পথে বেরিয়ে এল গ্রামের শীতল বাতাসে মাথার ভিতরের মদের ঘোর কেটে গেল, তারপর তার মনে পড়লো যে, দিনের বেলায় তার সঙ্গে টেক্কাদের ঝগড়া হয়েছিল এবং তখনই সে ঠিক করেছিল মুক্তোদাস করে বিদায় বাহিনীদের শাস্তি ও ভয়ের সম্মানে ঘরা করবে বলে সংকল্প করেছিল।

এক অপূর্ব উত্তেজনার ফলে আপন মনে সে বলে উঠলো, "যখন আমার কবিতা সমস্তের মুখে মুখে ফিরবে, তখন হয়তো আমাদের কষ্ট ভুলার মনে সে জন্য তাগ করবে।"

(১১৮ পৃষ্ঠায় দেখুন)

সবুজ বনে আগুন

(৭৪ পৃষ্ঠার পর)

ওরকমটা কি একেবারে থাকতে নেই। প্রতিভা, মিতু—বড় ছেলেটা, তার ছোট ভাই বন্ধুকে যে ভাবে আগলিয়ে, সেটাও একেবারের নিখুঁতপনা। তার এখনো মনের ওজন বোধ আসে নি। কিন্তু আশা রায় বলে যে মানুষ পরিচয়, তারও কি অল্পে নি মিতু কি মনের হাওয়া, আশা রায়ের কাছ থেকেই আহরণ করে নি।

মিতুর হাতের আঘাতে, বন্ধু মাটিতে আছড়ে, নিজেদের ভাষায় চিৎকার করে কাঁদতে লাগল। মিতু নিশ্চুপ হয়ে রইল। একটু অপেক্ষা, মিতু কোন রকম চিৎকার বা আস্ফালন করে নি, যে রক্ষণটা সব থেকে ভয়ানক। তার মানে, অপরাধটা ও স্বীকার করে নেয় নি। শাস্তিটাকে মেনে নেয় নি। হয় তো ও কান্নাকাটি করলে, মারার মাত্রা হত, মারতেও ঘৃণা হত, ছাড়িয়ে দিতে চাইত। কিন্তু মিতু, দাঁতে দাঁত টিপে, চোখের জল ফেলেছে, তবু, একটুও চেঁচায় নি।

মিতুর চুলটাই যেন মনটা বেশি মাত্রায় বিষণ্ণ হয়ে উঠল। সমস্ত বাড়িটা, আর তার অধিবাসীদের কেমন যেন নিরাসক্তের মনে হল। ঘটনাটা বোধহয় আকস্মিক ঘটে, ঘরে ঘরেই ঘটে, তাই কারোরই কিছু এসে যেত না। কেবল শাঁখা পরা মায়ের পিঠ সুড়ে সুড়ে করে, তারাই নিজের স্বভাবে কষ্ট ভিড় করেছিল।

বিহারী সকাল বেলায় বাজারে এসে ছিল। চুপচাপ খানিকক্ষণ হল থেকে, আস্তে আস্তে বেরিয়ে নিজে, শিবপ্রসন্নবাবু বেরিয়ে পড়লেন। মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি। এ রকম একটা পরিবেশে, কতদিন আর থাকতে পারবেন, বুঝতে পারছেন না।

তিনটে বাজার পরে, চা খেয়েই, শিবপ্রসন্নবাবু বেরিয়ে পড়লেন। আজ একটু তাড়াতাড়িই বেরোলেন। অন্যান্য দিন, আর একটু বেলাতে বেরোন। রেল লাইনের ধারে, বাঁধানো ইটের রাস্তায়, ধুলি খেলার আসরটাই জমজমাট। পরে তিনটে চারটে দল, ওখানে ধুলি খেলে। মাঠের পাশের বাড়ি থেকে, ছোট ছোট দু একটি মেয়েও আসে। বাঁধানো রাস্তার ওপরে, মাথা কেটে, ওরা একটা দৌড়ুনো খেলে। বড়দের বিশেষ এদিকে দেখা যায় না।

রাস্তাটা দিয়ে হেঁটে, উত্তর দিকে গিয়ে, পশ্চিমের মাঠেও চলে যান। সেখানে ফুটবল খেলা হয় না। খানিকটা জায়গা জুড়ে আদির ঘর কাটা আছে। সেখানে এক দল গরু খেলে। ভাঙাচুরি একদিকে। ঘুড়ো ঘুড়ি দৌড়াদৌড়িও হয়। দু একজন বুড়ো মানুষ সেখানে চুপচাপ বসে থাকে। শিবপ্রসন্নবাবু কিছুক্ষণ ওদের কাছাকাছি ঘুরে বেড়ান। শিবপ্রসন্নবাবু ছেলেবেলায় ফুটবল খেলতেন। ভালই খেলতেন। ছোটখাটো চেহারা, কিন্তু ভীষণ চটপটে। ডান পায়ের শটটা ছিল মারাত্মক। ভাল ফরোয়ার্ড খেলতেন। কিন্তু, সে সব অনেক দিনের কথা। এখন আর ওসব খেলা দেখতে ইচ্ছা করে। নিজেকে সে অত্যন্ত স্বাধীন আর নিরাপদ বলে বোধ করে।

খোলামাঠটা বড় অসাড়ত্বে। হঠাৎ চৈত্রের খোলা দরজা থেকে, একটা হিংস্রতার বাতাস বয়ে গেল, ঠিক ওদের মত করেই, ওদের ঘেঁকিয়ে দিল। তৎক্ষণাৎ, পশুদের এক-এক ঝাঁপিয়ে পড়ে, পায়ের তুলে নিল। বাকী দুজনও সরে দাঁড়াল। শিবপ্রসন্নবাবু ছেলে ফেলে উঠলেন, বুক ধড়াস করে উঠল।

মায়ের আদর খোকাই ছিল না, পরনেও সে রকম কাপড় ছিল না।

আজ তিনটের পর বেরিয়ে, পশুদের তিনি রোজ লাইনের দিকেই গেলেন। গিয়েই দাঁড়ির ঝোপে ঘুরতে দাঁড়িয়ে পড়লেন। দেখলেন, একটা মিউ এজিনের টানা, আসের দিনের কাঠের ট্রেন চলেছে। আর রেল লাইনের ধারে দাঁড়িয়ে, গাড়ির দিকে মুখ করে তিনটি ছেলে। তাদের মধ্যে দুজন রেলের দিকে পেছিয়ে কোমর দোলাচ্ছে আর হাসছে। চেঁচিয়ে ওদের বয়সী কোন কোন গালাগাল করছে।

ব্যাপারটা বোঝবার জন্য, শিবপ্রসন্নবাবু ঘাড় বাঁকিয়ে, একটু উঁচু ঘাসের ঢেপ্পা করতেই ঘুরতে গেলেন। তিনজনেই হাসছে, বাকী দুজন, হাত প্যান্টের বোতাম খুলে, অভ্যস্ত ধুলি আর গর্ব ছড়ে, তাদের পশুত্বাস দেখাচ্ছে। এ খেলাটা হয়তো, তাঁদের বড়ন দেখেন না। ছেলে চলতে ছিল, আহা দু এক্ষুনি দেখেছেন। এর মধ্যে ছোটরা এত বড়দের নিবিড় আনন্দ বোধ করে। আর কিসের করে, লম্বা ট্রেনের যাত্রীদের অসহায় দৃষ্টির সামনে, তাদের একটা মজার খেলা দেখাতে ইচ্ছা করে। নিজেকে সে অত্যন্ত স্বাধীন আর নিরাপদ বলে বোধ করে।

খোলামাঠটা বড় অসাড়ত্বে। হঠাৎ চৈত্রের খোলা দরজা থেকে, একটা হিংস্রতার বাতাস বয়ে গেল, ঠিক ওদের মত করেই, ওদের ঘেঁকিয়ে দিল। তৎক্ষণাৎ, পশুদের এক-এক ঝাঁপিয়ে পড়ে, পায়ের তুলে নিল। বাকী দুজনও সরে দাঁড়াল। শিবপ্রসন্নবাবু ছেলে ফেলে উঠলেন, বুক ধড়াস করে উঠল। ওরা তিনজনেই শিবপ্রসন্নবাবুর দিকে, ওঁকে ঘেরে ধরতে গেল। উনি হাত তুললেন।

তিনজনেই থমকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। কী করবে কিছু বুঝতে পারছে না। শিবপ্রসন্নবাবু ওদের দিকে এগিয়ে গেলেন। মুখে একটা অমায়িক হাসি ফুটিয়ে বলতে চাইলেন, 'ভয় নেই, এরা বুকের মধ্যে খালি এই কথা বলছে, 'পেরেছি পেরেছি।' ওদের ঘেঁকিয়ে তাদি বেরিয়েছি, তাদের পেরেছি। পায়ের স্পর্শ অতি তাড়াতাড়ি মাটিটি ঘটনা ঘটে। এরকম চৌদ্দ বছরে ঘটিয়েছে, তিনটি ছেলেকে হত্যা করেছে, একজনকে অন্ধ করেছে, অনেক মানুষকে আহত করেছে, সেই পাইরানিবাসের ফাঁসি পেয়েছি।'

পরক্ষণেই তিনি দেখলেন, সেই মিতু, মিতুই একমাত্র ছেলে, সে তার প্যান্টের বোতাম খুলে মাঠটাকে দেখায় নি, মাথা একজন বন্ধুর সেই রকম অভিনয় করার পরেও দাঁড়িয়ে পড়ে, পায়ের তুলে নিয়ে ছিল। মিতুই পরের পরের তুলে নিয়েছিল তাকে তুলতে দেখে, বাকী দুজনও পায়ে পায়ে তুলে নিয়েছে। তা হলে, মিতুই নিয়ন্তা। শিবপ্রসন্নবাবু কি তাহলে, ঠিকই বলেছিলেন কেন মিতু দুপুরের নিরালায় একা একা লাইনের ধারে দাঁড়িয়েছিল, এতক্ষণে ছিল সার্কি তার হতাশার ভাষা খুঁজতে

ইতিমধ্যে গাড়িটা চলে গিয়েছে, ও তিনজনেই শিবপ্রসন্নবাবুর দিকে একবার তারপর নিজেদের দিকে তাকাতাকি করল। শিবপ্রসন্নবাবু দেখলেন, মিতুকে ছাড়া, বাকী দুটো ছেলেকে তিনি চেনেন না। এ অঞ্চলটে কোনদিন দেখতে পান নি। বাকী দুজনের মিতুরই বয়সী হবে। একটি ছেলে মিতুর থেকে একটু বড়ও হতে পারে, কারণ তার ওপর ঠোঁটের ওপরে কালো রেখা যেন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অন্য ছেলেটি রোগা, টানা টানা চোখ, তিকলো নাক, গাঁট কুঁচি চুলগুলি সুন্দর। রোগা রোগা একহারা চেহারা। তার জামা প্যান্ট দেখলেই বোঝা যায়, মিতুদের মত অতটা তার নয়। একটু, অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে।

শিবপ্রসন্নবাবু কাছে এগিয়ে এসে বলেন, 'এমন করে কি চলন্ত গাড়িতে পাথর ছুঁড়তে আছে? দেখতে পায় আলাদা, লোকে মরেও যেতে পারে।'

তিনি কথাগুলো বললেন এমন ভাবে, যেন ঘটনাটা দেখলেন বলেই বললেন, এর ঘটনাটার গুরুত্ব যাতে ওরা বুঝতে পারে। দেখলেন, ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে মিতু, তার ডান হাতের মুঠোটা আলগা করল, পাথরটা পড়ে গেল মাটিতে। ওর দেখাদেখি, বাকী দুজনও হাত থেকে পাথর ফেলে দিল।

শিবপ্রসন্নবাবু দেখলেন, মিতুর ওপরে যেমন সন্দেহ আর ছোটছুটা, বাকী দুজনের ঠিক তা না। মিতু যেন শিবপ্রসন্নবাবুকে সব ঠিকঠাক বুঝতে চাইছে। কিন্তু, তিনি ভাবছিলেন, মিতুকে আজ তিনি, তার পরিচয়ও

সাথি। বাকী মুহূর্তের পরিচয়টা, এবং একলা চলাটা জেনে নেওয়া দরকার। দুঃখী এদের দলে, আরো অনেকেই আছে। সাধারণতঃ এই বিবরণকে ঘিরেই, তার কাজ এগোতে পারবে। তা ছাড়া, তিনি মনে মনে ঠিক করলেন, মিতুকে এখন কিছু বুঝতে দেওয়া উচিত না, যাতে ও সন্দেহ করতে পারে। কিছুদিন আগে, সেই মুহূর্তের ঘটনা তিনি কিছু বলেননি। শুধু আলো ঝিলিমি ছেলেটির দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী নাম তোমার, কোথায় থাক?'

ছেলেটি চকিতে একবার মিতুকে দেখে নিল। বলল, 'আমার নাম বিবেক—বিবেক বন্দ্যি ঘোষ।'

ঝিলিমিলনাথ যেন খুবই খুশি হলেন, এমনি ভাব করে বললেন, 'বাঃ, ভারি সুন্দর নাম তো তোমার। থাক কোথায়?'

হাত তুলে, পশ্চিম দিক দেখাল, অর্থাৎ গোটা লোকালয়টাই বোঝায়। বলল, 'ওদিকে।'

'আচ্ছা আচ্ছা। তোমার নাম কী?'

যে ছেলেটি একটু বড় বলে মনে হচ্ছে, তাকে জিজ্ঞেস করলেন। এর পোষাক প্রায়ই অনেকটা মিতুর মতই। তবে ওপরে আবার খাকি শা। একটু মোটাসোটা ছোটা-মোটা ভাব আছে। মিতু আর বিবেকের তুলনায়, অনেক বেশী ভাল মনে হয়। মিতু যার বিবেক ওর পায় নি ঝিলিমিলনাথকে দেখে। একটু অস্বস্তি বোধ করছে। কিন্তু এই ছেলেটির চেহারা মুখে, ভরসা যেন ফুটে উঠেছে। তবার দেবার আগ্রহ, তার গলার মোটা গ্রোণী কণ্ঠস্বরটায় মুখর হয়ে উঠল। যেন চেষ্টা করে বলতে হল, 'প্রীতিনিক নাম মিত্র।'

যা ভেবেছিলেন, তা-ই। মাঝিক অবশ্য কোন আর ভাঁড়ে, তা না হলে, 'শ্রী' বলত না। ওদের মধ্যে কথা বলেছিলেন ঘটে, ঝিলিমিলনাথের অসীম লক্ষ্য মিতুর দিকে। এবার তিনি হেসে মিতুর দিকে তাকালেন। ও-পক্ষে হেসে হঠাৎ চিনতে পেরেছে, এমনি ভাবে বললেন, 'তোমাকে কিছুদিন আগে দেখেছিলাম না?'

মিতু কোন প্রত্যুত্তর না দিয়ে, ওর বন্ধুদের দিকে তাকাল। ঝিলিমিলনাথ বুঝলেন, বড় কঠিন ঠাঁই এই মিতু। অথচ, মনে হয়, মিতুকে ছাড়া কিছুই জানা যাবে না। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার বাবা কী, কোথায় থাক?'

মিতু একবার ঝিলিমিলনাথের দিকে তাকাল। চোখে ওর গভীর সন্দেহ, সতর্কতা ওর মুখচোখে। তবার ও বন্ধুদের দিকে ফিরে বলল, 'চল্।'

ঝিলিমিলনাথ হেসে ফেললেন। তিনি সেই প্রায় বুঝলেন, মিতু পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। যাওয়াস্বাভাবিক। তিনি একটু তাল দিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে, মিতুর হাত ধরতে গেলেন, 'আরে যোস যোস—'

তার আগেই মিতু, ঝটকা মেরে ওর হাতটা সরিয়ে দিয়ে, সতর্কভাবে ফোঁস ফোঁস উত্তর দিল। ঘটনায় আকস্মিকতায়, তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ়। আর ঠিক তখনই, বিবেকও মুহূর্তের মধ্যে, ছিটকে সরে গিয়ে, মিতুকে অনুসরণ করল। ঝিলিমিলনাথ আর একটুও দেরী না করে, খপ্ করে মাঝিকের হাত চেপে ধরলেন। পরাজয়ের গ্লানিতে, একটু ঘোরতর চমক এসে গিয়েছে, ঘরকের সুরে বললেন, 'আরাবার, পালাবার চেষ্টা করবে না। ও কী রকমভাবে তোমরা ছেলেরা ভিতে লোকদের দেখাবে? মনে করেছ, কিছু বুঝি না আমি? চালকে শিঠের হাল তুলে দেব, অমনি ছেলে। চল, তোমাদের বাড়ি চল, তোমার মাকে আমি সব কথা বলে দিয়ে আসব।'

মাঝিকের তখন ঠোঁট কাঁপতে আরম্ভ করেছে। চোখে জল এসে পড়েছে। তোতলার মত কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, 'আমি— আমি কিছু, করি নি।'

ঝিলিমিলনাথ ধমক দিলেন, 'আবার মিথ্যে কথা বলছ, কিছু, করি নি। আমি নিজের চোখে দেখেছি। চল, তোমাদের বাড়ি চল।'

মাঝিক তখনকার কেঁদে উঠে বলল, 'আপনার পায়ে ধরি ছেড়ে দিন। আর কোন দিন করব না।'

ঝিলিমিলনাথ বুঝতে পারছিলেন, মাঝিকের ছোট্ট খুব বেশি দূরে না। মনের উত্তেজনা কাটিয়ে, তিনি সচেতন হলেন, সতর্ক হয়ে উঠলেন। তাইনে বাঁয়ে একবার তাকিয়ে দেখলেন। তিনি ভাবলেন, এ রকম একটা ঘটনা, লোকে ভাল চোখে দেখবে না। যা দিনকাল, ওঁকেই হয়তো শাস্তি কৈফিয়ৎ দিতে হবে। লোকেরা ওঁরই শিয়রে লাগবে। এই সব সাধারণ মানুষ, আসল বিষয়টা কিছুই জানে না, এদের কোন কারুকেই বিশ্বাস করা যায় না। অথচ, তাড়াতাড়ি মাঝিকের কাছ থেকে, যতটা পারা যায়, আদায় করতে হবে।

ঝিলিমিলনাথ কোমল স্বরে বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে, তোমাকে ছেড়ে দেব না তো কী করব। কিন্তু আর ও রকম দুষ্টুমি করো না, কেমন?

বললেন, কিন্তু মাঝিকের হাত ছাড়লেন না। মাঝিক ঘাড় কাত করে বলল, 'আচ্ছা।'

'কোন ক্লাসে পড়?'

'ক্লাস সেভেন।'

মিতুর সঙ্গেই পড়ে। বিবেকও নিশ্চয় তাই। জিজ্ঞেস করলেন, 'কোন ইস্কুলে?'

মাঝিক ইস্কুলের নাম বলল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'ওরা ও রকম দৌড়ে পালাল কেন?'

মাঝিকের পরিষ্কার জবাব। বন্ধুদের তাকিয়ে দিয়ে বলল, 'ওরা পাজী।'

ঝিলিমিলনাথ ঘাড় নেড়ে বললেন, 'হুম্, তোমরা আর কী আছে?'

'ভিলে ভাত খাও?'

'কী আর খাবে?'

'লেবুর আঁচলের কারবার।'

'হুম্, ও তাই যোস তোমরা?'

'আজ্ঞে।'

ঝিলিমিলনাথের বুকে যেন ঘুষি মেরে লাগল। লেবুর আঁচলের কোম্পানী, তার সন্তানদের সঙ্গে আছে।

তিনি গলার স্বর বদলে, অন্য পথে তুললেন। বললেন, 'যেলাগুলো কর, সেটা এক কথা, কিন্তু, ঝাঁড়িতে পাথর ছোড়া উচিত না। তাই না?'

মাঝিক সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ।'

'ওতে লোক মরেও যেতে পারে।'

মাঝিকের মুখে কোন ভাবান্তর নেই, ঘাড় নেড়ে কেবল সায় দিল। ঝিলিমিলনাথের যেন হঠাৎ মনে পড়ে গেল, ওৎসাহভরে বললেন, 'ওই তো কিছুদিন আগে, এ লাইনেই কোথায় যেন, ও রকম পাথর ছোড়ার ফলে একজন প্যাসেঞ্জার মরে গেল।'

মাঝিক বলে উঠল, 'হ্যাঁ, এখানেই তো।'

ঝিলিমিলনাথ সতর্ক হয়ে উঠলেন, 'তোমার বল তো?'

মাঝিক হাত তুলে, একেবারে নির্দিষ্ট জায়গাটাই দেখিয়ে দিল, এবং বলল। তিনি অনুমান করেছিলেন, ব্যাপারটা তা-ই। আপ-এর গাড়িটা থার্ড লাইন দিয়েই যাচ্ছিল। মাঝিক থার্ড লাইনের দিকেই হাত তুলে দেখাল। জিজ্ঞেস করলেন, 'যে লোকটা মরে গেছে, তাকে তুমি দেখেছিলে?'

'হ্যাঁ।'

মাঝিক সহজভাবে যতটা দেখে কী না জানছে। ঝিলিমিলনাথ বুঝতেই নিলেন, এবং তাড়াতাড়িই জিজ্ঞেস করলেন, 'লোকটার বেড়ানো কেমন? কত বয়স হবে?'

মাঝিক বলল, 'বেশি বয়স না। অবশ্য আর লম্বা।'

'তুমি কি লোকটিকে মরার পর দেখেছিলে?'

মাঝিক ঘাড় নেড়ে জানাল, না।

'কী দেখেছিলে তুমি?'

'লোকটাকে গাড়ি থেকে পড়ে যেতে দেখেছিলাম।'

'গাড়িটা দাঁড়িয়ে পড়েছিল?'

'হ্যাঁ, একটুখানি এগিয়ে।'

'তোমরা তখন দৌড়ে পালিয়েছিলে?'

'আ্যাঁ?'

'দৌড়ে পালিয়েছিলে?'

'আ্যাঁ?'

মাঝিক কী বলবে, ভেবে পাচ্ছে না। ঝিলিমিলনাথ মনে মনে অন্য সন্ধান করলেন, 'তোমরা কে কে ছিলে?'

মাঝিক এবার ভয় পাচ্ছে। সে জিজ্ঞেস করল, 'কেন?'

ঝিলিমিলনাথ বললেন, 'আমি জিজ্ঞেস করছি, তোমরা কে কে ছিলে?'

'কোথায়?'

'সেই পাখির ডিম ভাঙতে গেলে?'

'আমি ছিলাম না, সাঁতা বলছি।'

'তবে যে তুমি বললে, লোকটাকে তুমি গাছ থেকে পড়ে যেতে দেখেছিলে?'

'হ্যাঁ, কিন্তু আমি—আমি তো পাখির ডিম নিই।'

গিরিন্দ্রনাথ সাঁতা আমাদের চেষ্টা না করে, জিজ্ঞেস করলেন, 'কে কে ছিল?'

'মিতু।'

'কে মিতু?'

'ওই যে খেড়ে ছেলে গেল আগে।'

কথাটা তোমাকে, মাণিকের কোন আপত্তি নেই। মিতু বা বিবেক যেটা কখনই পাখির না হওয়ার। তার মনে মনে তিনিও জানেন, মিতু ছাড়া কিন্তু হতেই পারে না। জিজ্ঞেস করলেন, 'আর যে কে ছিল?'

'বিকু।'

'বিকু কে?'

'বিবেক। ওই যে ছেলে গেল।'

'আর কে?'

'আর?'

'হ্যাঁ, আর কে কে?'

মাণিক খানিকটা ভাবল। গিরিন্দ্রনাথ বললেন, 'মিথ্যে বলো না মাণিক, মনে কর বল, আর কে কে ছিল?'

মাণিক বলল, 'চাঁদ ছিল।'

'চাঁদ কে?'

'আমাদের সঙ্গে পড়ে।'

'তোমার বন্ধু?'

পুবদিকে হাত তুলে দেখিয়ে বলল, 'বাবকুক অলোনিতে।'

'আর কে কে?'

মাণিক বলল, 'আর কেউ না।'

'ঠিক মনে আছে তোমার'

'হ্যাঁ, আর কেউ ছিল না।'

গিরিন্দ্রনাথ পরে মাণিককে ছেড়ে দেবার মত করে বললেন, 'আচ্ছা, তুমি যাও।'

বলেই সঙ্গে সঙ্গে আবার বললেন, 'তুমি কী খেতে ভালবাস মাণিক?'

মাণিক হা করে তাকিয়ে রইল, কোন জবাব দিতে পারল না। গিরিন্দ্রনাথ বললেন, 'আমাকে বল, তুমি কী খেতে ভালবাস, আমি তোমাকে খাওয়াতে পারি কী না দেখি।'

মাণিক এক কথায় বলল, 'ভাতে।'

'ভাতে?'

গিরিন্দ্রনাথের মনে মনে খুব হাসি পেল, কেমন যেন কষ্টও মনে হল। বললেন, 'এখন রাতে কোথা থেকে খাওয়াব তোমাকে? আমার বাড়িতে তো এখন রাতে নেই।'

'কখনো কোথাও আছে।'

'সেটা কোথায়?'

'খি, চি, রোজে।'

'অত দূরে যাবে রাতে খেতে?'

'ওখানে ভাতা পাওয়া যায় না।'

'তবে কোথায় পাওয়া যায়?'

'সেই আনা আর বড়ো আনা।'

গিরিন্দ্রনাথ বুঝলেন, ভাই আনা বা বড়ো আনা সাপের কথাই বলতে চাইছে, মাণিকের কথায় কোবিনের মাংস খাওয়ার লোভটাই আগে হয়। গিরিন্দ্রনাথ মনে মনে একটু, হিংসা করলেন। মাণিকের দুর্বলতাটা বুঝতে পারছেন। পকেট থেকে আরেক আনা একটা টাকা বের করে হাতে নিলেন। মাণিক চকচকে চোখে টাকাটার দিকে তাকাল। গিরিন্দ্রনাথ ওর হাত ছেড়ে দিলেন। মাণিক দৌড়ে পালাল না।

গিরিন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা মাণিক, তোমরা সাপের ডিম ভেঙেছিলে কেন?'

মাণিক তাড়াতাড়ি মাথা নেড়ে বলল, 'আমি ভাঙি নি।'

কথাটা মিথ্যা, বুঝতে পারলেন। মাণিক শুধু লোভী না, নিজেকে বাঁচাবার কথাটা সব সময়ে মনে রাখে। মাণিক এক

ধরনের বোকা খুব। জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, ওরা কেন ভেঙেছিল?'

'এমনি।'

'এমনি এমনি কখনো হয়।'

'হ্যাঁ সাঁতা, এমনি এমনি।'

মাণিকের চেহারার দিকে চেয়ে একটু ভাবলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'একেবারে এমনি এমনি? মানে তো নিশ্চয় কোন কথা হয়। সবাই মিলে যখন একটা কিছু করে, তখন নিশ্চয়ই কিছু ঠিক করে নেয়।'

মাণিক যেন ভাবিত হয়ে পড়ল। কী বলবে, ভেবে পাচ্ছে না। তারপরে বলল, 'তা কী জানি। একজন বলেছে, বাওটাও খাবে বলে।'

গিরিন্দ্রনাথ বুঝলেন, মাণিক এটা মিথ্যা কথা বলছে না। আসলে, ভেবে কিছু বলবার নেই ওর। জিজ্ঞেস করলেন, 'খালি খেলা?'

'হ্যাঁ, এমনি এমনি। একজন পাখির ডিম ভাঙতে আরম্ভ করলে, সবাই ভাঙতে থাকে।'

'লোক মরে যাবে জেনেও?'

'তা কী করে জানবে?'

'জানবে না? আগেও তো কেউ ও রকম পাখির ডিম ভেঙে দেখে নয়। যদি সত্যি পাখির ছোঁয়াচ, তাহলে কি এত হত না বুঝে হয় না?'

মাণিক এ কথায় জবাব দিল না। তবে গিরিন্দ্রনাথের দিকে তাকিয়ে তাচ্ছিল্যের বলল, 'এত হয়।'

কথাটা অঠিক না।

উত্তেজনা থেকেই আশঙ্কার। মাণিকের কথা শুনে মনে হচ্ছে, সেখানে মাত্র একা ও পাখির ছোঁয়াচ নেই। মনে পড়ছে, তার ছোঁয়াচে। অবশ্যকের ব্যবস্থা এমন মনে হয় না। অবশ্যই মনে পড়ে, বুঝতে পারে। কিন্তু, কাজটা [illegible] নি, অনেকবার ঘটেছে। কি জেনে একটা অনুভূতির উত্তেজনা মনে মনে করে এমন ঘটতে পারে। একটা বিশেষ মনোভাব কি এর মধ্যে কাজ করছে না তেমন নিশ্চয়। উত্তেজনা , তেমন বা অন্যরকম, এবং ইচ্ছাও কি কাজ করছে না।

কিন্তু, মাণিকের কাছ থেকে এর বেশী জানা সম্ভব না। বললেন, 'কিন্তু এটা তো একটা মারাত্মক খেলা মাণিক। এতে নিজে লোকজন মরতে পারে। সাপের সমস্ত কেউ খেতে পারে না।'

মাণিক বলল, 'খেলতে তো তাড়াতাড়ি ফেলে পালিয়ে বলতে পারে না।'

'সাপও তো বলতে পারে।'

'সেই তো সাপ বলতে জানে না।'

অর্থাৎ, মরলেই নিশ্চিন্তে ফেলে দিলেন গিরিন্দ্রনাথ, এতে খেলা। এরকম আর আছে। একটু কথা বলতে পারে না বাড়িতে, সামান্য একটু, নামাতে করে। বাবারা কথা বলে ওঠে, সবে মতো কাঁপিয়ে পড়ে। ভাবতে আরম্ভ করে

তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাদের মধ্যে, কে সব কে সাপ পাখির ছোঁয়ে?'

'মিতু।'

এটাই আশা করেছিলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'আর?'

'বিকু, চাঁদ।'

'আর কেউ ছোঁয়নি না?'

'দেখি নি।'

তাহলে মোট [illegible] বাচ্ছে। মিতু, বিবেক চাঁদ আর মাণিক সাঁঝ ছোঁয় মাস হবে, চারটি ছেলে আক্রান্ত হয়ে চলেছে। তিনটি [illegible] আহত। আর হয় তো নয়ন [illegible] তিনি এসে পড়েছিলেন বলে না। কী ভয়ানক পাপের, ভেবে জিজ্ঞেস করলেন, 'কে কে পাখি?'

'মিতু?'

'কে সবচেয়ে আগে ছোঁবে?'

'তার কোন ঠিক নেই।'

'তবু?'

'মিতুই। ও তো খুব রাগী, আর ওর হাতের টিপ খুব ভাল।'

'মিতু খুব রাগী বুঝি?'

'হাঁ, ওর সঙ্গে কেউ পারে না মারা-মারি করে।

মিতুর সেই মার খাওয়ার ছবিটা ছেলে উঠল বিপিনবিহারীর চোখের ওপর। যে ছেলে উঁচু পর্দাটি না করে ওঠানো মার খেতে পারে, সে মার দিতেও পারে। ঠিক অর্জুন তবেই, কর্ণাদিকে পড়ে মারতে পারে, অবিকল তার ছোটো মার ধারার মত। বিপিনবিহারী জিজ্ঞেস করলেন, 'মাণিক, তুমি হরেকৃষ্ণ সাহার বাড়ি চেন?'

'হাঁ। চিনি। আমরা ওর নাম করি না।'

'কেন?'

'ওর নাম করলে নাকি হাঁড়ি ফেটে যায়। ওর মুখ দেখলে খারাপ হয়।'

বিপিনবিহারী মনে মনে হাসলেন। বললেন, 'আমি ওই বাড়ির মিতুর ইস্কুলের মাস্টার। তোমার যখন ইচ্ছা হয়, তুমি এস। এই নাও, একটু আগে থেকে বাড়ি চলে যেও।'

মাণিক টাকাটা নিয়ে একবার বিপিনবিহারীর দিকে দেখল। তারপরে পিছন ফিরে, উত্তর দিকেই চলতে আরম্ভ করল। বোঝাই গিয়ে, আর বিবেক গিয়েছে। বিপিনবিহারী ভাবলেন, সম্ভবতঃ এখন মাণিক গিয়ে ওর বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করবে। সম্ভবতঃ নয়, দেখা করবেই। মিতু আর বিবেক? নিশ্চয় মাণিকের ফেরাই অপেক্ষা করছে। লোকটা এতক্ষণ ওরে মাণিককে কী বলছিল, নিশ্চয়ই জানতে চাইবে। হয়তো, কোন অজুহাত দেখে, মিতু আর বিবেক, সঙ্গে স্লাপাহাটা লক্ষ করেছে। মাণিক দেখা করবে, টাকার কথাটা লুকোবার। বন্ধুদের সঙ্গে, টাকাটা ও ভাগবাটোয়ারা করতে চাইবে না। আর যদি ওরা দেখে থাকে, তাহলে টাকাটা সবাই মিলে খরচ করবে। মাণিক মোটামুটি ঘটনাটাও ওদের বলবে, নিজের দোষ ঢাকিয়ে। তারপর মিতুর হাতে মারের ভয় আছে। কিন্তু, ওদের পরিতিক্রিয়াটা কী হবে, সেটাই জানা দরকার।

হরেকৃষ্ণর বাড়িতে একটা নতুন অশান্তি দেখা দিয়েছে। রাধারাণী থেকে তার এত দূরে সম্পর্কের শালা এসেছে। বয়স বছর চব্বিশ পঁচিশ। বোনটি এই দূর সম্পর্কের ভাইকে পেয়ে খুব খুশি। রোদও মাখছে মন মন। রান্না হচ্ছে ভাল ভাল। এতদিনে জানা গেল, হরেকৃষ্ণর শ্বশুর মস্ত ধনী। তার ভাইয়ের ডাকাডাকি থেকেই, নাকী জানা গেল। হরেকৃষ্ণ কখনোই শ্বশুর বাড়ি যায় না। এখন কি, বিপিনবিহারী দুবার হাসি পর্যন্ত শুনতে পেয়েছেন। ছেলেটিকে এখন অনেকটা স্বাভাবিক লাগছে।

কিন্তু, হরেকৃষ্ণর অবস্থা সাংঘাতিক। সর্বক্ষণের বিষের ওপর তার বিশ্বাস নেই। সে নিজেই সর্বক্ষণ বাড়িতে আসছে। খোকনের মাথায় পয়সা ছেড়েই দিয়েছে, শালাবাবুই আনার পারে। হেসে হেসে বোকাতে চাইছে, শালাবাবুর বাড়িতে কয়েক বেলে ইচ্ছা করে না। মউ আর শালাবাবুকে নিয়ে, একদিন দক্ষিণেশ্বর সিনেমাও যেতে হল।

বিপিনবিহারী লক্ষ্য করেছেন, হরেকৃষ্ণর সন্দিগ্ধ চোখের কোণে রক্ত জমছে। লক্ষণটা ভাল না। যদি তার হাতে সত্যিই ভাইয়ের রক্ত লেগে যায়, তবে স্ত্রী বা শালকের রক্ত লাগাতে সে দ্বিধা করবে না। ব্যাপারটা ক্রোমাঞ্চকে গড়াবে, বোঝা যাচ্ছে না। তবে গতিক সুবিধের না।

বিপিনবিহারীর তাতে কিন্তু ভয় আসে না। তার নিজের চিন্তাটাই, তাঁর কাছে বড়। মাল কিনে ফাঁকতে ফাঁকতে, শেষ পর্যন্ত মিতুকে জমল খোলা ছাড়া, আর কিছু ভাবছেন না। তিনি চাঁদের সঙ্গে কথা বলেছেন। বিবেকের সঙ্গেও কথা বলেছেন। আঁদোলা সেটা খুব সহজে সম্ভব হয় নি। মনে কষ্ট করে করতে হয়েছে। চাঁদকে তিনি রামকৃষ্ণ কলোনিতে গিয়ে ধরেছিলেন। বিবেককে ধরে ছিলেন, শিবের রাস্তার ওপরে।

এই দুজনের সঙ্গে কথা বলে, এইটুকু বুঝেছেন, বিপিন উত্তেজনাই এদের পরান। এরা ক্ষমা চাইবার পরে, এদের মনে কিন্তু পরিতাপ হয়। একেবারে সুখী হয়ে থাকে না। চাঁদ আর বিবেক বিশেষ করে। এদের দুজনের মনের মধ্যে, কিন্তু, ভয়ও আছে।

এদের জন্যে, বিবেকের বাড়ির ব্যবস্থা সব থেকে ভাল। বাড়ির পরিবেশও খুব খারাপ না। তবে, ওর বাবা এত শান্ত মানুষ, পয়সা দেখা লাগাতে হয় না। মা খুবে বেড়াতে ভালবাসে। সিনেমাই বাড়ির সব কিছু।

চাঁদের বাবা একটা ফাকটরিতে মেকানিক-এর কাজ করে। অবস্থা ভাল না। পরিবারের পরিতি বিশেষ আকর্ষণ নেই। কেবল মাকে একটু ভালবাসে। বিবেক সিনিয়র বাসিন্দা অনুসত, তাদের পরিতি ওর কিছু ভালবাসাও আছে।

মিতুর কথা কিন্তু ওদের কার কাছে জানা যাচ্ছে। মিতুকে তিনিও বাড়ি থেকে লক্ষ রাখছেন। কিন্তু, রাস্তায় কোনদিনই ওকে ধরা যাচ্ছে না। সে অসম্ভব সতর্ক আর চতুর। বিপিনবিহারীর দাদা দেখলে, মুহূর্তে অন্তর্হিত হয়ে যায়। সে একটা কিছু আন্দাজ করেছে। এখন আসল খেলাটা, তাঁর আর মিতুর মধ্যে চলছে। লুকোচুরি খেলার মত।

বিবেক একটা অদ্ভুত কথা বলেছে মিতুর সম্পর্কে। বলেছে, 'মিতুটা কেমন অন্যরকম।'

'তার মানে?'

'ও যে কখন কী করে, তার ঠিক নেই।'

'যেমন?'

'ও না, ও একদিন কালী বাড়ির সিঁড়িতে হঠাৎ সোডাওয়াটার করে দিয়েছিল।'

শুনে মিতুর হেসে উঠেছিল। তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আর যখন পাথর ছোঁড়ে?'

বিবেক বলেছে, 'ওই গুলতির মতন, হঠাৎ ধাই ধাই করে ছুঁড়তে আরম্ভ করে দেয়।'

'হাঁ।'

'একেবারে হঠাৎ?'

'তার আগে কিছু বলে না?'

'কিছু না। হঠাৎ গম্ভীরমুখ নিয়ে, পাথর ছুঁড়তে আরম্ভ করে। আর খুব হেসে থাকে।'

'আর তোমরা?'

'আমরাও আরম্ভ করে দিই।'

এইসব কথার থেকে, একটা সিদ্ধান্তে তিনি এসেছেন। মিতুর মধ্যে কেবল নিছক উত্তেজনা কাজ করে না। ব্যাপারটা নেহাতই একটা খেলা না তার কাছে। তার চেয়ে বেশি কিছু। একটা জটিল পরিতোষের মত।

কিন্তু, কিসের পরিতোষ? বীরিহ টেস্টে যাচাইয়ের পরিতি ওর কিসের রাগ।

বিপিনবিহারী নিজের মনে তর্ক করলেন, কিন্তু কথাটা কি ভাই? টেস্টের যাচাইয়ের পরিতি কি আসলে ওর কোন রাগ আছে? বোধহয় না। রেল যাচাইয়ের কথা ওর মাথায় বোধহয় থাকে না। মারতে হবে, আঘাত করতে হবে, সে যেই হোক, এইটাই বোধহয় উত্তেজনা। আর চলন্ত ট্রেনে পাথর ছুঁড়ে যাচাইই সব থেকে নিরাপদ। নিজের নিরাপত্তার কথাও ওকে ভাবতে হয়। ও কাকে সঠিক মারতে চায়, জানে না। কিন্তু মারতে চায়, আর তাতেই শিকার হয়ে পড়ে নীরিহ রেল যাচাইরা।

আরো একটা ভয়ংকর কথাও বিপিনবিহারীর মনে লাগে। মিতু রাগী এবং তার হাতের টিপ খুব ভাল। অব্যর্থ লক্ষ্যেই সে মারে। তার পাথর ছোঁড়াটা, বাকীদের মত আনাড়ি না। ওতে মনে হয়, সে জেনে শুনেই মারে, কেউ একজন মরবে। একজনকে সে বাড়িতে ফেলবে। হত্যার বাসনা আছে ওর মধ্যে। কিংবা এ কথাও ভাবা যায়, মিতু ইতিমধ্যেই হত্যার স্বাদ পেয়েছে। ভিনমন যাচাই, হয়তো ওর হাতেই মরেছে, ওর পাথরে। আর সে কথা ও নিজেও ঠিক জানে।

কিন্তু, এই হত্যার পিছনে, মোটিভ কী। কখন কী অবস্থায়, ওর মাথায় খুন চাপে। চলন্ত ট্রেনে দেখলেই কী? নাকি ভিসের ভিসের কোন মুহূর্ত আছে।

বিপিনবিহারী মনে মনে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, মিতুকে চাই। যেমন করে হোক, মিতুর মনে কথা বলা ভিসের দরকার।

ইতিমধ্যেই একটা ঘটনাতে তিনি

হতবাক হয়ে গেলেন। রেল লাইনের ওপর থেকে, মাঝখানে যে ঝাঁঝরানো পাঁচিলটা দুটোকে, মানে দু পাশেই বাঁশি ঠাঁই থাকা স্টাফ-প্যাসেঞ্জার ক্লাসদুটোর প্রথম খানিকটা আলাদা হয়ে যেছে। সেখানে একটা ঘটনা দেখে, পরক্ষণে আঁতকে উঠলেন।

পরক্ষণে তাঁর ভেবেছিলেন, ওঁকে দেখে, মিতু নিচে প্রথমে পড়িয়েছে। খানিকটা ঘুরে, এক ভায়গায় প্রথমটা কাঁপছিল, বড়-ছিল। হিমাদ্রিনাথ দাঁড়িয়ে রইলেন। পা টিপে টিপে, খানিকটা গিয়ে, মাথা তুলে দেখেই বুঝতে পেরেছেন। নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারলেন না। দেখলেন, মিতুর ছোট ভাই হবে, বছর খানেক বয়স। সে সম্পূর্ণ নগ্ন। সে উপুড় হয়ে আছে, তার বুকের নিচে, ওদের বাড়িরই অন্য ভাড়াটেদের একটি বছর আঠারোর মেয়ে। সেও নগ্ন, এবং তাদের সমস্ত ব্যাপারটাই সম্পূর্ণ পরিণত বয়সের নরনারীদের আচরণের মত ঘটছে।

পাথরটা তাঁর গোড়ালি শক্ত হয়ে উঠল। হাত দুটি পাকিয়ে উঠল, পায়ের গোড়ালি উঁচু করতে চাইল। কিন্তু পর-মুহূর্তেই তিনি নিজেকে সামলে নিলেন। পা টিপে টিপেই তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে এলেন। বুকের কাছে তখনো তাঁর নিশ্বাস আটকে আসছে। রেল লাইনের ধারে চলে এলেন। কী করা উচিত, ভেবে পেলেন না। অথচ স্বস্তিও বোধ করলেন না। চুপ-চাপ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন।

তারপরে একসময়ে তাঁর মনে হল, ব্যাপারটাকে তেমন গুরুত্ব দেয়া ঠিক হবে না। মানুষের জীবনে এটা ঘটে থাকে, মানুষও করে। মিলন পশুরা পশুবৃত্তি থেকেই করে। মানুষের মিলনের পশুবৃত্তি ছাড়াও, অন্যকিছুর ঝোঁক থাকে। এই পশুবৃত্তি এবং অন্যকিছুর ঝোঁক, একটা অন্যটের পাশের ব্যাপার কিনা, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। কিন্তু মিতু আর মেয়েটি ছেলেমানুষ, মনে মনে জানে, ওরা অন্যায় পাপ কাজ করছে, পশুবৃত্তির পাশের যোগাযোগ প্রমাণ করতে পারবে না। প্রমাণ না, প্রমাণ হারাও হয়েছে। তার হাত থেকে, ওদের মুক্তি দিতে হলে, ওদের এ ব্যাপার থেকে নিবৃত্ত করা দরকার, এদের বোঝানো দরকার। কিন্তু মায়াবতী গাছে দেওয়া এই সময়ে কি সেই মানসিকতা থেকে, অথবা ভাববে? তার চেয়ে, ভাগ্যে উঠিয়েই সে কোথায় সব কিছুর সমাধার কথা চিন্তা করবে।

ঘটনাটা কিছুদিন ওঁর মাথায় ঘুরল, এবং নিজেকে খুব অসহায় বোধ করলেন, কিন্তু না করতে পেরে বা বলতে পেরে। তিনিও এই সময়েরই মানুষ। নীরব হয়ে যাওয়া ছাড়া, ভোলা ছাড়া, আপাতত ওঁর কিছু করার নেই।

শেষ পর্যন্ত তিনি একদিন মিতুকে ধরতে পারলেন। সেটাও এক চরকপ্রদ ঘটনা, সবের স্টেশনের, রেল লাইনের ধারে, একটা অলভাটের ওপর তিনি বসেছিলেন। ধারের ধার দিয়ে। তিনি জানতেন, মিতু চাঁদের বাড়ি যেতে, এই পথে ফিরবে, এবং অলভাটটা। এমন জায়গায়, দুটো মুখোমুখি দেখা হওয়ার সম্ভাবনা।

অনেক দিন অপেক্ষা করেছেন, আজ এই পথটাই অবলম্বন করেছেন। এবং ঘটলও তাই। মিতু একলা, ফেরা দুপুরে, অচেনা একেবারে নিশ্চিন্তমনের মুখোমুখি পড়ে গেল। হিমাদ্রিনাথ উঠলেন না, চুপ করে বসে তাকিয়ে রইলেন। কিন্তু মিতু না পালিয়ে, চলতে একটা পাথর তুলে নিল। হিমাদ্রিনাথ তবু চুপ করে রইলেন, ভিতরে ভিতরে শঙ্কিত আর শক্ত হয়ে গেলেন।

পরে তিনি অনেকক্ষণ পার হয়ে যাবার পরেও, মিতু পাথরটা ছুঁড়ল না। তিনি বললেন, 'আমাকে মারবে তুমি?'

মিতু কিছু না বলে পাথরটা ফেলে

আরদীয়া ধ্বনির পর

নিয়মিত সংখ্যা

প্রকাশিত হবে

১লা নভেম্বর, ১৯৬৯

দিয়ে, লাইনের ওপর পা বাড়াল। হিমাদ্রি-নাথ ডাকলেন, 'মিতু, শোন।'

মিতু দাঁড়াল, 'কী বলছেন?'

'শোন না।'

মিতু কয়েক মুহূর্ত ওঁর মুখের দিকে চেয়ে রইল। তারপর খানিকটা কাছে এসে বলল, 'কী?'

স্বরে ওর রুক্ষতা আর সন্দেহ। হিমাদ্রিনাথ বললেন, 'বস না এখানে। এক মতেই যাব। আমাকে তো তোমার ভয়ের কিছু নেই।'

মিতু বলল, 'আপনি তো সেই পাথর ছোঁড়ার কথা বলবেন?'

'না, সে কথা বলব না।'

'তবে কী বলবেন?'

'তোমার সঙ্গে একটু গল্প করব।'

মিতু কী ভাবল। তারপরে একটু দূরত্ব রেখে অলভাটের ওপর বসল। হিমাদ্রিনাথ জিজ্ঞেস করলেন, 'পড়াশুনো তুমি মন দিয়ে করছ তো?'

'করছি না।'

'বাবা মা ভাই বোন কেমন আছে?'

'ভালোই না।'

'একেবারে কারোকে ভালোবাসো না?'

'ছেলেকে একটু ভালোবাসি।'

'ছেলেটা কে?'

'আমাদের পাড়ায় একটা ফুটফুটে আছে।'

হিমাদ্রিনাথ চুপ করে ভাবলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'আর কাউ ওপরে খুব রাগ তোমার?'

মিতু চুপ করে রইল।

'বল।'

'জানি না।'

'আচ্ছা, পাথর ছোঁড়ার ব্যাপারে একটা কথা বলি। যার তোমার যদি কোনদিন থাকতে আর পাথরের ঘায়ে মরে যেত?'

'যেত যেত।'

নির্বিকার স্বরে বলায় মিল। অনুমান হয়, নিজেকে হত্যা করতে ওর আপত্তি নেই। ওর কেমনের আর ঘৃণার লক্ষ্য কি ওর আপনা বাবা মা?

হিমাদ্রিনাথ বললেন, 'তোমাকে দেখলে আমার মনে খুব কষ্ট হয়।'

মিতু জবাব ওঁর দিকে। তিনি আবার বললেন, 'তোমার বাবা তোমাকে একদিন মারছিলেন। আমি দেখেছি। তোমার কথা আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল।'

মিতু মুখ ঘুরিয়ে নিল। আবার বল-লেন, 'মাসিমা তোমার বাবাকে মন মেজাজ ভাল থাকবার কথা না। খাটা খাটুনির কাজ করেছিল। তুমি আমার সঙ্গে যাবে?'

'কোথায়?'

'ফলকাতায় আমার বাড়িতে। আমার কেউ নেই, তুমি আমার কাছে থাকবে।'

'বাড়ি থেকে তেড়ে দেবে কেন?'

'আমি তোমার বাবাকে বলব।'

মিতু চুপ করে রইল। হিমাদ্রিনাথ ওর একটা হাত ধরলেন। মিতু ওঁর মুখের দিকে তাকাল। জিজ্ঞেস করল, 'আমার মত খারাপ ছেলেকে স্নেহ কেন?'

'তুমি খারাপ তা কে বলেছে? তোমার ভেতরে খুব একটা কষ্ট আছে, আমি জানি।'

মিতুর চোখ মুখের চেহারা বদলে গেল। তিনি আবার বললেন, 'তোমার যে এত রাগ, মারামারি, সবই কষ্টের জন্য। আমি আমারও বড় কষ্ট, আমার কেউ নেই।'

হিমাদ্রিনাথের মুখের দিকে চেয়ে, মিতুর চোখ দুটো যেন ছলছলিয়ে উঠতে চাইল। সযত্নে মনের আবেগে হাত নামাল। কাঁধে সযত্নে পড়েছিল আলতো, তাতে যেন জলের স্পর্শ লাগছে। তিনি মিতুর হাত ধরে উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, 'চল যাই।'

দুজনেই হাঁটতে লাগলেন লাইনের ওপর দিয়ে। দুজনে কত শান্ত হয়ে, এক হয়ে মুখের হাত ধরে চলেছে।

নিষ্কৃতির পথে

(১১২ পৃষ্ঠার পর)

সরাইখানার কর্তৃপক্ষেরা ছাড়া অন্যদের মধ্যে দাসিলভা তখন নিষ্কৃষ্টতম। তেভিড নিজেকে তার কবলে ফেলবার চালাকি তার খর্বাটে ঢুকে ভাগ্যদেবতার একটি ছোট খাঁড়ল বেঁধে নিল। লাঠির মাথায় মৌটকে বেঁধে কাঁধ থেকে পথের দিকে যে পথ চলে গেছে সেই মুখে যাত্রা সুরু করলো।

যেখানে তার কাঁধের ঝোলার সঙ্গে রাস্তে মৌটকের একসঙ্গে ঠক হতে শুরু হয়েছে, তাদের পাশ কাটিয়ে গেল, এই ভেড়াগুলোকে চরানোই ছিল তার দৈনন্দিন কর্তব্য—যোটাই যখন সে টুকরো টুকরো কাজের তালিকা লিখতো, ভেড়াগুলো পড়তো এধার-ওধার ছড়িয়ে। তখনও ইভেনের চলনাভায় আলোর সাক্ষাৎ দেখা যাচ্ছে—অকস্মাৎ দুর্বলতা এসে তার সংকল্পকে নাড়া দিল। হয়তো এই আলোকের অর্থ এই যে, সে বিনিদ্র রাত্রি কাটাবে অনুশোচনায় জেগে আর পরের দিন সন্ধ্যে হবার—কিন্তু না। তেভিডের সংকল্প অটল। তেপর পথে তার স্থান নেই। একটি মানুষও সেখানে তার চিরকালের সাথী হতে পারে না। ঐ অন্ধকারে পথেই করেছে তার নির্ভর তার ভবিষ্যৎ।

আরও চল্লিশমাইল পরিভ্রমণের পর তিন তেভিডেরা পথ চলে গেছে চারটি রাস্তায় মধ্যে এক সোজা। পথচারীরা লোকেরা বিশ্বাস করতো যে, রাস্তাটা অন্ততঃ প্যারিস পর্যন্ত চলে গিয়েছে। কবি চলতে চলতে সেই নামটিই বার বার বিড়বিড় করে উচ্চারণ করতে লাগলো—"প্যারি, প্যারি"। তেভিড তখনও ভেবে দেখে নি।

বাঘের মোড়

সেখান থেকে তিন তেভিড সোজা গিয়ে পথটা একটা বাঁকার পরিবর্তে হল; আড়াআড়িভাবে তার একটা অপেক্ষাকৃত চওড়া রাস্তার সঙ্গে গিয়ে মিলেছে। তেভিড কিছুক্ষণ অনিশ্চিতভাবে দাঁড়িয়ে থেকে দক্ষিণমুখো রাস্তা ধরলো।

এই অপেক্ষাকৃত অনুত্তেজনাপূর্ণ রাস্তাটার ধুলোতে তেভিড একটি ঘোড়ার সাম্প্রতিক অস্তাবদের চিহ্ন দেখে ঘোড়ার মাথা তুলে গিয়েছিল। অনবধানতার পরে এই স্বাক্ষরের সত্যতা পরীক্ষিত হল তারই একখানা অশ্বত্থীর উপস্থিতিতে; সেটা একটা ঘোড়া পাহাড়ের তলায় তেভিড একটি তরবার পাকে আটকে রয়েছে, ধূসর সাঁইস ও তেভিডমান চীৎকার করে ও ঘোড়াগুলোর লাগাম ধরে টানাটানি করেও এক চুলও হিলাল কৃষ্ণবর্ণ পোশাক পরিহিত পুরুষ ও লম্বা, হালকা ছোড়া পরিহিতা একটি তরুণী মহিলা অশ্বারোহণ।

অশ্বারোহীদের পরিচ্ছদের ধরণের অনুভব করে তেভিড নিজেকে তেভিড গুছিয়ে নেবার সময় দিল। সে মহিলা দুটিকে ঘোড়ার কাছে যাবে চীৎকার করা বন্ধ করে রাজপুরুষের উপর পড়তি পড়বার করতে নির্দেশ দিল। একা তেভিডমান তার পরিচিত ঘোড়াগুলিকে তাদিক দিল; তেভিড নিজের শক্তিমত্তার চাপ দিল পায়ের নিচে এবং একটি লাফিয়ে, মুহূর্তের তেভিড বিরাট পাড়ুয়াদের মতো তাদের উপর উঠে পড়তে লাগলো। সাঁইস ধুলোয় লুটে যাবে উঠে বসলো।

তেভিড অশ্বারোহীর চলা এগুলোয় ভয় দিয়ে দাঁড়ালো। বিলালবশ; ভদ্রলোক হাত নেড়ে নির্দেশ দিলেন—"তুমি গাড়ীতে ওঠো"। তাঁর কণ্ঠস্বর তাঁর বলিষ্ঠতাই মত ভারী, কিন্তু; শিক্ষা ও প্রভাবের অনুশীলনে মার্জিত। এই কণ্ঠস্বরের সম্মুখে বেয়াড়া আপনা থেকেই আসে। তাঁরিত মুহূর্তের দিধা এই আদেশ শিরোধার্য উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও সংক্ষিপ্ত হল। তেভিড গাড়ীর বাঁকে পা রাখলো, সে অশ্বারোহীর আবছা দেখতে পেলো ভদ্রমহিলা পেছনের সীটে বসে আছেন। সে সামনের আসনে বসতে যাবে এমন সময় সেই কণ্ঠস্বর আবার তাকে আদেশ করলো—"তুমি মহিলার পাশে বসবে।"

ভদ্রলোক তার বিরাট দেহ সম্মুখের আসনে বিশ্রান্ত করলেন, গাড়ী পাহাড় বেয়ে উঠতে লাগলো। মহিলাটি নিজের কোলে কুকুরকে বসে ছিলেন। তেভিড আন্দাজ করতে পারলো না তিনি বৃদ্ধা না যুবতী, কিন্তু তাঁর বেশবাস থেকে একটা মৃদু মধুর সুগন্ধ এসে তার ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয়কে নাড়া দিয়ে গেল, তার বিশ্বাস হল যে, এই অজানা নারীদেহের অন্তরালে নিশ্চয়ই সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে। এই তো এসেছে সেই রোমান্সের, ঠিক যেমনটি তেভিড কল্পনা করেছে তেমনি। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তার হৃদয়ে এ রোমান্সলোকের চাবী পৌঁছায় নি, কারণ যতক্ষণ সে তার পূর্বের সাথীদের সঙ্গে বসেছিল, ততক্ষণ একটি কথাও কেউ উচ্চারণ করে নি।

ঘণ্টাখানেক পরে তেভিড লক্ষ্য করে দেখতে পেল যে গাড়ীখানা ক্রমেই পাহাড়ের রাস্তা ছিয়ে চলছে। তারপর সেটি একটি বৃক্ষ ও জলধারার বাড়ীর সামনে থামলো এবং একজন সাঁইস ঘোড়ার-গাড়ীর তার পরবার যা দিতে সুরু করলো। ইতিমধ্যে একটা তার-করা লালাভা খুলে দিয়ে একটি হাতের ইঙ্গিত-পরা মাথা বেরিয়ে এলো।

"এত রাত্রে সে মানুষের বিশ্রামের ব্যাঘাত করছো, কে তোমরা? আমরা সরাই বন্ধ। এখানে অপেক্ষা করলে এত রাত্রে খাবার দেয় না। সরাই যাবার ব্যবস্থা করে এখনি বিদায় হও।"

সাঁইসের মুখে গরম হয়ে উঠলো; "খোলো, খোলো বলছি, মহামহিম রাজে-নিজও মারকুইস দ্য বেলগার্ডনের আজ্ঞা-বাহক।"

উপরতলায় একটা অবজ্ঞাভরা কণ্ঠে হেঁচড়ে উঠলো। "আ! মাই লর্ড আমরা চাইনি, বদ হুজুরের বাস আমরা চাইনি। আমি জানতাম না—এত রাত হয়েছে—একটু দাঁড়ান খুলে দিচ্ছি, আমার মালিক সরাই হুজুরের সেবার নিয়োজিত হবে।"

ভিতর থেকে খিল ও খিল খোলার ঝনঝনানি শোনা গেল, দরজা খুলে গেল হাট করে।

শীত ও ভয়ে কম্পমান 'সিলভার ফ্লাগন' সরাইখানার মালিক অর্ধনগ্ন অবস্থায় বাতি হাতে এসে চৌকাঠের সামনে দাঁড়ালো।

তেভিড মারকুইসের পর গাড়ী থেকে নামলো। তাকে হুকুম করা হল : 'ভদ্র-মহিলাকে সাহায্য করো।' সে তা জানলো। মহিলার হাত ধরে গাড়ী থেকে নামানোর সময় সে অনুভব করলো ছোট হাতের কোমলতা। পরের হুকুম এলো—'বাড়ীর ভিতরে চলো।'

সামনে কামরাটাই হল সরাইখানার দীর্ঘ খানা-কামরা। বিরাট একটা ওক কাঠের চৌবিল পাতা রয়েছে তার সমস্ত দৈর্ঘ ব্যাপী। বিশাল ভদ্রলোকেটি চৌবিলের দক্ষিণ দিকে কাছাকাছি একটা চেয়ারে বসলেন। তার মহিলা দেখবাল করবার জন্য একটি চেয়ারে ঢেলে পড়লেন গভীর ক্লান্তির অভিব্যক্তিতে। তেভিড দাঁড়িয়ে থাকতে লাগলো কি করে ভালোয় ভালোয় বিদায় নিয়ে আবার করা সুরু করা যায়।

মালিক আকৃতি নত হয়ে 'যাও' করে বললো "মাই লর্ড, আ-আ-আমি যদি এ সোভাগ্য পূর্ব-পরিচয়ে করতাম, তাহলে উপযুক্ত খানা-পিনার ব্যবস্থা করতাম। কিন্তু, এখন—ম-ম-মও ঠান্ডা মুরগী আর বো-বো-বোধ হয়—"

"যাতি"—মারকুইস হুকুম করলেন মোটা দরজা হাতের আঙুলগুলির এক বিশেষ ভঙ্গী করে।

"আ-আ-আজ্ঞা হ্যাঁ, মাই লর্ড।" সে আর তখন দাঁতি এনে, সেগুলো চৌবিলের উপর রাখলো।

"ব-বাঁধ হাঁসির ইচ্ছা করেন তো এক প্রকারের বিশেষ বারগান্ডি মদ—এক বিশেষ আছে—"

"যাতি।" মারকুইস হুকুম করলেন অঙ্গুলী বিস্তৃত করে।

"নি-নিশ্চয়ই একটি—আমি উঠে যাবো আর আসবো, মাই লর্ড।

আরও তরবারির বাতি দুটিকে অঙ্গুলীকিত করলো। মারকুইসের বিরাট বপু চেয়ার ছাপিয়ে গিয়েছিল। তিনি আপাদ-মস্তক মূল্যবান কৃষ্ণবর্ণ পোষাকে সজ্জিত ছিলেন, কেবল কণ্ঠদেশে ও গলায় সোনা লাগানো দুপদন্ত কোচকানো লেস। এমন কি তার তলোয়ারের বাঁট ও খাপ পর্যন্ত

ছিল তরুণ রাজের। তাঁর মুখমণ্ডলে ছিল তুষারশিলার ধূসর ভাব। যারা পাকানো সোনালি চুলগুলো পরম তাঁর পরিবাস-বাহুর তরুণ চোখ দুটি পর্যন্ত দেখতে পেয়েছিল।

মহিলা স্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন; এতক্ষণে ভেতির উপলব্ধি করলো সে তিনি সুন্দরী এবং তাঁর একটা অপূর্ব বিলাসপূর্ণ ও আবেদন ছাপানো সৌন্দর্য রয়েছে। সেই সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যের পরিপ্রেক্ষিতে নিজে ছেলে থাকতে থাকতে অকস্মাৎ রায়কুইসের কণ্ঠের মন্ত্রমুগ্ধতার তার অন্তরতম হ'ল।

"তোমার নাম কি, কি করে করো?"

"ভেতির ভিসো; আমি একজন কবি।"

রায়কুইসের পাকানো গোঁফ কুঞ্চিতে ছোখের আয়ও কাছে উঠে গেল।

"সেই জন্যে কি জন্যে?"

"আমি মেষপালকও বটে; আমি আমার জন্যে ভেড়ার পাল পাহারা দিতাম।" ভেতির আরো উঁচু স্বরে বলবার ছিল, কিন্তু গলা হয়ে উঠলো তার গলদেশে।

"তাহলে তোমরা শ্রীমান মেষপালক ও কবি, আর ঘরে অন্তরালে কী সৌন্দর্যের অধিকারী তুমি হয়েছো, সে কথা শোনো। এই মহিলা হচ্ছেন আমার ভাইনি, মাদ-মোয়াজেলে লুসিয়া দা তবেন। উনি অভিজাত বংশোদ্ভূতা এবং ওঁর নিজস্ব বাসোরিক অর্থ হল দশ হাজার ফ্রাঁ। আর চাঁদ, সে তো তুমি নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছো। যদি এই মুহূর্ত তালিকায় তোমার মেষপালকের বৃত্তের মুখপ্রিয় হয় তবে এক ঘণ্টার ইনি তোমার পত্নী হবেন। আমার বলতে লাও, যারা মিও না। আর এরে আমি ওঁকে নিয়ে ভিলা-মোজ-এর কোন্ত (কাউন্ট)-এর পত্নীরূপে ফিরে যাচ্ছিলাম, আউস্টের সঙ্গে ওঁর বিয়ের কথা ছিল। অভিজাত সম্প্রদায়ের সকলে হাজির ছিলেন, বেঁধারক অপেক্ষা করছিলেন, বাদ-বাদ্যি ও ফুল সবকিছুরই এই ব্যক্তির সঙ্গে ওঁর বিবাহের সব প্রস্তুতিই ছিল। কিন্তু ওঁর মেউলে পা দেওয়া মাত্র এই কথা, যিনি এত দিন ছিল কর্তব্যপরায়ণ, কত নম্র, ছিলেন, আমার দিকে বাঘিনীর মত ফিরে দাঁড়ালেন, আমাকে নিষ্ঠুর ও অপরাধী বলে অভিহিত করলেন এবং হৃতোদ্যম ধর্মযাজকের সম্মুখে আমি ওঁর হয়ে যে প্রতিশ্রুতিপত্র হয়েছিলাম, সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলেন। আমি সেই স্থানে এবং তৎক্ষণাৎ লগ্নপত্র নিলাম, দশ হাজার লয়তনের নামে লগ্নপত্র নিলাম, যে আমরা পরিবার ত্যাগ করার পর পরের যে বাসস্থিতি দেবো পাবো, তা সে রায়কুমার, ভালোওবাসো বা চোর যেই হোক না কেন, সেই পুরুষের সঙ্গেই ওঁর বিয়ে দেবো। তুমি, মেষপালক, হচ্ছ সেই পরের বাসস্থিতি। রায়মোয়াজেলের আয় বিয়ে দিতেই হবে। তুমি যা হও, মনে করো মনে। তোমার কল ফিরে করতে দশ মিনিট সময় দিলাম। কথা ছলে যা পরিবর্তন করে আমার বিরুদ্ধে কোনো না। দশ মিনিট, মেষপালক —সময় চলে যাচ্ছে।"

রায়কুইস ভাঁজ। সূত্রে আলো বিয়ে ভেতিকে ছেড়ে চৌজ যাচ্ছে লাগলেন। তিনি সারা অঙ্গে যেন একটা পাতলা আবরণ টেনে দিলেন। যেন একটা বিরাট পরমাণু আবহাওয়ার বিরুদ্ধে ধরো-আলাদা এঁরই পক্ষে রয়েছে। ভেতিকের কথা বলতে ইচ্ছা থাকলেও বিশাল রায়কুইস হাবভাবে তার জিহ্বা স্তব্ধ হয়ে গেল। পরিশেষে সে মহিলার চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে 'ওঁর' করলো।

"সে বলছে সত্য, করলো এবং এখন আভিজাত্য ও সৌন্দর্যের সামনে কি সবে তার ভিরোধ করার সেতে অবাহত হচ্ছে তা ভেবে সে নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেল: "মাদমোয়াজেল, আপনি আমার মুখ থেকেই শুনেছেন আমি একটি মেষপালক। কখনও কখনও আমি নিজেকে কবি বলেও কল্পনা করে থাকি। যদি সৌন্দর্যের উপাসনা কবিত্বের লক্ষণ হয় তবে আজ, এই মুহূর্তে, আমি সত্যিকারের কবি। আমি কি আপনার কোনো সেবায় লাগতে পারি, মাদমোয়াজেল?"

তরুণী তার দিকে শুদ্ধ, বিস্ময় দৃষ্টি তুলে বললো। তার সরল, উজ্জ্বল মুখ, যা এই প্রাতঃভ্রমণের পুরুষের গাম্ভীর্য ধারণ করেছিল, তার বলিষ্ঠ, ভঙ্গু দেহ, তার নীল চোখের তরল সহানুভূতি এবং হৃতোদ্যম দীর্ঘ কাল-বঞ্চিত ধরা ও সাহায্যের আশু প্রয়োজনও তরুণীর মনের প্রমাণ ধরক পাথরে ওলটপালট নাড়িয়ে জানলো।

মাঝে কথায় তরুণী বললো, "মঁসিয়, আপনাকে দেখে সব ও দয়ালু বলে মনে হচ্ছে। উনি হলেন আমার কাকা, এবং আমার একমাত্র আত্মীয়। উনি আমার প্রতি ভালোবাসেন এবং আমি আমার মাঁই প্রতিচ্ছবি বলে আমাকে উনি ঘৃণা করেন। উনি আমার চরিত্রকে একটি দীর্ঘ বিভীষিকায় পরিণত করেছেন। ওঁকে দেখলেই আমার ভয় করে, তাই আমি এর আগে কখনও ওঁর অবাধ্য হতে সাহস পাই নি। কিন্তু আজ সকালে উনি আমার সঙ্গে আমার তিন গুণ বেশী বয়সের একটি লোকের বিয়ে দিচ্ছিলেন। মঁসিয়, আপনাকে এই বিয়ের ব্যাপারে ঠকাবার জন্য আমার আপনি ক্ষমা করবেন। যে পলায়নের কাপড়টা উনি আপনার উপর ফেলে করে চাপানোর চেষ্টা করেন আপনি নিশ্চয়ই তা প্রত্যাখান করবেন। যাই হোক, অন্ততঃ আপনার সময় ও উদার সাহায্যের জন্য আপনি আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। এত দিন আমি এমন ব্যবহার পাই নি।

কবির দৃষ্টিতে তখন উদারতার চেয়ে আরও বেশী কিছুই ছিল। সত্যিই বিস্ময়ের সে কবি ছিল, কারণ ইতোমধ্যে তখন বিস্মৃতির গর্ভে; এই নতুন, অপূর্ব, মুগ্ধতাকর তখন তার নবীন সুবমার ফাঁদে কবিকে ফেলে ফেলেছে। তার সূক্ষ্ম সৌন্দর্য কবির মনে অন্তরঙ্গপূর্ণ আবেদন জাগিয়ে তুলছে। ভেতিকের অনুরাগপূর্ণ দৃষ্টি তার উপর সূর্যালোকে উজ্জ্বল বিস্তার করলো। সেও তরুণীর মত কুঞ্চিত পড়লো ভেতিকের দিকে।

ভেতির বললো, "আমাকে দশ মিনিট দেওয়া হয়েছে যে কাজের জন্য, তা করতে হচ্ছে আমার এক মুহূর্ত দেরী হোতো। মাদ-মোয়াজেল, আমি বলবো না যে আপনাকে আমি ভালোবাসি, কারণ তা হবে মিথ্যাচরণ —আমি আপনাকে ভালোবাসি। আপনার কাছ থেকে এই মুহূর্তে আমি ভালোবাসার পত্রোত্তর করতে পারি না, তবু আমাকে অপেক্ষা এই বিশ্বের ঐশ্বর্যের হাত থেকে আপনাকে উদ্ধার করতে দিন, হয়তো সময়ে ভালোবাসাও জানবে। আমি বিশ্বাস করি আমার একটা ভবিষ্যৎ আছে, আমি চির-কালই মেষপালক থাকবো না। আপাততঃ আমি আমার সারা হৃদয় দিয়ে আপনাকে আগলে রাখবো, যাতে আপনার গায়ে মুখের আঁচ না লাগে। আমার হাতে কী আপনার ভাগ্য-সমর্পণ করবেন, মাদমোয়া-জেল?"

"আ, আপনি দয়া পরবশ হয়ে নিজের সর্বনাশ করবেন!"

"সেজন্য চিন্তা। সময় শেষ হয়ে এল, মাদমোয়াজেল।"

"আপনি পরে আফসোস করে আমাকে ঘৃণা করবেন।"

"আমি শুধু আপনাকে সুখী করবার জন্যই বেঁচে থাকবো, নিজেকে আপনার যোগ্য করে তুলবো।"

তার সুকোমল ছোট্ট হাতখানি কোলের কাছ থেকে তুলে এসে ভেতিকের হাতে অর্পণ দিল।

"আমি তোমার বিশ্বাস করবো", সে মৃদুস্বরে বললো, "আমার চোখে জল আসে। আর—আর তোমে— তাও তুমি ভুল বুঝে আছো। তার মুখে নেই। ওকে ভালো একবার ওর সম্মোহনী দৃষ্টির আড়ালে ছেড়ে পারলে আমি হয়তো সব ভুলতে পারবো।"

ভেতিক ফিরে রায়কুইসের সামনে দাঁড়ালো। তরুণের মূর্তিটি নড়ে উঠলো, বাজপাখী চোখ দুটি ফিরে হল—দৃষ্টির শ্লাঘা নিষ্কম্প হল।

"মেয়েটি খুব মিষ্টি থাকী আছে। একটা সুন্দরী বিত্তশালিনী মহিলাকে পত্নীরূপে করতে কি না স্থির করতে মেষপালকেরও কটি মিনিট সময় লাগে। বোসো বস, মেষপালক, তুমি কি বাদমোয়াজেলের স্বামী হতে সম্মত আছো?"

ভেতিক মৃদু ভঙ্গীতে বললো, "মাদ-মোয়াজেল আমার বিবাহ পরিবার পরিচয় শুনে আমার ধন্য করেছেন।"

"সাবাস!" রায়কুইস বললেন, "ভেরো চাঁদের বাবসা, তোমার মতো সমাজের সভ্য সমের মাত্রাসম্পন্নও আছে। যাই হোক, মাদ-মোয়াজেলের ভালো তোমার চেয়ে খারাপ পুরুষরাও জুটতে পারতো। এখন ব্যাপারটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেরে ফেলা যাক্, ঈশ্বর ও পরতন্ত্রের অনুমতি নিয়ে।"

তিনি ওলোনায়ের বাঁট দিয়ে জোরে টোঁয়কে উপর আঘাত করলেন। সরাই-ওয়ালা এলো কাঁপতে কাঁপতে, মহারাজির নতুন সম্রাটের মেজাজ চাঁতোর করার জন্য অনেক থেকেই এলো। কিন্তু মোরবাতি সাহস করে। "পাদ্রী নিয়ে এসো", মারকুইস গর্জে উঠলেন, "আমার দুঃখের কি—পাদ্রী, বার-বারাক! কম মিনিটের মধ্যে পাদ্রী না আসতে পারো তো।"

সরাইওয়ালা টলতে টলতে ফেরে গেলো।

পাদ্রী দৃশ্যটা দেখে, বিমর্ষ হলেন। তিনি তেতিস ছিলো ও লুসিয়া বা তাদের-কে স্বামী-স্ত্রী রূপে মিলিত করে, মারকুইসের হাতে কেরার একটি ক্ষুদ্র মূল্যে পকেটস্থ করে স্বস্তির পথে বাইরে, সাহের চেহারাকে মিলিয়ে গেলেন।

"ঘর", হুকুম দিলেন মারকুইস, সরাই-ওয়ালার দিকে তাঁর ভীতিকর আঙুল প্রায় বিদ্ধ করে। সরাই বলে ওঠেন, "সাহস ওরো।" তিনি চৌকাঠের সাথার দিকে দাঁড়িয়ে উঠলেন; মোরবাতি অনেকক্ষণ তাকে দাঁড়িয়েছিলো ও মনের অক্ষকার একটি পর্বতের মত মেঘাচ্ছিল, ভাঁটির উপর চোখ পড়ায়ার মেন তাঁর দৃষ্টি বিষাক্ত হয়ে উঠলো, পুরনো স্নেহের ভিক্তস্বাদ স্মরিতে।

মুখোশের তুলে ধরে তিনি বললেন, "মাঁদাম মিনো,আমি যা বলছি তা শোনবার পর স্বাস্থ্যপান করবেন। আপনি এমন একটি মহিলাকে স্ত্রী রূপে গ্রহণ করেছেন যে আপনার চরিত্রকে কুৎসিত ও কুৎসাযোগ্য করে তুলবে। তার বদনীতে যে প্রভু ধরে তা হচ্ছে ঘোরতর নিষ্ঠাচরণ ও চরিত্রহীন সর্বজনের উচ্চাভিলাষ। যে পরস্ত্রীর উত্তরাধিকার ও স্নেহের তা বিদ্বিত হচ্ছে ওর চেয়ে, তাকে ও মুখে, না হাজার ঘন ব্রত করবার জন্যও বাঁচে বাচতে দিবা করে না। এই হবে আপনার ভবিষ্যৎ সুখের আশার পরিণাম, মাঁসিয় কাঁর। নিন, সুরা পান করুন। অতঃপরে, মারকুইসেস, আমি তোমাকে বিদায় করে দিচ্ছলাম।"

মারকুইস সুরাপান করলেন। মেরেটির মুখ থেকে নির্গত হল একটা অস্ফুট আর্তনাদ, যেন আর্তনাদ আঘাতের কষ্ট। তেতিস নিজের গলাস হাতে নিয়ে তিন পা এগিয়ে মারকুইসের মুখোমুখি দাঁড়ালো। তখন তার আচরণে মেরেলিকসুলভ কিছুই ছিল না। সে শান্তস্বরে বললো : "এই মাত্র আমাকে মাঁসিয় (মহাশয়) নামে আর্তিহিত করে আপনি সম্মানিত করেছেন। আমি কি তবে আশা করতে পারি যে, মারকোয়ারেসের সঙ্গে আমার বিবাহের ফলে আমি আপনার একটু সাহায্যার্থে এসেছি, ধরে নিন, পারিতোষিক আতিথ্যের? এবং এই আতিথ্যের কি আমাকে মাঁসেনিয়রের পদের সমকক্ষ হিসাবে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমার মনোবল একটি অর্থহ পারিতোষিকের অধিকার দিয়েছে?"

মারকুইস মেয়েটির মনে আনেন, "তুমি তা আশা করতে পারো, মেরেমানুষ।"

"তবে", তেতিস যে দৃষ্টি মুখোমুখি চোখ ওকে মাপ করছিল তার উপর প্রায়-তীব্র মন ফুঁড়ে দিয়ে বললো, "হুকুমে আপনি অনুগ্রহ করে আমার সঙ্গে তুলনে নতুনে হবেন।"

মহারাজির লর্ডের কেরোসিন আলোর-বিহির অন্ধকারের মত একটি ভয়ঙ্কর পলকের প্রবাহে বিশ্লেষিত হল। তিনি খাস থেকে একটানে তলোয়ার বের করে নিলেন, অপেক্ষমান সরাইওয়ালাকে চীৎকার করে হুকুম দিলেন, "ওই চাবাটার জন্য একটা তলোয়ার নিয়ে এসো।" রাঁধুনীটির দিকে ফিরে ভয়ংকর একটি হাসি হাসলেন, তাতে তাঁর বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল, তারপর বললেন, "মাতাম, তুমি আমার জন্য অতিরিক্ত পরিশ্রম করছো। ধরে হচ্ছে এক মুহূর্তে তোমার স্বামীও খুঁজতে হবে, তোমাকে বিধবাও করতে হবে।"

তেতিস বললো, "আমি তলোয়ার খেলা জানি না।" সেমিজার সম্মুখে এই স্বীকারোক্তি করতে তার মুখ লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠলো।

মারকুইস হেসে বললেন, "তুমি তলোয়ার খেলা জানি না। তবে কী চাবাদের মত আমরা এক-আরের বুকের নিচে মুখ রাখবো না কি? হোলা, ফ্রান্সোয়া, আমার সিগন্তল বুটো আন্।"

বাড়ীর দাস থেকে একজন সাহস দৃষ্টি বিরাট চকচকে সিগন্তল নিয়ে এলো, তাতে মুখোশ তাড়াতাড়ি করা। মারকুইস একটিকে তেতিসের হাতের কাছে টেবিলে রেখে দিলেন। "টেবিলের উল্টো ধারে যাও", তিনি চীৎকার করে বললেন, "এতো বেপরোয়া ভিত্তিমার টানতে পারে, তবে যা বেপরোয়াদের সিগন্তলের গুলিতে মরার সৌভাগ্য খুব কম লোকেরই হয়।"

বেপরোয়া ও মারকুইস লম্বা টেবিলের দুই পক্ষের মুখোমুখি দাঁড়ালো। হোটেল-ওয়ালা ভয়ে বাচ্চাদিয়ন ছোকরার মত কাঁপতে কাঁপতে মুখো হাত থেকে তোলালে নামলো, "ম-ম-মঁসেনিয়র, যীশু খ্রীষ্টের দোহাই, আমার হোটেলে নয়। হুকুমত হচ্ছেন না, তবে আমার ব্যবসা নষ্ট হবে—মারকুইসের ভীতিকর দৃষ্টি তাকে স্তব্ধ করে দিল।

"ভাদরুন," বেপরোয়ার লর্ড উচ্চস্বরে বললেন, "যদি পারো তো একটু দ্রুত ইতস্তানি বন্ধ করে তুলনের নির্দেশ দাও।"

হোটেলওয়ালা হুঁচট্ খেতে খেতে পড়ে গেল, তার তখন সাক্ষাৎকৃতি হচ্ছে না। মুখ দিয়ে কোনো শব্দের শব্দ করাও তখন তার ক্ষমতার বাইরে। তবু, অনেকটা করে সে তার হোটেল ও ব্যবসার সুরক্ষার খাতিরে শান্তিরক্ষার প্রয়ে অনুরোধ বিনয় করতে লাগলে।

"আমি নির্দেশ দেবো," মেয়েটি দৃঢ় কণ্ঠে বললো। সে টেবিলের ওপরে দিয়ে ওকে স্নেহভরে চুম্বনে ভর্ৎসনা করলো। তার চোখ দুটি তখন তারার মত জ্বলছে, গালে গোলাপের প্রজ্বলনের রং। সে ঘেওয়ালে ঘেঁসে দাঁড়ালো; সুরুচির সুরের তার নির্দেশের জন্য তৈরী হয়ে সিগন্তল উঁচালো। উভয়ের সাহস।

"এক (এক) — দু (দুই) — তোরা (তিন)।"

বুটো আওয়াজ এত কাছাকাছি হল যে কাঁচিগুলো মনে হলো একসঙ্গে ফেটে উঠলো। মারকুইস হাসি মুখে কাঁপিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, তাঁর বা হাতের আঙুলগুলো টেবিলের পাশের ঝুলিয়ে। তেতিসও খাড়া রইল; সে ধীরে, অতি ধীরে মাথা ঘোরালো, তার স্থির অন্বেষণে দৃষ্টি চোখের কাঁপি মেলে। তারপর, আলমারি টাঙানো কাপড় যেমন করে মেঝের লুটোয়, তেমনি লুটিয়ে পড়লো সুন্দরে, কুঁকড়ে।

অস্ফুট একটি ভীতি ও হতাশা মিশ্রিতে আর্তনাদ করে সরাই ওয়ালা ছোকরা তার উপর কুঁকে পড়লো। সে তার অন্তর্চিহ্নটি খুলে বের করে সেই পুরাতন বিষয়ের দৃষ্টিতে উপরের দিকে চেয়ে দেখলো। ফিসফিস করে বললো, "ওর হৃৎপিণ্ডের মধ্য দিয়ে চলে গেছে। ওঃ, ওর হৃৎপিণ্ড!"

"চলো", মারকুইসের গম্ভীর কণ্ঠ গমগম করে উঠলো, "বেরিয়ে গাড়ীতে ওঠো। রাত্রি পঞ্চাশত হওয়ার আগেই তোমার আমার ঘাড় থেকে নামতে হবে। আমার তোমায় বিয়ে করতে হবে, এবার ঘোড়া হয়েছে, আমারই রাস্তে। যাই লেডী, বাকেই পথের পাশে ওয়ে, সে জানোয়ারই হোক আর চাষাই হোক্। যদি পথে আর কাউকে পাওয়া না যায় তবে যে হতচ্ছাড়া আমার পরিকল্পনের সেই খুলে দেয় তাকেই। আও ওঠো, গাড়ীতে চড়ো।"

মারকুইস, বিশাল, নির্মম ও অটল, তার পরে মহিলা আবার তার দুরবস্থার ফ্যাকে ঢাকা অবস্থায়, তারপর সাহস, পিস্তল দুটি হাতে নিয়ে অপেক্ষমান পক্ষে অভিমুখে চলে গেলেন। তার তারী জুতা-দুলির ধ্বনির মধ্যে সন্ত পক্ষের মধ্যে পাদিধ্বনি শুনলো। সিলভাই ফ্যোরমন হেমটেলের হল ঘরে উদ্‌ভ্রান্ত হোটেলওয়ালা কাঁপির মুওদেহের উপর হাত বুলাতে লাগলো, চৌকিলের উপর ঘনঘন করে নাচতে লাগলো চাম্পিপাটি মোরবাতির কম্পমান শিখা।

অনাবিলের মোড়

সেখান থেকে তিন ক্রোশ দোলা গিয়ে পাকা একটা রাস্তার পরিণত হল; আরামদায়ি তবে তার একটা আলোকজ্বল ছড়া রাস্তার নয়ে গিয়ে মিলেছে। তেতিস কিছুক্ষণ অনিশ্চিতের ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে অনাবিলের রাস্তা বাছলো।

তোমার যে পথের শেষ, সে তা জানতো না, কিন্তু সেই রাস্তার মধ্যে সে তেমনি গভীরকে বহু পিছনে ফেলে আবার রাস্তা পার সমকক্ষ হয়েছিল। এক ক্রোশ পথ

অতিক্রম করে সে একটা বড় সড় গোছের সরোবরের কাছ বরাবর পৌঁছলো। চোকাই বাড়ছিল ক্রমশঃই এখানে যানবাহন হচ্ছে। পাতিহাঁস ডানায় ঝিরে অনেকক্ষণ কলরব করছিল। বিরাট পাথরের সিংহ মহারাজ ভেতর থেকে পথ পর্যন্ত অতিথিদের প্রবেশের রেখা ধুলোয় উপর তাকিয়ে রেখে গেছে।

আরও তিন কোশ পথ ভেঙ্কিত এখন পর্যন্ত। সে বিশ্রামের পথের পাশে পাইন-জাতের লম্বায় নিশ্চিন্তেরীর কোলে বিশ্রাম নিল। তারপর উঠে পড়ে আবার যাত্রা শুরু করলো অজানা পথ বেয়ে।

এই ভাবে সে পাঁচ দিন সেই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করলো, কখনও পুরুষোত্তি-যান পাওয়া হয়ে গেলায়, কখনও চাষীদের বলদের গাড়ায়; তাদের আতিথেয়তায় রাম জলো রুটি খেয়ে, তার ক্ষুধা মিটলো, নদীর স্বচ্ছ বারিতে যা ক্লান্তি-চাঁক্ষেদের অবসাদ দূর-ক্লান্ত থেকে নিষ্কৃতি হলে তার তৃষ্ণা।

অবশেষে সে একটি বিরাট সেতু পার হয়ে পঞ্চম পদক্ষেপ করলো সেই চিরচঞ্চলা নগরীতে, যে নগরী কিংবদন্তির প্রথা যে কোনো নগরীর তুলনায় অনেক বেশী কবিকে হয় বিস্ময়মুগ্ধই পরিবেশে মন চুর্ণ-বিচূর্ণ করেছে। পারিস তাকে ছুঁল, পুরনো তার অভ্যর্থনা সঙ্গীত গোনালো—সে সঙ্গীত মানুষের কণ্ঠস্বর, পদক্ষেপ ও রথচক্রের ঘর্ঘরের সমষ্টি; সে সঙ্গীতে ভেঙ্কিতের পদাস মন্ত্রমুগ্ধায়িত হল।

যে কর্দমতে অবশ্যই একটি প্রাচীন গৃহে ছবির ঠিক তলায় ভেঙ্কিতের বাস স্থান মিললো; সে ঘর ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে একটা কাঠের চেয়ারে অধিষ্ঠিত হয়ে মনোনিবেশ করলো। কবিতা লেখায়। নীচের সমধি একদা অধ্যাপনা নাগরিকদের আশ্রয় ছিলেছিল, কিন্তু এখন সেটিকে দখল করছে সেই হতভাগোরা, যারা সর্বদা অধর্মনির পদরেখা অনুসরণ করে।

বাড়ীগুলি কেশ উঁচু এবং তখনও সেগুলির মধ্যে এক পক্ষকের অন্ধকারময় গাঢ়তীর্থ বর্তমান ছিল। কিন্তু তার মধ্যে অনেকগুলিরই ধুলো ও মাকড়সা ছাড়া কোনো বাসিন্দা ছিল না। রাত্রে শোনা যেত ইঁদুরের-ইঁদুরে সাধারণের শব্দ এবং সরাই-খানা পাঁচমেশালী গুণ্ডাদের চীৎকার। এখানে একদা অধ্যাপকের আবাস ছিল সন্দেহ নেই এখন হয়েছে মদ্য ও প্রতারক অন্ধকারের আস্তানা। কিন্তু এই স্থানেই ভেঙ্কিতের স্বপ্ন অনুসন্ধানের উপযুক্ত যাবাস ছিলো। দিনের আলোয় ও রাত্রির আলোক চলতে থাকলো তার কিয়াকলাপ।

একদিন অপরাহ্নে সে নীচের মহল থেকে খাদ্য অভিধানের পত্র কিনছিল, রুটি, মদ, ও এক বোতল সস্তা মদ নিয়ে। অন্ধকার সোপানের মাঝপথে, তার সঙ্গে দেখা হল—বলা যায় সে ঘুরোঘুরি হল—তখন মহিলাটি উপর সিঁড়িতেই কিনারে নিচ্ছি-লেন—একটি সুন্দরী মহিলার সঙ্গে, যাঁর সৌন্দর্য কবিকল্পনাকেও হার মানাতে পারে। তাঁর আয়না, খোলা কালো কেশের নীচে মুখাবয়ব গাউনের আভাস দেখা যাচ্ছিল। তাঁর আশ্চর্য চোখ দুটি চিন্তাধারার পরোক্ষটিই পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে পরিবর্তিত হচ্ছিল। মুহূর্তের জন্যেই তার চোখ বিদ্যুৎ খেলোতায় চোখের মাঝে তাল করে ভিক্টরিস মেয়ের চোখের ধৈর্য ও মোহিনী মায়া পরাজয় করছিল। এক হাতে তোলা পাইনের নীচে দেখা যাচ্ছিল একটি ছোট্ট হাঁস-উঁচু, ফুটো, তার ভিতেরে মুখে দিয়ে ছেকে লুটোচ্ছিল। আহা! এই সন্ধ্যার মুখের মালিক কি সত্য হতে চলেছে? ভেঙ্কিত ভাবলো মাঝে, তাকে মালার মোহিনী ভূমিকায়, প্রধানকর্তার ভূমিকায়! ভোর হয় সে ভেঙ্কিতকে উঠতে দেখে তার সাহায্যের চেয়েই সেখানে অপেক্ষা করছিল।

"আঃ, মাঁসিয় সিঁড়ি খবর কথা বাড়াবার এমন ভাষা করবেন, কিন্তু এই অন্ধকারে—খুবই অন্ধকার। এটা যে, তাই কিছুতেই বাঁধন মানে না! তুমা মাঁসিয় এত ভদ্রতা করেন!"

অবাক বিস্ময়ে বাঁধতে গিয়ে কবির আত্মসংযমে কেঁপে কেঁপে উঠছিল। তার পরেই সে তার বিশ্বজনক সান্নিধ্য থেকে পলায়ন করলো, কিন্তু সেই চোখ দুটি যেমনীয় দৃষ্টির মত দীর্ঘায়িত হয়ে মোহিনী মায়ার তাকে ধরে রাখলো। তাঁর সিঁড়ির রেলিংয়ে ভর দিয়ে, সন্ধ্যা মধ্যে বোতল আকড়ে ধরে সেখানেই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালো।

সে হেসে বললো, "আপনি বড় চালাক। মাঁসিয় কি—হয়তো—এ বাড়ীতেই থাকেন?"

"হাঁ, মাদাম। আমি—আমার ভাই তো মনে হচ্ছে।"

"তাহলে তোর হয় চারতলায়!"

"না মাদাম, তারও উপরে।"

মহিলা সামান্যতম বিস্ময়ভঙ্গির ইঙ্গিতে আওয়াজ দাড়লেন।

"মাফ করবেন। একথা জিজ্ঞাসা করা আমার মোটেই উচিত হয় নি। মাঁসিয় আমার তুমা করবেন কি?" তোমার থাকেন একথা জিজ্ঞাসা করা নিশ্চয়ই সুরুচির পরিচায়ক নয়।"

"মাদাম, আমি যে কথা বলছি আমি জানি—"

"না, না, না, আমাকে বলবেন না। আমার ভুল আমি বুঝেছি। এ বাড়ী এঁটে তাতে যা কিছু আছে সে সম্বন্ধে তোমারো আমার এখনও তোল না। এক দিন যে এটাই আমার ঘর ছিল। আমি পরের এখানে এসে নতুন করে সেই সবের ঘিন-গুলির স্বপ্ন বোধি। আপনি আমার এই প্রস্তাবে মানবেন কি?"

"আমাকে বলতে দিন, তাহলে আপ-নার তো কোনো আপত্তিতেই সম্ভোষজনক হবে।" কবি তাড়াতাড়ি উত্তর করে বললো। "আমি সবচেয়ে উপর তলায় থাকি—যে ছোট্ট ঘরটার সামনে সিঁড়িটা ঘুরে গিয়েছে, সেইখানে।"

মহিলা ঘাড় ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "সামনের ঘরে?"

"নিশ্চয়ই তাই, মাদাম।"

মহিলা যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে-লেন। তাঁর মোমাকার সরল দৃষ্টি পুরোপুরি করে বললেন, "আর আমি আপনার দেরী করিয়ে তোলা না দিলে। আমার বাড়ীটার একটু নতুন নেশেন। হয়। এখন আর বাড়ীটার স্মৃতি ছাড়া আর কিছুই অবশ্য আমার নয়। বিদায়। আপনার অভিজাত প্রথা অশেষ ধন্যবাদ!"

সে চলে গেল, তেঙ্কিত দেখে তার প্রশস্ত ললাটের রেখা এবং সুগোলের একটু আভাস। তোঙ্কিত যেন নিদ্রা-অবশ দেহ নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠলো। নিঃশব্দে হল, কিন্তু সেই হাসি ও সুমধুর স্বরে সেল তার স্মরণে, এবং সঙ্গে সঙ্গে তার সঙ্গী হয়ে রইল। এই সম্পূর্ণ অজানা মহিলার উদ্দেশ্যে সে রচনা করলো কত সোনালোখা, তাঁর কালো-চোখ, কুঞ্চিত কেশরাশি ও মধুর গলার সাধুতা নিয়ে কত না সনেট ও লিরিক।

তেঙ্কিত যেদিন অভিজাতের কবিই ছিল তারপর ইতোমধ্যে সে হয়ে গেল বিদেশী এবং এই অপরূপ ও নবীন রূপ-কাহিনী তাকে মুগ্ধ করে নিল তার সমা-সম্পূর্ণটিই কল্পনীয়তা দিয়ে। তার মেয়ের মুক্তা মেঝের ছাদ মনে অন্তরঙ্গরূপে যোগাযোগ করলো।

কোনো এক রাতে সেই বাড়ীরই চার তলায় তিনটি মানুষ একটা টেবিলের পাশে মুখ হয়েছিলেন। তিনটি চেয়ার, টেবিলটি মুখ হয়েছিলেনো তিনটি চেয়ার, টেবিলটি এর আসবাব। এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন একটি বিশাল পুরুষ, কৃষ্ণকেশের সোষাকে সজ্জিত। তাঁর মুখের-গীতে তাচ্ছিল্য ভরা গর্ব প্রকাশ পাচ্ছিল। তার ছুঁচলো সোনালো ভরা দুটি তাঁর কাজলা চোখের পাশে কাছাকাছি পৌঁছেছিল। অন্য জন হলেন এক মহিলা, সুন্দরী যুবতী, তাঁর চোখ পরোক্ষের অনুসরণে লিপ্তে মত সবার ও পোলাকার ছন্দে পরতো বা বেদেনী; মত দীর্ঘায়িত ও মোহিনী রূপ যাদে করতে পারতো। তৃতীয় ব্যক্তিটি ছিলেন একটি কর্মঠ পুরুষ, একজন কোপা, একটি সাহসী ও শক্তিধর চিত্রের প্রতিনায়ক—যাঁর সব সময়েই "ক্ষুধা বোধি" ভাব। অন্যরা তাহকে আপাতদৃষ্টি দেখেছেন আমে প্রতিহত করছিলেন।

এই মানুষটি হেঁসিলে ঘুরি মেরে চালা অন্যদের মধ্যে বললেন :

"আজ রাতে। আজ রাতে সে মন্ত্র-রাজের পদার্পণায় যোগ দিতে যাবে। আমি এই নিষ্ফল অন্ধকারে প্রতিবিরক্ত হয়ে পড়েছি। সাকেত, গুপ্ত আলোচনা, ভোজ—

এসব অর্থহীন পুলোশে আমার হেলা ধরে গেছে। আসলে, আমরা দু'জনেই রাজদ্রোহী হই যদি ফ্রান্সকে ওর কবল থেকে রক্ষা করতে হয়, তবে স্বোলাকুলিভাবে ওকে হত্যা করা হোক, তাঁর শেষে, তাঁর লাশিয়ে

আগই হোক, আমি বলছি, এবং এ কথার বিশ্বাসের আন্তরিকতায় সন্দেহ নিষ্প্রয়োজন। আমাকে ছাড়েই তার মৃত্যু হবে। আর যদি কখনো সে নৈশ পর্যবেক্ষণে বেরোয় দিতে যাবে, তখন।"

মহিলা তাঁর প্রতি সোহাগপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন। স্বামী প্রীতি তা সে যতই দুরন্তপনা এড়াবার চেষ্টা না কেন, চিরকালই বেপরোয়া সাহসের কাছে শ্রীতি স্বীকার ও করে। বিশাল মানুষটা পাকানো গোঁফে হাত বুলাতে লাগলেন।

স্বভাব-সংযত স্বরে গলায় তিনি বললেন, "নিশ্চয় ক্যাপটেন, একথা কিন্তু আপনার সঙ্গে আমি একমত। আর অযথা করে কোনো লাভ নেই। প্রয়োজন উদ্ধারের নিরাপত্তার উপযোগী অবশ্যই সমস্ত পুলোশ রক্ষী এখন আমাদের ধরাছোঁয়ায়।"

"আর যদি, ক্যাপটেন ফেরোল চোঁবিল চাপড়ে বললেন, 'আপনি আমার কথা শুনে-ছেন, মারকুইস—আমার হাতেই এ কাজ সমাধা করবে।

বিশাল মানুষটা সন্তুষ্টচিত্তে যোগ দিলেন, "কিন্তু, এখনও একটা পুলোশ রয়ে গেছে। অন্যদের ধরলে লোকেরা পুলোশকে খবর পাঠাতে হবে এবং একটা সংকেতও স্থির করতে হবে। এর মধ্যে পুলোশকে দরজা পর্যন্ত বোধ হয় কেউ পৌঁছাতে পারবে। কিন্তু সেখানের ব্যাপারে আছে। একবার তার কাছে খবর পৌঁছালেই সব ঠিক চলবে।"

"আমি খবর পাঠাবো," মহিলা বললেন।

"তাপনি, কাউন্টেস," মারকুইস ভদ্র কণ্ঠে বললেন, "আপনার আগ্রহ কত গভীর, তা আমরা জানি, কিন্তু—"

"শুনুন," মহিলা উঠে চৌবিলের উপর হাত রেখে বললেন, "ও বাড়ীর চিলকুঠরীতে পাহারা একটা ছোকরা আছে, সে যে কেয়ারলোকে চালাতো তাদেরই মত সরল ও নমনীয়। আমার সঙ্গে তার দু-তিন বার সিঁড়িতে দেখা হয়েছে। আমি তাকে পুলোশ করেছিলাম, কারণ আমার ভয় ছিল আমাদের এই পরামর্শ করার ফলের ওপরে সে বেশী কাজকর্মে থাকে। আমি ইচ্ছে করলেই ওকে আমার সম্পত্তি বানাতে পারি। সে তার চিলকোঠার ঘরে কবিতা লেখে—মনে হয় আমার সম্বন্ধে স্বপ্নও দেখে। আমি যা বলবো সে তাই করবে। সে-ই নিয়ে যাবে পুলোশের খবর।"

মারকুইস চেয়ার ছেড়ে উঠে "বাও" করে বললেন, "আমার কথাটা শেষ করতে দিলেন না কাউন্টেস। আমি বলছিলাম, "আপনার আগ্রহ যতখানি গভীর, কিন্তু আপনার উপস্থিত বুদ্ধি ও মোহিনী শক্তি তার চেয়েও বেশী কার্যকরী।"

যড়যন্ত্রকারীরা যখন ওয়ার্ডরোবের কাছে ছিলেন, তেঁকিত তার "সোপান সুন্দরী"র উদ্দেশ্যে রচিত অবশেষ দুই কবিতা নিয়ে ধস্তাধস্তি করছিল। পরে ওই সন্তুষ্ট অবাধ্যতের সঙ্গে তেঁকিত স্বয়ং খুলে দেওয়াতে যড়যন্ত্রকারীর সঙ্গে যোগ দেওয়ালো, মহিলা দস্তখতমান; গভীর সংযোগসন্ধান অবস্থায় পড়লে মানুষ যে রকম হাসতে থাকে, তার মুখ সেরকমভাবে ঔজ্জ্বল্য-পড়া অবস্থা, তার উপস্থিতে প্রাণিতে ভরেছে ভিতরে সরল দীপ্তি।

ভদ্রলোকের সে বললো, "মাসিয়, আমি আপনার কাছে বড় ঋণের পতে এসেছি। আমার বিশ্বাসে আপনি একজন খাঁটি মানুষ, আপনি ছাড়া আমাকে সাহায্য করার কেউ নেই। আমি যে কি করে সবের অতল, মানুষের ভীতের ঘরে ফিরে আপনার কাছে পৌঁছে এসেছি তা তখনকই জানেন। মাসিয় আমার মা মৃত্যু পলাচ্ছে। আমার মায়া ১৮ বছরের মেয়েটের পুলোশ রক্ষীদের ক্যাপটেন কোনো একজনকে ছুটে ফেতে হবে তাঁকে আনতে। আমি কি আশা করতে পারি—"

"মাদমোয়াজেল তেঁকিত যাবা ফিরে বললো, তার সেবার লম্বায় সাঁচ্ছন্নার উজ্জ্বল চোখ বিস্ফারিত করে, "আপনার আশা আমার উড়ে যাবার ডানা যোগাবে। বলুন, কেমন করে ভদ্রমোহাকে পাওয়া হবে।"

মহিলা একটি নীল করা খাম তার হাতে দিলেন। "দক্ষিণ দ্বারে যাবেন—মনে থাকে যেন, দক্ষিণের গেট—সেখানে গিয়ে রক্ষীদের বলবেন, "বাহুপাখী বাসা ছেড়েছে।" তারা আপনাকে ভিতরে ঢুকতে দেবে, তখন আপনি পুলোশের দক্ষিণ পুরের পথের সম্মুখে পৌঁছাবেন। কথা-গুলোর পুনরাবৃত্তি করবেন এবং চিঠিখানা দেবেন তাদেরই, যে প্রথমে বলবে, "বাহু-পাখী যখনই চায় তখন আবার ফিরতে পারে।" মাসিয়, এটা হল গুপ্ত সংকেত বাক্য যারা এটি আমার বিশ্বাস করে জানিয়ে দিয়েছেন কেন না এখন সারা দেশে গোল-মাল চলছে, রাজার বিরুদ্ধেও ষড়যন্ত্র হচ্ছে, তাই এই সংকেতবাক্য ছাড়া এদের কেউই পুলোশঘোষণে পুরুষে করার অধিকার পায় না। মাসিয়, যদি দয়া করে এই চিঠিখানা আমার কাছে ফেন তা হলে আমার মা চোখ মেলবার আগে একবার তাঁকে দেখা দেখে নিতে পারে।"

তেঁকিত গদ্গদস্বরে বললো, "দিন ওটা আমাকে। কিন্তু, কি করে আমি আপনাকে এত রাত্রে একা দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে বাড়ী ফিরে যেতে দিই?"

"না, না, আপনি ফেরে যান। এখন পর্যন্তই যুদ্ধের এক একটি মুহূর্তের মত মূল্যবান," মহিলা দীপাধারে চোখের বোদনী সুলভ মোহিনী দৃষ্টি নিক্ষার করে বললেন, "এক দিন আমি আপনার গুদ্ধতার ঋণ উপযুক্তভাবে পরিশোধ করবো।"

তাঁর চিঠিটা যুদ্ধের মতো পুরুষে সিঁড়ি দিয়ে এক ছোটে নেমে গেল। সে চলে যাওয়ার পর মহিলা নীচের ঘরে ফিরে গেলেন।

মারকুইসের অর্থপূর্ণ দৃষ্টি অনুসরণ তাঁকে পুলোশে অনুসরণ করলো।

মহিলা বললেন, "সে চলে গেছে। এর ভেতরে পুলোশের একটি ছেলার মতই ক্ষিপ্র পদে এক ঘোড়ায় ঘোড়ার মতই, সে চিঠিখানা নিয়ে ফ্রান্সে গিয়েছে।"

চৌবিলটা আবার ক্যাপটেন ফেরোলের মুখোমুখি ফেরে উঠলো। তিনি চীৎকার করে বললেন, "হায় ভগবান, আমি আমার বিশ্বাসগুলো ফেলে এসেছি—এখন কোনো অবস্থা আমি বিশ্বাস করি না।"

"এটা নিন," মারকুইস নিজের ফেরাকের তলা থেকে বিরাট, চকচকে, রৌপ্যখচিত একটি অস্ত্র বের করে দিলেন। "এর চেয়ে নিভুল নিশানার অস্ত্র আর নেই। কিন্তু, এটিকে সুরক্ষিত ভাবে রাখবেন, কারণ এর উপর আমার বাপচিহ্ন ও মোহর খোদা আছে এবং দুশ্চিন্তাবোই আমার উপর সন্দেহের দৃষ্টি পড়েছে। আজ রাতের ভিতরেই আমার এবং প্যারিসের মধ্যে যত ফেরোলের ব্যবধান আসতে হবে। আগামীকাল সকালে আমার নিজের পুলোশেই পাওয়া যায়। চলুন কাউন্টেস, আগে আপনি।"

মারকুইস মোমবাতিটা তুঁ, দিয়ে নিভিয়ে দিলেন। ফেরাকে ঢাকা মহিলাটি এবং ভদ্রলোক দুজন নিঃশব্দে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যু কান্তির সাকাঁশ অট্টালিকের প্রবেশদ্বার মধ্যে মিলিয়ে গেলেন।

তেঁকিত ছুটে চললো। রাজপ্রাসাদের দক্ষিণ দ্বারে তার যথাস্থানে বর্শাফলক এসে বাধা দিল, কিন্তু সংকেতবাক্য "বাহুপাখী বাসা ছেড়েছে" উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে সে পথ ঘুরে গেল।

পত্রবাহী বললো, "যাও ভাই, তাড়াতাড়ি ঢুকে যাও।"

পুলোশের দক্ষিণ সোপানে পুনরায় ওকে আটক করতে চেষ্টা করলো, কিন্তু আবার সংকেত বাক্যটি পহরীদের নিস্তব্ধ করে দিল। তাদের মধ্যে একজন এগিয়ে এসে সবে বলতে শুরু করেছে, "সে আমাকে—" কিন্তু পত্রবাহকের মধ্যে এমন কিছু ঘটেছে। সামরিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন একটি পুরুষ অকস্মাৎ তাদের মধ্য দিয়ে ঠেলে এগিয়ে এসে তেঁকিতের হাতে ধরা চিঠিটা ছিনিয়ে নিলেন। "আমার সঙ্গে এসো" বলে তাকে নিয়ে গেলেন ভিতরে হলঘরের অভ্যন্তরে। তারপর চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলে পড়লেন। মাস্কেটিয়ার অফিসারের ইউনিফর্ম পরিহিত এক ব্যক্তি সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন, তাঁকে তিনি ডেকে বললেন, "ক্যাপটেন চৌবিলো, আপনি দক্ষিণ দ্বার ও পুরোশ পথের রক্ষী-দের বন্দী করে প্যারিসে রাখুন। ওদের হাজতখানা তালা ও বিশ্বস্ত রক্ষীদের মোতায়েন করুন।" তেঁকিতকে বললেন, "আমার সঙ্গে এসো।"

তিনি তাকে একটি কবিতার ও ছোট কামরার মধ্যে দিয়ে একটি পথপ্রান্ত করে নিতে দেখলেন, যেখানে একটি গায় দেওয়ার পোশাক পরা বিরাট মানুষ একটি বিরাট চেয়ারে চিন্তামগ্ন হয়ে বসে ছিলেন। সেই মানুষটিকে তিনি বললেন : "সাহেব (মহারাজ), আপনাকে আমি আগেই বলেছি যে, সাধারণ জিনিস যেমন টিনের টুকরি থাকে তেমনি আমি সাধারণের মাঝখানে বাস করে পরিপূর্ণ হয়ে গেছি। আপনি তো বিশ্বাস করেন সাহেব, যে এটা আমার নিছক কল্পনা। এই লোকটা এদের সবে যোগসাজসে আপনার দরজা পর্যন্ত ঢুকে এসেছিল। ওর হাতে একটা চিঠি ছিল যা আমি ছিনিয়ে নিয়েছি। আমি ওকে সাক্ষাৎ মহারাজের কাছে নিয়ে এসেছি —যাতে আপনি আমার উৎসাহকে ভ্রান্ত প্রতিযোগিতা বলে না মনে করতে পারেন।"

"আমি ওকে পরখ করবো," রাজা চেয়ারে নড়েচড়ে উঠে বললেন। তিনি ভেতরের দিকে ভারী চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন, সে দৃষ্টির ওপর যেন একটা পাথরা অন্ধকার আস্তরণ পড়ে রয়েছে। কবি দাঁড়ি, নুয়ে অভিবাদন করলো।

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কোথা থেকে আসছো?"

"ইওথ-এ লোহার চেয়ার তৈরি করে থেকে, সাহেব।"

"সেখানে কি তার করো?"

"আমি—আমি কবি হতে চাই, সাহেব।"

"তোমার কি করতে?"

"আমার বাবার ভেড়ার পাল চরাতাম।"

রাজা আবার নড়ে উঠলেন, চোখের থেকে পর্দা সরে গেল।

"আ, মাঠে-মাঠে!"

"হাঁ, সাহেব!"

"তুমি মাঠে-মাঠে ঘুরে বেড়াতে, তুমি পুকুরের শীতলতায় ঝাঁপিয়ে এসে ঘাসের উপর, ভোর-বাতাস যখন পড়তে থাকতে। ভেড়ার পাল টিলার ঘাসে ছড়িয়ে পড়তো। তুমি গ্রীষ্মের চরা পত্রাহ থেকে পিপাসা মেটাতে, তুমি তোমার সুচিক্কণ লাল দাঁড়ি ছায়ায় বসে খেতে; আর, নিশ্চয়, তুমি একজনের মতো ব্যাঙ ঘাসের বাঁশী শুনতে পেতে। তাই না, মেরপালক?"

ভেতির দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, "ঠিক তাই, সাহেব। আর শুনতাম মৌমাছির গুঞ্জন, পুকুরের ছায়া, কখনও হয়তো টিলার ওপরের আওয়ে সাদাসেকারীদের গান। "হাঁ, হাঁ," রাজা অধিকতরভাবে বললেন, "হয়তো তাদের গানও শুনেছো, কিন্তু নিশ্চয়ই শুনেছো ব্ল্যাকবার্ডের গান। তারা সারাই গুরুত্ব দাবি দিচ্ছে, নয় কি?"

"ইওথ-এ লোহার-এর মত কোনওই তারা এত মধুর দিন দেয় না, সাহেব। আমি তাদের গান শুনেছি, কবিতায় তবে রাখার চেষ্টা করেছি।"

রাজা অন্যমনস্কের সঙ্গে বললেন, "তুমি কি কবিতাগুলো আমায় আবৃত্তি করতে পারো? অনেক দিন আগে আমি ব্ল্যাকবার্ডের গান শুনেছিলাম। যদি কেউ সাইকেলের কলের মনের অর্থোদ্ধার করতে পারতো। তাহলে ব্যাপারটা বাস্তব করার চেয়ে অনেক ভালো হতো। আচ্ছা, তবে তুমি ভেড়া-গুলোকে তাড়িয়ে খোঁয়াড়ে তুলিয়ে হাতের লাঠিতে নির্ভিবিলিতে ভর দেওয়ার সুস্বাদ, দাঁড়ি থেকে। না? তুমি সেই কবিতাগুলোর সুরঝঙ্কার করতে পারো না, মেরপালক?"

ভেতির পরপর্যায়ক্রমে আসুরের সঙ্গে বললো, "সেগুলো এই ধরনের, সাহেব :"

"ওগো মেরপালক, দেখো তোমার মেষ দিল্লি ঘাসে ওপরটিতে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে;
দেখো, তার গায়গুলি হাওয়ায় নাচছে,
শোনো, পান তার সবের বাঁশী বাজাচ্ছে।
শোনো, অন্যরা গাছের উপর থেকে ডাকছে,
দেখো, তারা তোমার মেষের পালের উপর
উড়ে বেড়াচ্ছি;
কিন্তু, পলক দাও, আমরা তাই দিয়ে বাসা
গরম রাখবো
সেই ডালগুলিতে, যেখানে—"

একটি কর্কশ স্বর বাধা দিয়ে বললো, "মহারাজ যদি অনুমতি করেন তাহলে আমি এই ছত্রাওয়ালাকে দু একটা সালাম করি। নষ্ট করার মত আর সময় নেই। যদি আপনার নিরাপত্তার জন্য আমার এই উৎকণ্ঠা মহারাজের বিরক্তির উদ্রেক করে তবে আমি ক্ষমা চাইছি।"

রাজা বলেন, "ডিউক অব আমাল-এর আনুগত্য এতবার প্রমাণিত হয়েছে যে বিশ্বাস হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।" তিনি আবার চেয়ারের মধ্যে ডুবে গেলেন, চোখের উপর আবার নেমে এল সেই আস্তরণ।

ডিউক বললেন, "পথের আপনাকে ও যে চিঠিটা এনেছে সেটা পড়ে দেখা দরকার।"

"আর তাতে মহারাজের মৃত্যুপরিকল্পনা। তবে অবশ্য মত যদি সে পত্রের আত্মার চলা হয়ে তাহলে পত্রবর্তনা করতে যায় তবে শু এলেনানোর-এর ঘোড়ে রাজদ্রোহী আঘাত হানবে। এই যদি তার উদ্দেশ্য থাকে, তবে পত্রবাহের বাঁকল পর্দাটির কেন্দ্রে উপরের আয়নায় একটা লাল আলো জ্বেলে রেখো, তাতে রাজদ্রোহী অবহিত হতে পারবে।"

ডিউক শান্তস্বরে মৃদু বললেন, "চাষী, তুমি কথাগুলো শুনলে। কে তোমাকে এই চিঠি আনতে অনুরোধ করেছিল?"

ভেতির আন্তরিকতার সঙ্গে প্রত্যয় দিল, "ডাই লর্ড ডিউক, আপনাকে সবই বলছি। এটা দিয়েছিলেন একটি মহিলা। তিনি বলে-ছিলেন যে তাঁর দাদা অসুস্থ, এবং এই চিঠিটা পেলে তার দাদা ভোর সময়ের সময়ে দেখতে আসবে। আমি চিঠিটার ভেতরে কিছু, বুঝতে না, কিন্তু, শপথ করে বলতে পারি তিনি সুন্দরী ও সৎ।"

"মেয়েটার বর্ণনা দাও", ডিউক হুকুম করলেন, "আর বলো কি করে তুমি তার হাতের পুতুল হলে।"

"তার বর্ণনা দেবো," ভেতির মধুর হাসি হেসে বললো, "আপনি কি আমাকে কথার মারপ্যাঁচে অপরাধিক ব্যাপার করতে হুকুম করছেন? সে সুন্দরীলোক ও সততার প্রতীক। সে আমাকে তাদের মধ্যে দিয়ে তারা, তাদেরই ছদ্ম তার চলাফেরায়। তার চোখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতেই তার দৃষ্টি পরিবর্তিত হয়। কখনও গোলাপের, কখনও অর্থোদ্ভিদ্রীর, যেন চোখের মধ্য দিয়ে সুরে উঁকি মারছে। যখন সে হাসে, যেন চারিদিকে স্বর্গ বর্ষিত হয়, তখন সে চলে যায় হৃদয়াকাশ ও হৃদয় ফুলের সুগন্ধ। সে আমার ওকে ২১ না ৩, কাঁচের বাড়ীতে এসেছিল।"

ডিউক রাজার দিকে ফিরে মন্তব্য করলেন, "সেই বাড়ীটা। সেটার উপর আমার নজর রেখেছি। কবির কল্পনায় পুরো ব্যাপার তুলোধোনা ব্যাটেলিয়ন ফেলেদেরি ছবি পেলাম।"

ডিউক স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে "সাহেব এবং লর্ড ডিউক, আমি আপনার কবি আমার কবিতাগুলি কেবল প্রকাশ করে নি। আমি মহিলার চোখে চোখ রেখেছি। চিঠি থাকুক আর না থাকুক, আমি আমার জীবন পণ করে বলতে রাজী আছি সে একটি দেবী।"

ডিউক স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে রেখেছেন। "আমি তোমাকে পরীক্ষা করবো" বইয়ের বাঁকে তিনি কথাগুলো উচ্চারণ করলেন। "সাহেব পোশাক পরে তুমি নিজে মহারাজের পরিবেশ সততার যোগ দেবে সাহেব আছো। তুমি এ পরীক্ষায় রাজী?"

ভেতির বললো। "আমি তার চোখে চোখ রেখেছি। সেখানেই আমার পরমার্থ পেয়ে গেছি। আপনার যেমন খুশী পরীক্ষা নিতে পারেন।"

রাত বারোটা বাজার আগে ঘণ্টা জানে ডিউক এ আমাল তাঁর নিজের হাতে পত্রবাহের রক্ষিত-পশ্চিমের একটা চিমনির একটা লাল আলো জ্বালালেন। ঠিক বারোটা বাজতে যখন মিনিট বাকী, তখন ভেতির ডিউকের হাতে ওর দিয়ে ঘাসের পোশাক পরে, ছায়াকীর্ণ আলোর থেকে কেন্দ্রের বাধা থেকে বাঁধে বাঁধে বেরিয়ে অপেক্ষমান গাড়ীতে উঠলো। ডিউক তার হাত ধরে গাড়ীতে তুলতে সাহায্য করে দরজা বন্ধ করে দিলেন। গাড়ী গতিতে পথে ছুটে চললো।

দু এলেনানোরের ঘোড়ে একটি বাড়ীতে সরাসরি আলমাল ছেলেরা নিজেদের সৈন্য নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। অত-রক্ষীরা এলেই তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার উদ্দেশ্যে।

কিন্তু, ঘোলের ঘোলো কারণে অত-রক্ষীরা তাদের ব্যূহের সংখ্যা পরি-বর্তন করেছিল। সাহসীর সঙ্গে মেরে দু কিলোমিটারে পৌঁছেছে, দু এলেনানোরের চেয়ে একটা মোড় আগেই, কালভার্ট ঘোরাল ওর হবে, যাহোক্তাই দল নিয়ে রাস্তার মেরে গাড়ীখানার উপর আক্রমণ চালালেন। অত-কিত আক্রমণে বিমূঢ় হলেও শকটরক্ষীরা মেরে বীরের মত ধাবা করলো। যুদ্ধের

উন্নয়নশীল দেশে শিল্প বিকাশ এবং
সম্প্রসারণই সমৃদ্ধির সোপান।

বেঙ্গল লিন (ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ফার্নেস) লিমিটেড

(ইন্দো ঃ জার্মান এণ্টার প্রাইজ)

৪১ চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৬

শব্দ পেয়ে আশপাশ থেকেও ছোটরা ছুটে এল তাদের উপাধ্যায়কে। নিজে, ইতিমধ্যে, ধরিত্রী আমাদের যেসব আরণ্যক অন্ধকার ধরনা ঘেঁটে ঘুরে বেড়ান তিনিও অপরাহ্ণের ঘুর্ণিটির থেকে তাঁর প্রাণ বাঁচাবার জন্যে দৌড় দিলেন।

ততক্ষণে, বিদ্যুৎ ঝিলিক উপস্থিতিতে রাত্রিদৃশ্য চাঁদমারি ও ইস্পাতের ধনুকে মুখরিত হয়ে উঠলো, কিন্তু, ভীত অন্ধকারের পক্ষটানকে পলায়ন করলো। গভীর উপরে মাথে ছাইল হতোদ্যম নকল বাজা ও কবির মতোদের, যার মতোর কারণ হল বাঁশবনির মার্কুইস ল যোগাড়ঁয়েল-এর পিস্তলের একটি গুলি।

বড় রাস্তা

যেখান থেকে তিন ছেলের সোজা দিয়ে পথটা এঁকেবেঁকে একটা বাঁকায় পরিণত হয়; প্রায়োজিতভাবে আর একটা চওড়া রাস্তার সঙ্গে গিয়ে মিলেছে। ছোট্ট কিছুক্ষণ অনিশ্চিতভাবে দাঁড়িয়ে থেকে পথের পাশে বসে পড়লো একটু বিশ্রামের মেওয়ার চলা।

পরবর্তীদিন কোথায় যেতে তা সে জানতো না। যে দিকেই চোখ ফিরুক সেদিকেই বিশাল ও কর্মচি পরিপূর্ণ বিরাট বিশ্বের মধ্যে দিয়ে সফরের সম্ভাবনা। বসে থাকতে থাকতে তার নজর পড়লো একটি উপরে তারার পরিচি, ছোট্টির সে ও ইভেন একান্ত আপনার ছেলে নামকরণ করেছিল। এর থেকেই ইভোনের কথা মনে পড়লো; তার মনে হল হয়তো সে অন্যান্যদের প্রতি-কারিতার পরিচয় দিচ্ছে। দু-একটা কথা কাটাকাটির জন্য বাসস্থান ও ইভোনকে ত্যাগ করার কী প্রয়োজন? শেষে কী এরকমই একটি তুচ্ছ বস্তু যে তৈরি বেদনার রেখা দিলেই তা ভেঙেচুরে খানখান হয়ে যাবে? সন্ধ্যার অকিঞ্চিৎকর ঘুমঘুমেঘনাগুলি সকলেই সেরে যায়। এখনও তার মনে ফেলার সময় আছে, এখন ফিরলে সন্ধ্যি-মন্দরে ভেতর গভীরের শুদ্ধ অধিবাসীরা কিছুই জানতে পারবে না। তার ঘুমের ভো ইভোনকেই সমর্পিত; সেখানে সে চিরদিন বাস করে এসেছে সেখানে থেকেই তো ভাবা-চর্চাও করতে পারবে, সুখও পাবে।

ভেক্তির উঠলো, বেড়ে ফেললো তার অস্থিরতা, মন থেকে মুছে ফেললো সেই পলায়নপর অশান্তি পাগলামি। সে হাঁটতার সঙ্গে যে পথ দিয়ে এসেছিল সেই পথে ফেরার মনে মনে পেরালো। সেই পথ দিয়ে হতক্ষণে সে ফেরে ফিরে এলো, ততক্ষণে তার ভ্রমণক্লান্তি মিটে গেছে। ফেরার ঘোঁড়াও পার হয়ে গেল ভেক্তির, ফেরাগুলো চঞ্চল হয়ে উঠলো অনবরত তার পদক্ষেপ শুনে, সেই পায়ের চলাচলের শব্দে ভেক্তিরের মনের ঠিক হয়ে উঠলো। নিজেকে সে তার ঘোড়া জানবার্ডিতে গিয়ে শুয়ে পড়লো, তার পরিচ্ছদগুলিকে যে সে ভাঁজে অন্যান্য সবের সাথেই রাখিয়ে করতে হয় নি তার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালো।

ভেক্তিরের মন সে সারাই ভালো করে বুঝতো। পরের দিন সন্ধ্যায় ইভোনকে দেখা গেল সেই ফুরোরার পাশে, যেখানে গাছের ঘুরুক-ঘুরুরীরা ভয় হয় পেয়ে-ছিলের উপদেশ, পাদ্রী সাহেবের ভিয়ে ভেওয়ার আয়োজন চলে। তার ছেলের লোপ ভেক্তিরের খেলতে ব্যস্ত ছিল। ধর্মও তার ওষ্ঠপুটে অনমনীয়তার ভাঁজে ঘুর্নিবন্ধ ছিল। ভেক্তির সে বুঝি লক্ষ্য করলো, সাহস করে সেই গম্ভীর মুখের সামনে দাঁড়িয়ে তার থেকে পরিত্রে অনুরোধের কথা এবং পরে ঘুরুনে এসবকে ঘরে নামবার পথে একটি চুম্বনও খাবার করলো।

তিন মাস পরে তাদের বিয়ে হল। ভেক্তিরের বাবা ছিলেন মহাজন ও পুরুত। তিনি বিয়েতে এমন ঘুরুনায় করেন যে, তিনি কেউ শুরুও সাড়ি পোনা যেন। তরুণ-তরুণী দুজনেই পরিবেশের শিকারের ছিল। পরদিন পথে লোভাযাত্রা হল, মরমরনে নাচ হল, 'তু' থেকে পুরুল-নাচ ও কলরবের দল এসে অতিথি যের অভ্যর্থনা করলো।

এক বছর কেটে গেল, ভেক্তিরের বাবা মারা গেলেন। ভেরার পাল কুরে-ঘরের উত্তরাধিকার পেল ভেক্তির। পাত্রের মেয়ে সুন্দরী বৌ তো তার প্রেমের থেকেই ছিল। ইভোনের ঘুরের বালতি ও মেওয়ের কৌলিন্যগুলো ছিল তকতকে—হাঁ, এত তকতকে যে ও পথে চললে তার থেকে চোখ ফিরিয়ে চোখ বাঁচা করে নিতে। কিন্তু তার আভিজাত্যও মেয়েদের মত ছিল, মেয়েদের ফুলের মেয়েগুলো এত উজ্জ্বল ও পরি-চ্ছন্ন যে মানুষ ঘুর্ণিগুলি আবার ফিরে পেত। তার পানও শোনা যেত, মধুরের পর্যন্ত, এমন কী ঘোড়া বাসস্থানের তলায় ঘুরো পুরনোর ভাঙারঘরটা পর্যন্ত পোঁছাতো তার স্বর।

কিন্তু এতদিন এরা যখন ভেক্তির দীর্ঘ দিন বন্ধ ভেরার থেকে মেখার কাগজ বের করে পেনসিল আমরাতে সুরু করলো। আবার বসন্ত এসে তার দুরে স্পর্শ করেছে। সে শীতাকরের কবিই ছিল ঘোষবন্ধ, তারপর ততক্ষণে ইভোন পাত্র বিস্মৃত হল। মাটির নতুন কমনীয়তা ও অনুপম সুষমার বাদ্য তার ঘুমের ঘর করে নিল। তার মন ও পরিস্থরের সুগন্ধ তার পাশে অপূর্ব উন্মাদনা আনলো। প্রথমে পরোয়াই সে ভেরার পাল চরাতে নিয়ে গিয়ে ঘরে নিরাপদে ফেরের ফিরিতে আনতো, কিন্তু এখন সে ভেরের তলায় গা ফেলে দিয়ে কাগজের উপর অবিরামই ঝুঁকে থাকতো। ভেরাগুলো এবার ওধার ইচ্ছিয়ে পড়তো, তার নেকড়ে-গুলোও বুঝে নিয়েছিল যে কবিতা রচে পড়তে হয়, ভেরার মনে পরেই নিশ্চয়ে পাওয়া যায়, কবিরই আমাও চুপচাপ বন থেকে বেরিয়ে ভেরা চুরি করতে সুরু করলো।

ভেক্তিরের কবিতা সম্পর্কে ক্রমেই বড় হতে লাগলো, ভেরার সংখ্যাও কমতে লাগলো সেই অনুপাতে। ইভোনের নাকের ডগা ও মেওয়ে কয়েক ইঞ্চি উঁচু হতে সুরু করলো, কথাবার্তাও হল গীতিময় লম্বা বিশেষ বাক্যাংশ-কৌশলিগুলোর ভিতর কখন বিষয়ে উঠলো তার চোখে। সে কবিকে ভালো করে বুঝিয়ে দিল যে অবহেলায় ফলে ভেরার পাল কমেগাই কমছে ও গৃহ-স্থালীর অবস্থা ঘরে উঠছে শোচনীয়। ভেক্তির একটা ভেরাকে রাইনে দিয়ে ভেড়ু পাহাড়ে ভেওয়ার কাজে নিযুক্ত করলো এবং নিজে কুঁড়েঘরের ভেতর চিলেকুঠরি কথ করে তারো অনেক কবিতা লিখলো। ছেলেটাও ছিল স্বভাব-কবি, কিন্তু সে কবিতার ভাষায় আত্মপ্রকাশ করতে অক্ষ হওয়ায় সেকে ঘুরিয়েই সময় কাটালো। ভেক্তিরের আবিষ্কার করতে দেরি লাগলো না যে, ঘরে ও জমা পয়সাই এক বস্তু, অতএব ভেড়ার পাল কমেগাই ছো হতে থাকলো। ইভোনের ঘর-মেওয়ায় তা ভেঙে বাড়তে লাগলো। কখনও কখনও ে উঠোনে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে ভেক্তিরকে গালাগালি দিত, উঁচু চালাতে তাকে দিয়ে তা ভেক্তিরকে কানে মধুবর্ষণ করতো। ে সব সময়েও তার স্বর ভেড়ার বাচ্চাগুলো ঘুরো পুরনোর কাছাকাছি পর্যন্ত পৌঁছাতো।

উকীলবাড়ুরি, এসব ব্যাপারেই দেখলেন শুনলেন, তাদের তার স্বভাব ছিল ন ব্যাপারেই নাক গলানো: তিনি ভেক্তিরকে কয়ে দিয়ে বিয়েটা এক টিপ নস্য নিয়ে পরিচি সময় করে বললেন :

"বন্ধু ছিনো, আমিই তোমার বাবা বিয়ের সাঁটাঁটিকরেই সাল লাগিয়েছিলাম এবং ছেলের দেওয়ালিবাবু দুজন বাঁধিয়ে সেই সাল লাগাতে আমার বড় বন্ধা লাগবে কিন্তু, তাঁর সেই লাগাবার কারণ: এসে জানছো। আমি পুরনো কথা ছিলেরে কথা বলছি। দেখতেই পাচ্ছি কারাচ্ছা তোমার মন-পরাণ নিবিষ্ট রয়েছে। 'ঘুরে আমার এক কথা আছেন ধরিত্র বিয়ে তাঁর নাম। এই অন্ধকারে, ভয় বিয়ে বাড়ীতিতি বইয়ের মধ্যে একটুখানি খো করে নিয়ে এসে থাকেন। তিনি পণ্ডিত লোক, পরিচি অনেক পাণ্ডিত্যের কাজও নিয়ে বইও লিখেছেন। তিনি তোমায় বলতে পারেন কবে রোমান ক্যাথলিক্স (ভূগর্ভস্থ 'পাতাল-পুরী') তৈরী হয়েছিল, কি করে তাদেরকাপড়ের নামকরণ হয়, সেন্টারে পাখীর লম্বা ঠোঁট কেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। তোমার কাছে ভেড়ার মা বা তাদের অর্থ যেমন পরিষ্কার তাঁর কাছে কবিতার অর্থ ও ঝঙ্কারটি তেমনিই সহজ। আমি তাঁর কাছে তোমার হয়ে একখানি চিঠি লেখ, তুমি তাঁর কাছে তোমার কবিতা লন্ডার নিয়ে গিয়ে তাকে পড়তে দিও তখন তুমি জানতে পারবে যে, তোমার আরও লেখা উচিত, না সুরী ও জয়বাদের দিকে নজর দেওয়া উচিত।

"চিঠিটা লিখুন, তারপর দেখা যাবে," আপনি এর আগে একটা বেশি ভালো ছিল।"

পরমুহূর্তেই মুখোশটার ওপর সজোরে একটা ঘুষি বসিয়ে দিল। অভিমানে যেন ফেটে পড়ল, তারপর। বিপক্ষদলের সে ফাঁসির বিলে-এর ওপরই গোঙরে গুলোয়াড়া পা চালাল। পাশ্চাত্য মানুষটি ফাঁসির পাশবিকতার হিংস্রতা দেখে চেয়ারকে তলায় ভিতরে দিয়ে তাঁর বন্ধুরা নিজেদের মুখে নিলেন, মুখ যেমন করে চল শুষে নেয়। তিনি ভেতিতকে জিততে পড়ার ঘরে দিয়ে গেলেন এবং তাকে ভেতরের মহাসভাগুলির মধ্যে ছোট একটি স্বাধীনের বাক্যবাণে বসালেন।

ফাঁসির বিলে বিধেয়কম্পন বাক্যটি। তিনি এক আঙুল পুরু কবিতার পাণ্ডুলো তাড়া দেখেও থামছিলেন না। পাণ্ডুলো কলাগোলো নিজের প্রন্থের উপর ছেড়ে পড়তে সুরু করলেন তিনি। বিস্ময়ই তাঁর আচ্ছন্নিলোব বিষয় নয়: পাণ্ডুলোকা যেমন ফল করে করে মধ্যে বাঁয়ের দিকে এগিয়ে যায় তেমনি করে তিনি সেই পড়লের পাঠোদ্ধার করতে থাকলেন।

ততক্ষণ ভেতিত আচ্ছন্নতুর হতো নাবিকের মত নিঃসঙ্গ বসে রইল, চারপাশের নাবিকদলের ঠেউয়ে কাপতে কাঁপতে। এই সাবিত্রাসমূহ তাঁর কানে পরমা করতে লাগলো। এর কাছে ও সাগরে পাড়ি দেওয়ার উপযুক্ত না ছিল মাস্তিষ্ক, না ছিল কম্পাস। তার মনে হল পৃথিবীর অর্ধেক মানুষ বোধহয় শুধু বই লেখার কাজেই ব্যস্ত আছে, না হলে এত বই আসে কোথা থেকে!

ফাঁসির বিলে কবিতাগুচ্ছের শেষ পাতাটি পর্যন্ত করে ফেলেন। তারপর চশমাজোড়া খুলে রুমাল দিয়ে চোখ মুছলেন।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "আমার পুরনো বন্ধু পাদ্রিনো তাহলো আছেন তো?"

"ফাঁসির বিলো, আপনার কতাগুলি ভেড়া আছে?"

"ভাল যখন গুনেছিলাম, তখন তিনশো নাঁচি ছিল। পালটার বড় দুর্ভাগা। আইনো পলাল থেকে ভয়ে ভয়ে এখন এই কটিতে এসে ঠেকেছে।"

"আপনার স্ত্রী আছে, ঘর আছে, বেশ বহাল তবিয়তে ছিলেন আপনি। ভেড়ার থেকে আপনার অবশ্যই আয় ছিল। এতের সঙ্গে মাঠে ঘুরে, মুক্তবায়ুতে বাতাসে ভর করে পাখির মিষ্টি গলগান শুনতে আপনার। আপনার আর ছিল শুধু একটু চোখ বন্ধ খোলা রেখে পরমাত্মার বুকে হেলান দিয়ে থাকা, কুয়োর ভিতরের ব্যাঙেরমতই নিশ্চিন্ত খোলা। এ পর্যন্ত আমি ঠিক বলেছি, কেমন?"

এ ঠিক, তোতিত প্রবাহ ছিল।

ফাঁসির বিলে বলে চললেন, তাঁর পুরস্কার-সমুদ্রের ঘুরন্ত ঘূর্ণি মিলিয়ে করে, যেন সুখের কিনারে তিনি একটি পালের অবশেষ দেখতে পেলেন: "আমি আপনার সব কবিতা পড়লাম। ঐ দিকে দেখুন, ঐ আলমারীটার ভিতর দিকে, ফাঁসির বিলো, বলুন তো ঐ পাণ্ডুলোর উপর কি লেখা আছে?"

তোতিত দেখে বললো, "দেখার একটা বাক্য।"

ফাঁসির বিলো বললেন, "ঠিক বলেছ এক লেখকের পাখী, যে আমাকে আমার কবিতা থেকে বিচ্যুত হতে দেয় না। ফাঁসির বিলো, পাখীটিকে আপনি চেনেন, ও হচ্ছে আকাশের মানসিক। সে তার নিজের ভালো আত্মসমর্পণ করে সন্তুষ্ট। বাঘ-ভেড়াকী চোখ ও লোকলোমান পক্ষদের সম্পদ ঐ পাখীটির ছোট্ট মুখী কে? ও পা চায় তা মাঠে-ঘাটে পায়। ও কখনো মুখে করে না ওর পালক ওটাতলের মত বহু বর্ণ-শোভিত নয় বলে। আপনি পড়েছেন ফাঁসির বিলো, পাখিটি ওতে কি খবর দিয়েছে। আপনার কি মনে হয় তা সত্যের নাইটিঙ্গেল ওর চেয়ে সুখী?"

তোতিত উঠে দাঁড়ালো। গায়ে ফেলে আসা ওকটা ভয়ঙ্কর কণ্ঠে কা-কা করে উঠলো।

"ধন্যবাদ, ফাঁসির বিলো", সে ধীরে বললো, "তাহলে আমার এইসব কা-কা করার মধ্যে নাইটিঙ্গেলের মতন আওয়াজ একটুকুও শোনা যায় না?"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফাঁসির বিলো বললেন, "তাহলে নিশ্চয় আমি তা ধরতে পারতাম। পড়িনি যখন আমি পড়েছি। থাক, যে, এখন দিয়ে কাজকাম করো, কাকা দেখার আর চেষ্টা করো না।"

তোতিত বাধার বললো, "আপনাকে ধন্যবাদ। এবার আমি আমার ভেড়াদের কাছেই ফিরে যাচ্ছি।"

পুরস্কারকর্তা মানুষটি বললেন, "আমার সঙ্গে যদি ঘরে আমার করে দুজনার চেলা তোলার চেষ্টা করো তাহলে তোমাকে আমি কবিতার বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে বলতে পারি।"

কবি বললো, না, মাঠে ফিরে আমার ভেড়ার পালের উপর কান্না করার সময় হয়েছে। ফিরে চললো সে, সেই পথ ধরে ফেনারের দিকে, কালে তার কবিতার তাড়া-গুলোকে পৌঁছে সে ফিলাদ্রা নামক এক আর্জানী ইহুদীর দোকানে ঢুকলো; ফিলাদ্রা এতে যা পেতো তাই খেতো।

তোতিত বললো, "বন্ধু, পাহাড় থেকে নেমে এসে নেকড়েরা আমার ভেড়াগুলোকে আক্রমণ করছে। তাদের বাঁচাবার জন্য আমাকে অস্ত্রশস্ত্র কিনতে হবে। তোমার কিছু আছে না কি?"

"বোস্ত ছিলো, আমি আমার বন্ধু খুঁজিনি, কারণ আমি ভেবেছি তোমাকে আমি একটা অন্য কিছুই করতে বাধা হবো এখন মনে, যা তার আসল মূল্যের কম তলোয়ার এর তার নয়। গত সপ্তাহেই আমি একটা ফেরীওয়ালার কাছ থেকে এক পাত্রী মাল কিনেছি, যা সে গ্রামের মোজাবক্সের নীলামে কিনেছিল। মালার হুড়োহুড়ি এক কিরাট লর্ডের স্যামার ও সম্পত্তির—আমি তার উপাধি জানি না, তবে তাঁকে বিদ্রুপের হতাশের আতঙ্কেরে নির্বাসিত করা হয়েছে। এই লটে রাস্তাই করা অনেকগুলো প্রাদেশিক মনে। এই বিশ্বকল্প—ও, রাস্তার উপযুক্ত একখানা গল্প করি—এটার নাম পরবে মাল চালান করা, শুধু তোমার চেনা, কথা ছিলো, না হয় আমার সোনা সমেত করা লোভনেই হল। তবে তোমার একটা পাখা-ধনুক—"

তোতিত মাউন্টার টানা ফেলে দিয়ে বললো, "তাতেই চলবে। এটা পাখা আছে কী?"

"আমি দেখে দিচ্ছি। তবে দলটা যদি গ্রামে কিছু, গালি বাদুরও দিতে পারি।"

তোতিত পিস্তলটা তোমার তলায় ঢুকে নিজের কাঁধে ঘরে ফিরলো। ইজোন সেখানে ছিল না। সম্পাদিত তার পাড়া-পড়শিবেলীদের সঙ্গে গল্পগুজবের আড্ডায়। একটু, ফেড়েছিল। কিন্তু, রাস্তাঘরের উনুনে গনগনে আঁচ ছিল। তোতিত দুলন্ত কম্বলার ওপর কবিতা-গুলো মেলে দিল। সেগুলো ধপ্ ধপ্ করে চলে ওঠার চিমনি দিয়ে একরাশের কক্ষ পুরন বদলি শোনা গেল।

তাঁর মন্তব্য শুনলো, "কাকের কাকলী।"

চিলকোঠায় গিয়ে সে স্যার বন্ধ করে দিল। গরম তখন এতই নিস্তব্ধ ছিল যে তলা কাঁড় লোক বিকট পিস্তলটার গর্জন শুনতে পেলো। তারা সেখানে ভীড় করে এসে সিঁড়ি বেয়ে উঠলো, ধোঁয়ার কুণ্ডলীর উৎস সন্ধান করে।

পুরুষেরা কবির মুখোমুখি বিছানার উপর শুইয়ে দিল, তখনও হাতে চেষ্টা করলো সেই হতভাগা কালো কাকের ছিন্নভিন্ন পালক জোড়া দিতে। মেয়েরা মুখর হয়ে উঠলো মায়া ও সহানুভূতি পাতলের সাগরে বিলাসে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ দৌড়ে ইজোনকে খবর দিতে গেল।

ফাঁসির পাশিনোর সন্ধানী মাঠে ওঁকে পুরুষ আলমন্ত্রকের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিয়েছিল। তিনি অপরটা তুলে নিয়ে তার রোমশ তারুকার্যের উপর চোখ বুলিয়েছিলেন লোকক্ষ বোঝার প্রাণবাক্যটিতে।

পাদটীকে ফিস্ ফিস করে বললেন, "ফাঁসোমিয়ন মার্কুইস না বোলার্ডেস-এর বলেছিল বোধা আছে।"

সম্পাদক : অভিজাত বন্দ্যোপাধ্যায়
অলোককুমার দাস কর্তৃক মডার্ন ইণ্ডিয়া প্রেস, ৭ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলি : ১৩
থেকে মুদ্রিত ও ৬০১২, বর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত।

CALCUTTA

জীবনে বাঁচার
মতো বাঁচতে হলে
শক্তি চাই

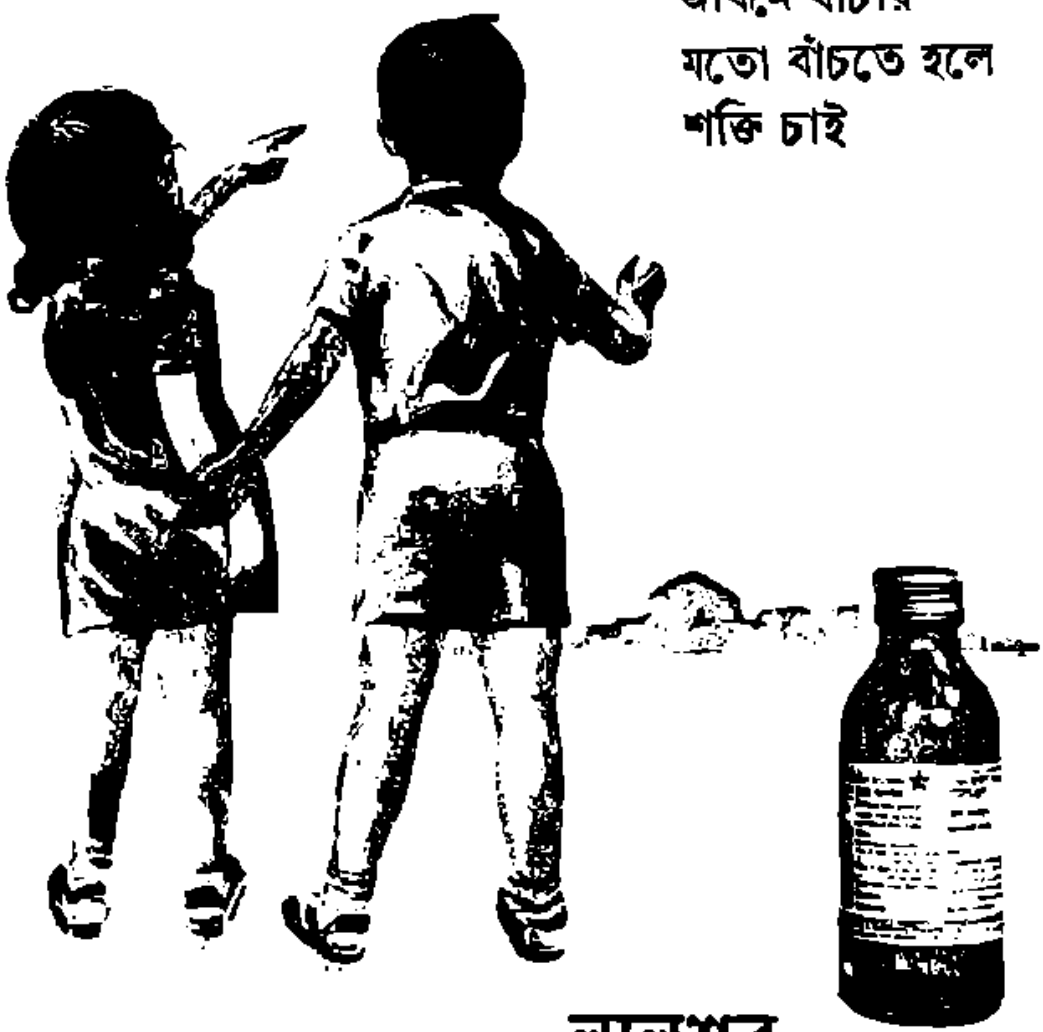

এদের **লালশর** খেতে দিন

(ডাবর বালামৃত)

১৮৮৪ সাল থেকে আপনার সেবায় নিরত

ডাবর (ডাঃ এস. কে. বর্ধন) প্রাইভেট লিঃ কলিকাতা-২৯

সমস্যা ?

এই দুর্মূল্যের অনিশ্চয়তাপূর্ণ দিনগুলিতে স্নেহশীলা মায়ের ঘরোয়া সমস্যার অন্ত নেই। তা বলে ছেলের সম্ভাবনাপূর্ণ ভবিষ্যতের প্রতি তিনি উদাসীন থাকতে পারেন না।

তিনি সংসারের খরচ-পত্র কমিয়ে পয়সা সাশ্রয় করেন। কারণ তিনি জানেন ছেলের ভবিষ্যতের জন্য তাঁকে সঞ্চয় করতেই হবে। আজ তিনি যে কষ্ট স্বীকার করছেন ভবিষ্যতে তার সুফল পাবেন।

'সেণ্ট্রাল'-এ সঞ্চয় করুন—
বেসরকারী সংস্থায় ইহাই বৃহত্তম ব্যাঙ্ক।

দি সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস : মহাত্মা গান্ধী রোড, ফোর্ট, বোম্বে-১
ভি. সি. প্যাটেল—চেয়ারম্যান
আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা-এর প্রধান অফিস :
৩৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১
বি, সি, সর্বাধিকারী—চীফ এজেণ্ট

CBI-19

ছোট পরিবার সুখী পরিবার

• জননী ও শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষা

• স্বাস্থ্যোজ্জ্বল শিশুটী

• পরিবারের আর্থিক উন্নতি

• সুন্দরতর ও সমৃদ্ধতর জীবন